পৌর-বিজ্ঞান

ও

অর্থশাস্ত্রের গোড়ার কথা



শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য

পৌর-বিজ্ঞান

ও

অর্থশাস্ত্রের গোড়ার কথা

সিটি কলেজের বাণিজ্য-বিভাগের অধ্যাপক
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক

শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য

এম. এ (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত), বি-এল (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত),

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট : কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ
জুলাই : ১৯৪৮

দাম : পাঁচ টাকা মাত্র

কলিকাতা ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক প্রকাশিত ও
২৪, বাগমারী রোড দত্ত প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীবিভূতিভূষণ পাল কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক কলা-বিভাগের ছাত্রদের জন্য Civics and Elements of Economics নামক বিষয়ের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী এই পুস্তক রচিত হইল। বহু দিন হইতে কলেজে অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ইহা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়াছি যে, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিবার পর ছাত্র-ছাত্রীগণ কলেজে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে বক্তৃতা শুনিতে বাধ্য হইয়া পাঠ্য বিষয় অনুধাবন করিতে বিশেষ অসুবিধা বোধ করে। বিদ্যার্থীর পরিশ্রমের এত অপচয় আর হইতে পারে না। ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা বুঝিতেই যায় অনেক দিন,—বিদেশী ভাষার আড়ালে আসল বিষয় বস্তু থাকে প্রচ্ছন্ন। ফলে অধীত বিষয় কোন-ও দিন আয়ত্ত হয় না, বড় জোর মুখস্থ রহিয়া যায়। আবার কত ছাত্র-ছাত্রী বিষয়-বস্তু বুঝিয়াও, ইংরাজী ভাষার জ্ঞানের অভাবে বক্তব্য গুছাইয়া বলিতে পারে না; অবিশুদ্ধ ভাষার জটিলতায় বিষয়-বস্তু রহিয়া যায় অপ্রকাশিত, কখনও বা হয় অপ-প্রকাশিত।

ইংরাজী ভাষার মধ্য দিয়া পড়াইতে গিয়া আমাদের অধ্যাপকদেরও কম বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয় না। সম্মুখের সারি সারি বেঞ্চে তারুণ্যের আশা ও আনন্দের দীপ্তিতে উজ্জ্বল বিদ্যার্থীর দল, অল্প দিনের মধ্যে আমাদের ধার-করা ইংরাজী বুলির আঘাতে ম্লান হইয়া পড়ে; হয়ত আত্মরক্ষার জন্যই বাজারের নোট বই মুখস্থ করিয়া সহজ পথে পরীক্ষার মরুভূমি পার হইবার সিদ্ধান্ত ঠিক করিয়া লয়। ছাত্র-ছাত্রীগণ নিঃশব্দে সহন শীলতার সহিত আমাদের ইংরাজী ভাষায় জুলুম স্বীকার করিয়া লয়; তাহাদের কাতর দৃষ্টি আমাদের বিচলিত করিলেও, সহজভাবে মাতৃভাষার সাহায্যে পাঠ্য বিষয়টি সরস করিয়া, মধুর করিয়া, বুঝাইবার পথে না গিয়া নীরস শুষ্ক কাষ্ঠের মতই কঠোর ও অপ্রিয় করিয়া তুলি। বস্তুতঃ, প্রচলিত বিদেশী ভাষার মাধ্যমে, বিষয়-বস্তু বুঝিবার ও বুঝাইবার পথে পর্ব্বত প্রমাণ বাধা সৃষ্টি করিয়া রহিয়াছে।

সুখের বিষয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীগণকে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর দিবার সুযোগ দিয়াছেন। আশা করা যায়, মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা দ্রুত সম্পন্ন হইবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এই পুস্তক রচনা করা. হইয়াছে। তবে, সাধারণ পাঠকও বইখানি পাঠ করিয়া 'পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রের' মূল বিষয়গুলি বুঝিতে পারিবেন, এইভাবে সরল ভাষায় বিস্তৃত আকারে বইখানি লেখা হইয়াছে। ভারতীয় ডোমিনিয়নের শাসন প্রণালীর সাম্প্রতিক পরিণতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং ভারত ও পাকিস্থানের অর্থনৈতিক অবস্থার কথাও বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। আশা করি ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এবং তৎসহ সাধারণ পাঠকবর্গ এই পুস্তক পাঠে আনন্দ ও উপকার লাভ করিবেন।

সিটি কলেজ, বাণিজ্য-বিভাগ
কলিকাতা
২৭শে জুলাই '৪৮।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

পৌর-বিজ্ঞান

(Civics)

প্রথম অধ্যায়

প্রস্তাবনা ১

পৌর-বিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক ... ২

পৌর-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান—পৌর-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র—পৌর-বিজ্ঞান ও ইতিহাস—পৌর-বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র ... ২—৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র ৫

রাষ্ট্র ও সরকার—সার্ব্বভৌমত্ব ... ৫—১১

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ১২

রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক উৎপত্তির মতবাদ—রাষ্ট্র চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—রাষ্ট্র গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—The Patriarchal Theory—The Matriarchal Theory—রাষ্ট্রের উৎপত্তি এক দিনে হয় নাই, ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে ধীরে ধীরে হইয়াছে ... ১২—২১

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রের গঠন-তন্ত্র ২২

দুই শ্রেণীর গঠন-তন্ত্রের সুবিধা ও অসুবিধা ... ২২—২৫

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যক্তিতন্ত্রবাদ বনাম সমাজতন্ত্রবাদ ... ২৬

ব্যক্তিতন্ত্রবাদের পক্ষে যুক্তি—ব্যক্তিতন্ত্রবাদের বিপক্ষে যুক্তি—সমাজতন্ত্রবাদ—সমাজতন্ত্রবাদের স্বপক্ষে যুক্তি—সমাজতন্ত্রবাদের বিপক্ষে যুক্তি—সিদ্ধান্ত—রাষ্ট্রের প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র কি—রাষ্ট্রের কার্য্য-বিভাগ ... ২৬—৩৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

সরকারের শ্রেণী-বিভাগ ৩৬

রাজতন্ত্র—অভিজাততন্ত্র—গণতন্ত্র—গণতন্ত্রের সপক্ষে যুক্তি—গণতন্ত্রের বিপক্ষে যুক্তি—সিদ্ধান্ত—গণতন্ত্র সফল করিতে হইলে কোন্ জিনিষ আবশ্যক ?—গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ডিক্টেটরশিপ বা একনায়কত্বের আবির্ভাব—মন্ত্রিমণ্ডল শাসিত সরকার এবং প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার—প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার—এক রাষ্ট্রীয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার—যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বিশেষত্ব কি ?—যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বন্টন—যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বন্টনের প্রণালী—যুক্তরাষ্ট্রের স্থবিধা ও অস্থবিধা—যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ৩৬—৫২

সপ্তম অধ্যায়

বিভিন্ন সরকারী কার্য্যের পৃথকীকরণ ... ৫৩

সমালোচনা—সিদ্ধান্ত—ভারতে সরকারী ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি ও প্রয়োগ ... ৫৩—৫৬

অষ্টম অধ্যায়

আইন সভা, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ ... ৫৭

আইন সভার ক্ষমতা—এক পরিষদ বিশিষ্ট আইন সভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি—দুই পরিষদ বিশিষ্ট আইন সভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি—শাসন বিভাগ—শাসন বিভাগ কিভাবে সংগঠিত হওয়া উচিত ?—বিচার বিভাগ—বিচারক নিয়োগের নিয়ম ... ৫৭—৬৫

নবম অধ্যায়

নাগরিকত্ব ৬৬

নাগরিকত্ব অর্জ্জনের উপায়—এক রাষ্ট্রে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকের মর্য্যাদা ... ৬৬—৬৯

দশম অধ্যায়

নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব ... ৭০

অধিকার কাহাকে বলে ?—অধিকার ও রাষ্ট্র—বিভিন্ন প্রকার অধিকার—ভারতীয় নাগরিকের অধিকার—অধিকার ও কর্ত্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক—নাগরিকের কর্ত্তব্য ৭০—৭৫

একাদশ অধ্যায়

আইন সভার নির্ব্বাচন ৭৬

প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রের ভোটাধিকার নীতির সপক্ষে যুক্তি—প্রাপ্ত বয়স্ক মাত্রের ভোটাধিকার নীতির বিরুদ্ধে যুক্তি—সিদ্ধান্ত—প্রাপ্তবয়স্ক সকলেই ভোট দিবার অধিকার পাইতে পারে না—স্ত্রীলোকদিগকে ভোটাধিকার দানের বিপক্ষে যুক্তি—স্ত্রীলোদিগকে ভোটাধিকার দানের পক্ষে যুক্তি—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নির্ব্বাচন—প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের সপক্ষে যুক্তি—প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের বিপক্ষে যুক্তি—পরোক্ষ নির্ব্বাচন—পরোক্ষ নির্ব্বাচনের পক্ষে যুক্তি—পরোক্ষ নির্ব্বাচনের বিপক্ষে যুক্তি—আইন সভার উপর নির্ব্বাচকমণ্ডলীর প্রভাব—সংখ্যালঘু নির্ব্বাচন সমস্যা—সংখ্যালঘু দলের প্রতিনিধিত্ব দিবার পক্ষে যুক্তি—সংখ্যালঘু দলের বিশেষ প্রতিনিধিত্বের বিপক্ষে যুক্তি—সংখ্যালঘু দলের বিশেষ নির্ব্বাচন প্রণালী—সাম্প্রদায়িক ও পৃথক নির্ব্বাচন ... ৭৬—৮৮

দ্বাদশ অধ্যায়

আইন, স্বাধীনতা এবং সাম্য ৮৯

আইনের সহিত মানুষের নৈতিক ধারণার সম্পর্ক কতটা ?—আইনের উৎপত্তি—স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায় ?—বিভিন্ন প্রকারের স্বাধীনতা—রাষ্ট্র কর্ত্তৃত্ব ও স্বাধীনতা—স্বাধীনতার রক্ষা-কবচ—সাম্য ... ৮৯—৯৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাজনৈতিক দল বা পার্টি ৯৮

পার্টির কার্য্য—পার্টি গভর্ণমেণ্টের পক্ষে যুক্তি—পার্টি গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে যুক্তি—দেশে দুইটি মাত্র পার্টি, না বহু পার্টি

থাকা উচিত ?—জনমত—জনমত গঠন ও প্রকাশের বিভিন্ন উপায় ... ৯৮—১০৫

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

জাতি ও জাতীয়তাবাদ ১০৬

রাষ্ট্র ও জাতির মধ্যে পার্থক্য—ভারতীয়গণ কি এক জাতি ? —জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার—জাতীয়তা ও আন্তর্জ্জাতীয়তা—জাতি-সঙ্ঘ—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান ১০৬—১১৬

পঞ্চদশ অধ্যায়

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ১১৭

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের উপকারিতা—স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন ... ১১৭—১২০

প্রশ্নাবলী ১২১

ব্যবহৃত পরিভাষা ১৩০

নির্ঘণ্ট ১৩৩

দ্বিতীয় খণ্ড

ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী
(Indian Administration)

প্রথম অধ্যায়

ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালী ১

ভারতে ইংরাজ শাসনের প্রতিষ্ঠা ও ক্রম-পরিণতি—মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার—১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইন—দ্বৈত-শাসন—দ্বৈত শাসনের বিফলতা—১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের বিশেষত্বসূচক চিহ্নগুলি—১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষত্ব ১—১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৯৩৫ সালের পরবর্ত্তী গঠনতান্ত্রিক পরিণতি ... ১৬

ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব—মন্ত্রী-মিশন—অন্তবর্ত্তী সরকার—বৃটিশ সরকারের ভারত ছাড়িবার সিদ্ধান্ত—মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা—ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭—গণ-পরিষদ—১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭—ভারত ডোমিনিয়নের গভর্ণর জেনারেল ১৬—২৫

তৃতীয় অধ্যায়

ভারত-সচিব ২৬

ভারত-সচিবের উপদেষ্টা সমিতি—১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত-সচিব—ইণ্ডিয়া অফিস ... ২৬—২৯

চতুর্থ অধ্যায়

বড়লাট বা রাষ্ট্রপাল ৩০

শাসন বিষয়ক ক্ষমতা—বড়লাটের আইন বিষয়ক ক্ষমতা—অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা—বড়লাট ও প্রাদেশিক সরকার—বড়লাটের শাসন-পরিষদ—অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার—বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ—ভারতীয় ডোমিনিয়নের বড়লাট বা রাষ্ট্রপাল—কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ... ৩০—৩৮

পঞ্চম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় আইনসভা ৩৯

রাষ্ট্রীয় পরিষদ—ব্যবস্থা পরিষদ—কেন্দ্রীয় আইন সভার ক্ষমতা—সরকারের আয়-ব্যয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা—শাসন বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা—আইন সভার উভয় পরিষদের পরস্পরের সম্পর্ক—বর্ত্তমান ভারতীয় ডোমিনিয়নের আইন সভা ... ৩৯—৪৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাদেশিক সরকার ৪৫

ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে—প্রাদেশিক গভর্ণর বা দেশপাল—গভর্ণরের শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা—গভর্ণরের আইন বিষয়ক ক্ষমতা—গভর্ণরের অর্থ-বিষয়ক ক্ষমতা—প্রাদেশিক গভর্ণরের

বিশেষ দায়িত্ব—প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা—মন্ত্রিমণ্ডল ও আইন সভা ... ৪৫—৫১

সপ্তম অধ্যায়

বর্ত্তমান প্রাদেশিক সরকার ৫২

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর—মন্ত্রিসভা ... ৫২—৫৫

অষ্টম অধ্যায়

প্রাদেশিক আইন-সভা ৫৬

ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে—আইন সভার ক্ষমতা—আইন সভায় দুই পরিষদের পরস্পরের সম্পর্ক ... ৫৬—৫৯

নবম অধ্যায়

প্রাদেশিক আইনসভা ৬০

ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে—আইন সভার ক্ষমতা—বর্ত্তমান প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহের আসন সংখ্যার তালিকা—বর্ত্তমান প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের আসন-সংখ্যার তালিকা ... ৬০—৬৪

দশম অধ্যায়

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকার ... ৬৫

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকারের পক্ষে যুক্তি ... ৬৫—৬৭

একাদশ অধ্যায়

১৯৩৫ সালের আইনের প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র ... ৬৮

১৯৩৫ সালের আইনের পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগ—যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভা—প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের দোষ ৬৮—৭১

দ্বাদশ অধ্যায়

সরকারী বিষয়সমূহের বিভাগ ... ৭২

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সংক্রান্ত তালিকা—প্রাদেশিক আইন সংক্রান্ত তালিকা—সমানাধিকার আইন সংক্রান্ত তালিকা—অবশিষ্ট বিষয়গুলি ... ৭২—৭৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আইন সভার নির্ব্বাচন ৭৬-৭৭

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

দেশীয় রাজ্য ৭৯

দেশীয় রাজ্যগুলির শাসনতান্ত্রিক মর্য্যাদা—নরেন্দ্র-মণ্ডল—১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র ও দেশীয় রাজ্য—ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দেশীয় রাজ্যগুলির শাসনতান্ত্রিক অবস্থা—১৯৪৭ সালের জুলাই হইতে ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের মধ্যে দেশীয় রাজ্যসমূহের রূপান্তর ৭৯—৮৫

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভারতের বিচারব্যবস্থা ৮৮

দেওয়ানী বিচার—ফৌজদারী বিচার—ফেডারেল কোর্ট—প্রিভি কাউন্সিল—ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার সমালোচনা—ভারতের সুপ্রীম কোর্ট ... ৮৮—৯০

ষোড়শ অধ্যায়

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ৯১

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রেণী বিভাগ—করপোরেশন—কলিকাতা করপোরেশন—বোম্বাই করপোরেশন—মিউনিসিপ্যালিটি—মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য—মিউনিসিপ্যালিটির আয়-ব্যয়—ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ড—গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন—জেলা বোর্ড—জেলা বোর্ডের কার্য্য—জেলা বোর্ডের আয়-ব্যয়—লোকাল বোর্ড অথবা তালুক বোর্ড—ইউনিয়ন বোর্ড—ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্য—ইউনিয়ন বোর্ডের আয়-ব্যয়—গ্রাম্য পঞ্চায়েত—স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সমালোচনা—স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ ... ৯১—১০১

সপ্তদশ অধ্যায়

ভারতীয় পাব্‌লিক সার্ভিস ১০২

পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশন—চাকুরীসমূহের ভারতীয়করণ ১০২—১০৪

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রাদেশিক শাসন ১০৬

বিভাগীয় কমিশনার—জেলার শাসনকর্তা—মহকুমা—থানা—
পুলিশ ও কারা বিভাগ—কারা-বিভাগ ... ১০৬—১১১

ঊনবিংশ অধ্যায়

শিক্ষা ১১২
শিক্ষা-বিষয়ক কর্তৃপক্ষ—প্রাথমিক শিক্ষা—প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পথে বাধা কি?—ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা—বুনিয়াদী শিক্ষা—মাধ্যমিক শিক্ষা—কলেজী শিক্ষা—বিশ্ববিদ্যালয়—বৃত্তি-শিক্ষা—স্ত্রী-শিক্ষা—সার্জ্জেণ্ট্ পরিকল্পনা ... ১১২—১২০

বিংশ অধ্যায়

জন-স্বাস্থ্য ১২২-১২৩

পরিশিষ্ট—ক

ভবিষ্যৎ ভারতের গঠনতন্ত্রের খসড়া ... ১২৪
ভারতীয় ইউনিয়নের শাসন-বিভাগ ... ১২৫
প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা—ভারতীয় মন্ত্রিসভা—ভারতীয় আইন সভা—রাষ্ট্র-সভা—লোক-সভা—আইন করিবার পদ্ধতি—ভারতীয় ইউনিয়নের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ব্যবস্থা—অর্থ-বিষয়ক বিল্—প্রেসিডেন্টের আইন সংক্রান্ত বিশেষ ক্ষমতা—গভর্ণর শাসিত প্রদেশ—মন্ত্রী-সভা—প্রাদেশিক আইন সভা—রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত ব্যবস্থা—গভর্ণরের আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা—গুরুতর জরুরী অবস্থায় গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা ১২৫—১৩৪

পরিশিষ্ট—খ

ভারতীয় গণ-পরিষদ কর্তৃক রচিত মৌলিক
অধিকারের তালিকা ... ১৩৫

পরিশিষ্ট—গ

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির নির্দ্দেশ ... ১৩৭
প্রশ্নাবলী ১৩৮
ব্যবহৃত পরিভাষা ১৪৩
নির্ঘন্ট ১৪৫

তৃতীয় খণ্ড

অর্থশাস্ত্র
(Economics)

প্রথম অধ্যায়

অর্থশাস্ত্র ১

অর্থশাস্ত্র এক প্রকার সমাজ-বিজ্ঞান—অর্থশাস্ত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা—অর্থশাস্ত্রকে কি বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে? অর্থশাস্ত্রের আইন বা সাধারণ নিয়ম—অর্থশাস্ত্রের সহিত অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক—অর্থশাস্ত্র ও সমাজবিদ্যা—অর্থশাস্ত্র ও রাষ্ট্র-নীতি—অর্থশাস্ত্র ও ইতিহাস—অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র ... ১—৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশ ... ৯—১১

তৃতীয় অধ্যায়

সম্পদ ... ... ১২—২৬

চতুর্থ অধ্যায়

উৎপাদন ১৭

বিভিন্ন প্রকারের উপযোগিতা—উৎপাদক কাহারা?—উৎপাদনের উপাদান ... ১৫—২০

পঞ্চম অধ্যায়

ভূমি বা প্রাকৃতিক দান ২১

ক্রমহ্রাসমান আগমের নিয়ম—নিয়মের ব্যতিক্রম—ক্রমহ্রাসমান আগমের নিয়ম এবং ভূমি ব্যতীত অন্যান্য প্রাকৃতিক দান ও শ্রমশিল্প ... ২১—২৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রম ... ...

জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কিত ম্যালথাসের মতবাদ—ম্যালথাসীয় মতবাদের সমালোচনা—Optimum Theory of Population—অতিরিক্ত জনসংখ্যা—শ্রমিকের কর্ম্ম-কুশলতা ২৬—৩২

সপ্তম অধ্যায়

মূলধন ৩৩

বিভিন্ন শ্রেণীর মূলধন—মূলধনের উদ্ভব ও বৃদ্ধি কিসের উপর নির্ভর করে ?—মূলধনের কার্য্যকারিতা ৩৩—৩৭

অষ্টম অধ্যায়

উৎপাদন সংগঠন ৩৮

শ্রম-বিভাগ—শ্রম-বিভাগের স্থবিধা শ্রমবিভাগের অস্থবিধা—সিদ্ধান্ত—কলকব্জা ও যন্ত্র উৎপাদনে যন্ত্রের প্রয়োগ—সম্পদ উৎপাদনের উপর যন্ত্রের প্রভাব—শ্রমশিল্পের স্থানীয়-করণ—শ্রমশিল্পের স্থানীয়করণের ভাল-মন্দ—বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন—এককালীন বহুল উৎপাদনের স্থযোগস্থবিধা—বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অস্থবিধা—ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্থবিধা--বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান—অংশীদারি—জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী—জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানীর স্থবিধা-অস্থবিধা—শিল্প-সমবায় ... ৩৮—৫৭

নবম অধ্যায়

উপষোগীতা ও অভাব ৫৮

বিভিন্ন রকমের অভাব—উপযোগিতা বলিতে কি বুঝায় ?—ক্রম-হ্রাসমান উপযোগের নিয়ম—ক্রমহ্রাসমান উপযোগের নিয়মের ব্যতিক্রম—প্রাপ্তিক উপযোগ ও সামগ্রিক উপযোগ ৫৮—৬৬

দশম অধ্যায়

চাহিদা ৬৭

চাহিদার নিয়ম—চাহিদার পরিবর্ত্তনশীলতা—চাহিদার পরিবর্ত্তনশীলতা কিসের উপর নির্ভর করে ?—ভোগোদ্বৃত্ত—বিভিন্ন ব্যবহারের নিয়ম ৬৭—৭৩

একাদশ অধ্যায়

বিনিময় ৭৪

বিনিময় কিভাবে হইয়া থাকে—বিনিময়ের দুই রূপ—দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের বিনিময়—দ্রব্য বিনিময়ের অসুবিধা—বাজার —কিরূপ জিনিষের বাজার বহু দূর বিস্তৃত ? ৭৪—৭৮

দ্বাদশ অধ্যায়

মূল্য ৭৯

মূল্য নিরূপিত হয় কি ভাবে ?—একচেটিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মূল্য নিরূপণ কিভাবে হয় ?—একচেটিয়া কারবারী কি যত ইচ্ছা মূল্য বৃদ্ধি করিতে পারে ? ৭৯—৮৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অর্থ ৮৫

স্বর্ণ ও রৌপ্য বিনিময়ের শ্রেষ্ঠ মাধ্যমরূপে পরিগণিত হইবার কারণ কি ?—অর্থের সংজ্ঞা কি ?—প্রত্যক্ষ দ্রব্য বিনিময় ত্যাগ করিয়া অর্থের মাধ্যমে দ্রব্য বিনিময়ের সুবিধা এবং—অর্থের কাজ কি ?—বিভিন্ন প্রকারের অর্থ—আদর্শ অর্থ এবং সাঙ্কেতিক অর্থ—মুদ্রাঙ্কণ—কাগজী অর্থ—তিন রকমের কাগজী অর্থ—কাগজী অর্থের ভাল-মন্দ—বিভিন্ন অর্থ-মান বা অর্থ প্রণালী—গ্রেশ্যামের আইন—গ্রেশ্যামের নিয়মের ব্যতিক্রম—অর্থের মূল্য—অর্থের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি হয় কেন ?—অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব ৮৫—১০১

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ক্রেডিট ১০২

চেক—চেক-কে কি অর্থ বলা যায় ?—চেক দ্বারা আদান-প্রদানের লাভ—হুণ্ডী ... ১০২—১০৫

পঞ্চদশ অধ্যায়

ব্যাঙ্ক ১০৬

ব্যাঙ্কের কাজ কি ?—বিভিন্ন রকমের ব্যাঙ্ক এবং কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্ক—অন্যান্য ব্যাঙ্ক ... ১০৬—১০৮

ষোড়শ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ১০৯

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভাল-মন্দ দিক—আমদানি-রপ্তানির জের এবং দেনা-পাওনার জের—অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ—সংরক্ষণ নীতির পক্ষে যুক্তি— ১০৯—১১২

প্রথম খণ্ড

পৌর-বিজ্ঞান

(Civics)

পৌর-বিজ্ঞান

ও

অর্থশাস্ত্রের গোড়ার কথা

প্রথম খণ্ড

পৌর-বিজ্ঞান

(CIVICS)

প্রথম অধ্যায়

মানুষ সামাজিক প্রাণী, সর্ব্বদাই একত্র ভাবে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে চায়। সমাজে অপর সকলের সহিত বাস করিতে হয় বলিয়া মানুষকে সকলের সুখ-সুবিধা ও অধিকার ভোগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রতি পদে নিজেকে সংযত করিয়া, খাপ খাওয়াইয়া, চলিতে হয়। আবার, সমাজের অন্তর্গত বলিয়া প্রত্যেক মানুষ কতকগুলি করিয়া অধিকার ভোগ করিতে পারে। সমাজের অংশ হিসাবে প্রত্যেক মানুষ যে সব অধিকার ভোগ করে এবং যে সব দায়িত্ব পালন করিতে বাধ্য হয় পৌর-বিজ্ঞানে আমরা সেইগুলির আলোচনা করিয়া থাকি।

মানুষ নানা রকম সভা, সমিতি, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গঠন করিয়া সামাজিক প্রকৃতির পরিচয় দেয়। এই সব সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির মধ্য দিয়া মানুষের আত্মবিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। মানুষ তাহার বৃত্তিসমূহের শ্রেষ্ঠ উৎকর্ষ সাধন এবং মনুষ্য সমাজের সাধারণ উন্নতিবিধান করিতে পারে। এই সকলের আলোচনাও পৌরবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। জেলা বোর্ড (District Board), মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি পৌর-প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্র, যাহাকে মনুষ্য-গঠিত সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বলা যায়, এই সমূহের অলোচনা পৌর-বিজ্ঞানের অন্তর্গত। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে মানুষের পারস্পরিক কর্ত্তব্য ও

অধিকারসমূহ এবং রাষ্ট্র সম্পর্কিত কর্ত্তব্য ও অধিকারসমূহ পৌরবিজ্ঞানের বিশেষ আলোচনার বিষয়। আজ সর্ব্বত্রই মানুষ তাহার নাগরিক অধিকার এবং নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। আবার মানুষের রাষ্ট্রিক অধিকার ও দায়িত্বের ধারণা নিজ নিজ রাষ্ট্রের চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িতেছে ;—মানুষ আজ বিশ্বরাষ্ট্রের কল্পনা করিতেছে। তাহা ছাড়া কোনও রাষ্ট্রই অন্য রাষ্ট্রসমূহ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া একক ভাবে থাকিতে পারে না। প্রত্যেক রাষ্ট্রকে অপরাপর রাষ্ট্রের সহিত সহযোগীতা করিয়া চলিতে হয়। এই সহযোগীতার উপরও নাগরিক জীবন অনেকটা নির্ভর করিয়া থাকে। কাজেই আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্কও পৌরবিজ্ঞানের অন্তর্গত। ইহা ব্যতীত, নাগরিককে তাহার দেশের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার সহিত পরিচিত হইতে হইবে। পৌর-কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে হইলে অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আহরণ করিতে হইবে এবং নিজ দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামোর সহিত পরিচয় লাভ করিতে হইবে। দেখিতে হইবে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে এমন করা যায়, যাহাতে মানুষের অন্যান্য সকল প্রকার উন্নতির সহিত ধন-সম্পদও বৃদ্ধি পায়। মানুষ যদি দারিদ্র্য ও অভাবের দুঃখকষ্টে প্রতিপদে পীড়িত হইতে থাকে, তখন তাহার পৌর-অধিকার অর্থহীন হইয়া পড়ে। এইজন্য অর্থশাস্ত্রীয় আলোচনাও পৌর-বিজ্ঞানের অন্তর্গত।

পৌর-বিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক

পৌর-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান

(Civics and Sociology)

সমাজ-বিজ্ঞানে সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং সমাজের বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যুগে সমাজ জীবনের বিশ্লেষণ ও বিবরণ এই শাস্ত্রে পাওয়া যায়। এই শাস্ত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমাজ গঠন বিচার করা হয়, সমাজের বিবিধ বিচিত্র প্রকাশ আলোচনা করা হয় এবং এই সমস্তর ভিতর সাধারণ সূত্রসমূহ আবিষ্কার করা হয়। কিন্তু পৌর-বিজ্ঞানের (Civics) আলোচনা অতদূর বিস্তৃত নহে ; ইহার সীমা তুলনায় সঙ্কীর্ণ। ইহার আলোচ্য বস্তু সমাজ জীবনের একটি মাত্র দিক, নাগরিক হিসাবে মানুষের বিবিধ কর্ত্তব্য ও অধিকার বিচারই পৌর-বিজ্ঞানের বিষয় বস্তু।

পৌর-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান
(Civics and Politics)

পৌর-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞান পরস্পর সম্পর্কসংযুক্ত। উভয় শাস্ত্রেই মানুষকে সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রিয় সমাজের অংশ হিসাবে বিচার করা হয়। মানুষের নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব আলোচনা এবং রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিষয় আলোচনা করা হয়। তথাপি, পৌর-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ঠিক একই বস্তু নহে। পৌর-বিজ্ঞান শুধুমাত্র নাগরিকদিগের কার্য্য-কলাপ আলোচনা করিয়া থাকে, সুতরাং পৌর-বিজ্ঞানকে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের অন্তর্গত শাখা বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বিশেষভাবে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-অন্তর্গত বিবিধ প্রতিষ্ঠানের বিষয় আলোচনা করিয়া থাকে; কিন্তু পৌর-বিজ্ঞানে এক হিসাবে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের চেয়েও বেশী বিষয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে; যেমন, পৌর-বিজ্ঞানে নাগরিক জীবনের সকল দিক আলোচিত হয় বলিয়া অর্থনৈতিক দিকও আলোচনার বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু অর্থশাস্ত্র রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হয় না। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্র ও সরকারের বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া থাকে, কিন্তু পৌর-বিজ্ঞান নাগরিক জীবনের সমস্যার বাস্তব দিকটার উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে। পৌর-বিজ্ঞানের লক্ষ্য নাগরিক যাহাতে শ্রেষ্ঠ নাগরিক হইতে পারে, আর রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের লক্ষ্য, যাহাতে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র ও শ্রেষ্ঠ সরকার গঠিত হইতে পারে।

পৌর-বিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র
(Civics and Economics)

পৌরবিজ্ঞানের সহিত অর্থশাস্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে অর্থশাস্ত্রের মূলনীতির জ্ঞান না থাকিলে পৌরকর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব নহে। অর্থনৈতিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া মানুষের মোট ধন-সম্পদ ও ব্যক্তিগত ধন সম্পদের উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের ধন সম্পদের অভাব বা প্রাচুর্য্য, জাতিগত দারিদ্র্য বা ঐশ্বর্য্য, বেকার-সমস্যা, অভাব ও দুঃখ দুর্দ্দশা এবং তজ্জনিত অসংখ্য কুফল, এগুলির মূল কারণ জানিতে হইবে; না জানিলে নাগরিক সাধারণকে দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে না এবং নাগরিক অধিকার ও কর্ত্তব্যের বড় বড় কথা অর্থহীন বুলিতে পরিণত হইবে। অতএব, অর্থশাস্ত্রের সম্পর্করহিত পৌরবিজ্ঞান কোনও সুফল দিতে পারে না। তবে, একথা মনে রাখা দরকার যে, অর্থশাস্ত্র পৌরবিজ্ঞানের একটি অংশ মাত্র পৌরবিজ্ঞানে অর্থশাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ও আলোচনা করিতে হইবে।

পৌরবিজ্ঞান ও ইতিহাস
(Civics and History)

ব্যাপক অর্থে বিচার করিলে ইতিহাস হইতেছে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের কাহিনী; দেশে দেশে কি ভাবে মানব সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছে, ইতিহাসের পাতায় তাহারই বিবরণ পাওয়া যায়। অতএব, পৌরবিজ্ঞানের সহিত ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। ইতিহাসের জ্ঞান হইতে মানুষ পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রমপরিণতির মূল কথা এবং ভবিষ্যৎ অগ্রগতির বিষয় বুঝিতে পারে। বর্ত্তমান কাল অতীতেরই পরিণতি এবং বর্তমানের মধ্যেই ভবিষ্যতের বীজ লুকায়িত আছে। তাই ইতিহাস পাঠের ফলে, অতীত কাহিনী বিচার করিয়া বর্ত্তমান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করিতে পারি এবং ভবিষ্যৎ গঠনসম্পকে মতামত স্থির করিতে পারি।

কিন্তু তাই বলিয়া ইতিহাস ও পৌর-বিজ্ঞান একই জিনিষ নহে। পৌর-বিজ্ঞানে এমন অনেক বিষয় আলোচিত হয়, যাহার সহিত ইতিহাসের কোনও সম্পর্ক নাই; আবার, ইতিহাসে পৌর-বিজ্ঞান বহির্ভূত অনেক বিষয় আলোচিত হইয়া থাকে।

পৌরবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র
(Civics and Ethics)

মানুষের আচরণের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, কোন্ কাজ ভাল কোন্ কাজ মন্দ,—নীতিশাস্ত্রে ইহাই আলোচিত হইয়া থাকে। নীতিশাস্ত্র হইতে মানুষ তাহার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারে। যে সব পৌরপ্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, সে-গুলির কার্য্যকলাপ নীতিশাস্ত্র-অনুমোদিত কি না, ইহা বিচার করিয়া এইগুলিকে আমরা সমর্থন অথবা প্রতিবাদ করিতে পারি। নীতিশাস্ত্র সমর্থিত কি না এই বিচার করিয়াই আমরা আমাদের নাগরিক অধিকার ও কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে পারি। নীতিশাস্ত্রবিগর্হিত কাজ করিয়া কেহ যোগ্য নাগরিক হইতে পারে না।

তাই বলিয়া, নীতিশাস্ত্র ও পৌর-বিজ্ঞান একই বস্তু নহে। পৌর-বিজ্ঞান নীতিশাস্ত্রের নিয়মগুলি স্বীকার করিয়া লয়। ইহা লইয়া বিচার-বিতর্ক উত্থাপন করে না। তা ছাড়া, নীতিশাস্ত্র মানুষের গোপন অন্তরের ভাল মন্দ অথবা মানসিক চিন্তাধারা লইয়াও বিচার করে, শুধুমাত্র বাহ্যিক কার্য্যকলাপ লইয়া বিচার করে না। কিন্তু পৌর-বিজ্ঞানে মানুষের বাহ্যিক কার্য্যকলাপই আলোচ্য, মনের গহনে যে ভাল-মন্দের ভাবধারা বহিয়া চলে, তাহা আলোচ্য নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র

(The State)

1. রাষ্ট্র-বিজ্ঞান আলোচনার প্রথমেই রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হওয়া দরকার। রাষ্ট্র কথাটি বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে, ইহার সংজ্ঞা সম্বন্ধেও নানা মুনির নানা মত। বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে অধ্যাপক গার্ণার (Prof. James Wilford Garner) প্রদত্ত সংজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ। অধ্যাপক গার্ণার বলিয়াছেন, "রাজনীতি-বিদ্যা ও শাসনতান্ত্রিক আইনের বিচারে, রাষ্ট্র এমন বহু লোকের সমষ্টি বিশেষ,—যাহারা স্থায়ীভাবে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে, যাহারা বাহিরের কোনও শাসনপাশ হইতে মুক্ত এবং যাহাদের একটি সুসংবদ্ধ সরকার রহিয়াছে, যে সরকারের আদেশ অধিবাসীরা স্বভাবতই পালন করিয়া থাকে।"* এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে আমরা নিম্নলিখিত জিনিষগুলি দেখিতে পাই—

(ক) অধিবাসী (Population) (খ) নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ড (Territory) (গ) গভর্ণমেণ্ট বা সরকার (Government) (ঘ) সার্ব্বভৌম ক্ষমতা (Sovereignty)

(ক) অধিবাসীবৃন্দ। অধিবাসীবৃন্দ ব্যতীত রাষ্ট্র থাকিতে পারে না। অবশ্য কত জন অধিবাসী হইলে একটি রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারিবে, তাহার কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা বলা যায় না। বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন সংখ্যক অধিবাসী রহিয়াছে। বড় বড় রাষ্ট্রে কোটী কোটী অধিবাসী আছে, আবার কয়েক লক্ষ লোক লইয়া গঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রও রহিয়াছে।

রাষ্ট্রের অধিবাসী সংখ্যা সম্বন্ধে এ্যারিষ্টল (Aristotle) এর মত ছিল এই যে রাষ্ট্রের অধিবাসীর সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকা উচিত। তিনি

* "The state, as a concept of political science and constitutional law is a community of persons more or less numerous, permently occupying a definite portion of territory, independent of external control and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience."

Garner—Introduction to Political science.

বলিতেন যে অধিবাসীসংখ্যা খুব বেশীও হইবে না খুব কমও হইবে না; এমন হওয়া উচিত যেন রাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া সুপরিচালিত হইতে পারে। রুশোর মত ছিল এই যে, আদর্শ রাষ্ট্রে দশ হাজারের বেশী অধিবাসী হওয়া উচিত নহে। বর্ত্তমান কালে রাষ্ট্রের রূপ যেভাবে বদলাইয়াছে তাহাতে রুশোর দশ হাজারের আদর্শ নিতান্ত অবাস্তব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(খ) অধিবাসীবৃন্দ একটি নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করা চাই, নতুবা রাষ্ট্র গঠিত হইতে পারে না। একদল ভ্রাম্যমান যাযাবর, যাহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়, কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঘরবাড়ী করিয়া বাস করে না, তাহাদিগকে লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হয় না। যাযাবরদলের নিজস্ব নেতা থাকিতে পারে, নিজেদের আইন-কানুন, শৃঙ্খলা ও সঙ্ঘ থাকিতে পারে, তথাপি যতদিন তাহারা দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, ততদিন রাষ্ট্র গড়িয়া উঠে না। যাযাবর-সম্প্রদায় যখন নিরন্তর ভ্রমণের নেশা ত্যাগ করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসবাস আরম্ভ করে, তখনই তাহাদের লইয়া রাষ্ট্র গঠনের সূত্রপাত হয়।

ইহুদি সম্প্রদায় পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ছড়াইয়া আছে, ইহাদের প্রভূত অর্থ-সম্পদ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দান, পরস্পরের মধ্যে নিবিড় ঐক্যবোধ, সমস্ত কিছু স্বত্বেও প্যালেষ্টাইন বিভাগ পরিকল্পনার পূর্ব্বে, কোনও সুনির্দ্দিষ্ট ভূভাগ ইহুদের দ্বারা অধ্যুষিত এবং রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত না হওয়ায়, ইহারাও রাষ্ট্র গঠন করিতে পারে নাই।

প্রাচীন গ্রীকগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র গঠন করা উচিত মনে করিতেন। প্রাচীন রোমকদের ধারণা ছিল, সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া রাষ্ট্রের সীমারেখা টানা হইবে। কিন্তু বাস্তবিক কতখানি ভূভাগ লইয়া রাষ্ট্র গঠিত হইবে, তাহার কোনও নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই। বর্ত্তমান জগতে অনেক রাষ্ট্রের আয়তন অতি বৃহৎ, যথা— চীন, রুশিয়া ভারতবর্ষ; ইহাদের আয়তন লক্ষ লক্ষ বর্গমাইল। আবার সামান্য কয়েক বর্গমাইল লইয়া গঠিত ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রও রহিয়াছে।

(গ) গভর্ণমেণ্ট বা সরকার রাষ্ট্রের একটি বিশেষত্ব। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, সরকার ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্ভব নহে। সরকার রাষ্ট্রের বহিঃপ্রকাশ; ইহা এমন একটি যন্ত্র যাহার দ্বারা রাষ্ট্রের অভিপ্রায় গঠিত ও প্রকাশিত হয় এবং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ধরা যউক এমন একটি দ্বীপ অছে যাহা কোনও সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীন নহে। কতকগুলি লোক গিয়া এই দ্বীপে বসবাস করিলেই যে একটি রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিল তাহা নহে। কিন্তু যদি এই লোকগুলি, সরকারের শাসনাধীনে বাস করিতে অভ্যস্ত বলিয়া অথবা অন্য

কোনও কারণে, নিজেদের মধ্যে চুক্তি দ্বারা বা অন্যভাবে এই একটি সুসংবদ্ধ সমাজ গড়িয়া তুলে এবং এক বা একাধিক ব্যক্তির হাতে শাসনভার অর্পণ করে, তখন আমরা রাষ্ট্রের সূচনা দেখিতে পাই। অথবা, যদি কেহ বা কতকগুলি লোক, তাহাদের শারীরিক শক্তির জোরে বা বুদ্ধি ও কৌশলের দ্বারা অপর লোকদিগকে বশীভূত করিয়া শাসনাধীনে আনিতে পারে তবে সে ক্ষেত্রেও আমরা রাষ্ট্রের উদ্ভব দেখিতে পাই। মোটের উপর আদেশ জারী করিবার অধিকারী ও ক্ষমতাসম্পন্ন, এবং সকলের বশ্যতা আদায় করিবার উপযুক্ত সরকার না থাকিলে, রাষ্ট্রও থাকিতে পারে না। ব্লুন্ট্স্লি (Blunstchli) যথার্থই বলিয়াছেন যদি আদেশ করিবার কর্ত্তা কেহ না থাকে এবং আদেশ পালন করিবারও কেহ না থাকে, তখন রাষ্ট্র গড়িতে পারে না, সেক্ষেত্রে শুধু অরাজকতা (Anarchy) বিরাজ করিবে।

(ঘ) রাষ্ট্ররূপ সঙ্ঘের যতগুলি চিহ্ন আছে তাহার মধ্যে সার্ব্বভৌমত্বই (Sovereignty) সর্ব্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এই চিহ্ন দ্বারাই সহজে অপরাপর সঙ্ঘ হইতে রাষ্ট্রের পার্থক্য ধরা পড়ে। এই সার্ব্বভৌমত্ব থাকার মানে রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল বস্তু, সকল ব্যক্তি, সকল সঙ্ঘ ও সকল দলের নিকট হইতে রাষ্ট্র বশ্যতা দাবী করিতে পারে এবং আদায় করিয়া লইতে পারে। রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকলের উপর অবাধ কর্তৃত্ব করিবার এবং সকলের উপর নিজের ইচ্ছা চাপাইয়া দিবার সীমাহীন ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে। এই ক্ষমতাকে অস্বীকার করিবার অধিকার কাহারও নাই, এই ক্ষমতার উপর কথা বলিবার অধিকার কাহারও নাই। রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল কিছুর উপর সীমাহীন কর্ত্তৃত্বের এই ক্ষমতাকে আভ্যন্তরীন সার্ব্বভৌমত্ব (internal sovereignty বলা চলে। সার্ব্বভৌমত্ব কথাটি রাষ্ট্রের বাহিরের সর্ব্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্তি; এই অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্র বাইরের অন্যান্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও শাসনমুক্ত হইয়া নিজের অভিপ্রায় অনুযায়ী নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে নিজেকে পরিচালিত করিবে। সার্ব্বভৌমত্ব ব্যতীত রাষ্ট্র হইতে পারে না। প্রত্যেক রাষ্ট্রের এমন সার্ব্বভৌমত্ব থাকিবে, যাহা বাহিরের কর্তৃত্ব নিরপেক্ষ থাকিয়া রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকলের উপর আদেশ জারী করিতে পারে এবং সকলের নিকট হইতে বশ্যতা আদায় করিয়া লইতে পারে। কোনও রাষ্ট্র হইতে এই সার্ব্বভৌমত্ব বাদ পড়িলে সে আর রাষ্ট্র থাকে না; সাধারণ সঙ্ঘের পর্য্যায়ে নামিয়া পড়ে।

রাষ্ট্র সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক লেখক বিভিন্নরূপ সংজ্ঞা দিয়াছে। ইংরাজ লেখক হল্যাণ্ড (Holland) বলিয়াছেন,* রাষ্ট্র, সাধারণত একটি নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের

* The state is a numerous assemblage of human beings, generally

অধিবাসী অগণিত মনুষ্যের সমষ্টি, যাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের মত বা কোনও এক নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর লোকের মত অপর সকলের মত অপেক্ষা প্রবল ও কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

আমেরিকার উড্রো উইল সন (Woodrow Wilson) বলিয়াছেন, * রাষ্ট্র হইতেছে একটি নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত জনসমষ্টি।

জার্ম্মাণ লেখক † ব্লুন্টশলি (Bluntschli) বলিয়াছেন, "রাষ্ট্র হইতেছে একটি নির্দ্দিষ্ট ভূভাগের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ জনসমষ্টি।" ইংরাজ লেখক ‡ বার্জেশ (Burgess) ঐ একই কথা বলিয়াছেন, "রাষ্ট্র হইতেছে মনুষ্য জাতির এক একটি সঙ্ঘবদ্ধ অংশ।"

এই সব বিভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যে পূর্ব্বপ্রদত্ত গার্ণারের সংজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ। ব্লুন্টশলি প্রভৃতি কয়েকজন লেখক, রাষ্ট্রের উপর কয়েকটি অতিরিক্ত বিশেষত্ব আরোপ করেন। রাষ্ট্রের অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধে অনেক লেখক জোর দিয়াছেন। মানুষের সুখ সমৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্র অত্যাবশ্যক এবং কোনও না কোনও আকারে রাষ্ট্র চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। সরকার পরিবর্ত্তন হইতে পারে। বস্তুতঃ সরকারের পরিবর্ত্তন প্রায়ই হয় দেখা যায়—কখনও বিপ্লবের মধ্য দিয়া সরকার দ্রুত রূপ বদলাইতেছে কখনও বা ধীরে ধীরে বিবর্ত্তনের পথে সরকার বদল হইতেছে। তা বলিয়া এই সঙ্গে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হইতেছে না, রাষ্ট্র ঠিকই বজায় আছে।

আর একদিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় রাষ্ট্রের একটি নিজস্ব বিশেষ স্বত্ত্বা আছে—আইনের চক্ষুতে প্রত্যেক রাষ্ট্রের অধিকার ও দায়িত্ব সম্বলিত একটি পৃথক অস্তিত্ব রহিয়াছে। রাষ্ট্র একদিকে শাসন করে, কর্তৃত্ব বিস্তার ও প্রয়োগ করে, অপর দিকে সাধারণ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, সম্পত্তি দখল ও ক্রয় বিক্রয় করে, মামলার বাদী বা বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হয় এবং অনুরূপ

---

occupying a certain territory, among whom the will of the majority or of an ascertainable class of persons is by the strength of such majority or class made to prevail against any of their number who oppose it."
Holland—Elements of Jurisprudence.

* A state is a people organised for law within a definite territory
—Woodrow Wilson.

'The state is the politically organised people of a definite territory"—Bluntschli.

‡ Tne state is a particular portion of mankind viewed as an organised unit"—Burgess—Political Science and Constitutional Law.

বহু কাজে লিপ্ত হয়। রাষ্ট্রের এই প্রকৃতি বহু জার্ম্মাণ ও ফরাসী লেখকের মতে একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব।

রাষ্ট্র ও সরকার
(State and Government)

আমরা সাধারণতঃ রাষ্ট্র ও সরকার এই দুইটি শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু রাষ্ট্র ও সরকার একই জিনিষ নহে। সরকার রাষ্ট্রের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষ, সরকার না থাকিলে রাষ্ট্রের কার্য্য চলা অসম্ভব। তাই বলিয়া, সরকার বলিতেই রাষ্ট্র বুঝায় না। রাষ্ট্র ও সরকার দুইটি শব্দ দ্বারা দুইটি পৃথক পৃথক জিনিষ বুঝায়। রাষ্ট্র বলিতে, রাষ্ট্রের চারিটি বিশেষত্ব, যথা, জনসমষ্টি, ভূখণ্ড, সরকার ও সার্ব্বভৌমত্ব, এই সকল গুণসম্পন্ন এক সম্পূর্ণ জিনিষকে বুঝায়। সরকার রাষ্ট্রের ঐ চারিটি বিশেষত্বর মধ্যে একটি মাত্র। সরকার হইতেছে রাষ্ট্রের অভিপ্রায় প্রকাশ ও কার্য্যকরী করিবার যন্ত্রবিশেষ ; ইহা রাষ্ট্রের অপরিহার্য্য অংশ, কিন্তু ইহাই রাষ্ট্র নহে। সরকার অপেক্ষাকৃত কম লোকের সমষ্টি, কিন্তু রাষ্ট্র তাহার অধীনস্থ সকল নাগরিকের সমষ্টি। রাষ্ট্রের অর্থ অতি ব্যাপক, ইহার দ্বারা বৃহৎ জনসমষ্টি বুঝায়, সরকার বলিতে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোকের সমষ্টি বুঝায়।

রাষ্ট্র এই কথাটির মধ্যে এক নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের ধারণা নিহিত আছে। কিন্তু সরকার বলিতে মাত্র কতকগুলি বিশেষ লোকের সমষ্টিকেই বুঝায়।

রাষ্ট্র একটি স্থায়ী জিনিষ, সরকার স্থায়ী নহে। সরকারের পরিবর্ত্তন প্রায়ই হইয়া থাকে। আজ একদল সরকার গঠন করিতেছে, দুদিন বাদে এই দল ভাঙ্গিয়া গিয়া নূতন দল সরকার গঠনের ভার লইতেছে, ইহা রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়। সরকার ভাঙ্গা-গড়ার মধ্যে রাষ্ট্র ভাঙ্গা-গড়া সূচিত হইতেছে না। সরকারের নিত্য পরিবর্ত্তনের মধ্যেও রাষ্ট্র স্থির রহিয়াছে।

সর্ব্বত্রই রাষ্ট্রের একই বিশেষত্ব, একই রূপ, দেখা যায়। দেশভেদে রাষ্ট্রের রূপ বদলায় না। কিন্তু দেশে দেশে বিভিন্ন সরকারের বিভিন্নরূপ দেখা যায়। রাষ্ট্র হিসাবে ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রূপ একই প্রকার। কিন্তু সরকার হিসাবে, ইংলণ্ডের সরকার ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সরকার বিভিন্ন প্রকার।

রাষ্ট্রেরই সার্ব্বভৌমত্ব রহিয়াছে, সরকারের নহে। সরকার অবশ্য রাষ্ট্রের নামে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকে, তথাপি, সার্ব্বভৌম ক্ষমতা আসলে রাষ্ট্রের, সরকারের নহে।

শেষ কথা এই যে, রাষ্ট্র বস্তু-নিরপেক্ষ একটা কল্পনা বিশেষ, (abstract idea); ইহা রাষ্ট্র বিজ্ঞানের একটি ধারণাবিশেষ। ইহার সুস্পষ্ট, অধিগম্য রূপ নাই। রাষ্ট্র সর্ব্বদা বিরাজমান। রাষ্ট্র, তাহার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ, তাহার সরকারের ভিতর দিয়াই সার্ব্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেছে। রাষ্ট্র যেন দেহস্থিত আত্মাবিশেষ। দেহ আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, আত্মা ইন্দ্রিয়াতীত, রাষ্ট্র তাহার দেহ অর্থাৎ সরকারের ভিতর দিয়া নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী কার্য্য করিতেছে।

সার্ব্বভৌমত্ব
(Sovereignty)

সার্ব্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের প্রধান বিশেষত্ব। সার্ব্বভৌমত্ব ভিন্ন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্ভব নহে। রাষ্ট্রের সংজ্ঞার মত, সার্ব্বভৌমত্ব কথাটিরও সংজ্ঞার অন্ত নাই। সার্ব্বভৌমত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত সকলের উপর অপ্রতিহত ক্ষমতা, ইহা রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেক প্রজা ও প্রত্যেক সঙ্ঘের উপর শাসন করিবার ও বশ্যতা আদায় করিবার সীমাহীন ক্ষমতা। সার্ব্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের সেই বিশেষত্ব যাহার ফলে রাষ্ট্র নিজের ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কাহারও কাছে আইনতঃ দায়ী হইতে পারে না, এই ক্ষমতার জন্য অন্য কোনও শক্তিই রাষ্ট্রের উপর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। সার্ব্বভৌমত্ব থাকার জন্যই রাষ্ট্র আভ্যন্তরীন সকল ব্যাপারে অগাধ কর্তৃত্ব করিবার অধিকারী; সেইরূপ, সার্ব্বভৌমত্ব গুণের জন্যই, রাষ্ট্র বাহিরের কোনও শক্তির অধীনতা বা নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

সার্ব্বভৌমত্বের ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে। প্রথমেই আমরা (Titular and Actual Sovereignty) প্রকৃত সার্ব্বভৌমত্ব ও নামমাত্র বা তথাকথিত সার্ব্বভৌমত্বের মধ্যে একটা প্রভেদ লক্ষ্য করিতে পারি। ইংলণ্ডে বা অন্যান্য দেশে যেখানে ইংলণ্ডের অনুরূপ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে দেখিতে পাই, রাজাই যেন রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি ও মহিমার মূর্ত্তবিকাশ, রাজার নামেই সেখানে শাসন কার্য্য পরিচালিত হয়। প্রকৃতপক্ষে রাজা কিন্তু নাম মাত্র সার্ব্বভৌম শাসক; আসল সার্ব্বভৌম ক্ষমতা রাজার হাতে নাই।

ইহা ব্যতীত, সার্ব্বভৌমত্বকে আমরা আইনতঃ অথবা রাজনীতির দৃষ্টিকোণ হইতে (Legal and Political Sovereignty) ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখিতে পারি। আইনগত সার্ব্বভৌম ক্ষমতা ও রাজনীতিগত সার্ব্বভৌম ক্ষমতার মধ্যে প্রভেদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। আইনগত সার্ব্বভৌম ক্ষমতা তাহারই যে আইনের আকারে রাষ্ট্রের আদেশ প্রকাশ করিতে পারে। আদালত শুধু এই সার্ব্বভৌমত্বকেই

স্বীকার করিবে। অন্য কাহাকেও নহে। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে দেখিতে পাই রাজাসহ পার্লামেন্টের মিলিত শক্তি (King in Parliament) এই আইনগত সার্ব্বভৌমত্ব গুণের অধিকারী। পার্লামেন্টে যে আইন পাশ হইবে, আদালত কর্ত্তৃক সেই আইনই কার্য্যকরী হইবে। কিন্তু এই আইনগত সার্ব্বভৌম ক্ষমতাই শেষ কথা নহে, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে রাজনীতিগত সার্ব্বভৌম ক্ষমতা, যাহাকেই আসল সার্ব্বভৌম ক্ষমতা বলা যায়। এই ক্ষমতা আইনের আকারে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারে না, আদালত এই আসল সার্ব্বভৌমত্ব ক্ষমতাকে অস্বীকার করিতে পারে, তথাপি এই ক্ষমতাকে আইনগত সার্ব্বভৌমত্বের অধিকারী ভুলিতে পারে না। এই আসল সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীদের নির্দ্দেশের নিকট আইনগত সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীদিগকে নতি স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, তাহারাই শেষপর্য্যন্ত তাহাদের নিজ আশা আকাঙ্ক্ষা ও অভিপ্রায় অনুযায়ী রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। একটু সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে সমগ্র ভোটদাতাগণ হইল এই আসল সার্ব্বভৌম ক্ষমতার মালিক ; আর, ব্যাপক অর্থে বলা যায় সমগ্র অধিবাসীবৃন্দ যাহারা জনমত গঠন করিয়া থাকেন, সকলেই এই আসল সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ডাইসী (Dicey) বলিয়াছেন, তাহারাই রাজনৈতিক সার্ব্বভৌমত্বের অধিকারী, যাহাদের ইচ্ছা রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দ শেষ পর্য্যন্ত মানিয়া লয়। (That body is politically sovereign the will of which is ultimately obeyed by the citizens of the State) সমস্ত ভোটার তথা সমস্ত অধিবাসীর কথাই শেষ পর্য্যন্ত আইন সভাকে মানিয়া লইতে হইল। কাজেই আইন সভা আইনের দৃষ্টিতে সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইলেও রাজনীতির দৃষ্টিতে সমগ্র অধিবাসীবৃন্দ সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

(The Origin of the State)

রাষ্ট্রের উৎপত্তির বিবরণ লইয়া নানাবিধ মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে। সুদূর অতীতকালে ঠিক কোন্ সময়ে কিভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা লইয়া পণ্ডিত মহলে মতভেদের অন্ত নাই। রাষ্ট্রীয় জীবনে অভ্যস্ত লোকজন কি ভাবে নূতন রাষ্ট্র ও সরকার গঠন করিয়াছে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কি ভাবে আদি মানব রাজনৈতিক চেতনা লাভ করিয়া রাজনৈতিক সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিয়াছে, কি ভাবে আদিযুগে রাষ্ট্রের আবির্ভাব প্রথম ঘটিল, সে কাহিনী অস্পষ্টতার কুহেলিকা মণ্ডিত ; সে কাহিনীর বর্ণনা ইতিহাসের কোনও পাতায় পাওয়া যায় না। যাহা হউক রাষ্ট্রের উৎপত্তি লইয়া যতগুলি বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে, সেগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে দেওয়া হইল।

রাষ্ট্রের ঐশ্বরিক উৎপত্তির মতবাদ

(The Theory of Divine Origin)

রাষ্ট্র ঈশ্বর সৃষ্ট জিনিষ। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যতগুলি মতবাদ এ পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছে, এই ঐশ্বরিক মতবাদ তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই মত অনুসারে রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। রাজারা ঈশ্বরের মনোনীত প্রতিনিধি, তাঁহারা ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে শাসন কার্য্য পরিচালনা করেন। ঈশ্বর তাঁহার অভিপ্রায় রাজাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন এবং রাজাদের মারফত, সেই অভিপ্রায় প্রজাদের নিকট ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব রাজানুরক্তি প্রজাদের শুধু রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য নহে, ইহা ঐশ্বরিক বিধান। যেহেতু রাজা ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার বলে শাসন করেন, সেহেতু রাজার বিরুদ্ধে কোনও প্রজার ব্যক্তি-অধিকারের কোন প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

মধ্যযুগে এই মতবাদ খৃষ্টীয়দের মধ্যে প্রায় ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অঙ্গস্বরূপ ছিল। ঐশ্বরিক অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত রাজাদের শাসন ক্ষমতার এই মতবাদ ইউরোপ ও এসিয়ার প্রায় সর্ব্বত্র অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল ; কোনও কোনও স্থানে উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার আধিপত্য ছিল। আজও

এই মতবাদ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। রাজতন্ত্রের সমর্থক এখনও পাওয়া যায়। ক্ষীয়মান রাজতন্ত্র দ্রুতবেগে বিলুপ্তির পথে চলিলেও, ইহাদের সমর্থনে এখনও ঐশ্বরিক অধিকারের সতর্ক মৃদু উল্লেখ দেখা যায়। অনগ্রসর জাতিদের মধ্যে এখনও এই মত দৃঢ় যে নিশ্চয় কোনও অপার্থিব শক্তি রাজাকে সমর্থন ও পরিচালন করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা ধর্ম্মের অনুশাসন। বর্ত্তমানে রাষ্ট্রনীতিবিদরা ঐশ্বরিক মতবাদকে রাষ্ট্রের উৎপত্তির ঐতিহাসিক বিবরণ হিসাবে কেহ গ্রহণ করেন না। ঈশ্বর রাষ্ট্র সৃজন করিয়াছেন, শাসকগণ ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছে এবং শাসকগণ তাহাদের শাসন কার্য্যের জন্য ঈশ্বর ছাড়া আর কাহারোও নিকট দায়ী নহে, এই মধ্যযুগীয় মতবাদের আর বিশেষ কেহ সমর্থক নাই। অধ্যাপক গার্ণার বলেন যে ঐশ্বরিক অধিকারের এই মতবাদ মনুষ্য কর্তৃক এক উদ্দেশ্যমূলক আবিষ্কার মাত্র—প্রকৃতপক্ষে কতকগুগি স্বৈরাচারী শাসক যাহাতে প্রজাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া এবং কাহারও কাছে জবাবদিহী না করিয়া স্বেচ্ছাতন্ত্র চালাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এই ঐশ্বরিক মতবাদ সৃষ্ট হইয়াছিল।

রাষ্ট্র চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত
(The Social Contract Theory)

এই মতবাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সর্ব্বাধিক। ইহা একটি প্রাচীন মতবাদ। প্লেটোর (Plato) বিখ্যাত Republic গ্রন্থেও এই মতবাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই মতবাদ পৃথিবীর, বিশেষ করিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার, রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রভাবান্বিত করিয়াছে। বহু বিপ্লবের মূলে ছিল এই মতবাদ। কতবার এই মতবাদের আঘাতে বিভিন্ন দেশের সরকার ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, নূতন সরকার গঠিত হইয়াছে।

এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে চুক্তি হইতে। অনেক লোক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বেচ্ছামূলক চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র গঠন করিয়াছে, এই মতবাদের সমর্থকগণের অধিকাংশের মতে, রাষ্ট্র গঠনের পূর্ব্বে এমন এক অবস্থা ছিল যখন মানুষ প্রকৃতির আইনের (Law of Nature) অধীন ছিল ; যখন মনুষ্যরচিত আইন বলিয়া কিছু ছিল না, মানুষ শুধু যুক্তির অনুশাসন দ্বারা অথবা নৈতিক আইন দ্বারা শাসিত হইত। দার্শনিক টমাস হিল গ্রীন বলেন, প্রাক্-রাষ্ট্রীয় এই অবস্থায় প্রত্যেকে যে যাহার খুসীমত কাজ করিতে পারিত এবং এই অবস্থা হইতে মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে। মনুষ্য

সমাজের এই অবস্থাকে আলোচ্য মতবাদের লেখকগণ প্রকৃতির অবস্থা (State of Nature) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে হব্‌স্ (Thomas Hobbes) তাঁহার Leviathan পুস্তকে এবং লক্ (John Locke) তাঁহার Two Treatises of Government নামক পুস্তকে এই মতবাদকে সমর্থন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী শতাব্দীতে বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রুশো (Rousseau) তাঁহার Le Contract Social নামক পুস্তকে এই মতবাদ প্রচার করেন ; তাঁহার দ্বারাই এই মতবাদ অভূতপূর্ব্ব জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে। বস্তুতঃ এই মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে রুশোর নামই সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

প্রাক রাষ্ট্রীয় যুগে মানুষ যে প্রকৃতির অবস্থায় (State of Nature) বাস করিত সেই প্রকৃতির অবস্থার বর্ণনায় হব্‌স্, লক্ ও রুশোর মধ্যে গুরুতর পার্থক্য দেখা যায়। হব্‌সের মতে সকলের মধ্যে ইহা ছিল নিরন্তর সংগ্রাম এবং ক্রূর হৃদয়হীন প্রতিযোগীতার যুগ, পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের যুগ। মানুষের মধ্যে আছে স্বার্থ ও ক্ষমতাপ্রিয়তা এবং সম্মানের আকাঙ্ক্ষা—শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ইহার আর বিরতি নাই। তাই মানুষ প্রকৃতির অবস্থায় ক্ষুধিত নেকড়ে বাঘের মত পরস্পরকে আহার করিবার চেষ্টা করে। প্রকৃতির অবস্থার ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দর মধ্যে ভেদ নাই ; সে সময় ন্যায়-অন্যায় বা ভাল-মন্দ বিচার করিবার জন্য আইন বলিয়া কিছু নাই। একমাত্র শারীরিক শক্তিদ্বারাই মানুষের অধিকার নির্ণীত হয় এবং মানুষ শুধু শারীরিক শক্তির দ্বারাই যতটা সম্ভব সম্পদ বা অন্য অধিকার অর্জ্জন ও উপভোগ করে অর্থাৎ তখন জোর যার মুলুক তার, নীতির আধিপত্য চলে। এই অবস্থায় মানুষের জীবনকে হব্‌স্ বলিয়াছেন, "নিঃসঙ্গ, হতভাগ্য, বিশ্রী, পশুসুলভ এবং স্বল্পস্থায়ী" (solitary, poor, nasty, brutish and short)

লকের মতে মানুষ সাধারণতঃ যুক্তি ও ন্যায় দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় এবং মানুষ স্বভাবতই দুর্বৃত্ত প্রকৃতি, এমন নহে। তাঁহার মতে প্রকৃতির অবস্থায় বন্য মানুষ যে নিরন্তর পশুসুলভ সংগ্রামে রত থাকিত তাহা নহে, বরং প্রকৃতির অবস্থায় শান্তির ও যুক্তির রাজত্ব ছিল বলা চলে। প্রকৃতির অবস্থায় মানুষের যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল, তাহা, হব্‌সের ধারণামত শারীরিক ক্ষমতার সমতুল্য নহে, তাহা শুধু প্রাকৃতিক আইন ও যুক্তির অনুশাসনদ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ ছিল। তথাপি, লকের মতে প্রকৃতির অবস্থা কোনও ক্রমেই আদর্শ অবস্থা ছিল না। মানুষের স্বাধীনতা সব সময় অপর কর্ত্তৃক বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল। কারণ

সর্ব্বজন গ্রাহ্য কোনও আইন ছিল না, ঝগড়া-বিবাদের নিষ্পত্তির কোনও সর্ব্ব-সম্মত উপায় ছিল না।

রুশোর মতে প্রাক্ রাষ্ট্রীয় যুগের প্রকৃতির অবস্থা মানুষের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা সুখময় যুগ ছিল। ইহাই ছিল আদর্শ যুগ। রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সেই স্বর্ণযুগে সব জিনিষে ছিল সকলের সমান অধিকার। তখন ছিল স্বর্গীয় সুখ ও আনন্দের দিন। মানুষ তখন অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করিত। রাষ্ট্রের ভার তখন মানুষের মাথায় নামে নাই। মানুষে মানুষে ভেদ ছিল না। তখন ছিল আদিম যুগের আদিম সারল্য এবং মানুষ ছিল কর্ত্তৃত্বের শৃঙ্খলপাশ মুক্ত। মানুষের রচিত আইন তখন মানুষকে শতপাকে বাঁধিয়া ফেলে নাই। কিন্তু রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে কর্ত্তৃপক্ষের খুসীমত শাসনের বশীভূত হইতে হইয়াছে। তাই রুশো বলিয়াছেন, মানুষ স্বাধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই দেখি মানুষ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ("Man is born free and he is everywhere in chains") কিন্তু মানুষের যতই সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, আদিম অবস্থার সুখ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য অন্তর্হিত হইতে লাগিল। অবশেষে মানুষ তাহার প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ত্যাগ করিতে এবং প্রকৃতির অবস্থার পরিবর্ত্তে রাষ্ট্র গঠন করিয়া তুলিতে বাধ্য হইল।

প্রাক্ রাষ্ট্রীয় প্রকৃতির অবস্থা অসহনীয় হওয়ায় মানুষ অতীত যুগে প্রাকৃতিক অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রবেশ করে। এই চুক্তির প্রকৃতি ও পরিণাম সম্পর্কে হব্‌স্, লক্ ও রুশোর মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়।

হব্‌সের মতে মানুষ পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করিয়া রাষ্ট্র স্থাপন করে। মানুষ নিজের নিজের প্রাকৃতিক অধিকার ত্যাগ করে এবং বিনিময়ে নিজের আইনসঙ্গত অধিকার রক্ষার আশ্বাস লাভ করে। মানুষ চুক্তি দ্বারা এক কর্ত্তা বা রাজার কাছে বশ্যতা স্বীকার করিতে স্থির করে। এই কর্ত্তা বা রাজা এই চুক্তির কোনও পক্ষ নহে, সুতরাং এই চুক্তি রাজাকে অসীম অবিসংবাদিত সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বের অধিকারী করে। এই চুক্তি একবার হওয়ার পর আর ভঙ্গ করা যায় না, ইহা চিরকালের জন্য কার্য্যকরী ও বলবৎ থাকিবে। হব্‌স্ এই মতবাদ দ্বারা ইংলণ্ডের ষ্টুয়ার্ট রাজাদের অবাধ শাসন সমর্থন করিয়াছিলেন। যেহেতু রাজা চুক্তির কোনও পক্ষ নহে, রাজা চুক্তির দ্বারা বাধ্যও নহে। রাজা তাঁহার কর্ত্তৃত্বের অধিকার পাইয়াছেন চুক্তির দ্বারা নহে, রাজা তাঁহার অধিকার পাইয়াছেন এই জন্যে যে লোকে তাহাদের অধিকারসমূহ

তাঁহার কাছে অর্পণ করিয়াছে। সুতরাং রাজাকে তাঁহার কর্ত্তৃত্বের আসন হইতে অপসারণ করা যাইতে পারে না। রাজার কাছ হইতে শাসন কর্ত্তৃত্ব কাড়িয়া লওয়া যাইতে পারে না।

লকের মতে, মানুষ পরস্পরের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিবার জন্য একটি চুক্তি করে। প্রাকৃতিক জীবনের অসুবিধা ও অনিশ্চয়তা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য মানুষ রাষ্ট্র স্থাপন করে এবং রাষ্ট্রের আশ্রয়ে নিজেদের ধনসম্পত্তি ও জীবন রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করে। লকের মতে এই চুক্তি হইয়াছিল একদিকে রাজা অপরদিকে সকল প্রজার মধ্যে। রাজা এই চুক্তির ফলে শাসন করিবার অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, অতএব, লকের মতে, রাজা যদি চুক্তির সর্ত্তসমূহ যথাযথ পালন না করেন, তবে, তিনি তাঁহার শাসন করিবার অধিকারও হারাইবেন। লক্ এই মত প্রচার করিয়াছেন যে জনসাধারণের হাতেই শেষ পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌম ক্ষমতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

রুশোর মতে মানুষ প্রাকৃতিক জীবনের অসুবিধা দেখিয়া নিজেদের মধ্যে রাষ্ট্র স্থাপন করিবার জন্য একটি চুক্তি করে। গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিবার জন্য আলাদা কোনও চুক্তি করা হয় নাই। হব্‌সের ন্যায়, রুশো ভাবিতেন রাজা চুক্তির কোনও পক্ষে ছিলেন না, তবে, রুশো একথা বলিতেন যে মানুষ তাহাদের সকল অধিকার রাজাকে অর্পণ করে নাই, নবগঠিত রাষ্ট্রীয় সমাজকে অর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু হব্‌স্ মনে করিতেন মানুষ তাহাদের সমস্ত অধিকার রাজার হাতে অর্পণ করিয়াছিল। তাই হব্‌স্ রাজার সার্ব্বভৌম ক্ষমতার কথা প্রচার করিয়াছেন, আর রুশো বলিয়াছেন প্রজাসাধারণের হাতেই সার্ব্বভৌম ক্ষমতা রহিয়াছে।

বহু মনীষী Social Contract Theoryর বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বেন্‌থাম (Jeremy Bentham) হেন্‌রি (Sir Henry Maine), টমাস্ হিল্ গ্রীন (Thomas Hill Green), অধ্যাপক ব্লুনট্‌শ্‌লি (Bluntschli) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রথম কথা এই যে এই রাষ্ট্রগঠনের এইরূপ কাহিনী ইতিহাসে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইতিহাসে কোথাও এমন নজির নাই যেখানে দেখা যায় যে মানুষ নিজেদের মধ্যে ভাবিয়া চিন্তিয়া স্বেচ্ছামূলক চুক্তি দ্বারা রাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছে।

যুক্তির কষ্টিপাথরেও ওই মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায় না। এই মতবাদ অনুসারে, রাষ্ট্র স্থাপন করিবার পূর্ব্বে, মানুষ যখন প্রাকৃতিক জীবন যাপন করিত, তখন তাহাদের মধ্যে ছিল সাম্য, স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক চেতনা। তাই

তাহারা রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে সাম্য ও স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক চেতনা, মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে আসিয়াছে, রাষ্ট্র গঠনের পরে বিকাশ লাভ করিয়াছে, রাষ্ট্রগঠনের পূর্ব্বে তাহা থাকিতে পারে না।

তা ছাড়া, এই মতবাদ এক মিথ্যা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক চুক্তিমূলক নহে। তাহা হইলে যে কোনও প্রজা নিজের খুশীমত রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে অথবা হইতে অস্বীকার করিতে পারে। এইরূপ মতবাদের ফলে সমস্ত কর্ত্তৃত্বের অবসান হইবে এবং অরাজকতা সৃষ্টি হইবে। বার্ক যথার্থই বলিয়াছেন যে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্ক কোনও স্বেচ্ছাকৃত চুক্তির উপর নির্ভর করে না। রাষ্ট্রের সহিত ব্যক্তির যে বাধ্যবাধকতা ও বশ্যতার সম্পর্ক, তাহা সমাজের সাধারণতঃ স্বার্থ ও প্রয়োজনীয়তা এবং উপযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত, কাহারও ইচ্ছাধীন চুক্তির উপরে নহে।

আসল কথা এই যে এই মতবাদ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া সৃষ্ট হইয়াছিল। রাজাদের স্বেচ্ছামূলক ও জবরদস্তিমূলক শাসনব্যবস্থাকে প্রজাদের বাধা দিবার অধিকার আছে, ইহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই এই মতবাদের প্রয়োজন হইয়াছিল।

শাসক ও শাসিতের মধ্যে পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব রহিয়াছে, শাসক শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখিবে এবং শাসিত বশ্যতা স্বীকার করিবে,—এই অর্থে contract theory গ্রহণ করিলে কাহারও আপত্তি হইবে না। কিন্তু মানুষ প্রাকৃতিক অবস্থায় আলাপ আলোচনা করিয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া, ভোট দিয়া রাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছে,—এই অর্থে contract theory অশ্রদ্ধেয়।

রাষ্ট্র গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে
(The Theory of Force)

এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র শারীরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং শারীরিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত। যখন কেহ কেহ, শুধুমাত্র শারীরিক শক্তির অথবা নেতৃত্বের গুণসমূহের অধিকারী হওয়ার জন্য, রাষ্ট্রীয় জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতাহীন লোকজনকে নিজের বশে আনিয়া নিজের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করে, তখন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। বলবান লোক দুর্ব্বল লোকদের বশীভূত করিয়া নিজ কর্ত্তৃত্বের অধীন করিয়া রাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছে।

রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে এই মতবাদের সমর্থক বেশী নাই। তবে,

রাষ্ট্র-কর্তৃত্বের ভিত্তি যে শারীরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, একথা মোটামুটি রকম ঠিক। গায়ের জোরে রাষ্ট্র প্রজাদের নিকট হইতে বশ্যতা আদায় করিয়া লইতে পারে, বস্তুতঃ এই গায়ের জোর রাষ্ট্রের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন বিশেষ। ব্লুন্ট্‌শ্‌লি (Bluntschli) বলিয়াছেন, এই গুণ ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্ভব নহে। পুরাতন রাষ্ট্র সংগঠন এবং নূতন রাষ্ট্ররূপ পরিগ্রহের মূলে বহু পরিমাণে শারীরিক শক্তি রহিয়াছে। বহু রাষ্ট্র শারীরিক শক্তির রক্তাক্ত পথে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে রাষ্ট্রগঠন ও পরিচালন ব্যাপারে শারীরিক শক্তির রক্ত-লীলা আরও বেশী দেখা যাইবে।

একথা মনে রাখিতে হইবে যে রাষ্ট্র গঠনে শারীরিক শক্তির দান উপেক্ষণীয় নহে, তবে, শারীরিক শক্তির উল্লেখ করিয়াই রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা করা যায় না। এই মতবাদের প্রধান দোষ এই যে রাষ্ট্রগঠনে গায়ের জোরের উপরই একমাত্র জোর দেওরা হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্র কেবল শারীরিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই গড়িয়া উঠিতে পারে না। রাষ্ট্রগঠনে শারীরিক শক্তি একটা উপাদান হিসাবে গণ্য হইতে পারে। কিন্তু একমাত্র ইহার উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্র দাঁড়াইতে পারে না। রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে সকলের নৈতিক সমর্থনের উপরই রাষ্ট্রের স্থায়ী ভিত্তি রচিত হইতে পারে। তাই অধ্যাপক টমাস্ গ্রীন (Thomas Green) বলিয়াছেন, জনগণের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি, শারীরিক শক্তি নহে। ('Will, not force, is the basis of the state'.) প্রজাগণের সমর্থন না থাকিলে কিছুদিন আগে বা পরে, রাষ্ট্রসৌধ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। গণতন্ত্রের বিজয় অভিযানের সহিত এই সত্য আজ সুপ্রতিষ্ঠিত যে সভ্য রাষ্ট্রমাত্রই প্রজাসাধারণের সমর্থনের উপর দাঁড়াইয়া থাকিবে; প্রজাসাধারণের সমর্থন ব্যতীত কোনও রাষ্ট্র টিকিতে পারে না।

The Patriarchal Theory.

সার হেনরি মেন (Sir Henry Maine) এই মতবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন। তিনি তাঁহার Ancient Law এবং Early History of Institutions নামক দুইটি গ্রন্থে এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে এই ভাবে—গোড়ায় ছিল পৃথক্ পৃথক্ পরিবার (family)—পরিবারের মধ্যে সব চেয়ে অধিক বয়স্ক পুরুষ পরিবারের সর্ব্বময় কর্ত্তা হিসাবে থাকিত। কতকগুলি পরিবার একত্র হইয়া গঠিত হইত gens বা house. কতকগুলি gens বা house একত্র হইয়া গঠিত হইত

tribe এবং কতকগুলি tribeকে লইয়া গড়িয়া উঠিত রাষ্ট্র। Patriarchal Theory অনুসারে পরিবার বা familyর ক্রম-সম্প্রসারণের ফলেই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। একটি মানুষ ও তাহার স্ত্রী এবং পুত্রকন্যা লইয়া পরিবার গঠিত ছিল। পুত্র কন্যার বিবাহের দ্বারা ক্রমে পরিবারের সম্প্রসারণ হইতে থাকে, এবং লোক-সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। লোকসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাক, প্রথম পরিবারের কর্ত্তার আধিপত্য তাহার জীবদ্দশায় সকলে মানিতে থাকে। কালক্রমে প্রথম কর্ত্তা হইতে উদ্ভূত অনেকগুলি পরিবার একত্র হইলে, বৃহৎ জনসমষ্টি হয় এবং tribe এর হয় উৎপত্তি। এক tribe এর সকলে রক্তসম্পর্কে আবদ্ধ থাকে বলিয়া সাধারণত তাহারা একত্র থাকে, বিশেষত যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় এইরূপ একতা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। ক্রমশ সকলে মিলিয়া একটা সাধারণ কর্ত্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা করে এবং ইহার ফলেই রাষ্ট্রের হয় উদ্ভব।

Patriarchal Theory এককালে অবিসংবাদী সত্য তথ্যরূপে গৃহীত হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞান গবেষণার ফলে Patriarchal Theoryর সারবত্তা ও যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ ঘটিয়াছে। ম্যাক্লিনান (McLennan), মর্গ্যান (Morgan) প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত এই মতবাদের দোষ ত্রুটি দেখাইয়াছেন। প্রথমত, এই theoryর সপক্ষে কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। আদি সমাজে মনুষ্য-সমষ্টির প্রথম রূপ ছিল পরিবার, যেখানে পুরুষের সম্পর্ক ধরিয়া মানুষ একত্র থাকিত এবং Patriarch বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকবয়স্ক পুরুষ-কর্ত্তা শাসন করিত—এই কথার কোনও ইতিহাস-গ্রাহ্য প্রমাণ নাই। ম্যাক্লিনান্ প্রভৃতি পণ্ডিতের মত এই যে, আদি সমাজে পরিবার ছিল এরূপ, যেখানে স্ত্রীলোকের সম্পর্ক ধরিয়া মানুষ আত্মীয়তা স্থির করিত। তাঁহাদের মতে patriarchal familyর বহু পূর্ব্বে matriarchal familyর অস্তিত্ব ছিল। এই পরিবার ছিল মাতৃকর্ত্তৃত্বাধীন। ইহাতে নারীর সম্পর্ক ধরিয়া আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ বহুলোক একত্র বাস করিত।

The Matriarchal Theory

ম্যাক্লিনান (McLennan), এড্ওয়ার্ড জেঙ্কস্ (Edward Jenks) প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিতের মত এই যে আদিযুগের পরিবার ছিল মাতৃকর্ত্তৃত্বীয়। তখন নারীরা বহু পতি গ্রহণ করিত এবং নারীর সম্পর্ক ধরিয়া আত্মীয়তা স্থির হইত। মোটামুটি ভাবে স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক ছিল অতিমাত্রায় শিথিল এবং বিবাহ-বন্ধন বলিয়া কিছু ছিল না। জেঙ্কস্ বলিয়াছেন যে, মেন (Sir Henry

Maine) family হইতে tribe এর ক্রমপরিণতির যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ ভুল; আসলে পরিণতি হইয়াছে উল্টা দিক হইতে। প্রথম ও আদি দল ছিল tribe, tribe ভাঙ্গিয়া কয়েকটি করিয়া clan সৃষ্টি হয়, clan ভাঙ্গিয়া household, এবং household ভাঙ্গিয়া family সৃষ্টি হয়।

Patriarchal Theoryর মত Matriarchal Theory সম্পর্কেও একথা বলা যায় যে ইহার সমর্থনে ইতিহাসের কোনও প্রমাণ নাই। আদিম অবস্থা সম্পর্কে যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহা হইতে একথা বলা যায় না যে, সর্ব্বত্র কোনও বিশেষ ধরণের পরিবার (family) বিদ্যমান ছিল এবং এই পরিবারই বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের ভিতর দিয়া রাষ্ট্রের রূপ ধরিয়াছে। অধ্যাপক গার্ণার বলেন, পরিবার ও রাষ্ট্র, গঠনের দিক দিয়া এবং উদ্দেশ্য ও কর্ম্মের দিক দিয়া—সর্ব্বতোভাবে পৃথক্ পৃথক্ জিনিষ, কাজেই একটি অন্যটি হইতে উদ্ভূত অথবা একটির সহিত অপরের কোনও সম্পর্ক রহিয়াছে, এমন কথা মনে করিবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি একদিনে হয় নাই, ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে ধীরে ধীরে হইয়াছে

(The Historical or Evolutionary Theory)

অধ্যাপক গার্ণার রাষ্ট্রের উৎপত্তির সকল রকম মতবাদ আলোচনার পর মন্তব্য করিয়াছেন, রাষ্ট্র ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট নহে, অথবা শুধু গায়ের জোরেই গঠিত নহে, পারস্পরিক চুক্তি দ্বারা অথবা পরিবারের সম্প্রসারণের ফলেও সৃষ্ট নহে। ("The state is neither the handiwork of God, nor the result of superior physical force, nor the creation of resolution or convention, nor a mere expansion of the family." —Garner) পরন্তু, রাষ্ট্র ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ফলে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। গভর্ণমেণ্টের মত রাষ্ট্র একটা ভাবিয়া-চিন্তিয়া প্রস্তুত কৃত্রিম জিনিষ নহে, ইহা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ভাবে জন্ম ও উন্নতি লাভ করিয়াছে। রাষ্ট্রের মধ্যে মানব সমাজের যে পরিণতি আজ দেখা যাইতেছে, তাহা একদিনে হয় নাই। আদি মানব সমাজ বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় জীবন যাপনে অভ্যস্ত মানব সমাজ হইতে সম্পূর্ণ পৃথকরূপ ছিল। সেই প্রাচীন যুগের মানব সমাজের অসম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ আকার হইতে ধীরে ধীরে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ উন্নত রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত মানবের মনে রাজনৈতিক বোধ একদিনে উদ্ভব হয় নাই।

Contract Theory অনুযায়ী রাষ্ট্র হঠাৎ একদিন মানুষে মানুষে চুক্তির ফলে সৃষ্ট হইয়াছে, একথা ঠিক নহে। রাষ্ট্রের ধারণা মানুষের মনে রূপ গ্রহণ করিতে নিশ্চয় দীর্ঘকাল গিয়াছে। তাহার পর সহজ সরল রকম রাষ্ট্র যখন ধীরে ধীরে সৃষ্টি হইল, তখন হইতে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রও বিভিন্ন বিকাশের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। যতই সময় যাইতেছে, সভ্যতার অগ্রগতির সহিত রাষ্ট্রের রূপও ততই জটিল হইতেছে, রাষ্ট্রের ক্রিয়া-কলাপ বহুদূর প্রসারী হইতেছে এবং রাষ্ট্র মানবজীবনে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

যে সকল শক্তির ক্রিয়ার ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়তা (Kinship), ধর্ম্মের বন্ধন, জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং শারীরিক শক্তি।

আদি মানব সমাজে রক্ত সম্পর্কের বন্ধন মানুষকে সহজে একত্র করিয়াছে। যখন মানুষ দেখিয়াছে বা অনুভব করিয়াছে তাহাদের মধ্যে একই রক্ত সম্পর্ক, তখন তাহারা একত্র হইয়া পরিবার ও গোষ্ঠীর মধ্যে বাস করিয়াছে।

ধর্ম্মের বন্ধনও রাষ্ট্র গঠনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। প্রাচীন কালে অরাজকতা ও বর্ব্বরতার যুগে ধর্ম্মই মানুষকে শ্রদ্ধার ভাব ও বশ্যতা, এবং শৃঙ্খলা ও কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য শিক্ষা দিয়াছে—রাষ্ট্র ও গভর্ণমেণ্ট এই সব গুণের উপরই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

অতীতে মানুষ ক্রমশঃ যাযাবর অভ্যাস ত্যাগ করিয়া চাষ বাস সুরু করিয়াছে এবং ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা মানুষের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বহিঃশক্তির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা এবং দেশের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার প্রয়োজনীয়তা মানুষ অনুভব করিয়াছে। এই প্রয়োজনীয়তা হইতেই গোষ্ঠীর সর্দ্দার বা প্রধানদের উদ্ভব হইয়াছে—ইহারা সংগঠন করিয়া শারীরিক শক্তির বলে বহিরাক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষার এবং আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রের গঠন-তন্ত্র

(Constitution)

প্রত্যেক রাষ্ট্রের গঠন-তন্ত্র থাকা চাই। গঠন-তন্ত্র ব্যতীত কোনও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্র কি ভাবে পরিচালিত হইবে, সরকারের কোন্ ক্ষমতা থাকিবে এবং সেই ক্ষমতা সমূহ কি ভাবে প্রয়োগ করা হইবে, কোন কোন নিয়ম-কানুন অনুযায়ী সরকার গঠিত ও পরিচালিত হইবে। সরকারের বিভিন্ন অংশের মধ্যে কি সম্পর্ক থাকিবে এবং সরকার বনাম প্রজা সাধারণের কি কি অধিকার ও দায়িত্ব থাকিবে,—রাষ্ট্রের গঠন-তন্ত্র বলিতে ইহাই বুঝায়।

জার্ম্মান লেখক শুল্জ্ (Schulze) বলিয়াছেন, প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষে গঠন-তন্ত্র অনিবার্য্য অংশ। ইহা শাসক ও শাসিতের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করে এবং রাষ্ট্র-ক্ষমতা কিভাবে ব্যবহার করা হইবে তাহা স্থির করে। গঠন-তন্ত্র বলিতে—সেই সব লিখিত ও অলিখিত নিয়ম ও আইনের সমষ্টি বুঝায় যে-গুলির দ্বারা রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশমান হয়, সরকার গঠিত ও পরিচালিত হয় এবং শাসক ও প্রজাবর্গের মধ্যে সম্পর্ক নির্দ্ধারিত হয়।

সরকারের পরিচালন ব্যাপারে জনসাধারণ কতটা অংশ গ্রহণ করিতে পারে, সেই দিক হইতে বিচার করিয়া গঠন-তন্ত্রকে কেহ কেহ, গণতান্ত্রিক (democratic), অভিজাততান্ত্রিক (aristocratic), প্রভৃতি বিভাগে ভাগ করিয়াছেন। অন্য দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, কোনও কোনও গঠন-তন্ত্র ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রথা অথবা আদালতের সিদ্ধান্ত প্রভৃতির উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সব গঠন-তন্ত্র ভাবিয়া চিন্তিয়া আইন করিয়া সৃষ্ট হয় নাই, এগুলি ক্রমবিবর্ত্তনের ফলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের গঠন-তন্ত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আবার অন্য এক শ্রেণীর গঠন-তন্ত্র আছে যাহা কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির রচিত আইনের ফলে গৃহীত ও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গঠন-তন্ত্র, ভারতীয় গঠন-তন্ত্র; প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

উপরি-উক্ত শ্রেণী-বিভাগ ছাড়া, গঠন-তন্ত্রের শ্রেণী-বিভাগ সাধারণত এই দুই ভাবে করা হয়: প্রথমত, লিখিত ও অলিখিত গঠন-তন্ত্র; দ্বিতীয়ত, সহজে পরিবর্ত্তনীয় নহে (rigid) এবং সহজে পরিবর্ত্তনীয় (flexible) গঠন-তন্ত্র।

অলিখিত গঠন-তন্ত্র কাহারও দ্বারা এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সুনির্দ্দিষ্ট আইনের

আকারে রচিত ও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এইরূপ গঠন-তন্ত্রের বেশীর ভাগ অংশই হইল প্রচলিত-প্রথা ও ব্যবস্থা, এবং আদালতের সিদ্ধান্ত দ্বারা পরিপূর্ণ। আইন সভায় রচিত আইনের অংশ ইহাতে তুলনায় অতি অল্প মাত্র। এই শ্রেণীর গঠন-তন্ত্র ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে, ভাবিয়া চিন্তিয়া মানুষ ইহাকে এক দিনে বা অল্প কয়েক দিনে রচনা করে নাই। সার জেম্‌স্ ম্যাকইনটস্ (Sir James McIntosh) যে বলিয়াছেন গঠন-তন্ত্র ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠে, গঠন-তন্ত্রকে কেহ একদিনে তৈরী করে না—ইহা অলিখিত গঠন-তন্ত্র সম্পর্কে বিশেষ ভাবে সত্য। ইংলণ্ডের গঠন-তন্ত্র অলিখিত গঠন-তন্ত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অপর পক্ষে, লিখিত গঠন-তন্ত্র হইতেছে একটি বা কতকগুলি বিধিবদ্ধ আইনের সমষ্টি। গভর্ণমেণ্ট কিভাবে সংগঠিত এবং পরিচালিত হইবে, তাহার নিয়মাবলী সুনির্দ্দিষ্ট আইনের আকারে এইরূপ গঠন-তন্ত্রে লিপিবদ্ধ থাকে। সাধারণত লিখিত গঠন-তন্ত্র একটি মাত্র বৃহৎ আইন দ্বারা রচিত হইয়া থাকে। কখনও কখনও ইহা আবার কতকগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত আইনের সমষ্টি। যে আইনে গঠন-তন্ত্র লিপিবদ্ধ হয়, সে আইন আবার সাধারণ আইন হইতে পৃথক ভাবে রচিত হয় এবং পৃথক মর্য্যাদার আসন পাইয়া থাকে। যেখানে লিখিত গঠন-তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেখানে গঠন-তন্ত্র সংক্রান্ত আইন ও অন্য সাধারণ আইন বদলাইবার ব্যবস্থা এক রকম নহে। লিখিত গঠন-তন্ত্রের উদাহারণ স্থল, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ, ফ্রান্‌স্, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি। ইহা উল্লেখযোগ্য যে অধিকাংশ দেশেই লিখিত গঠন-তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

লিখিত ও অলিখিত গঠন-তন্ত্রের পার্থক্য একটা মূল পার্থক্য নহে। প্রকৃতপক্ষে এই পার্থক্য দ্বারা বিভিন্ন প্রকৃতির গঠন-তন্ত্র সূচিত হয় না। প্রত্যেক লিখিত গঠন-তন্ত্রই কিছুকাল চালু থাকিবার পর তাহাতে বহু অলিখিত অংশ জমিয়া উঠে। ব্রাইস (Bryce) বলিয়াছেন, প্রত্যেক লিখিত গঠন-তন্ত্রই ব্যাখ্যার দ্বারা, আদালতের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের দ্বারা এবং বিবিধ প্রথার দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া নূতন রূপ প্রাপ্ত হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গঠন-তন্ত্র লিখিত গঠন-তন্ত্র, অথচ আজ বহু বৎসরের ব্যবহারের ফলে এই গঠন-তন্ত্রেও নানা রকমের অলিখিত অংশ স্থান পাইয়াছে। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পৃথিবীর কোনও গঠন-তন্ত্রই সম্পূর্ণ লিখিত নহে। আবার একথাও সত্য যে কোনও গঠন-তন্ত্রই সম্পূর্ণ অলিখিত নহে। তথাকথিত অলিখিত গঠন-তন্ত্রে বহু লিখিত অংশ রহিয়াছে। যে সব প্রথা অলিখিত গঠন-তন্ত্রের অংশ, কালক্রমে তাহারা লিপিবদ্ধ হয়। ইংলণ্ডের গঠন-তন্ত্রই অলিখিত গঠন-তন্ত্রের একমাত্র উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

Magna Carta প্রভৃতি ইংলণ্ডে গঠন-তন্ত্র সম্বন্ধীয় বহু আইন রহিয়াছে। অবশ্য, লিখিত গঠন-তন্ত্রের তুলনায় অলিখিত গঠন-তন্ত্রে লিখিত সুসংবদ্ধ আইনের পরিমাণ কম, তথাপি ইহা নিতান্ত নগণ্য নহে। অতএব লিখিত ও অলিখিত গঠন-তন্ত্রের এই পার্থক্য অবৈজ্ঞানিক ও ভ্রান্তিকর বলিয়া পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। তৎপরিবর্ত্তে গঠন-তন্ত্রকে সহজে পরিবর্ত্তনীয় (Flexible) এবং সহজে পরিবর্ত্তনীয় নহে (rigid), এই দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

গঠন-তন্ত্রের সহিত সাধারণ আইনের সম্পর্ক ধরিয়া বিচার করিয়া এইভাবে গঠন-তন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। যে সব গঠন-তন্ত্রের আইনগত মর্য্যাদা সাধারণ আইনের সমতুল্য, যে সব গঠন-তন্ত্র সাধারণ আইনের ন্যায় সহজে পরিবর্ত্তন করা যাইতে প্রারে, সেই সব গঠন-তন্ত্রকে সহজে পরিবর্ত্তনীয় (Flexible) গঠন-তন্ত্র বলা যাইতে পারে। যে সব গঠন-তন্ত্রের আইনগত মর্য্যাদা সাধারণ আইনের উচ্চে, যে সব গঠন-তন্ত্র এরূপ যে তৎসম্বন্ধীয় আইন-কানুন পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সাধারণ আইন পরিবর্ত্তন করিবার পন্থায় হয় না, তজ্জন্য পৃথক পন্থা অনুসরণ করিতে হয়, সেই সব গঠন-তন্ত্রকে সহজে পরিবর্ত্তনীয় নহে (rigid), বা স্থায়ী গঠন-তন্ত্র বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ইংলণ্ড, হাঙ্গেরী ও স্পেনের গঠন-তন্ত্র সহজে পরিবর্ত্তনীয় এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রায় অন্যান্য সকল দেশের গঠন-তন্ত্রই সহজে পরিবর্ত্তনীয় নহে। এই সব রাষ্ট্রের গঠন-তন্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে হইলে নির্দ্দিষ্ট বিশেষ পন্থায় অগ্রসর হইতে হইবে, তাহার নিয়মকানুন, সাধারণ আইন প্রণয়নের নিয়মকানুন হইতে পৃথক।

দুই শ্রেণীর গঠন-তন্ত্রের সুবিধা অসুবিধা

উল্লিখিত দুই শ্রেণীর গঠন-তন্ত্রের ভাল মন্দ দুই দিক আছে। সহজে পরিবর্ত্তনীয় (Flexible)গঠন-তন্ত্রের সপক্ষে বলিবার কথা এই যে এইরূপ গঠন-তন্ত্র দেশের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সঙ্গে সহজে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে।

এইরূপ গঠনতন্ত্র প্রগতিশীল রাষ্ট্রের উপযোগী। এইরূপ গঠনতন্ত্র সুশৃঙ্খলভাবে দেশের অগ্রগতির সহিত সমান তালে আগাইয়া চলে, এবং এমন অবস্থার উদ্ভব হয় না যে, দেশ আগাইয়া চলিয়াছে, আর গঠনতন্ত্র পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা ছাড়া বলিবার কথা এই যে, যেহেতু গঠনতন্ত্র সহজে বদলানো চলে, সেহেতু জনমত পরিবর্তনের সহিত গঠনতন্ত্র যখন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে, তখন সহজেই গঠনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া জনমত শান্ত করা যায়। দেশের প্রয়োজন ও

আদর্শ পরিবর্ত্তনের সহিত যদি গঠনতন্ত্র পরিবর্ত্তন সহজে করার ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে এবং বিপ্লবের পথে এই বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করিতে পারে! সহজে পরিবর্ত্তনশীল গঠনতন্ত্র এইরূপ বিপ্লবের সম্ভাবনা দূর করে। পরিবর্ত্তিত অবস্থার মধ্যেও যদি গঠনতন্ত্রকে পরিবর্ত্তন করা না যায়, তবে লোকে গঠনতন্ত্র ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিবে।

এইরূপ সহজে নমনীয় বা পরিবর্ত্তনীয় (flexible) গঠনতন্ত্রের প্রধান ত্রুটি এই যে, ইহার স্থায়িত্ব কিছুই নাই, ইহা সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। জনচিত্তের ক্ষণস্থায়ী খেয়াল মিটাইবার জন্য অথবা জনসাধারণের সদা পরিবর্ত্তনশীল অভিপ্রায় চরিতার্থ করিবার জন্য অনেক সময় এইরূপ গঠনতন্ত্রের কাঠামো বদল হইতে পারে। সুতরাং এইরূপ গঠনতন্ত্রের ভিতর একটা অনিশ্চয়তা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত জনসাধারণ স্বভাবত ভয় করিতে পারে যে, এইরূপ গঠনতন্ত্রে তাহাদের স্বার্থ, তাহাদের নাগরিক অধিকার, সরকারী লোকজন কর্ত্তৃক পদে পদে ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। লর্ড ব্রাইস বলিয়াছেন, জনসাধারণ স্বভাবতই ভীত ও সন্দেহপরায়ণ, জনসাধারণ খুব সহজ সরল গঠনতন্ত্র দেখিতে চায়, তাহারা সহজে পরিবর্ত্তনীয় গঠনতন্ত্রকে সন্দেহের চোখে দেখিয়া থাকে। আর সত্য কথাও এই যে, জনসাধারণ সজাগ না থাকিলে সহজে পরিবর্ত্তনীয় গঠনতন্ত্রে তাহাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা যে নাই, তাহা নহে।

যে গঠনতন্ত্র সহজে পরিবর্ত্তনীয় নহে (rigid), তাহার একটি গুণ এই যে, তাহার স্থায়িত্ব বেশী। এইরূপ গঠনতন্ত্র অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রস্তুত করা হয়। ইহার বিধি-বিধান স্পষ্ট, এবং ইহার মধ্যে অনিশ্চয়তা কম। এইরূপ গঠনতন্ত্র দ্রুত এবং ঘন ঘন অদল-বদল হইতে পারে না। কাজেই, জনসাধারণের অধিকার এই গঠনতন্ত্রে বিশেষ ভাবে রক্ষিত হয়। গণ-চিত্তের সাময়িক উত্তেজনার ফলে এইরূপ গঠনতন্ত্র পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু, এই গঠনতন্ত্রের দোষ এই যে, গঠনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করা সহজ নহে বলিয়া অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। মানুষের প্রয়োজন ও আদর্শ ক্রমশঃ রূপ বদলাইতেছে, এবং এই পরিবর্ত্তনের সহিত সমান তালে গঠনতন্ত্রও পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত। প্রয়োজন অনুযায়ী গঠনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন করিবার সহজ ব্যবস্থা না থাকিলে, অসন্তোষ বৃদ্ধির সহিত গঠনতন্ত্র অমান্য করিবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং পরিণামে বিপ্লব সৃষ্টি হইতে পারে। মেকলে (Macaulay) যথার্থ-ই বলিয়াছেন যে, জাতি অগ্রগতির পথে চলিয়াছে, আর গঠনতন্ত্র একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে,—বিপ্লব ঘটিবার ইহা একটি বড় কারণ।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যক্তিতন্ত্রবাদ বনাম সমাজতন্ত্রবাদ

(Individualism Vs. Socialism.)

রাষ্ট্রের কার্য্যক্ষেত্র কতদূর বিস্তৃত হওয়া উচিত, ইহা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে এবং বাস্তব রাজনীতিতে একটি দুরূহ সমস্যা। এ সম্বন্ধে প্রথমতঃ দুইটি মত প্রচলিত আছে :—

(১) ব্যক্তিতন্ত্রবাদ (Individualism) এবং (২) সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism).

ব্যক্তিতন্ত্রবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র ভাল জিনিষ নহে, অত্যন্ত মন্দ জিনিষ। তথাপি, মানুষের জীবনে রাষ্ট্র না হইলে চলে না। সুতরাং রাষ্ট্রের কার্য্য-সীমা যতদূর সম্ভব কম হওয়া উচিত। শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য যতটুকু করা অত্যাবশ্যক, রাষ্ট্র তাহার বেশী কিছু করিবে না। মানুষ অহঙ্কারে পরিপূর্ণ এবং অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, স্বার্থসাধনের জন্য মানুষ একে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে দ্বিধা বোধ করে না,—শুধু মাত্র এই কারণেই বাধ্য হইয়া রাষ্ট্র থাকা দরকার। মানুষ যদি অন্যায় না করিত, একে অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিত, নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করিত, তবে রাষ্ট্র থাকিবার দরকার হইত না। ফ্রীম্যান (Freeman) বলিয়াছেন, কোনও রূপ সরকার (Government) না থাকাই আদর্শ ব্যবস্থা। যে কোনও রকমের সরকার থাকুক না কেন, উহা দ্বারা কেবল মানুষের অসম্পূর্ণতা সূচিত হয়। ব্যক্তিতন্ত্র-বাদী বলেন, সরকারের কাজ যতই অল্প হয়, ততই মঙ্গল। এই মতবাদ অনুসারে, সরকার শুধু একটা পুলিস-সঙ্ঘের মত জিনিষ হইয়া থাকিবে, ইহার কাজের সীমা হইবে শান্তিরক্ষা করা, অপরাধ নিবারণের ব্যবস্থা করা এবং চুক্তি অনুযায়ী মানুষকে কাজ করিতে বাধ্য করা। ইহার বেশী কোনও কাজ সরকারের করা উচিত নহে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে ইউরোপে রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্বের অতিরিক্ত প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ব্যক্তিতন্ত্রবাদের উদ্ভব হয়। এ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক Wealth of Nations-এ এই মতবাদের সমর্থন করেন এবং এই সময় এই মতবাদ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে। এ্যাডাম

স্মিথ এই মত প্রচার করেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শ্রমজাত দ্রব্যের বিনিময় ব্যাপারে এবং শ্রমিক নিয়োগ ব্যাপারে, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কুফল প্রসব করে, অতএব ইহা বিশেষ নিন্দনীয়। অর্থনীতিক ক্ষেত্রে, স্বাধীনতাদানের নীতি ইংরাজ অর্থনীতিবিদ রিকার্ডো (Ricardo), ম্যালথাস (Malthus), ফরাসী লেখক দ্য তকভিল (De Toqueville) এবং জার্ম্মাণ পণ্ডিত কাণ্ট (Kant), ফিকৃটে (Fichte) প্রভৃতি সমর্থন করিয়াছেন। পরবর্ত্তী যুগে হার্ব্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) ও জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) ব্যক্তিতন্ত্রবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন।

ইহাদের মধ্যে হার্ব্বাট স্পেন্সার তাঁহার Social Statistics and Man versus the State নামক পুস্তকে এই মতবাদকে বিশেষ জনপ্রিয় করিয়া তুলেন। তাঁহার মত এই যে, মানুষের অন্তর্নিহিত দুষ্ট প্রবৃত্তির জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রয়োজন রহিয়াছে, এবং প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র মানুষের অধিকার সঙ্কুচিত করে। জগতে অপরাধ আছে—তাই রাষ্ট্র আছে, অপরাধ না থাকিলে রাষ্ট্র থাকিত না। সরকার চিরস্থায়ী বলিয়া ধারণা করা ভুল। মানুষের দুষ্ট প্রবৃত্তি যেদিন দূর হইবে, মানুষের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ ও প্রবঞ্চনা যেদিন থাকিবে না, সেদিন কোনও সরকার থাকিবারও দরকার হইবে না। স্পেন্সারের মতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থাকিলে মানুষ কোনও দিন সুখী হইতে পারিবে না। মানুষ স্বাধীনভাবে নিজে কাজ করিতে পারিলেই সুখের সন্ধান পাইবে। রাষ্ট্রের কাজ যথাসম্ভব কম হওয়া উচিত। রাষ্ট্র পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত অধিকারসমূহ রক্ষা করিবে, নূতন করিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা বা সৃষ্টি করিবে না।

ব্যক্তিতন্ত্রবাদের পক্ষে যুক্তি
(Individualism)

ব্যক্তিতন্ত্রবাদের পক্ষে একটি বড় যুক্তি এই যে, মানুষকে তাহার পূর্ণ সত্তা উপলব্ধি করিতে হইবে, স্বাধীনভাবে কাজ করিতে হইবে, রাষ্ট্র যেন তাহার কাজে যথাসম্ভব কম হস্তক্ষেপ করে। কাণ্ট, ফিকৃটে প্রভৃতি পণ্ডিতরাও এই মত পোষণ ও প্রচার করিয়াছেন। রাষ্ট্র ব্যক্তির কাজে যতই হস্তক্ষেপ করিবে, ততই মানুষের আত্মনির্ভরতা, কর্ম্মশক্তি ও উদ্যম এবং দায়িত্বজ্ঞান হ্রাস পাইবে, ততই মানুষের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের দৃঢ়তা হ্রাস পাইবে। রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ফলে মানুষের চরিত্রের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি হইয়া থাকে। অপর পক্ষে, অবাধ প্রতিযোগিতার ফলেই কর্ম্মক্ষমতা, উদ্যম, আত্মনির্ভরতা,

চরিত্রের দৃঢ়তা এবং মৌলিকতা বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তিতন্ত্রবাদীদের মতে, সভ্যতার সর্ব্বাধিক উন্নতি হইয়াছে ব্যক্তিতন্ত্রের যুগে; ব্যক্তিতন্ত্রই সভ্যতার পথ সহজ করিয়াছে। জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন, ব্যক্তিতন্ত্রবাদের অভাবে মানুষ যেখানে সব সময় সরকারের মুখাপেক্ষী, সাধারণ স্বার্থের জন্য সমবেত কর্ম্মের অভ্যাস যেখানে নাই, সেখানে বুঝিতে হইবে, মানুষের চিত্ত-বৃত্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হয় নাই।*

এ-কথাও বলা হয় যে, ব্যক্তিতন্ত্রবাদ বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদ ক্রম-বিবর্ত্তনের নীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, এই মতবাদের ফলেই অর্থনীতিক ক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি টিকিয়া থাকিবে এবং অযোগ্য ব্যক্তির পরাভব ঘটিবে। প্রত্যেককে রাষ্ট্রের সাহায্য না লইয়া নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে, নিজের ভাগ্য নিজেকে সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহার ফলে যাহারা সবচেয়ে বলবান বা যোগ্য, তাহারাই জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবে, অযোগ্য ও দুর্ব্বল লোক থাকিতে পারিবে না। পরিণামে সমাজের কল্যাণ হইবে।

ব্যক্তিতন্ত্রবাদ নির্ভুল অর্থনৈতিক যুক্তির দ্বারা সমর্থিত। এ্যাডাম স্মিথ তাঁহার পুস্তকে† দেখাইয়াছেন যে, এই মতবাদ প্রবর্ত্তনের ফলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ধনোৎপাদন হইবে। খরিদ্দার নিজ স্বার্থে-ই এমন জিনিষ চাহিবে, যাহা সমাজের হিতকারী এবং উৎপাদক নিজ স্বার্থে-ই সর্ব্বাপেক্ষা কম খরচে উৎপাদন করিবে। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে, উৎপন্ন দ্রব্য উন্নত শ্রেণীর হইবে, অথচ অল্প মূল্যের হইবে। জিনিষের ও শ্রমের মূল্য এবং সুদের হার স্বাভাবিক স্তরে থাকিবে।

অতীতের অভিজ্ঞতা ব্যক্তিতন্ত্রবাদের সমর্থন করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ইউরোপে বহু সরকার খাদ্যবস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে, বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদন করিতে বা উৎপাদনে বাধ্য করিতে চাহিয়াছে,—এইরূপ বিবিধ অর্থনৈতিক কাজে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। এইসব সরকারী প্রচেষ্টার ব্যর্থতায় ইতিহাসের পাতা পরিপূর্ণ। বাক্‌ল (Buckle) বলিয়াছেন, সরকার যেভাবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়া ক্ষতি করিয়াছে, তাহাতে সভ্যতার বিকাশ হইল কি করিয়া, ইহা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়।¶

---

* Political Economy. ২য় খণ্ড।

† Wealth of Nations.

¶ Buckle's History of Civilization—১ম খণ্ড।

ব্যক্তিতন্ত্রবাদের পক্ষে আর একটি যুক্তি এই যে, সরকারের ক্ষমতা ব্যক্তিগত ক্ষমতার বেশী কিছু নহে। সরকারের উপর বেশী কাজের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া ঠিক নহে। জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন, ব্যক্তির উপর নির্ভর না করিয়া সরকারের উপর বেশী কাজ চাপাইবার ফলে অনেক কাজ খারাপভাবে সম্পন্ন হয়, এবং অনেক কাজ একেবারেই হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের কাজ সরকারের চেয়ে ভাল বুঝে। কাজেই সরকারী প্রচেষ্টায় যে কাজ হয়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সে কাজ নিকৃষ্ট শ্রেণীর হয়।*

ব্যক্তিতন্ত্রবাদের (Individualism) বিপক্ষে যুক্তি

ব্যক্তিতন্ত্রবাদের বিপক্ষে যুক্তির অভাব নাই। রাষ্ট্র অতি মন্দ জিনিষ, এই মতের উপর ব্যক্তিতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইতিহাস এই মতের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়। মানুষের অভিজ্ঞতাও বিপরীত কথা বলে। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্রের কর্তৃত্বেই সভ্যতার বিকাশ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছে। অবশ্য রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব সময় সময় জনস্বার্থ-বিরোধী হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া রাষ্ট্রকে মন্দ বলা আর সময় সময় রেল দুর্ঘটনা হয় বলিয়া রেলগাড়ীকে মন্দ বলা একই রকম কথা। প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্র ভাল জিনিষ; ইহার দ্বারা মানুষের কল্যাণই হইয়া থাকে। জগতে অপরাধ আছে বলিয়াই রাষ্ট্র আছে, স্পেন্সারের এই কথা গ্রহণ-যোগ্য নহে। বর্ত্তমান সভ্যতার অগ্রগতির সহিত রাষ্ট্র মানুষের জীবনে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিতেছে। বাস্তবিক, ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধ মত আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হাক্স্‌লি বলিয়াছেন, সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত মানুষ একে অপরের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে এবং একজনের ভাল-মন্দের সহিত অপর সকলের ভাল-মন্দ জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান জটিল সভ্যতার যুগে রাষ্ট্রকে শুধু অপরাধ দমন করিয়া ক্ষান্ত হইলেই চলিবে না, তাহা অপেক্ষা মহত্তর কাজ করিতে হইবে। স্পেন্সরের মত বর্ত্তমান যুগে অচল।

ব্যক্তিতন্ত্রবাদীরা যে বলেন, রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী, এ কথাও ঠিক নহে। প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্র সকলের কার্য্যকলাপ সুবিবেচনার সহিত নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রত্যেকের অধিকারের সীমা বৃদ্ধি করে। গার্ণার খুব খাঁটি কথা বলিয়াছেন, "রাষ্ট্র-কর্ত্তৃত্বের সহিত বাগানের মালীর ফলের গাছ ছাঁটার তুলনা করা চলে। ইহাতে কিছু কম ফল হইলেও, ভাল ফল হয়, প্রকৃতপক্ষে সকলে লাভবান হয়।" সরকারী কর্ত্তৃত্বের ফলেই সকল নাগরিক অধিকতর অধিকার,

* J. S. Mill—Political Economy.

অধিকতর নিশ্চয়তার সহিত এবং অব্যাহতভাবে উপভোগ করিতে পারে এবং নিজ নিজ ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশসাধন করিতে পারে। অতীতে সরকারী কাজে ভুল-ত্রুটি ঘটিয়াছে বলিয়া ভবিষ্যতেও ঐরূপ হইবে, একথা বলা বুদ্ধিমানের কাজ নহে।*

ব্যক্তিতন্ত্রবাদীরা যে বলেন প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থ ভালভাবে বুঝে এবং রাষ্ট্র যদি হস্তক্ষেপ না করে, তবে প্রত্যেকে নিজের মঙ্গল যাহাতে হয় তাহাই করিবে, একথা ভ্রমাত্মক। সাধারণ লোক নিজের স্বার্থ বা মঙ্গল বিচার করিবার মত বুদ্ধি ও ক্ষমতাসম্পন্ন নহে। বহু লোক দূষিত জল পান করে, ভেজাল খাদ্য খায়, এমন অনেক কাজ করে যাহাতে তাহার ক্ষতি হয়, মঙ্গল হয় না। তাহারা যে জানিয়া শুনিয়া নিজ স্বার্থরক্ষা সম্পর্কে সচেতন হইয়া এইরূপ করে তাহা নহে, প্রকৃতপক্ষে লোকে নিজ স্বার্থ বুঝিতে পারে না। রাষ্ট্রই ব্যক্তির সকল প্রকার অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজন ভালভাবে বিচার-বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারে। ব্যক্তির স্বার্থরক্ষা ও মঙ্গলবিধানের জন্যই রাষ্ট্রের পক্ষে বিবিধ প্রকার কাজে আত্ম-নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র সরকার ব্যক্তিতন্ত্রবাদ ত্যাগ করিয়াছে। সর্ব্বত্রই সরকার খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল নিবারণ করে। স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করে, কারখানার কাজের সময় ও অবস্থা ঠিক করিয়া দেয়—এইরূপ বহুবিধ কাজ করে, যাহা ব্যক্তিতন্ত্র-বাদীর মতবিরুদ্ধ। ব্যক্তির যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হয়, বিবিধ নিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়া সরকার তাহারই চেষ্টা করে। রাষ্ট্র যদি শুধু শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ নিবারণ করিত, অন্য কিছু না করিত, তবে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যই বিফল হইত।

সমাজতন্ত্রবাদ
(Socialism)

এই মতবাদ অনুযায়ী সরকারী কার্য্যের ক্ষেত্রে বহুদূর বিস্তৃত হওয়া উচিত। এই মতবাদে রাষ্ট্র একটি অতি উৎকৃষ্ট জিনিষ এবং রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হইবে সকল প্রজার আর্থিক, নৈতিক ও মানসিক—সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ-বিধান। সমাজতন্ত্র-

* এ বিষয়ে হাক্সলি বলিয়াছেন, রাষ্ট্রের কাজের ভুল-ত্রুটি আমাদের চোখে বেশী করিয়া ধরা পড়ে, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দোষ ও বিফলতা চোখ এড়াইয়া যায়।

Huxley—Critiques and Addresses.

লর্ড পেমব্রাক বলিয়াছেন, ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার বিফলতা একত্র করিলে পর্ব্বতপ্রমাণ দেখাইবে।

Lord Pembrack—Liberty and Socialism.

বাদীরা মনে করেন যে, রাষ্ট্রের ভিতর সমাজ এরূপভাবে সংগঠিত হইবে যে, উৎপন্ন সম্পদ ন্যায়সঙ্গতভাবে মানুষের মধ্যে বণ্টন করা হইবে এবং মানবজাতির সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হইবে। এই মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি একথা মনে করেন যে, রাষ্ট্রীয় কর্ত্তৃত্বের অধীনেই ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভালভাবে উপভোগ করা সম্ভব।

সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে চরম মতাবলম্বীরা এই মত পোষণ করেন যে, সরকার সমস্ত জমি, মূলধন, উৎপাদনের যন্ত্র, সমগ্র যানবাহন ব্যবস্থা এবং সমস্ত শিল্পের মালিক ও পরিচালক হইবে। এই মত অনুযায়ী সম্পদ উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের সকল ব্যবস্থাই রাষ্ট্রের অধীন হইবে। সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে এই চরম মত বুঝায় না। সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে বুঝায় রাষ্ট্রের কার্য্যক্ষেত্র সম্প্রসারণ এবং মানুষের সম্পদের বৈষম্য দূর করিয়া সমতা আনয়নের উদ্দেশ্যে শিল্পসমূহের জাতীয়করণ।

সমাজতন্ত্রবাদের (Socialism) সপক্ষে যুক্তি

বর্ত্তমান অর্থ নৈতিক কাঠামোর মধ্যে শ্রমজীবী তাহার পরিশ্রমের মূল্য পায় না। যাহারা সত্যিকারের উৎপাদক, সেই শ্রমিক ও কৃষককুল মোট উৎপন্ন সম্পদের সামান্য অংশই পায়। বেশীর ভাগ সম্পদ, মূলধন নিয়োগের মূল্য হিসাবে এবং পরিচালকদের পারিশ্রমিক হিসাবে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের পকেট ভারী করে। বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থা ধনীদের স্বার্থরক্ষার জন্য রচিত হইয়াছে, দরিদ্র ব্যক্তির স্বার্থ এখানে পদে পদে বলি দেওয়া হয়। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় ধনী প্রতিদিন অধিকতর ধনশালী হইতেছে, আর দরিদ্র প্রতিদিন দরিদ্রতর হইতেছে। সমাজতন্ত্রবাদসম্মত ব্যবস্থাই এই অবস্থার প্রতিকার করিতে পারে।

সমাজতন্ত্রবাদ ন্যায় ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জমি ও খনিসমূহ সূর্য্যালোক ও বাতাসের মতই প্রকৃতির দান। অতএব এগুলির উপর সকলের সমান অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়, মুষ্টিমেয় জন কতকের হাতে এই সব সম্পদ সঞ্চিত হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

বর্ত্তমান ব্যবস্থায় অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে শক্তিমান ও যোগ্য ব্যক্তি জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারে এবং দুর্ব্বল ও অযোগ্য ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, এই যুক্তি ব্যক্তিতন্ত্রবাদীরা তাঁহাদের মতের সমর্থনে দিয়া থাকেন। কিন্তু এ যুক্তি অশ্রদ্ধেয়। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে শ্রমিকদের বেতন কমিয়া যায়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষ উৎপন্ন হয়, বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পায়। অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে, বস্তুতান্ত্রিকতা জন্মে ও ব্যক্তিগত চরিত্রের অবনতি হয়, অসাধুতা

বৃদ্ধি পায়। ইহা মানুষের অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতা ও পাপকে বাড়াইয়া তুলে। তাই সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্ত্তন করিয়া মানুষকে নিজের স্বাভাবিক দোষ ও দুর্ব্বলতার হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে এবং উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে হইবে।

বস্তুতঃ, সরকার সর্ব্বত্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পথ বর্জ্জন করিয়া সমাজতন্ত্রবাদের পথে চলিয়াছে। সর্ব্বত্রই সরকার ডাক ও তার বিভাগ পরিচালন করিয়া থাকে, মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে, রেলগাড়ী ও কয়েকটি শিল্প নিজ তত্ত্বাবধানে পরিচালন করিয়া থাকে; ইহার ফল কোথাও খারাপ হয় নাই, বরং ভালই হইয়াছে। রাষ্ট্রের পক্ষে আরও অধিক অগ্রসর হইয়া সমগ্র ভাবে উৎপাদন ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রত্যেকে যাহাতে তাহার ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সমাজতন্ত্রবাদের (Socialism) বিপক্ষে যুক্তি

সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি এই যে ইহা বাস্তবে পরিণত করা শুধু কঠিন নহে, এক রূপ অসম্ভব। এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রকে যে সব কাজ করিতে বলা হয়, তাহা করিবার শক্তি বা যোগ্যতা রাষ্ট্রের নাই। এই মতবাদে রাষ্ট্রকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া ধরা হয়, মনে করা হয় যে রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলেই যে কোনও কাজ করিতে পারে; অথচ বাস্তবিক পক্ষে রাষ্ট্রের ক্ষমতা অতি সীমাবদ্ধ।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ করিয়া সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্ত্তন করিতে গেলে, মানুষের ব্যক্তিগত কর্ম্ম-প্রচেষ্টার প্রধান উৎস রোধ করা হইবে। মানুষ যদি নিজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জ্জন বা উপভোগ করিতে না পারে, তবে, কর্ম্মের উদ্যম চলিয়া যাইবে। বেলজিয়ান লেখক লাভলিয়ে (Laveleye) সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে খুব কড়া সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই মতবাদের নীতি হইতেছে এই যে, অযোগ্য ও অলস ব্যক্তিরা যোগ্য ও পরিশ্রমী ব্যক্তিদের সহিত সমান ফলভোগ করিবে। প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন না ঘটিলে সমাজতন্ত্রবাদ কার্য্যকরী হইতে পারে না। অধ্যাপক এলি (Ely) সত্যই বলিয়াছেন, সমাজতন্ত্রবাদ খুব বড় আদর্শ বটে, তবে, স্বর্গরাজ্যের স্বর্ণদ্বারের এদিকে পৃথিবীতে ইহা বাস্তবে পরিণত হইতে পারে না।

সমাজতন্ত্রবাদ অর্থনীতি শাস্ত্রের নিয়মবিরোধী। সমাজতন্ত্রবাদ অনুযায়ী উৎপাদন রাষ্ট্রপরিচালনার অধীন হইবে, কাজের চাহিদা ও যোগানের উপর উৎপাদন নির্ভর করিবে না। তাহা ছাড়া সরকারী কর্তৃত্বে উৎপাদন হওয়ার জন্য,

ব্যক্তিগত উদ্যমের স্থান ইহাতে থাকিবে না। ব্যক্তিগত স্বার্থের অভাবে, অধিকতর দ্রব্য সস্তায় উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। ফলে, সমাজ দরিদ্র হইয়া পড়িবে।

সমাজতন্ত্রবাদের ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা লোপ পাইবে। মিল, স্পেন্সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই দিকটার উপর বেশী জোর দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে সমাজতন্ত্রবাদের পরিণামে সমস্ত সমাজ সেনা বাহিনীর মত সংগঠিত ও পরিচালিত হইবে এবং মানুষ স্বাধীনতা হারাইয়া দাসত্ব জীবন যাপন করিবে।

সিদ্ধান্ত
(Conclusion)

ব্যক্তিতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে ঘোরতর পার্থক্য থাকিলেও বর্ত্তমানে সকলে এ বিষয়ে একমত যে রাষ্ট্রের পক্ষে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার পুলিসী কর্ত্তব্য ছাড়াও মহত্তর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। অবশ্য মানব-সমাজের শৈশবে, রাষ্ট্রের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল বাহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করা এবং দেশের মধ্যে শান্তিরক্ষা করা। কিন্তু সমাজ যতই সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে, রাষ্ট্রের কার্য্যক্ষেত্র ততই বাড়িয়া গিয়াছে। আজ, জাতির সম্পদ বৃদ্ধি ও কল্যাণ বিধান করা, চিত্তবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করা এবং জাতীয় জীবন উন্নত করা, এগুলি রাষ্ট্রের কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। পোলক (Pollock) একটি খুব খাঁটি কথা বলিয়াছেন, "রাষ্ট্র যখন আদি যুগে জীবন ও সম্পত্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন যে কারণে তাহা সমর্থনযোগ্য ছিল, পরবর্ত্তী যুগে, রাষ্ট্র যখন দাসত্ব প্রথা বিলোপ করিয়াছিল, সেই কারণেই তাহা তখন সমর্থনযোগ্য ছিল, আর, আজ রাষ্ট্র যে অজ্ঞতা দূর করিতে চাহিতেছে, তাহা সমর্থন করিবারও সেই একই কারণ, এবং ভবিষ্যতে রাষ্ট্র যে জীবনের বিবিধ দোষ ত্রুটি সংশোধন করিবে, তাহাও সেই একই কারণে সমর্থন লাভ করিবে।" সমাজে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে মানুষ তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ বিকশিত করিতে পারে এবং জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি ও সফল করিতে পারে। রাষ্ট্র মানুষের সর্ব্ববিধ উন্নতির যন্ত্রস্বরূপ হইবে। আজ সর্ব্বত্র রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রবাদের মূল নীতি গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বে যাহা ব্যক্তিস্বাধীনতায় ছাড়িয়া দেওয়া হইত, এমন অনেক জিনিষ রাষ্ট্র হাতে লইয়াছে। ভবিষ্যতে রাষ্ট্রকর্ত্তৃত্ব বিস্তারের জন্য মানুষের জীবন ক্রীতদাসের জীবনের মত দাঁড়াইবে, এই দুর্ভাবনা করিয়া পীড়িত হইবার দরকার নাই। বর্ত্তমানে রাষ্ট্র

কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অতীতের বিরুদ্ধভাব দূর হইয়া সর্ব্বত্র রাষ্ট্র কর্তৃত্ব বিস্তার করিয়া রাষ্ট্রের হাতে অনেক কাজ তুলিয়া দিবার জন্যই প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়াছে।

রাষ্ট্রের প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র কি
(Proper Sphere of the State)

রাষ্ট্রের কার্য্য সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনার দ্বারা দেখিয়াছি যে ব্যক্তি-তন্ত্রবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদ, উভয় মতবাদের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তির অভাব নাই। এখন আমাদের জানা দরকার রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? রাষ্ট্র কি কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্রবিশেষ, অথবা ইহা একটি নিজের উদ্দেশ্য?

প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণ রাষ্ট্রকে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্রস্বরূপ মনে না করিয়া ইহাকেই একটি উদ্দেশ্যস্বরূপ মনে করিতেন। ব্যক্তির জীবনের কোনও দিকই রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের বাহিরে ছিল না, ব্যক্তিগত জীবনের সব কিছু রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের অধীন ছিল। ব্যক্তি কি খাইবে, কখন খাইবে, কি রকম কাপড় পরিবে, কিরূপ বিবাহ করিবে প্রভৃতি সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। বর্ত্তমান রাষ্ট্রবিজ্ঞান কিন্তু অন্য কথা বলে। এখন রাষ্ট্র সমাজের কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়স্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসমূহকে বিভিন্ন ভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়া থাকে। হোল্‌-ৎসেনডর্ফ্ (Holzendorff) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যসমূহকে প্রকৃত ও আশু উদ্দেশ্য, এবং আদর্শ উদ্দেশ্য, এই দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন। হেগেল (Hegel) বলিয়াছেন, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, হইল নৈতিকজীবন উপলব্ধির ব্যবস্থা করা। ব্লুন্‌ট্‌শ্‌লি (Bluntshli) রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হিসাবে সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ-সাধনের উপর গুরুত্ব দিয়াছেন। তিনি নিজেই আবার বলিয়াছেন, সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ বলিতে কি বুঝায়, তাহা স্পষ্ট নহে। লক্ (Locke) বলিয়াছেন, মানুষের যাহাতে ভাল হয়, তাহার বিধান করাই রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য। হাক্সলি (Huxley) এই সংজ্ঞাকে সংক্ষিপ্ততম ও মহত্তম সংজ্ঞা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন, অথচ, মানুষের ভাল বলিতে কি বুঝায়, এবং কি ভাবে তাহা সাধিত হইবে, সে সকল বিষয়েও বহু মতানৈক্য রহিয়াছে। ব্লুন্‌ট্‌শ্‌লির মতের ন্যায় লকের মতও সুস্পষ্ট নহে। অধ্যাপক গার্ণার (Garner) রাষ্ট্রের কর্ত্তব্যসমূহকে এই ভাবে বিভাগ করিয়াছেন—(১) প্রাথমিক কর্ত্তব্য, যথা শান্তি শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা রক্ষা এবং সকলের পক্ষে ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা, (২) দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র সম্প্রদায়ের বৃহত্তর প্রয়োজন সাধন। সাধারণের স্বার্থে যে সব জিনিষ হওয়া দরকার এবং যাহা ব্যক্তিগত চেষ্টায় হইতে পারে না বা ভাল

হইতে পারে না, তাহা করার ব্যবস্থা, এবং (৩) তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের চরম উদ্দেশ্য হইতেছে, মনের সভ্যতার উন্নতিবিধান।

রাষ্ট্রের কার্য্যবিভাগ
(The Activities of the State)

রাষ্ট্রের কার্য্যাবলীকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করা যায়। কতকগুলি কার্য্য অত্যাবশ্যক এবং অবশ্য কর্ত্তব্য, কতকগুলি কার্য্য স্বাভাবিক, তবে অত্যাবশ্যক নহে, আর তৃতীয়তঃ, কতকগুলি কার্য্য অত্যাবশ্যক বা স্বাভাবিক নহে, তবে, বর্ত্তমানে রাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রায়ই তাহা সম্পাদিত হয়। অত্যাবশ্যক কার্য্য বলিতে, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা বুঝায়। স্বাভাবিক কার্য্য বলিতে সেই সব কার্য্য বুঝায় যাহা রাষ্ট্র না করিলে চলিতে পারে, তবে, তাহা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ছাড়িয়া দিলে ভাল ভাবে কাজ হইবে না। ডাক চলাচলের ব্যবস্থা, খাল-খনন, সরকারী রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যবস্থা, সাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা, দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাজ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আবার যেসব কার্য্য স্বাভাবিকও নহে, অত্যাবশ্যকও নহে, অথচ রাষ্ট্র যেগুলি ব্যক্তিগত চেষ্টার অপেক্ষা সহজে ও কম ব্যয়ে করিয়া থাকে, সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটির উল্লেখ করা যায়,—রেলওয়ে পরিচালন, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, শুল্ক প্রভৃতির দ্বারা শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি, কৃষির উন্নতিবিধান, ব্যাঙ্কিং নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সরকারের শ্রেণী-বিভাগ

(Classification of Governments)

রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা (Sovereignty) পরিচালনের অধিকার কতজন লোকের উপর রহিয়াছে, তাহা বিচার করিয়া এ্যারিষ্টটল (Aristotle) রাষ্ট্র সমূহকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন, যথা—monarchy, aristocracy এবং polity—এইগুলি তাঁহার মতে ছিল রাষ্ট্রের বিশুদ্ধ ও স্বাভাবিক রূপ। অনুরূপভাবে এ্যারিষ্টটলের মতে রাষ্ট্রের বিকৃত ও অশুদ্ধরূপ tyranny, oligarchy এবং anarchy, এই তিনটি। রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা যখন একজন মাত্র ব্যক্তির হাতে থাকে, তখন ইহা monarchy, সার্ব্বভৌম ক্ষমতা যখন কয়েকজনের হাতে থাকে, তখন ইহা aristocracy, আর, সার্ব্বভৌম ক্ষমতা যখন রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীর হাতে থাকে, তখন ইহাকে polity বলা হয়। এ্যারিষ্টটলের এই সুবিখ্যাত শ্রেণী বিভাগ পরবর্ত্তীকালে বহু লেখক অনুসরণ করিয়াছেন। monarchy, aristocracy এবং polity হইল রাষ্ট্রের সুন্দর ও স্বাভাবিক রূপ। কারণ, এইসব রাষ্ট্রে শাসন ব্যবস্থা সাধারণের হিতার্থে পরিচালিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রগুলি যদি সাধারণের হিতার্থে পরিচালিত না হইয়া, ব্যক্তিবিশেষ বা কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থে পরিচালিত হয়, তখন রাষ্ট্রগুলির বিকৃত ও দূষিত রূপ দেখা যায়। যেমন, রাষ্ট্র যখন একজন কর্ত্তৃক তাহার নিজ স্বার্থে পরিচালিত হয়, তখন তাহা হয় tyranny, যখন কয়েকজন কর্ত্তৃক তাহাদের নিজ স্বার্থে পরিচালিত হয়, তখন তাহা হয় oligarchy এবং বহু লোক কর্ত্তৃক তাহাদের স্বার্থ-সাধনের জন্য পরিচালিত হয়, তখন তাহাকে বলা হয় democracy।

এ্যারিষ্টটল কর্ত্তৃক রাষ্ট্রসমূহের যেভাবে শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে, অনেক লেখক তাহার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ এই শ্রেণী বিভাগ কোনও মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; শুধুমাত্র ক্ষমতা পরিচালকদের সংখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই শ্রেণী বিভাগ একটা যান্ত্রিক শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। অধ্যাপক সীলী (Seely) এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান কালে এ্যারিষ্টটল-কৃত রাষ্ট্রের শ্রেণী বিভাগ প্রযোজ্য নহে। এ্যারিষ্টটলের সময়ে যে ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র (city-state) ছিল, তাহার স্বরূপ বর্ত্তমান রাষ্ট্র হইতে পৃথক ছিল। তাহা ছাড়া, বর্ত্তমানে এমন কোনও সভ্য রাষ্ট্র নাই যেখানে সার্ব্বভৌম ক্ষমতা একজন ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তির হাতেই রহিয়াছে। সুতরাং এ্যারিষ্টলের শ্রেণী বিভাগ এ যুগে অচল। ইংলণ্ডের মত রাষ্ট্রে এ্যারিষ্টলের শ্রেণী বিভাগ প্রয়োগ করিতে গেলে তাহার অবাস্তবতা স্পষ্ট ধরা পড়ে। ইংলণ্ডে আইনের দৃষ্টিতে, পার্লামেণ্টই সার্ব্বভৌম ক্ষমতার (legal sovereignty) অধিকারী; আর বাস্তব অথবা রাজনৈতিক দৃষ্টিতে নির্ব্বাচকমণ্ডলী সার্ব্বভৌম ক্ষমতার (political sovereignty) অধিকারী। ইহা ছাড়া, এ্যারিষ্টটলের শ্রেণী বিভাগে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের (constitutional monarchy) কথা স্থান পায় নাই। এইরূপভাবে নানা দিক দিয়া এ্যারিষ্টটলের শ্রেণী বিভাগের বিরুদ্ধ সমালোচনা করা যাইতে পারে।

বাস্তবিক পক্ষে, রাষ্ট্রের আইনগত প্রকৃতি এবং মূল উদ্দেশ্য ধরিয়া বিচার করিলে, সকল রাষ্ট্রই সমান—সকল রাষ্ট্রেরই একই রকম চিহ্ন বর্ত্তমান; সকল রাষ্ট্রেই অধিবাসীবৃন্দ (population), ভূভাগ (territory), সরকার (government) এবং সার্ব্বভৌম ক্ষমতা (sovereignty) বর্ত্তমান থাকিবে। তথাপি বিভিন্ন দিক হইতে বিচার করিয়া রাষ্ট্রসমূহকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হইয়াছে। যেমন, রাষ্ট্রের ভূভাগের আয়তন কতটা তাহা ধরিয়া, রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র কিরূপ তাহা বিচার করিয়া, রাষ্ট্রের সরকার কিভাবে গঠিত তাহা বিবেচনা করিয়া, বিভিন্ন ভাবে রাষ্ট্রের শ্রেণীকরণ করা হইয়াছে। এ সকলের মধ্যে, সার্ব্বভৌম ক্ষমতা কাহার হাতে রহিয়াছে, তাহা বিচার করিয়া এ্যারিষ্টটল যে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বর্ত্তমানকালে, রাষ্ট্রের শ্রেণীকরণ অপেক্ষা সরকারের শ্রেণী বিভাগ আমাদের কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ্যারিষ্টটলের রাষ্ট্রের শ্রেণী বিভাগের সূত্র ধরিয়া আমরা সরকারকেও monarchy, aristocracy এবং democracy রূপে বিভাগ করিতে পারি।

রাজতন্ত্র
(Monarchy)

যে সরকারের সমস্ত শাসন ক্ষমতা একটি ব্যক্তির হাতে থাকে, সেই সরকারকে রাজতান্ত্রিক (monarchic) বলা চলে। রাজার অধস্তন বহু কর্ম্মচারী থাকিতে পারেন, তবু, রাজতন্ত্রে রাজার হাতেই চরম শাসনভার থাকে। রাজতন্ত্র নির্ব্বাচন

অথবা জন্মগত উত্তরাধিকারের উপর নির্ভর করিতে পারে। জনসাধারণ অবশ্য রাজতন্ত্র বলিতে বুঝে এমন শাসন-ব্যবস্থা, যেখানে রাজা জন্মসূত্রে রাজত্ব পাইয়া থাকে। তবে নির্ব্বাচিত রাজতন্ত্রেরও উদাহরণ আছে। প্রাচীন রোমে অথবা প্রাচীন পোল্যাণ্ডে, রাজতন্ত্র নির্ব্বাচনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সাধারণতঃ রাজারা অবশ্য সর্ব্বত্রই জন্মগত উত্তরাধিকার সূত্রে রাজ্যপদ ভোগ করিয়া আসিয়াছেন।

রাজতন্ত্রকে আর এক ভাবে ভাগ করা যাইতে পারে। এক রকম হইতেছে অসীম ক্ষমতাযুক্ত রাজতন্ত্র (absolute monarchy) এবং নিয়মতান্ত্রিক বা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র (constitutional or limited monarchy)। যে রাজতন্ত্রে রাজা প্রকৃতপক্ষে সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তাহাকে অবাধ রাজতন্ত্র বলা চলে। এরূপ স্থলে রাজা নিজ ইচ্ছা ছাড়া কাহারও কাছে মাথা নত করেন না। রাজা নিজের খুসী মত যেভাবে ইচ্ছা শাসন করিবার অধিকারী থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে রাজা ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনও ভেদ থাকে না। এইরূপ শাসন-ব্যবস্থার গুণ এই যে, ইহা খুব সহজ ব্যবস্থা, এবং ইহা দ্রুত উদ্যমের সহিত কাজ করিতে সক্ষম। তাহা ছাড়া যে দেশে মানুষের রাজনৈতিক চেতনা বিকশিত হয় নাই, মানুষ যেখানে আদিম সভ্যতাহীন যুগের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই, সেখানে এইরূপ অসীম শক্তিসম্পন্ন রাজতন্ত্র বিশেষ কার্য্যকরী। এইরূপ রাজতন্ত্র মানুষকে শৃঙ্খলা ও আইনের প্রতি আনুগত্য শিক্ষা দেয়।

অবাধ রাজতন্ত্রের এইসব গুণ সত্ত্বেও, ইহার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। সাধারণভাবে মনুষ্য-চরিত্র বিচার করিলে বলা যায় যে, এইরূপ অবাধ রাজতন্ত্র ক্রমে স্বেচ্ছাচার ও অত্যাচারমূলক শাসন-ব্যবস্থায় পরিণত হয়। দুই একটি রাজা হয়ত বুদ্ধিমান, ক্ষমতাশালী এবং প্রজাদের প্রতি আন্তরিক দরদ-সম্পন্ন উপযুক্ত শাসক হইতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজা উপযুক্ত শাসকের গুণাবলী হইতে বঞ্চিত লোক হইয়া থাকেন, এবং নিজ স্বার্থকে প্রজার স্বার্থের উপরে স্থান দিয়া থাকেন। সে অবস্থায় দেশের সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা এই যে, অবাধ রাজতন্ত্রে, জনসাধারণ সরকারের শাসনকার্য্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, জনসাধারণ রাষ্ট্রের কাজ নিজের কাজ বলিয়া ভাবিতে শিখে না। অবাধ রাজতন্ত্রে বুদ্ধিমান উৎসাহী নাগরিক সৃষ্টি হয় না। সুতরাং অবাধ রাজতন্ত্র কিছুতেই আদর্শ শাসন-ব্যবস্থারূপে গণ্য হইতে পারে না।

যে শাসন ব্যবস্থায় রাজা থাকেন, অথচ রাজা নামে মাত্র সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, বস্তুত, রাজা যেখানে একটি শাসনতন্ত্রের অনুশাসনের অধীন, তাহাকে

নিয়মতান্ত্রিক বা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র বলা চলে। বর্ত্তমানে যে যে স্থানে রাজতন্ত্র প্রচলিত আছে, সে সমস্তই অল্পাধিক নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। এই রাজতন্ত্রে গঠনতন্ত্র দ্বারাই রাজার মর্য্যাদা ও ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। রাজা গঠনতন্ত্র বহির্ভূত কিছু করিতে পারেন না। রাজা গঠনতন্ত্রের সকল নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকেন। জনসাধারণের নির্ব্বাচিত আইন সভা আইন প্রণয়ন করে এবং রাজা সেই আইন অনুসারে মন্ত্রিদিগের পরামর্শক্রমে শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। রাজা নামে মাত্র শাসন পরিচালনা করেন, আসল ক্ষমতা মন্ত্রিগণ এবং আইন সভার হাতে থাকে।

অভিজাততন্ত্র
(Aristocracy)

যে ব্যবস্থায় চূড়ান্ত শাসনক্ষমতা কয়েকজন লোকের হাতে থাকে, তাহাকে অভিজাততন্ত্র বলা চলে। প্রাচীন গ্রীকগণ অভিজাততন্ত্রকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা বলিয়া মনে করিতেন। জ্ঞানী ও গুণী লোকদের সংখ্যা স্বভাবতঃই কম, এবং অভিজাততন্ত্রে শাসন ব্যবস্থা জ্ঞানী ও গুণী লোকদিগের উপর থাকে, ইহাই ছিল প্রাচীন গ্রীকদিগের অভিমত। অভিজাততন্ত্র বিভিন্ন বস্তুর উপর নির্ভর করিতে পারে। ইহা অতীত কালে বিশেষ বিশেষ বংশে জন্মলাভের উপর অথবা সম্পত্তির পরিমাণের উপর সাধারণতঃ নির্ভর করিত। কতকগুলি সদ্গুণ সম্পন্ন হইবার জন্যই অভিজাত বলিয়া শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে স্থান পাওয়ার অধিকার লাভের দৃষ্টান্ত দেখা যায় নাই। সামরিক খ্যাতি অর্জ্জনের উপর অথবা বড় বড় সরকারী পদ লাভের উপরও অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

এ্যারিষ্টটল অভিজাততন্ত্রের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ইহা একটি উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা। সকল ব্যক্তি শাসন কাজের যোগ্য নহে, কেবল যোগ্যতম ব্যক্তিরাই শাসন কার্য্যের অধিকার পাইবে। এই ব্যবস্থায় যোগ্যতা, সদ্গুণ, জ্ঞান ও রাজনৈতিক ক্ষমতার সমাদর হইয়া থাকে এবং ইহার বিশেষ গুণ হইতেছে এই যে, ইহার মধ্যে শাসনের দৃঢ়তা এবং দ্রুত পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ বর্ত্তমান থাকে।

বর্ত্তমান যুগে অভিজাততন্ত্র আর সমাদর লাভ করে না। যদিও মানব-সভ্যতার শৈশবে, সর্ব্বত্র অভিজাততন্ত্রই প্রতিষ্ঠিত ছিল, তথাপি জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইহার পক্ষের সকল যুক্তি অচল হইয়া পড়িয়াছে। অতীতেও দেখা গিয়াছে, অভিজাততন্ত্রে শাসকবর্গই নিজ নিজ

স্বার্থসাধনের সঙ্কীর্ণ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হইয়া শাসনব্যবস্থাকে কলুষিত করিয়াছে। অভিজাততন্ত্রে শাসকবর্গ স্থির করিবার কোনও নির্দ্দিষ্ট পন্থাও আবিষ্কৃত হয় নাই। বিশেষ বংশে জন্মলাভ বা সম্পত্তির মালিক হওয়ার উপর সাধারণতঃ অভিজাততন্ত্র নির্ভর করিত, কিন্তু এই পন্থাগুলিতে যোগ্যতার সমাদর হইতে পারে না।

গণতন্ত্র
(Democracy)

যে শাসনতন্ত্রের পরিচালন ব্যবস্থায় জনসাধারণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে, তাহাকে গণতন্ত্র বলে। গণতন্ত্র সম্পর্কে এব্রাহাম লিন্কন্ (Abraham Lincoln) যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, গণতন্ত্র হইতেছে, জনসাধারণ কর্ত্তৃক, জনসাধারণের জন্য, জনসাধারণের নিজেদের শাসন (government of the people, by the people, for the people)। গণতন্ত্র এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে, জনসাধারণ নিজেদের শাসনব্যবস্থা নিজেরাই পরিচালনা করিতে পারে।

গণতন্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা,—খাঁটি গণতন্ত্র বা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (direct democracy), এবং প্রতিনিধিমূলক বা পরোক্ষ গণতন্ত্র (representative or indirect democracy)। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে সকল প্রজা প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য্যে অংশ গ্রহণ করে। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ইচ্ছা সকল প্রজা কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নিরূপিত এবং প্রকাশিত হয়। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে প্রজাসাধারণ কয়েকজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া দেয়, এবং এই প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা রাষ্ট্রের ইচ্ছা নির্ণীত এবং প্রকাশিত হইয়া থাকে।

প্রাচীন গ্রীসে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। এথেন্সে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের খাঁটি রূপ দেখা দিয়াছিল। কুড়ি বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক সকল নাগরিক একত্র সমবেত হইয়া শাসনকার্য্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারিত। বর্ত্তমান যুগে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র আর সম্ভব নহে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে, যেখানে ভোটাধিকারী লোকের সংখ্যা বেশী নহে, এবং মানুষের সামাজিক প্রয়োজন যেখানে কম ও অনাড়ম্বর, সেইখানেই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র টিকিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে, রাষ্ট্রের আয়তন হইয়াছে অতি বৃহৎ, লোকসংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে এবং মানুষের জীবন জটিল হইয়া উঠিয়াছে। এই অবস্থায় সকল প্রজার পক্ষে একসঙ্গে জুটিয়া প্রত্যক্ষভাবে শাসন ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নহে। তাই বর্ত্তমানে গণতন্ত্র সর্ব্বত্রই প্রতিনিধি-মূলক। এইখানে মনে রাখা দরকার যে, যে-দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সেখানে

শাসনকার্য্য ব্যাপারে সকলের অংশ গ্রহণের অধিকার থাকার অর্থ ইহা নহে যে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অথবা নির্ব্বিশেষে সকলেই এই অধিকার ভোগ করিতে পারে। একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সের নিম্নবয়স্ক ছেলেমেয়েকে ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হয় না। এই বয়সের উর্দ্ধ বয়স্ক সকল স্ত্রী-পুরুষ আজকাল প্রত্যেক প্রগতি-সম্পন্ন গণতন্ত্রের দেশে ভোট দিবার অধিকার পাইয়া থাকে। ভোটাধিকারী নাগরিকগণ তাঁহাদের ইচ্ছামত প্রতিনিধিসমূহ নির্ব্বাচন করেন এবং এই প্রতিনিধি-বর্গই সকলের হইয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করেন। যদিও শাসনকার্য্যের ভার কয়েকজন প্রতিনিধির উপর ন্যস্ত থাকে, তথাপি এই ব্যবস্থায় চূড়ান্ত ক্ষমতা শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র জনসাধারণের হাতে থাকে। প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের তরফে তাঁহাদের ন্যস্ত শাসন অধিকারই পরিচালনা করেন।

গণতন্ত্রের (Democracy) সপক্ষে যুক্তি

গণতন্ত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা। অবশ্য, বর্ত্তমান যুগে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র ছাড়া প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রয়োগ করিবার সম্ভাবনা নাই। গণতন্ত্রের পক্ষে প্রথম যুক্তি হইতেছে এই যে, এই শাসনব্যবস্থা জনসাধারণের প্রয়োজন ও অভিপ্রায় অনুসারে পরিচালিত হইয়া থাকে। শাসিতদের প্রতি শাসকবর্গের দায়িত্ব ও কর্তব্য এই ব্যবস্থার মধ্যেই পালন করা হইয়া থাকে। এই শাসন-ব্যবস্থা জনসাধারণের প্রতি দায়িত্বশীল ও জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীন; কাজেই ইহাতে শাসকবর্গ নিজেদের স্বার্থে অথবা কোনও শ্রেণীবিশেষের স্বার্থে শাসন পরিচালনা করিতে পারে না। জন ষ্টুয়ার্ট মিল গণতন্ত্রের একজন উপাসক ছিলেন। তিনি ইহাকে আদর্শ ব্যবস্থা বলিয়া ইহার জয়গান করিয়াছেন। কারণ ইহাতে চূড়ান্ত শাসন ক্ষমতা শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র জনসাধারণের হাতেই থাকে। মিলের মতে, ব্যক্তির অধিকার ও স্বার্থ তখনই ভালভাবে রক্ষিত হয়, যখন ব্যক্তি নিজে তাহা রক্ষার জন্য লড়াই করিতে পারে, এবং গণতন্ত্রেই ইহা সম্ভব। গণতন্ত্রে অধিক সংখ্যক লোক শাসন ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করার ফলে, জন-সাধারণের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইয়া সকলকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলে।

আর সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, গণতন্ত্র নাগরিকদিগের চরিত্র উন্নত করে। ইহা সকলের চিত্তবৃত্তির বিকাশ করে, রাজনৈতিক চেতনা ও জ্ঞান দান করে, সাধারণের কাজে সকলের উৎসাহ বৃদ্ধি করে এবং প্রকৃত নাগরিক হইবার শিক্ষা দেয়। গণতন্ত্রে সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্থান নাই, ইহা সকলকে সমান রাজ-নৈতিক অধিকার প্রদান করে। জনসাধারণ সরকারের পরিচালনায় অংশ গ্রহণ

করিতে পারে বলিয়া সরকারের জন্য হাসিমুখে ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকে। নাগরিক মাত্রেই ভাবিতে শিখে যে, দেশ তাহাদের নিজেদের, শাসকগণ দেশের সেবক মাত্র, প্রভু নহে। সুতরাং দেশকে তাহারা প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে শিখে। গণতন্ত্র বিপ্লবের আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়ে না, কারণ ইহা শাসিতের সম্মতি এবং শাসন অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্রে শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগ থাকিলে তাহা সহজেই দূর করা সম্ভব।

গণতান্ত্রিক শাসনে সকলের বুদ্ধি ও অন্যান্য সদ্‌গুণ বিকাশ লাভ করে। শাসনব্যবস্থার বাস্তব রূপের সহিত মানুষ পরিচয় লাভ করে এবং হাতে-কলমে কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করে।

গণতন্ত্রের বিপক্ষে যুক্তি
(Arguments against Democracy)

গণতন্ত্রের বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেখানো হয়। গণতন্ত্রের দোষ-ত্রুটি অনেক সময় পক্ষপাতিত্ব সহকারে অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। গণতন্ত্রের বিপক্ষে প্রথম যুক্তি এই দেখানো হয় যে, ইহাতে মানুষের সংখ্যাকেই বড় করা হইয়াছে, গুনকে নহে। ইহা যোগ্যতার আদর করে না। সকলেই শাসনকার্য্যে সমান যোগ্যতার অধিকারী, এই ভুল নীতির উপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ, গণতন্ত্রের ভক্ত মিল (J. S. Mill) এবং মঁতকিউ (Montesquieu) স্বীকার করিয়াছেন যে, যেখানে নাগরিকগণ যথেষ্ট বুদ্ধি ও সদ্‌গুণের অধিকারী, সেখানেই গণতন্ত্র বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভব।

মেন (Sir Henri Maine) ও অধ্যাপক লেকি (W. E. H. Lecky) গণতন্ত্রের কড়া সমালোচনা করিয়াছেন। মেন সাহেব বলিয়াছিলেন যে, গণতন্ত্র অতি অস্থায়ী জিনিষ; ইহা কিছুতেই বেশী দিন টিকিবে না। তাঁহার মতে, সর্ব্বসাধারণের ভোটাধিকার নীতির উপর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, এবং সর্ব্বসাধারণের ভোটাধিকার জুলুমবাজীর স্বাভাবিক ভিত্তি; গণতন্ত্র হইতেছে অজ্ঞ ও বুদ্ধি-বিবেচনাহীন লোকদের শাসন। মেন সাহেব আরও বলিয়াছেন যে, গণতন্ত্রের সহিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার সম্পর্ক কিছুমাত্র নাই, এবং গণতন্ত্রের পরিণাম ভয়াবহ। অধ্যাপক লেকিও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গণতন্ত্র হইতেছে দরিদ্রতম, অজ্ঞতম, অযোগ্যতম ব্যক্তিদের শাসন। যোগ্যতা কতিপয় লোকেরই থাকে, সকলের থাকে না। এই কতিপয় যোগ্য ব্যক্তির হাতেই শাসনভার দিতে হইবে, সর্ব্বসাধারণের হাতে নহে। এইসব সমালোচক একথাও বলেন যে,

গণতন্ত্র সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির পরিপন্থী। গণতন্ত্র এইসব জিনিষ অপ্রয়োজনীয় বলিয়া ইহা বর্জ্জন করে অথবা গণতন্ত্রে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহা এসব বিষয়ের চর্চ্চার অনুকূল নহে। অজ্ঞ ও অযোগ্য লোকদের হাতে পড়িয়া গণতন্ত্র অচিরে জুলুমবাজী ও স্বেচ্ছাচার হইয়া দাঁড়ায় এবং সমান অধিকার বা স্বাধীনতা বলিয়া কিছু থাকে না।

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একথাও বলা হয় যে, ইহাতে শাসন-ব্যবস্থা একদল হইতে অন্য দলের হাতে যায়। ইহাতে শাসননীতির ধারা সমান থাকে না, বারে বারে ইহা ক্ষুণ্ণ হয়।

সিদ্ধান্ত
(Conclusion)

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যত যুক্তি দেখানো হইয়াছে, তাহা বিশেষ সারবান নহে। মেন সাহেব গণতন্ত্রের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্পর্কে যে, ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, সুখের বিষয়, তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে। আজ সভ্য জগতের প্রায় সর্ব্বত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজ ইহা সুস্পষ্ট যে, গণতন্ত্র রাজনীতির ইতিহাসে অনিবার্য্য ও অপ্রতিরোধ্য পরিণতি। কোনও শক্তি ইহার অভিযান ঠেকাইতে পারে না।

গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে কোন্ জিনিষ আবশ্যক ?
(How can Democracy be successful)

গণতন্ত্রের সফলতা কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সকলের চেয়ে বড় কথা এই যে, নাগরিকদের বিচারবুদ্ধি এবং কর্ত্তব্যবোধ থাকা চাই—এই সকল সদ্‌গুণের উপরই গণতন্ত্র স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন, গণতন্ত্রের সফলতার জন্য তিনটি জিনিষ দরকার। প্রথমতঃ, দেশের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালনা করিবার মত শক্তি ও ইচ্ছা থাকা চাই। দ্বিতীয়তঃ, দেশের জনসাধারণ যেন সর্ব্বদা তাহাদের নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য সতর্ক থাকে। নাগরিক স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ যেন তাহারা কোনও ভাবে সহ্য না করে। তৃতীয়তঃ, সকলে যেন তাহাদের নাগরিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত থাকে। প্রত্যেকে যেন সর্ব্বসাধারণের স্বার্থকে নিজের স্বার্থ বলিয়া মনে করিতে পারে, এবং তজ্জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকে। বিচারবুদ্ধি ও সাধুতার সহিত সকলে যেন নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করে। দেশের

শাসনতন্ত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার বিধান থাকিলেই চলিবে না, জনসাধারণ যেন তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সদা-জাগ্রত দৃষ্টি লইয়া প্রস্তুত থাকে। অর্থাৎ তাহাদের রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হওয়া চাই। গণতন্ত্রের সফলতার পথে আর একটি বাধা হইতেছে, অর্থ-নৈতিক অসাম্য। বর্তমান সমাজে যেরূপ আর্থিক অসাম্য রহিয়াছে তাহা দূর হওয়া দরকার। সকলে যেন অভাবের পীড়ন হইতে মুক্ত থাকে। ধনসম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে এত অধিক বৈষম্য থাকিলে, গণতন্ত্র সফল হইতে পারিবে না।

গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ডিক্টেটরশিপ বা একনায়কত্বের আবির্ভাব

(The Rise of Dictatorship against Democracy)

প্রথম মহাযুদ্ধের পর গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্ব্বত্র একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইউরোপের অনেক দেশে যুদ্ধোত্তর সমস্যাগুলি সমাধানে গভর্ণমেণ্টের অক্ষমতা দেখা যায়। তা'ছাড়া অনেক স্থানে বহু দলের অস্তিত্ব থাকায়, সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিশালী বড় দল গঠন করিয়া দেশের শাসন কাজ চালানো অসম্ভব হইয়া পড়ে। ফলে, দেশে অসন্তোষ বাড়িতে থাকে। গণতন্ত্রের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে লোকের ধারণা শিথিল হইতে থাকে। এই সুযোগে ইউরোপের ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ছাড়া প্রায় সর্ব্বত্র ডিক্টেটরী শাসন চাপিয়া বসে। যুদ্ধোত্তরকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ডিক্টেটরদের আবির্ভাবের কারণ। এক একজন ডিক্টেটর হইল এক একটি পার্টির সর্ব্বময় কর্ত্তা। এই পার্টির সভ্যগণ অন্ধভাবে তাহাকে অনুসরণ করে। ডিক্টেটরী শাসনে, একটিমাত্র পার্টি থাকিতে দেওয়া হয়—ডিক্টেটরের পার্টি ; ইহা অন্য সব পার্টিকে গায়ের জোরে বিনষ্ট করে । রাষ্ট্র একটি মাত্র দলের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়ে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই থাকে না। মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা অথবা সঙ্ঘবদ্ধ হইবার স্বাধীনতা লোপ পায়।

একনায়কত্ববাদ অনুসারে রাষ্ট্র সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, এবং রাষ্ট্র ব্যক্তি-জীবনের সমস্ত দিক নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকারী। ব্যক্তি-জীবন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের অধীন হইবে। ব্যক্তির রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনও অধিকার থাকিতে পারিবে না। একনায়কত্ববাদ, এক নেতা, এক দল, এক জাতি এবং এক রাষ্ট্র—এই আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।

একনায়কত্বের পক্ষে এই যুক্তি দেওয়া হয়, যে, ইহা সম্পূর্ণ জাতীয় একতা আনয়ন করে। ইহা খুব দ্রুতভাবে কাজ করিতে পারে, সুতরাং ইহা সহজে

জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হইতে পারে। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় এবং বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে ইহা বিশেষ কার্য্যকরী। ইহা স্বদেশ প্রেম, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং আত্মত্যাগ শিক্ষা দেয় এবং ইহা বর্তমান ধনতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় বিশেষ কার্য্যকরী।

একনায়কত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি এই যে, ইহা মানুষের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহা গায়ের জোরের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। সুতরাং ইহার ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহ হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই ব্যবস্থায় সর্ব্বসাধারণ শাসন ব্যাপারে কোনও অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। এই ব্যবস্থায় সকলকে অন্ধভাবে রাষ্ট্রের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে হয় এবং বার বার যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্য দিয়া মৃত্যুর পথ বরণ করিয়া লইতে হয়। জনসাধারণ ক্রমশঃ দেশের ব্যাপারে উৎসাহ হারাইয়া ফেলে, অবশেষে তাহাদের স্বদেশ-প্রীতি পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। একনায়কত্বের মধ্যে মানুষ ব্যক্তিত্ব হারাইয়া রাষ্ট্রের হাতে যন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা একেবারেই থাকে না। ইহাতে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ বিকশিত না হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়।

যদিও গণতন্ত্র অনেক স্থানে একনায়কত্ববাদের চাপে পড়িয়া বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তথাপি ইহাকে গণতন্ত্রের পরাজয় বলা চলে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, জার্ম্মাণী, ইটালী প্রভৃতি একনায়কত্ববাদী দেশের পরাজয়ের ফলে, গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে বলা চলে। তাহা ছাড়া ল্যাস্কি (Laski) যথার্থ-ই বলিয়াছেন, যে গণতন্ত্র এতদিন চলিয়াছে, তাহা ধনতন্ত্রবাদীদের হাতে একটা যন্ত্রস্বরূপ বলা চলে। এই ধনতন্ত্রসম্মত গণতন্ত্র বদলাইয়া ধনসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র এখনও ভাল ভাবে পরীক্ষিত হয় নাই। প্রকৃত গণতন্ত্র সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হইবেই।

মন্ত্রিমণ্ডল শাসিত সরকার এবং প্রেসিডেন্ট শাসিত সরকার

(Cabinet Government and Presidential Government)

শাসন বিভাগের সহিত আইন সভার সম্পর্ক বিচার করিয়া গভর্ণমেণ্টকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা,—Cabinet Government এবং Presidential Government. Cabinet Government বলিতে সেইরূপ গভর্ণমেণ্ট বুঝায়, যেখানে শাসন বিভাগের আসল কর্ত্তাগণ, অর্থাৎ মন্ত্রিগণ প্রত্যক্ষভাবে আইন সভার নিকট দায়ী থাকে এবং পরোক্ষভাবে নির্ব্বাচকমণ্ডলীর

নিকট দায়ী থাকে। মন্ত্রিগণকে আইন সভার সভ্য হইতে হয়। একথা বলা যাইতে পারে যে, Cabinet Government-এ মন্ত্রিদের বেলায় শাসন-বিভাগীয় ও আইন বিভাগীয় ক্ষমতার একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে। সমবেতভাবে মন্ত্রিগণই গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া থাকেন। মন্ত্রিগণ প্রধান প্রধান আইন রচনা করেন এবং যাহাতে তাঁহাদের রচিত-আইন,আইন-সভায় গৃহীত হয় তাহার ব্যবস্থা করেন। মন্ত্রিগণ গভর্ণমেণ্টের এক বা একাধিক বিভাগের কর্ত্তা হিসাবে স্ব স্ব বিভাগের শাসন পরিচালনা করেন। মন্ত্রিগণ তাঁহাদের শাসন কার্য্যের জন্য আইন সভার নিকট দায়ী থাকেন, যতদিন মন্ত্রিগণ কর্তৃক অনুসৃত নীতি আইন সভার অধিকাংশ সভ্য কর্তৃক সমর্থিত হইয়া থাকে, ততদিন মন্ত্রিগণ তাঁহাদের মন্ত্রিত্বের পদে সমাসীন থাকিয়া দেশের শাসন পরিচালনা করেন। কিন্তু যখনই আইন সভা মন্ত্রিগণের উপর অনাস্থা প্রকাশ করে, তখনই, মন্ত্রিগণ হয় পদত্যাগ করিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরোধী-দলকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে সুযোগ দেন, নতুবা, আইন সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করেন। নূতন নির্ব্বাচন যদি মন্ত্রিগণের দলের অনুকূল হয়, তবে মন্ত্রিগণ শাসনকর্ত্তা হিসাবে কাজ চালাইয়া যাইতে থাকেন। কিন্তু নির্ব্বাচনের ফল মন্ত্রিগণের দলের প্রতিকূল হইলে, মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করেন। তখন যে-দল নির্ব্বাচনে সংখ্যাধিক্যে জয়লাভ করে, সেই দল মন্ত্রীসভা গঠন করে। সেই দলের নেতৃবর্গ বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হন।

Cabinet Government-এর উদ্ভব হয় ইংলণ্ডে। সেখানে Cabinet Government কাহারো চেষ্টায় রাতারাতি গড়িয়া উঠে নাই। ইহা ধীরে ধীরে ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ফলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। Cabinet Government ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপের অনেক দেশে, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে এবং ভারতীয় ইউনিয়নে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইসব স্থানে আইন সভার নির্ব্বাচনের পর, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করে এবং মন্ত্রিমণ্ডলী আইন সভার নিকট তাঁহাদের কার্য্যের জন্য দায়ী থাকেন।

প্রেসিডেণ্ট শাসিত সরকার
(Presidential Government)

Presidential Government বলিতে সেই গভর্ণমেণ্ট বুঝায় যেখানে শাসন বিভাগের কর্ত্তা, গঠনতন্ত্র অনুসারে আইন বিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীন নহে। এইরূপ গভর্ণমেণ্টে আইন সভা, শাসন বিভাগীয় কর্ত্তার কার্য্যকালের স্থায়িত্ব

এবং অনুসৃত শাসননীতি ও শাসনকার্য্য, প্রভৃতি বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত। গঠনতন্ত্র অনুসারে, শাসন বিভাগীয় বড়কর্ত্তা আইন সভার নিকট দায়ী নহেন ; তিনি তাঁহার কার্য্যকলাপ এবং নীতির জন্য আইন সভার নিকট জবাবদিহী করিতে বাধ্য নহেন। অবশ্য, সাধারণতঃ, খুব গুরুতর অপরাধের জন্য শাসন বিভাগীয় কর্ত্তার বিচার (impeachment) করিবার ভার আইন সভায় থাকে। কিন্তু এইরূপ বিচার করিবার ক্ষমতা ছাড়া, অন্য কোনও ভাবে, আইন সভা শাসন বিভাগীয় কর্ত্তাকে জবাবদিহী করিতে বাধ্য করিতে পারে না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র Presidential Governmentএর প্রথম ও উজ্জল দৃষ্টান্ত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জনসাধারণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হন ; তাঁহার কার্য্যকাল আইন সভা কমাইতে পারে না। তাঁহার কার্য্যের জন্যও আইন সভা তাঁহাকে জবাবদিহী করিতে বাধ্য করিতে পারে না। শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য এই ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নির্ব্বাচিত মন্ত্রীমণ্ডলী থাকেন, কিন্তু এই মন্ত্রিগণ আইন সভার সভ্য নহে, এবং আইন সভার নিকট দায়ীও নহে। আইন সভা যদি ইঁহাদের কার্য্যে অনাস্থা প্রকাশ করে, তথাপি ইঁহারা পদত্যাগ না করিয়া কাজ চালাইয়া যাইতে পারেন।

এক-রাষ্ট্রীয় এবং যুক্ত রাষ্ট্রীয় সরকার
(Unitary and Federal Government)

সরকারী ক্ষমতাসমূহ কিভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে সেই দিক হইতে বিচার করিয়া গভর্ণমেন্টকে Unitary ও Federal গভর্ণমেণ্টে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। সরকারী ক্ষমতাসমূহ যখন একটি স্থানে কেন্দ্রীভূত থাকে, স্থানীয় সরকার-সমূহ যখন কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছায় সৃষ্ট ও পরিচালিত হয়, এবং তাহাদের কেন্দ্রীয় সরকার-নিরপেক্ষ নিজস্ব অধিকার বলিয়া কিছুই থাকে না, তখন সেই গভর্ণমেণ্টকে Unitary Government বলে। এইরূপ অবস্থায় সরকারী কর্ত্তৃত্ব একস্থানে কেন্দ্রীভূত থাকে, তবে, শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য স্থানীয় সরকার গঠিত হইতে পারে। কিন্তু এই সব স্থানীয় সরকারের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার হইতে প্রাপ্ত। এই সব স্থানীয় সরকারের স্বাধীন ইচ্ছা বা কাজ করিবার ক্ষমতা বলিয়া কিছু থাকে না, ইহারা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরূপেই থাকিবার ও কাজ করিবার অধিকারী হইয়া থাকে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি বহু রাষ্ট্র এই গভর্ণমেণ্টের উদাহরণ স্থল।

দেশের সমুদয় শাসন ক্ষমতা যখন একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও কতকগুলি স্থানীয় সরকারের মধ্যে বন্টিত হয়, তখন যেখানে স্থানীয় সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সৃষ্ট বস্তু মাত্র নহে অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিস্থানীয় মাত্র নহে, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারসমূহ, উভয়ের ক্ষেত্র এক মূল শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট এবং কোনও সরকারই নিজ নিজ সীমা লঙ্ঘন করিয়া অপর কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, সেখানে আমরা Federal Government অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উদাহরণ পাই। যুক্তরাষ্ট্রে দুই রকম সরকার থাকে, একটি কেন্দ্রীয় বা আসল যুক্ত রাষ্ট্রীয় সরকার, দুই, স্থানীয় সরকারসমূহ। একটি সাধারণ শাসনতন্ত্র কর্তৃক ইহাদের নিজ নিজ কার্য্যসীমা নির্দ্দিষ্ট করা থাকে, নিজ নিজ কার্য্যসীমার মধ্যে, কি কেন্দ্রীয় সরকার, কি স্থানীয় সরকার, উভয়কেই কাজ করিতে হয়। এই নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে কেহ কাহারও কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। কতকগুলি সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র কতকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে পারে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এইভাবে গঠিত হইয়াছিল। আজ যে ৪৮টি ষ্টেট (State) লইয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গঠিত, তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য্যক্ষেত্র গঠনতন্ত্র কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। কতকগুলি সাধারণ বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীন, কতকগুলি স্থানীয় বিষয় ষ্টেটগুলির সরকারের কর্তৃত্বাধীন। ষ্টেটগুলি নিজ নিজ সত্তা সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন না দিয়া একটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন মিলিত হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে গঠিত হইয়াছে, ভারতবর্ষের যুক্তরাষ্ট্র তাহার বিপরীতভাবে গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে প্রথমে ছিল Unitary Government—এই সরকারের বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ প্রদেশগুলির হাতে স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হইয়াছে এবং অবশেষে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন মত ভারত বিভাগের পর ভারতবর্ষে গণ-পরিষদ কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্রের খসড়া রচিত হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বিশেষত্ব কি?
(Characteristics of a Federal Government)

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কয়েকটি বিশেষত্বসূচক চিহ্ন রহিয়াছে। প্রথমতঃ, ইহাতে একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও কয়েকটি স্থানীয় সরকার থাকে। প্রত্যেক সরকারই

গঠন-তন্ত্র-নির্দ্দিষ্ট নিজ নিজ সীমার মধ্যে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার অধিকারী, কেহ অপরের কর্ত্তৃত্বাধীন নহে।

দ্বিতীয়তঃ, গঠনতন্ত্র কর্ত্তৃক সরকারী ক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার সমূহের মধ্যে বন্টন করা হয়। সর্ব্বসাধারণের স্বার্থজড়িত বিষয়গুলি, যথা, দেশরক্ষা, মুদ্রাব্যবস্থা, ডাক ও তার বিভাগ, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রাখা হয় এবং যে সব বিষয়কে স্থানীয় ব্যাপার বলা যায়, বা যে সব বিষয়ের পরিচালনা বন্দোবস্ত স্থানভেদে ও অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকম করা দরকার হইতে পারে, সেগুলি স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারের হাতে রাখা হয়।

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত গঠনতন্ত্র থাকে। যুক্তরাষ্ট্র যদি অলিখিত গঠনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা প্রয়োগ লইয়া কলহ উপস্থিত হইতে পারে। তাই, যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত গঠনতন্ত্র দ্বারা উভয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ও কার্য্যসমূহ সুনির্দ্দিষ্টভাবে স্থির করিয়া দেওয়া হয়। চতুর্থতঃ, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে মীমাংসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Court) প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গঠনতান্ত্রিক আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারে এবং গঠনতান্ত্রিক বিরোধের বিচার করিতে পারে।

পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদিগকে উভয় সরকারের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকার—উভয় সরকারের আইনই নাগরিকগণকে সমভাবে পালন করিতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টন
(Divison of Powers in a Federal State)

যুক্তরাষ্ট্রে শাসনক্ষমতাসমূহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারসমূহের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এই ক্ষমতা বণ্টনের মূলনীতি হইতেছে এই যে, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল স্থান বা প্রদেশের স্বার্থজড়িত সাধারণ বিষয়গুলি এবং যেসব বিষয়গুলি সম্পর্কে একই রকম আইন-কানুন ও পরিচালন-ব্যবস্থা দরকার, সেই বিষয়গুলির ভার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দেওয়া হয়। আর যেসব বিষয়ে সাধারণের স্বার্থ সমভাবে জড়িত নহে, অথবা যেসব বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দরকার, সে বিষয়গুলি স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারের হাতে দেওয়া হয়। এই মূলনীতি অনুযায়ী, দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, মুদ্রানীতি, ব্যাঙ্কিং, বীমা প্রভৃতি বিষয় কেন্দ্রীয়

সরকারের হাতে দেওয়া হয় এবং কৃষি, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারের হাতে দেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টনের প্রণালী

(How the Powers are distributed in a Federal State)

যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টনের দুইটি প্রণালী অনুসৃত হয়। বেশীর ভাগ যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার কি কি ক্ষমতা পাইবে, গঠনতন্ত্রে তাহার উল্লেখ থাকে। অবশিষ্ট অনুল্লিখিত ক্ষমতাগুলি (residuary powers) স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারের হাতে দেওয়া হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এই প্রণালীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই ইহাকে আমেরিকান প্রণালী বলা হয়। এই ব্যবস্থায়, কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে কর্তৃত্ব করেন, এবং স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকার অবশিষ্ট অনুল্লিখিত ক্ষমতাগুলির (residuary powers) কর্তৃত্ব করিবার অধিকারী হন।

আর এক রকম প্রণালী আছে, যাহাকে ক্যানাডীয় ব্যবস্থা বলা হয়। কারণ, ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত-স্থল ক্যানাডা। এই ব্যবস্থা অনুসারে, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট বিষয় স্থানীয় বা প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকে, অবশিষ্ট অনুল্লিখিত বিষয়গুলি থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।

ভারতবর্ষের বেলায় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে এক নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কতকগুলি ক্ষমতা প্রদেশের হাতে, কতকগুলি ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, এবং কতকগুলি ক্ষমতা একই সঙ্গে উভয় সরকারের হাতে সুনির্দ্দিষ্টভাবে দেওয়া হইয়াছিল। এই তিনটি তালিকার বহির্ভূত যদি কোনও অনুল্লিখিত অবশিষ্ট বিষয় থাকে, তাহা বড়লাট তাঁহার খুশী মত প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে পারিতেন। ভারতীয় ইউনিয়নের গণ-পরিষদ কর্তৃক নব-রচিত শাসনতন্ত্রে অবশিষ্ট অনুল্লিখিত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধা ও অসুবিধা

(Advantages and Disadvantages of a Federal State)

বড় বড় দেশে, যেখানে এক স্থান হইতে অন্য স্থানের মধ্যে বহু পার্থক্য বিদ্যমান, সেখানে এইসব অসম স্থানগুলিকে একসূত্রে গাঁথিয়া একটি বড় শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করিবার পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র কার্য্যকরী ব্যবস্থা। যুক্তরাষ্ট্রে

কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ বিষয়গুলির শাসন পরিচালনা করে। স্থানীয় ব্যাপারগুলি স্থানীয় সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ফলে স্থানীয় বিষয়গুলির স্থানীয় প্রয়োজনের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ ভাগ করিয়া লওয়া হয়, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার, যে যাহার নিজের শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে শাসন পরিচালনা করে। ফলে, শাসন ব্যাপার সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন হয়। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়া একত্রীভূত হইয়াছে এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দ্বারাই জাতীয় ঐক্য এবং স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য, এই দুইটির সমন্বয় হইতে পারে। বিভিন্ন প্রদেশ বা স্থান নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানীয় বিষয় সম্পর্কে পৃথক পৃথক আইন প্রণয়ন ও শাসন-ব্যবস্থা করিতে পারে। ইহাতে স্থানীয় বা প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যবোধ লুপ্ত হয় ; অথচ, জাতীয় ঐক্যও ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ, সর্ব্বসাধারণের স্বার্থ-বিজড়িত সাধারণ বিষয়গুলির শাসন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। স্থানীয় ব্যাপারে বিভিন্ন প্রদেশের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব থাকার ফলে, স্থানীয় ব্যাপারে জনসাধারণের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়, জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য হয়, এবং সকলে নাগরিক কর্ত্তব্য পালনে শিক্ষা লাভ করে। এইসব কথা ছাড়া আর একটা দিক আছে। রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা একস্থানে কেন্দ্রীভূত না হইয়া বিভিন্ন সরকারের মধ্যে বণ্টিত হয় বলিয়া স্বৈরাচার হইতে পারে না ; এমন যথেচ্ছাচারী শক্তির উদ্ভব হইতে পারে না, যাহা সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়া জন-স্বাধীনতা বিপন্ন করিয়া তুলিতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় দোষ যে নাই, তাহা নহে। অনেকে বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার হইল শক্তিহীন সরকার। শাসনক্ষমতা বিভিন্ন সরকারের মধ্যে বন্টিত থাকে, কাজেই কোনও সরকারই শক্তিশালী হয় না। যুক্তরাষ্ট্রে শাসনের দায়িত্ব দুই শ্রেণীর রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত থাকে, ইহা শাসন-ব্যবস্থায় দুর্ব্বলতা সৃষ্টি করে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, শ্রম, বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে বিভিন্ন খণ্ডে বিভিন্ন ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের একটা গলদ। এইসব ব্যাপারে সর্ব্বত্র একই ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলির কথা বলিয়াছেন :—পররাষ্ট্র ব্যাপারে দুর্ব্বলতা, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রদেশের উপর পূর্ণ শাসন অধিকার প্রয়োগের অক্ষমতা, অন্তর্ভুক্ত প্রদেশসমূহের বিদ্রোহের অথবা যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়া বাহির হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, বিভিন্ন অংশের ভিতর এক রকম আইন-কানুনের অভাব এবং দুই রকম সরকার থাকিবার জন্য আনুসঙ্গিক খরচ ও গোলযোগ।

যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ
(Future of Federal States)

ভবিষ্যৎ যুগে যুক্তরাষ্ট্র ক্রমশঃ আরও অধিক জনপ্রিয় হইবে, ইহা অনেক রাষ্ট্রনীতিবিদের অভিমত। সিজভিক্ (Sidzwick) বলিয়াছেন, আমেরিকার আদর্শে পশ্চিম ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। জার্ম্মাণ লেখক ব্রী (Brie) এবং বেষ্টেরকাম্প (Vesterkamp) বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্র কথাটির চরম বিকাশ হইয়াছে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। আধুনিক সভ্যতার যুগে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রই স্থায়ী সরকার রূপে টিকিতে পারে বলিয়া অনেক লোকের অভিমত। ভবিষ্যতে কোনও দিন বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহা যুক্ত-রাষ্ট্রের ভিত্তিতেই রচিত হইবে। এই স্থলে মনে রাখা দরকার যে, ডাইসি (Dicey), ফ্রীম্যান (Freeman), লীকক (Leacock) প্রভৃতি কতিপয় লেখক লিখিয়াছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র, সরকারের অস্থায়ী রূপ মাত্র, ইহা ব্যাহিক অবস্থার চাপে উদ্ভব হইয়াছে এবং সাময়িক প্রয়োজন ফুরাইলে, সরকারের এই রূপ পরিবর্ত্তিত হইবে এবং ইহার স্থলে প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী উন্নততর গভর্ণমেণ্টের বিকাশ ঘটিবে।

সপ্তম অধ্যায়

বিভিন্ন সরকারী কার্য্যের পৃথকীকরণ

(Separation of Powers)

বর্ত্তমানে সরকারের কার্য্যাবলীকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়: আইন বিষয়ক (legislative), শাসন বিষয়ক (executive) এবং বিচার বিষয়ক (judicial)। এই তিন প্রকারের কার্য্য করিবার জন্য মোটামুটি তিনটি বিভাগ রহিয়াছে। যথা,—আইন বিভাগ (legislature), শাসন বিভাগ (executive) এবং বিচার বিভাগ (judiciary)। আইন বিভাগের কার্য্য হইতেছে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন সকলের নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন করা, শাসন বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইতেছে আইনসমূহ বলবৎ করা এবং আইন অনুযায়ী শাসনকার্য্য পরিচালন করা, এবং বিচার বিভাগের কার্য্য হইতেছে আইনসমূহের ব্যাখ্যা করা এবং বিচারার্থ আনীত মামলাসমূহে আইনসমূহের প্রয়োগ করা।

সরকারী ক্ষমতা ও কার্য্যাবলীকে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারে ভাগ করিবার মূল নীতি এরিষ্টটল (Aristotle) প্রমুখ প্রাচীন লেখকগণ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলেন। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে বোডিন (Bodin) প্রমুখ লেখকগণ দেখাইয়াছেন যে, একই ব্যক্তির হাতে আইন প্রণয়ন ও বিচার করিবার ভার থাকিলে, অবিচার হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং বিচার করিবার ভার সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন বিচারপতিগণের হাতে থাকা বাঞ্ছনীয়। ইংলণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, সরকারী ক্ষমতাসমূহ বিভিন্ন বিভাগ কর্তৃক প্রয়োগ করিবার নীতি রাজনীতিক মতবাদরূপে প্রাধান্য লাভ করে। ক্রমওয়েল (Cromwell) তাঁহার শাসনতন্ত্রে শাসনবিষয়ক ক্ষমতা পৃথক করিয়াছিলেন। তবে তিনি বিচার বিষয়ক ক্ষমতার পৃথকীকরণ করেন নাই। জন লক-ও (John Locke) মোটামুটিভাবে সরকারী ক্ষমতা ও কার্য্যের তিন ভাগ করিবার নীতি স্বীকার করিয়াছিলেন। তবে ফরাসী লেখক মঁতকিউ (Montesquieu) সর্ব্বপ্রথম ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার প্রকাশিত এক বিখ্যাত পুস্তকে (L' Esprit des Lois) সরকারী কার্য্য ক্ষমতাসমূহ তিন ভাগে বিভাগের নীতিকে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের একটি মূলনীতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "প্রত্যেক সরকারের তিন প্রকারের ক্ষমতা আছে। আইন বিষয়ক, শাসন বিষয়ক এবং বিচার বিষয়ক। যদি একই ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির হাতে আইন বিষয়ক ও শাসন বিষয়ক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়, তাহা হইলে

স্বাধীনতা বলিয়া কিছু থাকিবে না। আবার আইন বিষয়ক ও শাসন বিষয়ক ক্ষমতাবলী হইতে যদি বিচার বিষয়ক ক্ষমতাসমূহ পৃথক করা না হয়, তাহা হইলেও স্বাধীনতা থাকে না। যদি বিচার বিষয়ক ক্ষমতার সহিত আইন বিষয়ক ক্ষমতার যোগ হয়, তাহা হইলে আইন প্রণেতাই বিচারক হইবেন। ফলে, নাগরিকের জীবন ও স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে। আবার বিচার করিবার ক্ষমতা যদি শাসন করিবার ক্ষমতায় যুক্ত হয়, তাহা হইলে বিচারক উৎপীড়ক হইয়া উঠিবেন। অতএব একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি সরকারী ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিবার অধিকারী না হইয়া পৃথক পৃথক ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি বিভিন্ন শ্রেণীর সরকারী ক্ষমতা পরিচালনের অধিকারী হওয়া উচিত। যাঁহারা শাসন করিবেন, তাঁহারা আইন করিবেন না, বা বিচারকের আসনে বসিবেন না; যাঁহারা আইন করিবেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য্যে লিপ্ত হইবেন না। আবার যাঁহারা বিচারক হইবেন, তাঁহারা শাসনকার্য্য পরিচালন অথবা আইন প্রণয়ন করিবেন না। এইভাবে সরকারী কার্য্যাবলীকে পৃথক পৃথক তিন ভাগে ভাগ করিয়া, তিন শ্রেণীর লোকের হাতে তাহা পরিচালনের ভার দেওয়া উচিত। ইহার দ্বারাই অন্যায়, স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনের সম্ভাবনা লোপ পাইবে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষিত হইবে। জনসাধারণ সরকারী জুলুম হইতে রক্ষা পাইবে। প্রত্যেক বিভাগ অপরাপর বিভাগের কার্য্য সংযত করিবে। কোনও বিভাগ নিজের খুসীমত কার্য্য করিয়া যাইতে পারিবে না।" এই মতবাদের নাম—Theory of Seperation of Powers (সরকারী ক্ষমতা বিভাগের নীতি)। ফরাসী বিপ্লবের সময় এই নীতি একটি প্রধান রাজনীতিক মতবাদরূপে গৃহীত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত কয়েকটি শাসনতন্ত্রে, প্রধানতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে, ইহা বিশেষভাবে অনুসৃত হইয়াছিল।

সমালোচনা
(Criticism)

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, সরকারী ক্ষমতা ও কার্য্যসমূহ তিনটি পৃথক সরকারী বিভাগের মধ্যে বণ্টন করিবার নীতি রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে একটি মূলনীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। তথাপি, বিচার-বিতর্ক এবং অভিজ্ঞতা, উভয় দিক হইতে দেখিলে উপলব্ধি হয় যে, কোনও সরকারকেই সম্পূর্ণরূপে পৃথক পৃথক তিনটি বিভাগে ভাগ করা সম্ভব নহে। প্রত্যেক সরকারের বিভাগসমূহ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক সরকারী বিভাগের কার্য্য অন্যান্য বিভাগের কার্য্যের সহিত নানাভাবে জড়িত। সরকারী বিভাগের কার্য্যসমূহকে পৃথক পৃথক ভাগে ভাগ

করিয়া তিনটি পৃথক ও অনন্য-নির্ভরশীল বিভাগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া অসম্ভব। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র রচয়িতাগণ সরকারী ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি (Theory of Separation of Powers) একটা মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবু তাঁহারা গঠনতন্ত্র রচনা করিবার সময়ই এই নীতির পূর্ণ প্রয়োগের অবাস্তবতা দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহারা সরকারী কার্য্যগুলিকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও পৃথক করিয়া তুলিতে সক্ষম হন নাই। জন ষ্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) তাঁহার Representative Government নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, সরকারী বিভাগগুলি যদি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল না হইয়া নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিভাগে পরিণত হয়, তবে বিভাগগুলির মধ্যে অনবরত সঙ্ঘর্ষ হইবে, এবং শাসন-কার্য্য অচল হইয়া উঠিবে। সরকারী বিভাগসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা থাকিবে, পরস্পরের সেগুলি কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবে। নতুবা, সরকারী শাসনের চরম অবনতি ঘটিবে।

যদিও নীতির দিক দিয়া সরকারী বিভাগগুলি পরস্পর সমান, তথাপি, বাস্তব দৃষ্টিতে, সরকারী বিভাগগুলি সম-ক্ষমতাবিশিষ্ট নহে। প্রত্যেক সরকারেই আইন বিভাগ সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং বিচার বিভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প শক্তিশালী। আইন সভাই বিবিধভাবে সমগ্র সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। আইন সভাই সমগ্র সরকারের নিয়ামক। আইন সভাকৃত আইন অনুসারেই শাসনকার্য্য পরিচালিত হইবে এবং বিচার বিভাগের বিচারকার্য্য চলিবে। অতএব আইন সভাই অপর দুই বিভাগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তাহা ছাড়া, সরকারী ক্ষমতা ও কার্য্যসমূহ সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক বিভাগের মধ্যে বণ্টিত না হইলে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা লোপ পাইবে বলিয়া যে যুক্তি দেখানো হয়, তাহাও অসার। ইংলণ্ড এবং অন্যান্য যেসব দেশের গঠনতন্ত্রে এই পৃথকীকরণ নীতি অত্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে, সেই সব স্থানের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, এইভাবে সরকারী ক্ষমতাসমূহ পৃথকীকরণ না হইলেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে, এমন কোনও কথা নাই।

সিদ্ধান্ত
(Conclusion)

প্রকৃতপক্ষে, সরকারী ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতির অর্থ এই নহে যে, আইন বিভাগ কেবল আইন বিষয়ক ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে, অথবা শাসন বিভাগ কেবল শাসন বিষয়ক ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে, অথবা বিচার বিভাগ কেবল

বিচার বিষয়ক ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে। এইরূপ অর্থে, সরকারী ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতি কার্য্যকরী হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেক বিভাগ প্রধানতঃ নিজ বিভাগ সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিলেও, প্রসঙ্গত অন্যান্য বিভাগ সংক্রান্ত এমন বহু ক্ষমতাও প্রয়োগ করে, যাহা তাহার মূল কার্য্য করিবার পক্ষে প্রয়োজন। সরকার ত' একটি প্রাণহীন যন্ত্রবিশেষ নহে, তাহা একটি জীবন্ত, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল বস্তু। সরকার কতকগুলি অন্ধ শক্তির সমাবেশ নহে, তাহা কতকগুলি লোকের সমষ্টি, যাহাদের কার্য্যের বিভিন্নতা সত্ত্বেও উদ্দেশ্য একই। সুতরাং সরকারের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সহযোগিতা ও সামঞ্জস্য অপরিহার্য্য। বিভিন্ন সরকারী বিভাগের মধ্যে কোনও স্পষ্ট পার্থক্যের রেখা টানা অসম্ভব। প্রত্যেক বিভাগকেই এমন কতকগুলি কাজ করিতে হয়, যাহা মূল theory-র দ্বারা অনুমোদিত নহে, অথচ যাহা সরকারের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে অত্যাবশ্যক। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সরকারী কার্য্য ও ক্ষমতাসমূহকে পৃথক পৃথক ভাগে ভাগ করা গেলে-ও, সরকারী বিভাগসমূহকে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ভাগে ভাগ করা যায় না।

ভারতে সরকারী ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি ও প্রয়োগ
(Theory and Practice of Separation of Powers in India)

ভারতবর্ষে, এই theory বড় বেশী প্রয়োগ করা হয় নাই। ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যাপারে বড়লাট ছিলেন সর্ব্বময় কর্ত্তা, এবং প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে গভর্ণর ছিলেন সর্ব্বময় প্রভু। উভয় ক্ষেত্রেই আইন বিভাগের চেয়ে শাসন বিভাগের অধিপত্য ও ক্ষমতা ছিল বেশী। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর হইতে ভারত সরকারের পট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভারতীয় ডোমিনিয়নের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন বিভাগ আইন বিভাগের অধীন হইয়াছে। কিন্তু ইহাও Theory of Separation of Powers-এর প্রয়োগের দৃষ্টান্ত নহে।

জেলা-শাসন ব্যাপারে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শাসন বিষয়ক কর্ত্তা। কিন্তু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ বিভাগের-ও কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকারী। তিনি যে-কোনও ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও অভিযুক্ত করিতে পারেন। ইনি আবার প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার ও দণ্ড দিবার অধিকারী। এইভাবে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার একত্র সমাবেশ হইয়াছে। ইহা সরকারী ক্ষমতা বিভাগের নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত এবং সুবিচারের পরিপন্থী।

অষ্টম অধ্যায়

আইন সভা, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ

(The Legislative, the Executive & the Judiciary)

অনেকস্থলে আইনসভা দুইটি পরিষদে (House বা Chamber) বিভক্ত হইয়া থাকে। এক-পরিষদ-বিশিষ্ট আইন সভা (Unicameral Legislature) অপেক্ষা দুই-পরিষদ-বিশিষ্ট আইন সভা (Bicameral Legislature) বেশী দেখা যায়। পূর্ব্বে এক পরিষদবিশিষ্ট আইন সভার পক্ষে অনেক লেখক মত প্রকাশ করিতেন। ফরাসী বিদ্রোহের সময় এক-পরিষদ-বিশিষ্ট আইন সভার সমর্থক অনেক ছিলেন এবং ১৭৯১ সালে National Assembly-তে এক পরিষদ-বিশিষ্ট আইন সভার পক্ষে প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এক পরিষদ-বিশিষ্ট আইন সভার ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ায়, ক্রমে দুই পরিষদ-বিশিষ্ট আইন সভা সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে।

যেখানে আইন সভা দুই পরিষদে (House) বিভক্ত, সেখানে একটি পরিষদের নাম উচ্চ পরিষদ (Upper House),এবং অপরটির নাম নিম্ন পরিষদ (Lower House)। নিম্ন পরিষদকে আবার প্রথম পরিষদ (First Chamber), এবং উচ্চ পরিষদকে দ্বিতীয় পরিষদ (Second Chamber) বলা হয়। উচ্চ পরিষদের ক্ষমতা সাধারণতঃ নিম্ন পরিষদের ক্ষমতা অপেক্ষা অনেক কম। নিম্ন পরিষদের সভ্যগণ উচ্চতর পরিষদের সদস্যগণ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক নির্ব্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা নির্ব্বাচিত হন। এইজন্য নিম্ন পরিষদকে জনপ্রিয় পরিষদ (Popular Chamber) বলা হয়। উচ্চতর পরিষদের সদস্যগণকে নির্ব্বাচিত করিবার যাঁহারা অধিকারী, তাঁহাদের ভোট দিবার ক্ষমতা অধিকতর অর্থ-সম্পত্তি প্রভৃতি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। আবার ইংলণ্ডের মত স্থানে House of Lords নামক উচ্চ পরিষদের সদস্যগণের সদস্যপদ অনেক পরিমাণে উত্তরাধিকারসূত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ক্যানাডায় উচ্চ পরিষদের সদস্যগণ সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। ভারতবর্ষে নূতন শাসনতন্ত্রে প্রদেশে এবং কেন্দ্রে আইন সভার সদস্যদের অধিকাংশ ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন, প্রাদেশিক উচ্চ পরিষদে অথবা

কেন্দ্রীয় উচ্চ পরিষদে গভর্ণর বা প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সামান্য কয়েকজন মাত্র সদস্য মনোনীত হইতে পারিবেন।

আইন সভার ক্ষমতা
(Powers of Legislature)

আইন সভার সর্ব্বপ্রধান ক্ষমতা হইতেছে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন সকল কিছুর নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন করা। আইন প্রণয়ণ ছাড়াও আইন সভার অন্য কার্য্য আছে। ইহা সরকারী আয় ও ব্যয়ের আলোচনা ও মঞ্জুরী করিয়া থাকে। সাধারণতঃ সরকারী আয় ও ব্যয়ের উপর আইন সভার পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকে। কিভাবে এবং কত পরিমাণ সরকারী আয় হইবে, কি কি কর ধার্য্য হইবে, কর পদ্ধতি কি হইবে, এবং বিভিন্ন সরকারী বিভাগের জন্য কত ব্যয় হইবে, এই সব সম্পর্কে আইন সভাই শেষ কথা বলিবার অধিকারী।

এ সব ছাড়া, যে সকল দেশে Cabinet Government প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে সব স্থানে আইন সভার নিকট শাসন বিভাগ দায়ী থাকে, এবং আইন সভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে। আইন সভা মন্ত্রীদের শাসন পরিচালনার উপর নজর রাখে, এবং মন্ত্রীদের শাসন-নীতি বা শাসন কার্য্য অসন্তোষজনক হইলে, ইচ্ছা করিলে মন্ত্রিসভাকে অপসারিত করিতে পারে।

আইন সভা কোনও কোনও স্থানে মন্ত্রী অথবা অন্যান্য শাসন বিভাগীয় কর্ত্তাকে অভিযুক্ত করিবার ও বিচার (impeach) করিবার অধিকারী। ভারতের নূতন শাসনতন্ত্রে ভারতীয় প্রেসিডেন্টকে বিচার করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইন সভার হাতে দেওয়া হইয়াছে। কোথাও কোথাও, আইন সভা সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যাপারেও কথা বলিবার অধিকারী। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ পরিষদ অর্থাৎ সেনেট (Senate) প্রেসিডেন্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারীদের নিয়োগ সমর্থন বা অসমর্থন করিতে পারে।

এক পরিষদ বিশিষ্ট আইন সভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি
(Merits and Demerits of Unicameral Legislature)

এক-পরিষদ আইন সভার পক্ষে রবসপিয়ের (Robespierre) প্রভৃতি ফরাসী লেখকগণ ফরাসী বিদ্রোহের সময় ও তৎপরবর্ত্তী কালে এই যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে, ইহার দ্বারা সরকারের আইন বিভাগের একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়;

দুইটি পরিষদ থাকিলে, আইন বিভাগের মধ্যে দুইটি পৃথক্ ভাগ সৃষ্টি হয় এবং একত্ব নষ্ট হয়। আইন সভার একাধিক পরিষদ রাখিবার অর্থ একাধিক সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সৃষ্টি করা। আইন হইল জনগণের ইচ্ছার বিধিবদ্ধ প্রকাশ। জনগণের একই কালে কোনও বিষয়ে দুইটি বিভিন্ন ইচ্ছা থাকিতে পারে না। সুতরাং আইন সভা একটিমাত্র হওয়াই উচিত। যেখানে দুইটি পরিষদে আইন সভা বিভক্ত, সেখানে বিভেদ ও কলহ অবশ্যম্ভাবী। কাজেই সরকারী কাজ অচল হইয়া পড়িবে। আইন সভার একাধিক পরিষদ থাকার মানে সার্ব্বভৌম ক্ষমতাকে বিভক্ত করিয়া ফেলা। আমেরিকার ফ্রাঙ্কলিন (Franklin) প্রভৃতি কয়েকজন লেখকও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

এক-পরিষদ-বিশিষ্ট আইন সভার বিপক্ষে বলিবার কথা যথেষ্ট আছে। কয়েকটি দেশে এইরূপ আইন সভার অভিজ্ঞতা হইতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে ইহা অনেক স্থলে হিংসা ও দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে, এবং স্বেচ্ছাতন্ত্রে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এইরূপ আইন সভা কতিপয় ব্যক্তির নিজ স্বার্থসাধনের যন্ত্র স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং সশস্ত্র বিদ্রোহ ছাড়া ইহার জুলুম হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোনও উপায় নাই। লেকি (Lecky) তাঁহার এক পুস্তকে * বলিয়াছেন যে যত প্রকারের সরকার আছে বা হইতে পারে, তাহার মধ্যে সার্ব্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এক পরিষদ-বিশিষ্ট আইন সভা মূলক সরকারের সমতুল্য খারাপ কেহই নহে। অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী স্বেচ্ছাচারী শাসকের মতই ইহারও লোভ ও দুরাশার অন্ত নাই।

দুই পরিষদ বিশিষ্ট আইন সভার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি

(Merits and demerits of Bicameral Legislature)

বর্ত্তমান যুগে এক-পরিষদ-বিশিষ্ট আইন সভা অপেক্ষা দুই-পরিষদ-বিশিষ্ট আইন সভাই বেশী দেখা যায়। এইরূপ আইন সভার পক্ষে প্রথম যুক্তি এই যে দুইটি পরিষদ থাকার ফলে ধীরস্থির ভাবে, উপযুক্ত ভাবনা চিন্তা করিবার পর আইন প্রণয়ন করা হইয়া থাকে। আইন সভা একটিমাত্র পরিষদ-বিশিষ্ট হইলে অতি দ্রুত এবং উপযুক্ত বিবেচনাবিহীন আইন হইবার সম্ভাবনা। আইন সভাসমূহ অনেক সময় প্রবল সাময়িক উত্তেজনার বশীভূত হইয়া বুদ্ধি বিবেচনা হারাইয়া ফেলে। কখনও বা আইন্ সভা অধীর হইয়া যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন

* Democracy and Liberty.

করিতে ভুলিয়া যায়। আইন সভার একটিমাত্র পরিষদ থাকিলে, তাহার সদস্যগণ সাময়িক ভাব-প্রবাহে বিচলিত হইয়া এমন আইন প্রণয়ন করিতে পারে যাহা ভালভাবে বিবেচনা করিলে মোটেই উচিত মনে হইবে না। আইন সভার দ্বিতীয় পরিষদ থাকার ফলে, আইনের প্রস্তাব এবং আইন প্রণয়নের শেষ অধ্যায়ের মধ্যে অনেকখানি সময় পাওয়া যায়, যাহাতে ভালভাবে বিবেচনা করিবার অবসর ঘটে। আইন প্রণয়নের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া দেখা উচিত ; দ্বিতীয় পরিষদ থাকিলেই ইহা সম্ভব। ব্লুণ্টশ্‌লি (Bluntschli) দুই পরিষদ বিশিষ্ট আইন সভার গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে চারটি চক্ষু অবশ্যই দুই চক্ষু অপেক্ষা বেশী এবং ভাল করিয়া দেখিতে পায়, বিশেষতঃ আইন সভার মত স্থানে যেখানে কোনও বিষয় বিভিন্ন ভাবে দেখা চলে, সেখানে এই কথা আরও বেশী রকম খাটে। দুই-পরিষদ-বিশিষ্ট আইন সভায় দ্বিতীয় বা উচ্চ পরিষদ প্রথম বা নিম্ন পরিষদের কার্য্যাবলী ভাল করিয়া পুনর্বিবেচনা করিতে পারে। প্রথম বা নিম্ন পরিষদ তাড়াতাড়িতে অথবা কাজের চাপে সকল প্রস্তাব ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার সময় ও সুবিধা না পাইতে পারে। আইন সভার দ্বিতীয় পরিষদ থাকিবার ফলে নিম্ন পরিষদের প্রত্যেকটি প্রস্তাব ভাল ভাবে বিবেচিত হইয়া তবে আইনে পরিণত হয়।

আইন সভার দ্বিতীয় পরিষদে রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন বিশেষ শ্রেণীর বা স্বার্থ-বিশিষ্ট লোকদের প্রতিনিধি প্রেরণ করা সম্ভব হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রে বিভিন্ন স্বার্থ-বিশিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণী রহিয়াছে। আইন সভা সকল স্বার্থ ও সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিমূলক হওয়া উচিত। কোনও শ্রেণী যদি আইন সভার প্রতিনিধি প্রেরণের একেবারে সুযোগ না পায়, তাহা হইলে গণতন্ত্রের মূল নীতি ক্ষুণ্ণ করা হয়। যে সকল শ্রেণী নিম্ন পরিষদে উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে সক্ষম হইবে না, তাহাদিগকে দ্বিতীয় পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় বা উচ্চ পরিষদের নির্ব্বাচন ব্যবস্থা এমন করা যাইতে পারে যাহাতে, যে সব শ্রেণীর লোক নিম্ন পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে, তাহা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণী প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ পাইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় গভর্ণমেন্টের বেলায় দ্বিতীয় বা উচ্চ পরিষদে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্র বা প্রদেশ সমমর্য্যাদার অধিকারী হিসাবে সমসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইয়া থাকে। এই ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র বা প্রদেশগুলির সমমর্য্যাদা স্বীকার করা হয়।

আইন সভায় একটিমাত্র পরিষদ থাকিলে, তাহা সকল ক্ষমতার অধিকারী হইয়া অত্যাচারী হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয় পরিষদ এই অত্যাচারের সম্ভাবনা নিবারণ করে। আইনসভাগুলি সর্ব্বত্রই সরকারের সকল ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিতে চায়। আইন সভার একটিমাত্র পরিষদ থাকিলে শক্তির অপব্যবহার প্রতিরোধ করিবার কেহই থাকে না। আইন সভা দুইটি পরিষদে বিভক্ত থাকিলে, ইহা অত্যাচারপ্রবণ বা দুর্নীতিমূলক হইয়া উঠিতে পারে না।

দুই-পরিষদ-বিশিষ্ট আইন সভার পক্ষে অনেক যুক্তি থাকিলেও এবং এইরূপ আইন সভা অধিকাংশ দেশে অধিষ্ঠিত থাকিলেও, ইহার বিপক্ষেও যুক্তি রহিয়াছে। লাস্কি (Laski) প্রভৃতি বর্ত্তমান লেখকগণ এইরূপ আইন সভার বিপক্ষে। তাঁহাদের মতে আইন সভার দ্বিতীয় বা উচ্চ পরিষদ অনাবশ্যক। বর্ত্তমানে, বহু আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক এবং বিশ্লেষণের পর আইন প্রণয়ন করা হয়। দ্বিতীয় পরিষদ থাকিলে সেখানে প্রথম পরিষদের আলোচনার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই হইবে না। ইহাতে কেবল সময় নষ্ট হইবে।

দ্বিতীয় পরিষদ থাকিলে, প্রথম গৃহের বা নিম্ন পরিষদের ক্ষমতার অপব্যবহার হইবে বলিয়া যে যুক্তি দেখানো হয়, তাহাও ভিত্তিহীন। নিম্ন পরিষদ জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয় এবং গণপ্রতিনিধিমূলক পরিষদের বিরুদ্ধে কাহারও কথা বলিবার অধিকার গ্রাহ্য হইবে না।

ফরাসী লেখক আবে সিয়ে * এই প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, উচ্চ পরিষদ যদি নিম্ন পরিষদের সহিত একমত হয়, তবে, তাহা সম্পূর্ণ বাহুল্য মাত্র, আর উচ্চপরিষদ যদি বিরুদ্ধ মত পোষণ করে, তবে তাহা অত্যন্ত রকম অবাঞ্ছনীয় ও ক্ষতি-কর। প্রকৃত পক্ষে, উচ্চ পরিষদ যদি নিম্ন পরিষদের কাজে বাধা দান করে, তাহা হইলে জনগণের ইচ্ছা পূরণের বাধা সৃষ্টি করা হয়।

উচ্চ পরিষদ সাধারণতঃ বিত্তশালী ও সংরক্ষণশীল লোকদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হয়। সুতরাং উচ্চ পরিষদ প্রায়ই নিম্ন পরিষদের প্রগতিমূলক প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া থাকে।

এক-পরিষদ-বিশিষ্ট আইন সভা থাকিলে, ব্যয় কম হইবে, আইন সভার গঠন ও কার্য্য সাধারণের সহজবোধ্য হইবে। দুইটি পরিষদ-বিশিষ্ট আইন সভায় অনেক সময় পরিষদগুলির মধ্যে পরস্পর কলহ ও সঙ্ঘর্ষ হয় এবং আইন প্রণয়নে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। দুইটি পরিষদ-বিশিষ্ট আইন সভাকে, বিপরীত দিকে ধাবমান দুইটি অশ্ব-যুক্ত এক শকটের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

* Abbe´ Seieyes

এই সব কারণে অনেক লেখক দুই-পরিষদ-বিশিষ্ট আইন সভা অপেক্ষা এক-পরিষদ-বিশিষ্ট আইন সভার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শাসন বিভাগ
(The Executive)

রাষ্ট্রের অভিপ্রায় অনুযায়ী শাসন কার্য্য চালাইবার ভার যাঁহাদের উপর আছে, তাঁহাদের লইয়া শাসন বিভাগ গঠিত। ইহাদের কার্য্য হইতেছে আইনসমূহ প্রয়োগ করা এবং শাসন বিভাগ পরিচালন করা, দেশের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা, আইন মান্য করিতে বাধ্য করা, দেশরক্ষার ব্যবস্থা করা, সম্পর্ক স্থির করা, বিদেশে দূত প্রেরণ, দেশের বিবিধ কল্যাণকর কার্য্য ইহাদের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে। ভারতবর্ষের বড়লাট শাসনবিভাগীয় প্রধান কর্ত্তা; অবশ্য আসল ক্ষমতা মন্ত্রিমণ্ডলীর হাতেই রহিয়াছে। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন বিভাগীয় অসংখ্য কর্ম্মচারী আছেন। প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে, প্রাদেশিক লাট সাহেবই প্রধান কর্ত্তা; অবশ্য আসল ক্ষমতা প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলীর হাতে রহিয়াছে। ইহাদের অধীন প্রাদেশিক সরকারের অনেক শাসন বিভাগীয় কর্ম্মচারী রহিয়াছেন।

শাসন বিভাগ কিভাবে সংগঠিত হওয়া উচিত?

শাসন বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ অনেক লোক লইয়া গঠিত হইলে কাজের অসুবিধা হইবে। আইন সভা অনেক প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইতে পারে, কারণ ইহার কর্ত্তব্য হইতেছে পরস্পর যুক্তি পরামর্শ করিয়া, সমাজের অবস্থা ও প্রয়োজন স্থির করিয়া উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা, কিন্তু শাসন বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষকে আইন বিভাগ রচিত আইন সমূহ কার্য্যকরী করিতে হইবে। সুতরাং অনেক সময়, শাসন বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষকে দ্রুততা এবং দৃঢ়তা সহকারে কার্য্য করিতে হয়, ইতস্ততঃ করিবার বা অনেকের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবার মত সময় শাসন বিভাগের হাতে থাকে না। সুতরাং শাসন বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ একজন অথবা অতি অল্প লোক লইয়া গঠিত হওয়া উচিত। সুইজারল্যাণ্ড ছাড়া আর সর্ব্বত্রই শাসন বিভাগীয় প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ মাত্র একজন লইয়া গঠিত (Single Executive)। একমাত্র সুইজারল্যাণ্ডেই শাসন বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ একাধিক ব্যক্তি লইয়া গঠিত (Plural Executive)। যে সব দেশে Parliamentary Government রহিয়াছে, সে সব দেশে শাসন বিভাগীয় কর্ত্তা নামমাত্র ক্ষমতার অধিকারী, আসল ক্ষমতা মন্ত্রিবর্গের হাতে রহিয়াছে। ইংলণ্ডের রাজা ইংলণ্ডের শাসন বিভাগের প্রধান

কর্ত্তা, এবং উত্তরাধিকার সূত্রেই, ইংলণ্ডের সিংহাসনের অধিকারী স্থির হয়। আবার ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট ফ্রান্সের শাসন বিভাগীয় প্রধান কর্ত্তা, কিন্তু তিনি আবার নির্ব্বাচনমূলে নিযুক্ত হন। ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেও, ভারতের প্রদেশগুলিতে লাট সাহেব প্রাদেশিক শাসন বিভাগের প্রধান কর্ত্তা। ১৯৩৫ সালের সংশোধিত ভারত শাসন আইনে বড়লাট কর্ত্তৃক তাঁহাদের মনোনীত হইবার বিধানও আছে। নূতন শাসনতন্ত্রে লাট সাহেবের নির্ব্বাচিত হইবার বিধান রহিয়াছে। শাসন বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ বিভিন্ন ভাবে নিযুক্ত হইলেও, যে দেশে Parliamentary Government আছে, সেখানে শাসন বিভাগীয় প্রধান কর্ত্তার হাতে আসল ক্ষমতা না থাকিয়া মন্ত্রীদের হাতে থাকে।

আবার, যে দেশে Presdential form of Government আছে, যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, সে দেশে President হইলেন শাসন বিভাগায় প্রধান কর্ত্তা, তিনি কয়েক বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হন এবং সকল শাসন বিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী হন। তাঁহারও মন্ত্রীসভা থাকে বটে, তবে তাঁহার মন্ত্রিবর্গ তাঁহার নিযুক্ত উপদেষ্টা মাত্র, আসল ক্ষমতার অধিকারী নহে।

বিচার বিভাগ
(The Judiciary)

পৌর অধিকার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া রক্ষা করিবার জন্য, অপরাধীর দণ্ডবিধান করিবার জন্য, বিবাদের বিচার নিষ্পত্তি করিবার জন্য এবং নির্দ্দোষ ব্যক্তিদিগকে অপরের অন্যায় হস্তক্ষেপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক দেশেই বিচার বিভাগ থাকা আবশ্যক। যেখানে বিচার বিভাগ নাই, সেখানে বিবাদ নিষ্পত্তি হইবে না, অধিকারসমূহ রক্ষিত হইবে না, এবং সরকারও টিকিতে পারিবে না। বিচারকদের কার্য্য হইতেছে দেশের আইন অনুযায়ী সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখিয়া মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা। আইন বিভাগের আইনগুলির ব্যাখ্যা করিবার ভার বিচারকদের উপর। কোনও বিষয়ে আইন রচনা করিবার পর আইন বিভাগের কার্য্য শেষ হইল এবং বিচারবিভাগের কার্য্য আরম্ভ হইল। আইনের কি ব্যাখ্যা হওয়া উচিত তাহা বিচার বিভাগ স্থির করিবেন, এবং নিজ ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিভিন্ন মামলায় আইন প্রয়োগ করিবে। আবার বিচার করিতে বসিয়া বিচারকগণ এমন বিষয়ের সম্মুখীন হইতে পারেন, যে বিষয় ঠিক কোনও আইনের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না, সেস্থলে বিচারকগণ ন্যায় বিচার ও বিবেচনা (equity) মতে সেই সব বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের আবার একটি

অতিরিক্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য রহিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের উপর যুক্ত-রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার ভার আছে। যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভা ও সরকার অথবা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত পৃথক পৃথক রাষ্ট্রগুলি শাসনতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কোনও কার্য্য করে, তাহা হইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত তাহা শাসনতন্ত্র বহির্ভূত ও বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে।

বিচারক-নিয়োগের নিয়ম

(How the Judges are appointed)

বিচারকগণের নিয়োগের বিভিন্নরূপ ব্যবস্থা থাকিতে পারে। বিচারকগণ আইন সভা কর্ত্তৃক বা জনসাধারণ কর্ত্তৃক ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, অথবা শাসন কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক আইন সভার পরামর্শক্রমে বা পরামর্শ না লইয়া নিযুক্ত হইতে পারেন। আইন সভার হউক বা জনসাধারণের হউক, ভোটের উপর বিচারকগণের নির্ব্বাচন ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য নহে। আইন সভার হাতে নির্ব্বাচন ভার থাকিলে, বিচার বিভাগও রাজনীতিক দলাদলির সহিত জড়িত হইয়া পড়িবে এবং বিচারক নির্ব্বাচন কালে কূটনীতিক ষড়যন্ত্র প্রসার লাভ করিয়া ন্যায় বিচার প্রাপ্তির পথে বাধা সৃষ্টি করিবে। জনসাধারণের হাতেও অনুরূপ কারণে বিচারক নির্ব্বাচনের ভার দেওয়া যায় না। তাহা ছাড়া সাধারণ লোক বিচারক নির্ব্বাচনের মত যোগ্যতাসম্পন্ন নহে। বিচার-বিতর্ক ও অতীত অভিজ্ঞতা, উভয় দিক হইতে দেখিলে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় যে, শাসন কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক বিচারকগণের নিয়োগ ব্যবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বস্তুতঃ,এই নিয়োগ ব্যবস্থাই আজকাল সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। শাসনকর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক বিচারক নিয়োগের ফলে, বিচারবিভাগ রাজনীতির দলাদলির ক্ষুদ্রতার ঊর্দ্ধে থাকে এবং বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও মর্য্যাদাসম্পন্ন হইতে পারে। বিচারপতিগণ একবার নিযুক্ত হইবার পর অন্যায় ও দুর্নীতির আশ্রয় না লইলে কর্ম্মচ্যুত হইবেন না, এইরূপ বিধান থাকা দরকার।

বিচার বিভাগকে অন্য বিভাগের অধীনতার বা প্রভাবের মধ্যে রাখা চলিবে না। বিচারবিভাগ সম্পূর্ণরূপে একটি স্বাধীন বিভাগ হিসাবে থাকিবে। বিচারক-গণ যদি তাঁহাদের চাকরির স্থায়িত্বের জন্য অন্য বিভাগের উপর নির্ভরশীল হন, তাহা হইলে তাঁহারা স্বাধীন ও নির্ভীকভাবে বিচার করিতে পারিবেন না।

বিচারক যদি যে কোনও সময় শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কর্ম্মচ্যুত হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকিতে হইবে, তাঁহার বিচারও পক্ষপাতশূন্য হইবে না। নিরপেক্ষ ও নির্ভীক বিচার লাভ করিবার জন্য বিচার-বিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বাধীন বিভাগে পরিণত করিতে হইবে। পৌর অধিকার নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে হইলে বিচার বিভাগকে অন্য-নিরপেক্ষ করিতে হইবে, বিচারকগণের কর্ম্মের স্থায়িত্ব দিতে হইবে এবং তাঁহাদিগকে শাসন বিভাগ বা আইন বিভাগের অধীন করিলে চলিবে না। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের উপরই ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভাবে নির্ভর করে।

নবম অধ্যায়

নাগরিকত্ব

(Citizenship)

রাষ্ট্রের অধিবাসিদিগকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে; যাহারা ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক (citizen) এবং যাহারা বিদেশী, ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক নহে (alien)। নাগরিক বলিতে শুধু নগর বা সহরের অধিবাসী বুঝাইতেছে না। নাগরিক বলিতে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকারকারী অধিবাসিবৃন্দকে বুঝায়। নাগরিক তাহারাই যাহারা রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে ও সর্ব্বতোভাবে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন থাকে, যাহারা রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ পাইয়া থাকে, রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা উপভোগ করে। নাগরিকবৃন্দ লইয়াই রাষ্ট্র গঠিত। প্রত্যেক নাগরিক রাষ্ট্রের আশ্রয়ে থাকে। নাগরিক যেথানেই থাক না কেন, রাষ্ট্রের অনুগত থাকিয়া রাষ্ট্রের প্রতি তাহার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পালন করিতে প্রস্তুত থাকিবে। রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীকেই,—তাহারা নাগরিক হউক বা না হউক,—রাষ্ট্রের আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হয়, প্রয়োজনমত সরকারী কর বহন করিতে হয়। তবে রাষ্ট্রের নাগরিকের শাসনগত মর্য্যাদা বিদেশী অপেক্ষা পৃথক। রাষ্ট্রের নাগরিককে তাহার রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করিতে হয়। রাষ্ট্রের অনাগরিক অধিবাসী বিদেশী লোক— সে তাহার নিজ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করে। রাষ্ট্র তাহার সকল নাগরিকের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব করিতে পারে; দরকার হইলে প্রত্যেক নাগরিককে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বলিতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র বিদেশী লোকজনের উপর এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারে না। রাষ্ট্রের নাগরিক যেথানেই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ দাবী করিতে পারে; কিন্তু বিদেশী বাসিন্দা যতদিন রাষ্ট্রের মধ্যে বাস করে, ততদিনই কেবল রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণে বাস করে। রাষ্ট্র ছাড়িয়া অন্যত্র যাইলে, আর সেই রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ দাবী করিতে পারে না। ভারতবাসী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যাইলে, যতদিন সেথানে অবস্থান করিবে, ততদিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ ভোগ করিবে, কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়া অন্যত্র যাইলে, আর যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণ পাইবে না। কিন্তু ভারতবাসী যেথানেই থাকুক না কেন, ভারতীয় রাষ্ট্রের সাহায্য দাবী করিতে পারিবে। তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রের নাগরিক রাষ্ট্রের রাজনীতিক ও পৌর অধিকারসমূহ (political and

civil rights) ভোগ করে ; কিন্তু যাহারা বিদেশী বাসিন্দা মাত্র, তাহারা শুধু জীবন, সম্পত্তি প্রভৃতি সম্পর্কিত পৌর অধিকারগুলিই ভোগ করে, রাজনীতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে না। সাধারণতঃ, বিদেশী বাসিন্দা আইন সভার নির্ব্বাচনে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইতে পারে না, অথবা ভোট দিবার অধিকারী হইতে পারে না।

নাগরিকত্ব অর্জ্জনের উপায়
(Mode of Acquisition of Citizenship)

কোনও লোকের কোন্ রাষ্ট্রে জন্ম হইয়াছে বা তাহার পিতামাতা তাহার জন্মকালে কোন্ রাষ্ট্রের নাগরিক ছিল, ইহা দেখিয়া নাগরিকত্ব নির্ণয় করা যাইতে পারে। অনেক রাষ্ট্রে এই নিয়ম মানা হয় যে, যেস্থানে লোকের জন্ম হইয়াছে, তাহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া ধরা হইবে। এই নীতিকে বলে Jus Soli or Jus Loci *—ইহার অর্থ এই যে, মানুষের জন্মভূমি বিচার করিয়া নাগরিকত্ব স্থির করিতে হইবে। এই নীতি অনুযায়ী যদি কোনও ভারতবাসীর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম হয়, তাহা হইলে সে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে অথবা অনুরূপভাবে যদি কোনও ফরাসী পিতামাতার সন্তান ইংলণ্ডে ভূমিষ্ট হয়, তবে সে ইংলণ্ডের অধিবাসী বলিয়া গণ্য হইবে।

আর একটি নীতি আছে, যাহাকে বলা হয় Jus Sanguinis †—এই নীতি অনুযায়ী কোনও ব্যক্তির জন্মকালে পিতামাতা কোন্ দেশের নাগরিক ছিল, তাহা দেখিয়া নাগরিকত্ব স্থির করিতে হইবে। এই নীতি অনুযায়ী নাগরিকত্ব নির্ণয় করিবার জন্য মানুষের জন্মভূমি বিবেচ্য নহে, জন্মকালে পিতামাতার নাগরিকত্ব আসল বিবেচ্য জিনিষ। এই নীতি অনুযায়ী ফরাসী রাষ্ট্রের নাগরিক পিতামাতার সন্তান যদি ফরাসী রাষ্ট্রের বাহিরে অন্য রাষ্ট্রে ভূমিষ্ঠ হয়, তথাপি তাহাকে ফরাসী নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইবে। ইংলণ্ড ও আমেরিকা তাহাদের এলাকায় যে সব বিদেশী পিতামাতার সন্তান জন্মলাভ করে, তাহাদের সম্পর্কে Jus Soli নীতি অনুসরণ করে, অর্থাৎ তাহারা নাগরিক হিসাবে গণ্য হয়, এবং তাহাদের নিজেদের নাগরিকদের যে সব সন্তান অন্য রাষ্ট্রের এলাকায় ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাদের সম্পর্কে Jus Sanguinis নীতি অবলম্বন করে ; ফলে, এই সব সন্তানরাও নাগরিক বলিয়া গণ্য হয়।

এই উভয় নীতি প্রচলিত থাকিবার ফলে একই ব্যক্তি একই সঙ্গে দুইটি রাষ্ট্রের

* ভূমিগত অধিকার।
† রক্তগত অধিকার।

নাগরিক বলিয়া কথা উঠিতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে, সেই ব্যক্তি সাবালক হইবার পর নিজের খুসীমত যে কোনও একটি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব বাছিয়া লইতে পারে।

নাগরিকত্ব অর্জ্জন সম্পর্কে উক্ত উভয় নীতির পক্ষে ও বিপক্ষে যথেষ্ট বলিবার আছে। যেখানে জন্মভূমি নাগরিকত্ব নির্ণয় করে, সেখানে নাগরিকত্ব প্রমাণ করা সহজসাধ্য। কিন্তু ভাল করিয়া বিচার করিলে এই নীতির দোষ ধরা পড়ে। কোনও রাষ্ট্রে হয়ত বিদেশী পিতামাতা স্বল্পকালের জন্য বিবিধ কারণে আসিতে পারে, এবং তাহাদের সেই রাষ্ট্রে থাকিবার ইচ্ছা মোটেই না থাকিতে পারে; তবু, এই নীতির প্রয়োগের ফলে, সেই রাষ্ট্রের মধ্যে তাহাদের সন্তান জন্মলাভ করিলে,সেই সন্তান ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা কোনও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ইহাকে সামন্ত যুগের (feudalism) চিহ্ন বলিয়া মনে করা হয়। *

অপর নীতি Jus Sanguinis সম্পর্কে এইসব আপত্তি উত্থাপন করা যায় না। তবে, বাস্তবক্ষেত্রে পিতামাতার নাগরিকত্ব প্রমাণ করা কঠিন হইতে পারে। তবু এই নীতি যুক্তিসম্মত বলিয়া গণ্য করা হয়।

রাষ্ট্র আবার বাহিরের লোককে নাগরিকত্ব অর্পণ করিয়া তাহাকে স্বীয় নাগরিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারে। অন্যদিক দিয়া দেখিলে বলা যায়, কোনও রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব রাষ্ট্রের দান হিসাবে অর্জ্জন করা যাইতে পারে। এই ভাবে নাগরিকত্ব প্রাপ্তির নাম naturalisation এবং যে এইভাবে নাগরিকত্ব অর্জ্জন করে তাহাকে naturalised citizen বলা হয়।

প্রত্যেক রাষ্ট্র, কতকগুলি সর্ত্ত পালিত হইলে অনেক সময় অন্য রাষ্ট্রের নাগরিককে স্বীয় নাগরিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। এইভাবে নাগরিকত্ব অর্পণ সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ কোনও অবস্থায় কাহাকেও নাগরিক বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। সাধারণতঃ, রাষ্ট্রের বাহিরের কোনও লোক যখন নাগরিক হইতে চায়, তখন তাহাকে বিধিমত দরখাস্ত করিতে হয়, এবং আদালত অথবা কোনও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী দরখাস্ত বিবেচনা করিয়া নাগরিকত্ব অর্পণ করা হইবে কিনা তাহা সিদ্ধান্ত করে। যে সকল সর্ত্ত পালনের উপর নাগরিকত্ব অর্পণ নির্ভর করে, তাহা বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন প্রকার। সাধারণতঃ একটা নির্দ্দিষ্ট কাল রাষ্ট্রের এলাকায় বসবাস করা অথবা রাষ্ট্রের অধীন চাকরি করা সর্ত্ত হিসাবে রাখা হয়। কোথাও কোথাও রাষ্ট্রের এলাকায় জমি ক্রয় বা সরকারী সেনাবাহিনীতে চাকরি করিলে নাগরিকত্ব লাভ করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়। অনেক রাষ্ট্রেই

* Garner—Introduction to Political Science.

আইন আছে যে, অপর রাষ্ট্রের নাগরিক স্ত্রীলোক রাষ্ট্রের নাগরিককে বিবাহ করিলে,রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে। অপর দেশ জয় করিয়া অথবা অন্যভাবে অপর দেশ রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত করিয়া, তত্রত্য লোককে নাগরিক করা যাইতে পারে।

যে জন্মসূত্রে নাগরিক হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি নাগরিকত্ব অর্জ্জন করিয়াছে (naturlised citizen), তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ কোনও পার্থক্য রাখা না হইলেও কোনও কোনও দেশে জন্মসূত্রে নাগরিকদিগের একটু বেশী মর্য্যাদা দেওয়া হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস প্রেসিডেণ্টের পদ জন্মসূত্রে নাগরিক ব্যতীত অন্য কেহ পাইতে পারিবে না, এইরূপ বিধান আছে।

যেমন নাগরিকত্ব বিভিন্ন ভাবে অর্জ্জন করা যাইতে পারে, তেমনি নাগরিকত্ব বিভিন্ন ভাবে বিনষ্ট হইতে পারে। অনেক স্থলে এই বিধান আছে যে, কোনও রাষ্ট্রের নাগরিক স্ত্রীলোক অপর রাষ্ট্রের নাগরিককে বিবাহ করিলে পূর্ব্বোক্ত রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব হারাইয়া সে স্বামীর রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জ্জন করে। অনেক রাষ্ট্রের নিয়ম আছে যে, অপর রাষ্ট্রে সরকারী চাকরি, সেনাবাহিনীতে প্রবেশ প্রভৃতি দ্বারা নাগরিকত্বের বিনাশ হয়। অনেক সময় সেনাবাহিনী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে নাগরিকত্ব বিনাশ হয়। দীর্ঘকাল নিজ রাষ্ট্রের বাহিরে গিয়া অপর রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করিলেও নাগরিকত্ব হারাইতে হয়।

এক রাষ্ট্রে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকের মর্য্যাদা
(Rights and Privileges of an Alien)

যাহারা বিদেশী এবং অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক, তাহারা যদিও অপর রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যপরায়ণ, তথাপি তাহারা যে রাষ্ট্রে রহিয়াছে, সেই রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন এবং সেই রাষ্ট্রের প্রতি তাহাদের স্থানীয় ও অস্থায়ী আনুগত্য প্রকাশের দায়িত্ব রহিয়াছে। বিদেশীদিগকে রাষ্ট্রের সকল আইন-কানুন মানিয়া চলিতে হইবে, এবং আইন ভঙ্গ করিলে, অপরের সহিত সমানভাবে দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। যতদিন তাহারা রাষ্ট্রের মধ্যে রহিয়াছে, ততদিন তাহারা রাষ্ট্রের নিকট জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবার অধিকার পাইবে। বিদেশীর জীবন ও ধন-সম্পত্তি রাষ্ট্র নাগরিকদের মতই সমভাবে রক্ষা করিবে। বস্তুতঃ, রাজনৈতিক অধিকার ব্যতীত প্রায় অন্য সকল প্রকার নাগরিক অধিকার ভোগ করিবার সুবিধা বিদেশীকে দেওয়া হয়। তবে, ভূ-সম্পত্তি ক্রয় সম্পর্কে বিদেশীর উপর অনেক দেশেই বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়। বিদেশীরা সাধারণতঃ রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে। আইন সভা বা মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতির নির্ব্বাচনে ভোট দিবার ক্ষমতা অথবা কোনও সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সাধারণতঃ বিদেশীদিগকে দেওয়া হয় না।

দশম অধ্যায়

নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব

(Rights and Duties of Citizens)

অধিকার কাহাকে বলে?

(What is a Right?)

মানুষ যাহাতে সমাজে তাহার জীবনের পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। এই জন্য প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার কতকগুলি ক্ষমতা থাকা দরকার। তাহা না থাকিলে, মানুষের বৃত্তি সমূহ উন্নত হইবে না, মানুষের শক্তির শ্রেষ্ঠ বিকাশ সম্ভব হইবে না। এইজন্য রাষ্ট্র মানুষকে কতকগুলি অধিকার দান করে। এই অধিকারগুলি ব্যতীত মানুষ সমাজ জীবনে নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। অতএব অধিকার হইতেছে, সমাজের মধ্যে ব্যক্তির কাজ করিবার রাষ্ট্র কর্ত্তৃক স্বীকৃত ক্ষমতা অথবা সুযোগ। এই ক্ষমতা বা সুযোগ ব্যক্তি যাহাতে ভোগ করিতে পারে, রাষ্ট্র তাহার ব্যবস্থা করে। কেহ যদি এই ক্ষমতার প্রয়োগে বা সুযোগের উপভোগে বাধা সৃষ্টি করে, রাষ্ট্র তাহাকে বলপ্রয়োগে প্রতিনিবৃত্ত করে, শাস্তি দেয় এবং যাহার অধিকার আছে তাহাকে তাহা প্রয়োগের সুযোগ দেয়।

অধিকার ও রাষ্ট্র

(Rights and the State)

অধিকার সৃষ্টি হইয়াছে রাষ্ট্রের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে। যেখানে রাষ্ট্র নাই, সেখানে অধিকারও নাই। রাষ্ট্র না থাকিলে অধিকার-প্রতিরোধকারীদের শাস্তি দিবার এবং অধিকারসমূহ উপভোগের সুযোগ দিবার কেহ থাকে না। সুতরাং অধিকারও থাকে না। সমাজে ব্যক্তির যে যে অধিকার স্বীকৃত হয়, রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব ছাড়া তাহা একদিনও টিকিতে পারে না।

বিভিন্ন প্রকার অধিকার

(Different kinds of Rights)

রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে অধিকার বলিতে আইনগত অধিকার (legal right) বুঝায়; এই অধিকার রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃত এবং প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগের দ্বারা

রক্ষিত হয়। এই অধিকারে যদি কেহ হস্তক্ষেপ করে, রাষ্ট্র তাহার শাস্তি-বিধান করে।

অন্য এক প্রকার অধিকার আছে, যাহাকে নৈতিক অধিকার (moral right) বলা চলে। ইহা মানুষের নীতি-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি কেহ এই অধিকার ভঙ্গ করে, সমাজ তাহার নিন্দা করিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র অধিকার-ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেয় না।

আইনগত অধিকার সমূহকে (ligal rights) আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—পৌর-অধিকার (civil rights) এবং রাজনৈতিক অধিকার (political rights)। পৌর অধিকার (civil rights) বলিতে বুঝায় সেই সব অধিকার যাহা ছাড়া সভ্য জীবনযাত্রা অসম্ভব। জীবন ও ধন-সম্পত্তি রক্ষার অধিকার, ধর্ম্ম আচরণ করিবার অধিকার, স্বাধীনভাবে বক্তৃতা দিবার বা লেখা প্রকাশ করিবার অধিকার প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

রাজনীতিক অধিকার (political rights) বলিতে বুঝায় সেইসব অধিকার, যাহা দ্বারা মানুষ দেশের শাসনকার্য্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। ভোট দিবার অধিকার, সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করিবার অধিকার, রাজনৈতিক সঙ্ঘ গঠন করিবার অধিকার প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

জীবন রক্ষার অধিকার (Right to Life)—ইহা অবশ্য একটি মূল অধিকার। অপরের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রহিয়াছে। নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য অপরের প্রতি প্রয়োজন অনুযায়ী বল-প্রয়োগও করা যাইতে পারে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার (Right to Liberty)—প্রত্যেক নাগরিক রাষ্ট্রের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিবার অধিকারী, রাষ্ট্র বা অন্য কেহ তাহার ইচ্ছামত গমনা-গমনে বাধা দিতে পারিবে না। গভর্ণমেণ্ট বা অন্য কেহ বে-আইনীভাবে কাহাকেও গ্রেপ্তার বা কারারুদ্ধ করিতে পারিবে না। অবশ্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য অথবা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হইয়া থাকে।

সম্পত্তির অধিকার (Right to Property)—প্রত্যেক নাগরিক তাহার সম্পত্তি বিনা বাধায় নিজ ইচ্ছামত উপভোগ করিতে পারে। গভর্ণমেণ্ট বা অপর কেহ বে-আইনীভাবে কাহারও বাড়ীতে প্রবেশ করিতে বা খানাতল্লাসী করিতে বা অন্য কোনও ভাবে কাহারও সম্পত্তির যথেচ্ছা উপভোগে বাধা জন্মাইতে পারে না। অন্যান্য অধিকারের মত সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য অবশ্য এই অধিকারও

সঙ্কুচিত করা হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, সর্ব্বত্র খাদ্যাভাবের দরুণ, খাদ্য অপচয় নিবারণের জন্য যথেচ্ছা খাদ্য নষ্ট করা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ইচ্ছামত চুক্তি করিবার ক্ষমতা (Right of Contract)—নাগরিকগণ পরস্পরের মধ্যে ইচ্ছামত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে। এই অধিকারও সমাজের হিতাহিত বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা হয়। যেমন, কোনও চুক্তি যদি সমাজের অহিতকর বা জন-স্বার্থ বিরোধী হয়, তাহা অগ্রাহ্য হইবে।

ধর্ম্মাচরণের অধিকার (Right of Worship and Conscience) —কাহারও ধর্ম্ম-বিশ্বাস বা ধর্ম্ম আচরণে বাধা দেওয়া হইবে না। কোনও সভ্য রাষ্ট্রই বিশেষ কোনও ধর্ম্মমতের সমর্থন এবং অন্য ধর্ম্মমতের প্রতিকূল আচরণ করিতে পারে না। সকল ধর্ম্মাবলম্বীরই নিজ নিজ ধর্ম্ম আচরণের সুযোগ পাওয়া উচিত।

বলিবার স্বাধীনতা (Freedom of Speech)। প্রত্যেক সভ্যরাষ্ট্রে নাগরিকগণ নিজ নিজ স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার ভোগ করিয়া থাকে। সরকারী নীতি ও কার্য্য স্বাধীনভাবে আলোচনা করিবার অধিকারও এই অধিকারের অন্তর্গত। সরকারী নীতি ও কার্য্যের সমালোচনা যতই অপ্রিয় হউক না কেন, তথাপি তাহা যদি যথার্থ হয় এবং রাষ্ট্রদ্রোহমূলক না হয়, তবে, সরকার তাহার জন্য কাহাকেও শাস্তি দিবে না। এই অধিকার পূর্ণভাবে প্রদত্ত না হইলে গণতন্ত্র অর্থহীন হইয়া পড়িবে। নাগরিকগণ স্বাধীনভাবে সরকারের সমালোচনা দ্বারা সরকারকে ন্যায্য পথে শাসন করিতে বাধ্য করিতে পারে। আর যদি স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দেওয়া না হয়, সরকারী ভুল-ত্রুটি যদি দেখাইবার স্বাধীনতা না থাকে, তবে সরকার অনতিবিলম্বে স্বেচ্ছাচারী সরকারে পরিণত হইবে। অবশ্য স্বাধীনভাবে বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা দ্বারা রাষ্ট্রদ্রোহ প্রচার, দুর্নীতি-পূর্ণ বা অশ্লীল কথাবার্ত্তা প্রভৃতি আপত্তিজনক কার্য্য সমর্থিত হয় না। এগুলি অবশ্যই বন্ধ করা হইবে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা (Freedom of the Press)—এই অধিকার দ্বারা বুঝায়, মানুষের চিন্তা ও মতামত ছাপাইবার ক্ষমতা। নাগরিকের যেমন স্বাধীন ভাবে কথা বলিবার অধিকার আছে, তেমনি তাহার মতামত পুস্তকে বা সংবাদ পত্রে ছাপাইবার অধিকারও আছে। ইহার দ্বারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও বুঝায়। সংবাদপত্রসমূহের সকল প্রকার মতামত, ধারণা ও সমালোচনা ছাপাইবার অধিকার আছে। এই স্বাধীনতার ফলে উন্নত জনমত গঠিত হয়, জনসাধারণ বিবিধ বিষয়ে ভাবিতে শিখে। অন্যান্য অধিকারের মত, এই অধিকারও সাধারণ

বিধি-নিষেধের দ্বারা সীমাবদ্ধ। যেমন, কুরুচিসঙ্গত বা রাষ্ট্রদ্রোহজনক রচনা বা সংবাদ মুদ্রণ নিষিদ্ধ।

সভা ও সঙ্ঘ গঠন করিবার অধিকার (Right to Public Meeting and Association)—সভা-সমিতি করিয়া নিজ নিজ মত প্রচার করিবার সুযোগ থাকা উচিত। ইহা বিশেষ মূল্যবান অধিকার। অন্যান্যের সহিত না মিলিয়া একাকী কেহ নিজ ইচ্ছা, মত বা ধারণা অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারে না। সভা-সমিতি দ্বারা মানুষ একত্র হইয়া উদ্দেশ্য সফল করিতে পারে। তাহা ছাড়া জনসভায় বক্তৃতা দ্বারা সাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচার হয়, জনসাধারণ রাজনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যার সহিত পরিচিত হয়। সরকারও সভা-সমিতিতে প্রকাশিত মতামতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাধারণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে এবং শাসনকার্য্য ঠিক পথে চালাইতে পারে।

এই অধিকারও জনসাধারণের কল্যাণার্থে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সঙ্কুচিত হইতে পারে। যে সকল সভা-সমিতি সমাজ-বিরোধী হিংসাত্মক কার্য্য করে বা রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ করে, সরকার সেগুলি অবশ্যই বন্ধ করিয়া দিতে পারে।

রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights) ভোগ করিয়া থাকে।

ভোট দিবার অধিকার (Right to Vote)—বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, নাগরিকগণ সকলেই ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার লাভ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি মাত্রকেই ভোটাধিকার দেওয়া গণতন্ত্রসম্মত। অবশ্য, দেউলিয়া, উন্মাদ এবং কতকগুলি বিশেষ অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিরা এই অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে।

সরকারী কর্ম্ম গ্রহণের অধিকার (Right to hold Public Offices)—উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে, যে কোনও নাগরিকই যে কোনও সরকারী পদে নিযুক্ত হইতে পারিবে।

সরকারের নিকট দরখাস্ত পাঠাইবার অধিকার (Right to send Petitions)—প্রত্যেক নাগরিক নিজ নিজ অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিবার অধিকার পাইবে।

ভারতীয় নাগরিকের অধিকার
(Rights of an Indian Citizen)

ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে পরাধীন ভারতবর্ষে ভারতীয় নাগরিকের অধিকার-গুলি বিশেষভাবে সঙ্কুচিত ছিল, বিদেশী গভর্ণমেণ্ট একমাত্র বিদেশী শাসন চালাই

বার উদ্দেশ্যেই নাগরিক অধিকারগুলি বিধি-নিষেধের দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে মৌলিক অধিকার সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। এই প্রস্তাবের আদর্শ অনুযায়ী ভারতীয় গণ-পরিষদ মৌলিক অধিকার সম্পর্কে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

অধিকার ও কর্ত্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক
(Relation between Rights and Duties)

নাগরিকের অধিকার যেমন রহিয়াছে, তেমনই কর্ত্তব্য ও দায়িত্বও রহিয়াছে। কর্ত্তব্য ও অধিকার পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। অধিকারের কথা বলিলে কর্ত্তব্যের কথা উঠে। একটি ছাড়িয়া অপরটি থাকিতে পারে না। যখন বলা হয়, কোনও নাগরিকের একটি অধিকার আছে, সেই সঙ্গে একথাও বুঝিতে হইবে যে, অপর সকলের সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ না করার দায়িত্বও রহিয়াছে। যদি বলা হয় যে, নাগরিকের স্বাধীন মতবাদ ব্যক্ত করিবার অধিকার আছে, তাহা হইলে একথাও বুঝায় যে, অপর সকলের পক্ষে সেই অধিকারে বাধা সৃষ্টি না করার দায়িত্ব রহিয়াছে। এই সঙ্গে একথাও বুঝায় যে নাগরিকের অধিকার যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার দায়িত্বও রাষ্ট্রের রহিয়াছে। আবার, যাহার অধিকার আছে, তাহার নিজেরও দায়িত্ব হইতেছে যে, অপরের অনুরূপ অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া এবং অপরের অনুরূপ অধিকার ভোগে বাধা না দেওয়া। তাছাড়া যেহেতু রাষ্ট্রই আমাদের অধিকারের উৎস, রাষ্ট্র না থাকিলে অধিকারও থাকিত না, সেইহেতু, আমাদের সকলের কর্ত্তব্য হইতেছে রাষ্ট্রকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা। রাষ্ট্র ত অধিকারগুলি শুধু শুধুই দেয় নাই, যাহাতে মানুষের উন্নতি হইতে পারে, যাহাতে নাগরিক হিসাবে কর্ত্তব্য করা সহজ হইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই অধিকার দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক নাগরিকের কর্ত্তব্য হইতেছে তাহার অধিকারগুলির এমন ভাবে ব্যবহার করা যাহাতে নিজ নিজ বৃত্তিসমূহ উন্নত করিয়া রাষ্ট্রের ও সমাজের উপকার করা যাইতে পারে।

নাগরিকের কর্ত্তব্য
(Duties of a Citizen)

প্রত্যেক নাগরিকের নিজের প্রতি ও পরিবারবর্গের প্রতি এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি বহুবিধ কর্ত্তব্য রহিয়াছে।

(১) **আনুগত্য** (Allegiance)—রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করা নাগরিকের অবশ্য কর্ত্তব্য। বহিরাক্রমণ ও অন্তর্বিদ্রোহ হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা

করিবার জন্য জীবন পণ করিতে সংগ্রাম করিতে নাগরিককে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শাসন কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা করা নাগরিকের কর্ত্তব্য। অপরাধ নিবারণ ও অপরাধীদের গ্রেপ্তারের কার্য্যে কর্তৃপক্ষকে সর্ব্বদা সাহায্য করিতে হইবে।

(২) **রাষ্ট্রের আইন মান্য করিয়া চলা** (Obedience to Law)—সকল নাগরিকের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই আইন প্রণয়ন করা হয়। আইন মানিয়া না চলিলে, রাষ্ট্র যে অধিকার সমূহ স্বীকার করিয়াছে,তাহা ভোগ করা যাইবে না এবং সরকারও অচল হইয়া পড়িবে। সুতরাং, আইন মানিয়া চলা নাগরিকের কর্ত্তব্য। অবশ্য কোনও আইন যদি ন্যায়সঙ্গত না হয়, অথবা অকল্যাণকর মনে হয়, তবে তাহার জন্য নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করা যাইতে পারে।

(৩) **কর প্রদান** (Payment of Taxes)—সরকারী করসমূহ যথাবিধি আদায় দেওয়া নাগরিকের কর্ত্তব্য। সরকারকে তাহার ক্রমবর্দ্ধমান কার্য্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে হইলে প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। নাগরিকগণ তাহাদের দেয় কর না দিলে সরকার অচল হইয়া পড়িবে।

(৪) **সৎভাবে ভোট প্রদান** (Honest exercise of Vote)—প্রত্যেক নাগরিককে সুবিবেচনা ও সাধুতা সহকারে ভোট দিতে হইবে। প্রত্যেক নাগরিককে বিভিন্ন দলের কার্য্যতালিকা বিশ্লেষণ করিয়া এবং বিভিন্ন নির্ব্বাচন-প্রার্থীর গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া স্বাধীন বিবেচনার সহিত, অপর কর্তৃক অন্যায়ভাবে বশীভূত না হইয়া, ভোট দিবার অধিকার প্রয়োগ করিতে হইবে।

(৫) **পৌর সেবা** (Service to Society)—প্রত্যেক নাগরিককে পৌর ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। তাছাড়া যে কোন সরকারী কর্ত্তব্যের ভার তাহার উপর পড়ুক না কেন, তাহাকে উহা পালন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

(৬) **অন্যান্য কর্ত্তব্য** (Other Duties)—অন্যান্য কর্ত্তব্যের মধ্যে, নাগরিককে সর্ব্বদা তাহার অধিকার সমূহ রক্ষা করিবার জন্য জাগ্রত ও সচেষ্ট থাকিতে হইবে। নাগরিকের যদি পৌর বুদ্ধি (civic sense) পরিণত না হইয়া থাকে, সে যদি তাহার পৌর অধিকার রক্ষার জন্য দৃঢ়তার সহিত সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত না থাকে, নাগরিক যদি অলস ও স্বার্থবুদ্ধি-যুক্ত এবং আত্ম কলহে নিমগ্ন হয়, তাহা হইলে অচিরে পৌর অধিকারগুলিও তাহার থাকিবে না। নাগরিককে স্বার্থবুদ্ধি পরিহার করিয়া পৌরকর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। সমাজের কল্যাণের জন্য এবং রাষ্ট্রের রক্ষার উদ্দেশ্যে ত্যাগ স্বীকার করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং নিজের ও অপরাপর নাগরিকের অধিকার রক্ষার জন্য সর্ব্বদা সচেতন থাকিতে হইবে।

একাদশ অধ্যায়

আইন সভার নির্ব্বাচন

(Election to the Legislature)

ভোট দিয়া আইন সভায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার একটি বিশেষ মূল্যবান রাজনৈতিক অধিকার বলিয়া গণ্য হয়। এই অধিকার সকলেই ভোগ করিবে, অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইহা ভোগ করিবে, ইহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ ছিল। এখন অবশ্য অধিকাংশ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ একমত যে, ভোট দিবার অধিকার মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া, ইহা প্রাপ্তবয়স্কমাত্রকেই দিতে হইবে। প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রের ভোটাধিকার ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি সভ্য জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইয়াছে।

প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রের ভোটাধিকার নীতির সপক্ষে যুক্তি
(Arguments for Universal Adult Suffrage)

প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রের ভোটাধিকার সমর্থকগণের একটা যুক্তি হইতেছে এই যে, ভোট দিবার অধিকার ব্যক্তিমাত্রেরই জন্মগত অধিকার। রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা সর্ব্বসাধারণের সমষ্টিগত ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু নয় এবং এই ইচ্ছা নির্ভুল ভাবে প্রকাশ এবং স্থির করিবার জন্য প্রয়োজন, যাহাতে সকল নাগরিকই প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। রুশো (Rousseau), প্রভৃতি ফরাসী-বিপ্লবী যুগের পণ্ডিতগণ এই মত পোষণ করিতেন। রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা জনগণের মিলিত ক্ষমতা ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং সকলকে রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে দিতে হইবে।

সরকারের ক্ষমতার ভিত্তি হইতেছে জনগণের সম্মতি। সরকার জনগণের সম্মতির উপরই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং জনগণকে সরকারের পরিচালন ব্যাপারে সম্মতি দিতে হইবে। এই জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে সর্ব্বসাধারণের ভোটাধিকার একান্ত আবশ্যক।

সরকারের হস্তক্ষেপ হইতে যদি প্রজাদের অধিকার রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে সকলের ভোটাধিকার একান্ত আবশ্যক। সরকার অন্যায় করিলে বা

সরকারী নীতি ক্ষতিকর বিবেচিত হইলে, জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করিয়া নূতন প্রতিনিধিদল পাঠাইতে পারে এবং নূতন সরকার গঠন করিতে পারে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রকেই ভোটাধিকার দিতে হইবে।

রাষ্ট্র সর্ব্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের কার্য্য ও নীতির সহিত সকলের ভাল-মন্দ জড়িত। সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালন-ভার যাহাদের হাতে থাকিবে, তাহাদের নির্ব্বাচনের অধিকারও সকলের থাকা উচিত।

কতকগুলি লোককে ভোটাধিকার দিয়া বাকী সকলকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে, ভোটাধিকারহীন ব্যক্তিদের মনে অসন্তোষ ও ঈর্ষার সৃষ্টি হইবে। তাহা ছাড়া তাহারা মনে করিবে তাহারা রাষ্ট্রের কেহ নহে, সুতরাং রাষ্ট্রের কার্য্যে তাহাদের কোনও উৎসাহ থাকিবে না। আবার ইহার ফলে, প্রতিনিধিগণ ভোট-বিহীন ব্যক্তিদের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া, ভোটাধিকারীদের স্বার্থরক্ষায় যত্নবান হইবে।

প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রের ভোটাধিকার নীতির বিরুদ্ধে যুক্তি

(Arguments against Universal Adult Suffrage)

প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রকেই ভোট দিবার অধিকার দানের বিরুদ্ধে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill), লেকি (Lecky), মেইন (Maine) প্রভৃতি লেখক যুক্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভোট দিবার অধিকার একটা জন্মগত অধিকার নহে। উপযুক্ত না হইয়া কেহ এই পৌর অধিকার ভোগ করিতে পারিবে না। এই অধিকার ভোগ করিবার যাহার যোগ্যতা আছে, সে-ই এই অধিকার ভোগ করিবে। জনসাধারণ সাধারণতঃ অশিক্ষিত, ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার যোগ্যতা তাহাদের নাই। ভোট দিবার পূর্ব্বে রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জ্জন করা চাই, সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া চাই এবং লেখাপড়া জানা চাই।

মিল বলিয়াছেন, কেহ লিখিতে পড়িতে অথবা পাটীগণিতের সাধারণ সূত্রসমূহ না জানিলে তাহাকে ভোট দিবার অধিকার দেওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। মিল অবশ্য একথাও বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রই সকলের লেখা-পড়া শিখাইবার ভার গ্রহণ করিবে। মিল আবার এ কথাও বলেন যে, যাহারা কিছু না কিছু কর দিয়া থাকে, কেবল তাহারাই নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকারী হওয়া উচিত। যাহারা

করদাতা নহে, তাহাদের হাতে করদাতাদের অর্থ সম্পর্কিত ব্যবস্থা করিবার ভার দিলে, তাহারা স্বভাবতঃই অমিতব্যয়ী হইয়া পড়িবে। কেবলমাত্র করদাতাগণই ভোটাধিকারী হইবে।

লেকি (Lecky) অজ্ঞ জনসাধারণ কর্তৃক ভোটাধিকার প্রয়োগের সম্ভাব্য কুফল সম্পর্কে অনেক কথা লিখিয়াছেন। মিলের মত তিনিও বলেন যে, শিক্ষা ও করদান এই দুইটি বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া তবে ভোটাধিকার দেওয়া উচিত। মেইন (Maine) সাহেবও বলিয়াছেন যে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রের ভোটাধিকারের কুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ইহা আরও বিস্তৃত হইলে সভ্যতা বিপন্ন হইবে।

সিদ্ধান্ত
(Conclusion)

সৌভাগ্যক্রমে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধবাদীদের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয় নাই। আজ সভ্য জগতের সর্ব্বত্র প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দানের নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষেও নূতন শাসনতন্ত্রে প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রের ভোটাধিকার নীতি গৃহীত হইয়াছে।

মিল যে বলিয়াছেন, লেখা-পড়া না জানিলে ভোটাধিকার দেওয়া যায় না, ইহার সম্পর্কে বলিবার কথা এই যে, লেখাপড়া জানা না থাকিলেও লোকে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হইতে পারে। নিরক্ষর লোকদের মধ্যে প্রখর বুদ্ধিশালী লোকের অভাব নাই। তবে একথাও ঠিক এবং মিল নিজেও একথা বলিয়াছেন যে, লেখাপড়াই যদি ভোটাধিকারের সর্ত্ত হয়, তবে রাষ্ট্রের উচিত সকলকে লেখাপড়া শিখাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করা। আর করদাতা হইলে অথবা সম্পত্তিশালী হইলে যে ভোটাধিকারী হইবে, নতুবা ভোটাধিকারী হইবে না, এই নীতি অশ্রদ্ধেয়। দারিদ্র্য বা বিত্তহীনতার জন্যই কাহাকেও ভোটাধিকারের মত গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করা আজকাল কেহ সমর্থন করে না।

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের নীতি সর্ব্বত্র গৃহীত হইলেও অশিক্ষিত জনসাধারণের হাতে ভোটাধিকার দেওয়ার বিপদের কথা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। ব্লুণ্ট্‌শ্‌লি (Bluntschli) বলিয়াছেন, যাহারা রাষ্ট্রের পরিচালক হইবে, তাহাদের নির্ব্বাচনের ভার অক্ষম ও অপদার্থ জনগণের হাতে দেওয়া রাষ্ট্রের আত্মহত্যার সমান হইবে। সুতরাং গভর্ণমেন্টকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে, ভোটার জনসাধারণ যাহাতে শিক্ষিত ও সুযোগ্য হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রাপ্তবয়স্ক সকলেই ভোট দিবার অধিকার পাইতে পারে না

প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার বলিতে বুঝায়—অপ্রাপ্ত বয়স্কদের ভোট দিবার ক্ষমতা নাই। যাহারা প্রাপ্তবয়স্ক নহে, তাহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি এমন হয় নাই যে, তাহাদিগকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া যাইতে পারে। উন্মাদ, জড় প্রকৃতি, দেউলিয়া এবং খুব গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিগণও ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়া উচিত। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া হইত না। এখনও কোন কোন রাষ্ট্র স্ত্রীলোকগণকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।

স্ত্রীলোকদিগকে ভোটাধিকার দানের বিপক্ষে যুক্তি
(Arguments against Female Suffrage)

স্ত্রীলোকদিগের ভোটাধিকার দানের বিপক্ষবাদীদের একটি বড় যুক্তি এই যে, গৃহই স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক কর্ম্মক্ষেত্র। রাজনীতির আসরে স্ত্রীলোকের নামা উচিত নহে। স্ত্রীলোকের কোমল প্রকৃতি রাজনীতির কাজ করিবার অনুপযুক্ত। রাজনীতির আবর্ত্তে পড়িলে স্ত্রীলোকের কোমল বৃত্তিগুলি ধ্বংস পাইবে। রাজনীতির কাজের মধ্যে আসিলে, স্ত্রীলোকেরা স্বামী ও সন্তান এবং ঘর-সংসারের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবে না। স্ত্রীলোকদিগকে ভোট দানের ফলে ঘর-সংসার ভাঙ্গিয়া পড়িবে; কারণ, পরিবারের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ সমস্ত নির্ভর করে স্ত্রীলোকের উপর। স্ত্রীলোকদিগকে ভোটাধিকার দেওয়ার ফলে, যদি স্ত্রী ও স্বামী দুই বিরোধী ভোটপ্রার্থীকে ভোট দেয়, তবে সংসারের মধ্যে মনোমালিন্য ও অশান্তি সৃষ্টি হইবে। আর যদি উভয়ে একই প্রার্থীকে ভোট দেয়, তবে ত স্ত্রীলোকের ভোট বাহুল্য হইয়া পড়িল। আর একটি যুক্তি দেখানো হয় যে, স্ত্রীলোকগণ নিজেরাই ভোট পাইবার দাবীর বিরুদ্ধে মত পোষণ করে।

স্ত্রীলোকদিগের ভোটাধিকার দানের পক্ষে যুক্তি
(Arguments for Female Suffrage)

স্ত্রীলোকগণও পুরুষদের মতই রাষ্ট্রের নাগরিক। রাষ্ট্র ত স্ত্রীলোকদিগকে বাদ দিয়া সৃষ্ট হয় নাই। রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল নাগরিকের ক্ষমতা; স্ত্রীলোকদিগকে বাদ দিয়া শুধু পুরুষদের ক্ষমতা লইয়া সার্ব্ব-

ভৌম ক্ষমতা থাকিতে পারে না। সুতরাং এই সার্ব্বভৌম ক্ষমতা পরিচালনের ভার যাহাদের, তাহাদিগকে নির্ব্বাচনের অধিকার—স্ত্রীলোকদিগকেও দেওয়া দরকার। কাহারও ভোট দেওয়ার অধিকার পাওয়া উচিত বা অনুচিত, ইহা বিচার করিতে হইলে তাহার জ্ঞান-বুদ্ধি এবং অন্যান্য গুণপনা বিবেচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু সে স্ত্রী বা পুরুষ শুধু এই দেখিয়া ভোট দেওয়ার অধিকার স্থির করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে, রাজনৈতিক অধিকার পাওয়া উচিত কি অনুচিত, তাহা শুধু স্ত্রী-পুরুষ বিচার করিয়া স্থির করা মানুষের চুলের রং বিচার করিয়া ভোট দানের অধিকার দেওয়ার মতই অসঙ্গত ব্যাপার। তাছাড়া, স্ত্রীলোকগণ পুরুষদের অপেক্ষা দুর্ব্বল বলিয়া তাহাদের রক্ষার জন্য আইনের ও সমাজের সাহায্য বেশী করিয়া দরকার। সুতরাং তাহাদের ভোট দিবার অধিকার অবশ্যই দেওয়া কর্ত্তব্য। বহু ক্ষেত্রে পুরুষদের রচিত আইনে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি সুবিচার করা হয় নাই। এই অন্যায় হইতে আত্মরক্ষার জন্য স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার প্রয়োজন। আবার, আইন যখন স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের উপর সমভাবে প্রযোজ্য, তখন আইন শুধু পুরুষদের প্রতিনিধি দ্বারা রচিত হওয়া উচিত নহে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের আগমনের ফলে রাজনীতির ধূলি-কাদা ও মলিনতার হ্রাস হইবে, রাজনীতির মধ্যে পবিত্র ও উন্নত আবহাওয়া সৃষ্টি হইবে, রাজনীতি শ্রীমণ্ডিত হইবে, সরকারী কাজেরও অনেক উন্নতি হইবে এবং সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইবে। যাহারা বলে যে, স্ত্রীলোকগণ যদি স্বামীদের মতানুযায়ী ভোট দেয়, তবে তাহা সম্পূর্ণ বাহুল্য মাত্র হইবে, আর যদি স্বামীদের বিরুদ্ধে ভোট দেয়, তবে তাহা পারিবারিক কলহ সৃষ্টি করিবে, তাহাদের উত্তরে জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে, যদি স্ত্রীলোকগণ স্বামীদের আদেশ অনুযায়ী ভোট দেয়, তাহা হইলে ক্ষতি ত কিছুই নাই। কিন্তু যদি তাহারা নিজেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া মতামত স্থির করিয়া ভোট দেয়, তাহা হইলে প্রভূত মঙ্গল হইবে। স্ত্রীলোকগণ নিজেরাই ভোট দিবার অধিকার চাহে না—ইহার উত্তরে বলা যায় যে, স্ত্রীলোকগণ যদি নিজেরা চলিতে না-ও চায়, তবুও যে শৃঙ্খলে এতকাল তাহাদিগকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই শৃঙ্খল হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া দরকার।

স্ত্রীলোকদিগের ভোটাধিকার এখন সভ্য জগতে প্রায় সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষেও নূতন গঠনতন্ত্রে স্ত্রীলোকদিগের ভোটাধিকার নীতি গৃহীত হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নির্ব্বাচন
(Direct and Indirect Election)

ভোটদাতাগণ যখন প্রত্যক্ষভাবে সোজাসুজি ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে, তখন তাহাকে প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচন বলে। প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যগণ ভোটদাতাগণ কর্ত্তৃক সোজাসুজি প্রত্যক্ষভাবে নির্ব্বাচিত হন। জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন প্রণালী প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের দৃষ্টান্ত স্থল।

প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের সপক্ষে যুক্তি
(Arguments for Direct Election)

প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা থাকিলে নির্ব্বাচন ব্যাপারে ভোটদাতার আগ্রহ সমধিক বর্দ্ধিত হয়। ভোটদাতাবর্গের ভোটের ফলে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হওয়ায় ভোটদাতাগণের দায়িত্ব-বোধ বৃদ্ধি পায়। ভোটদাতাগণের নিকট ভোটপ্রার্থী ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ নীতি ও কার্য্যতালিকা সম্পর্কে বক্তৃতা এবং অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে প্রচার কার্য্য চালান; ফলে, ভোটদাতাদের রাজনৈতিক কৌতূহল বৃদ্ধি পায় এবং জ্ঞান লাভ হয়।

প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের বিপক্ষে যুক্তি
(Arguments against Direct Election)

প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচন ব্যবস্থার ফল খারাপ হইবে। কারণ, ভোটদাতাগণ সাধারণ ভাবে অশিক্ষিত। বিভিন্ন ভোটপ্রার্থীর বিভিন্ন নীতি ও কার্য্যতালিকার গুণাগুণ বিচার করা তাহাদের সাধ্যাতীত। সুচতুর প্রচারকদের চটকদার বক্তৃতায় তাহারা বিভ্রান্ত হইয়া ভাল-মন্দ স্থির করিতে পারে না। বিবেক-বুদ্ধিবিহীন বক্তা বা প্রচারক মিথ্যা বক্তৃতায় তাহাদিগকে ভুলাইয়া ভোট যোগাড় করিয়া লয়। নির্ব্বাচনী প্রচারের ষড়যন্ত্রে প্রতারিত হইয়া ভোটার সাধারণ অযোগ্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে পারে।

পরোক্ষ নির্ব্বাচন
(Indirect Election)

যখন সাধারণ ভোটারগণ সোজাসুজি প্রত্যক্ষভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন না করিয়া অল্পসংখ্যক লোক নির্ব্বাচন করিয়া দেয় এবং সেই অল্পসংখ্যক লোক প্রতি-

নিধি নির্ব্বাচন করে, তখন আমরা পরোক্ষ নির্ব্বাচনের দৃষ্টান্ত পাই। পরোক্ষ নির্ব্বাচনের বেলায় বস্তুতঃ দুইটি নির্ব্বাচন হইয়া থাকে ; প্রথম, ভোটদাতা জনসাধারণ মাত্র কয়েকজনকে নির্ব্বাচিত করে এবং দ্বিতীয়, এই কয়েকজন লোক আসল প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করেন। প্রতিনিধিগণ একেবারে সোজাসুজি ভোটারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন না। প্রাদেশিক আইন সভার উচ্চ পরিষদের কয়েকজন সদস্য নিম্ন পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হওয়ার বিধান ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ছিল। ইহা পরোক্ষ নির্ব্বাচনের একটি দৃষ্টান্ত।

পরোক্ষ নির্ব্বাচনের পক্ষে যুক্তি
(Arguments for Indirect Election)

পরোক্ষ নির্ব্বাচনের ফলে, জনসাধারণকে ভোটাধিকার দেওয়ায় যে বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাহা নিবারিত হয় ; কারণ, আসল প্রতিনিধি নির্ব্বাচন সর্ব্ব-সাধারণের হাতে না থাকিয়া কয়েকজন মাত্র সুযোগ্য দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তির হাতে পড়ে। কাজেই, উৎকৃষ্ট প্রতিনিধি নির্ব্বাচন হইবার সম্ভাবনা থাকে।

পরোক্ষ নির্ব্বাচন ব্যবস্থায়, দলগত উত্তেজনা, কলহ ও দুর্নীতি কম হইবার সম্ভাবনা। যে অল্পসংখ্যক লোক আসল প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে, তাহারা জন-সাধারণের মত সাময়িক উত্তেজনার বশীভূত না হইয়া যত্ন সহকারে সব দিক বিবেচনা করিয়া ধীর স্থিরভাবে নির্ব্বাচন করিতে পারিবে।

পরোক্ষ নির্ব্বাচনের বিপক্ষে যুক্তি
(Arguments against Indirect Election)

মধ্যবর্ত্তী লোকদ্বারা পরোক্ষ নির্ব্বাচনের ফলে ভোটদাতাগণের রাজনীতিক আগ্রহ কমিয়া যায়। ভোটদাতাগণ প্রত্যক্ষভাবে কোনও প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে না, তাহারা ভোট দিবার সময় জানিতেও পারিবে না যে, কোন্ ব্যক্তি শেষ পর্য্যন্ত প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইবে। ভোটদাতাগণ ক্রমশঃ রাজনৈতিক ব্যাপারে উদাসীন হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ, আসল প্রতিনিধি নির্ব্বাচন অল্পসংখ্যক লোকের ভোটের উপর নির্ভর করায়, দুর্নীতি ও কূট ষড়যন্ত্র প্রবল আকার ধারণ করে। তাছাড়া বর্ত্তমান গণতন্ত্রের যুগে পরোক্ষ নির্ব্বাচন অচল। গণতন্ত্রের একটি প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে জনসাধারণের রাজনৈতিক কার্য্যে উৎসাহ এবং রাজনৈতিক জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরোক্ষ নির্ব্বাচন দ্বারা ভোটার ও প্রতি-নিধির মধ্যে যদি একজন তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে ভোটারের

রাজনৈতিক শিক্ষার সুযোগ থাকে না, এবং তাহার রাজনৈতিক কার্য্যে উৎসাহ কমিয়া যায়। যেখানেই রাজনৈতিক দলগুলি পরিপুষ্ট ও সঙ্ঘবদ্ধ, সেখানেই পরোক্ষ নির্ব্বাচন-প্রথা একটা বাহুল্য ব্যাপারে দাঁড়াইয়া যায়। কারণ, প্রাথমিক ভোটারগণ যাহাদিগকে প্রথম নির্ব্বাচন করিবে, তাহারা কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলভুক্ত, এবং রাজনৈতিক দলভুক্ত হওয়ার জন্য তাহারা দলের নির্দ্দেশ অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে। সুতরাং, প্রাথমিক নির্ব্বাচন কালেই বুঝা যায় প্রতিনিধি কে হইবে, কে হইবে না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচন এইরূপ এক বাহুল্যকর প্রথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

পরোক্ষ নির্ব্বাচন ফ্রান্স্ প্রভৃতি যে দুই একটি দেশে পরীক্ষা করা হইয়াছিল, সে সকল স্থানে ইহা পরিত্যক্ত হইয়া প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচন-প্রথা গৃহীত হইয়াছে।

প্রকাশ্য অথবা গোপন বা ব্যালট (Ballot) ভোট—ভোট দিবার কর্ত্তব্য প্রকাশ্যে পালন করিবার পক্ষে কয়েকজন লেখক যুক্তি দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের মতে, ভোটদাতাগণ প্রকাশ্যে তাহাদের মনোনীত প্রতিনিধির নাম ঘোষণা করিবে। ভোট দিবার কর্ত্তব্য সর্ব্বসাধারণের পালনীয় কর্ত্তব্য, এবং ইহা সর্ব্বসাধারণের সমালোচনা উপেক্ষা করিয়া নির্ভীক ভাবে সর্ব্ব-সমক্ষে পালন করা উচিত। ইহা উঁচুদরের কথা হইলেও, গোপন ভোট বা ব্যালট প্রথায় ভোটদানের নীতি আজ সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছে। ভোটদাতাকে যদি স্বাধীন ভাবে ও নির্ভীক ভাবে ভোট দিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে উৎপীড়নের সম্ভাবনা হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। বিরুদ্ধ দলে ভোট দিবার জন্য ভোটদাতাকে যাহাতে বিব্রত বা উৎপীড়িত হইতে না হয়, যাহাতে ভোটদাতা নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মত যাহাকে খুসী ভোট দিতে পারে, সেই জন্য ভোটদাতার পক্ষে গোপনে ভোট দিবার ব্যবস্থা প্রয়োজন। ব্যালট প্রথায় ভোট দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের ফলে, ভোটদাতা বহু ক্ষেত্রে উৎপীড়নের সম্ভাবনা হইতে মুক্ত হইয়াছে।

আইন সভার উপর নির্ব্বাচক মণ্ডলীর প্রভাব
(Influence of Voters over Legislature)

প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার পর ভোটদাতাগণকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া আইন সভার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, যাহাতে নির্ব্বাচন কালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে সরকার পরিচালিত হয়। নির্ব্বাচক মণ্ডলীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অথবা নির্ব্বাচন কালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করিয়া যদি সরকার পরিচালিত হয়, তবে গণতন্ত্র থাকিতে পারে না। ভোটদাতাগণ

নানাভাবে সরকারের উপর চাপ দিতে পারে। ভোটদাতাগণ সদা জাগ্রত জনমত সৃষ্টি করিয়া জনসভা, শোভাযাত্রা, সংবাদ-পত্র প্রভৃতির মধ্য দিয়া সরকারের উপর পরোক্ষ চাপ দিতে পারে। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত উপায়গুলির দ্বারা ভোটদাতাগণ প্রত্যক্ষভাবে সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে ; যথা, অল্প ব্যবধানে নির্ব্বাচন, প্রতিনিধিকে আইন সভা হইতে ফিরাইয়া আনিবার অধিকার (Recall), গণভোট (Referendum), এবং ভোটদাতাগণের নিজেদের পক্ষ হইতে আইন করিবার অধিকার (Initiative)।

বেশী দীর্ঘকাল পরে পরে না হইয়া যদি অল্পকাল ব্যবধানে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা থাকে, তবে আইন সভা স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে সময় পায় না এবং সর্ব্বদা জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত থাকে।

যদি কোনও প্রতিনিধি তাহার নির্ব্বাচন কেন্দ্রের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে কাজ করে, তাহা হইলে তাহাকে অপসারিত (Recall) করিবার ক্ষমতা থাকিলে সে আইন সভার নির্ব্বাচকমণ্ডলীর মতামত মানিয়া চলিতে বাধ্য হইবে।

গণভোট (Referendum) ব্যবস্থাও বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহার দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব আইন সভায় স্থির না হইয়া দেশের সকল ভোটদাতার সিদ্ধান্তের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ভোটদাতাগণ যদি সেই প্রস্তাবের অনুকূলে ভোট দেয়, তবেই তাহা আইনে পরিণত হয়।

ভোটদাতাগণ যদি দেখে যে, কোনও আইন হওয়া উচিত, অথচ আইন সভা সেই আইন প্রণয়ন করিতেছে না, তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই যদি সেই প্রস্তাবে দেশের ভোট লইয়া আইন করিবার ব্যবস্থা করিতে পারে, তবে সেই ব্যবস্থার নাম Initiative.

সংখ্যালঘু নির্ব্বাচন সমস্যা
(Election of the Minorities)

প্রত্যেক দেশেই দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক দল থাকে। যে দলের লোকসংখ্যা বেশী, নির্ব্বাচনে যে দলের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক প্রার্থী জয়লাভ করে, তাহারাই মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং গভর্ণমেণ্ট পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। এবং সংখ্যালঘু দল পরাজিত হইয়া থাকে। এমন হইতে পারে যে, সংখ্যালঘু দল তাহাদের লোকসংখ্যার অনুপাতেও প্রার্থী দাঁড় করাইতে পারিল না, অথবা প্রতিনিধিত্ব হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইল। এখন সমস্যা হইতেছে এই যে, সংখ্যালঘু দলসমূহকে আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব করিতে দেওয়া উচিত কিনা, এবং উচিত হইলে কিভাবে দেওয়া উচিত।

সংখ্যালঘু দলের প্রতিনিধিত্ব দিবার পক্ষে যুক্তি
(Arguments for Representation of the Minorities)

জন ষ্টুয়ার্ট মিল 'Representative Government' নামক তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকে লিখিয়াছেন : "সংখ্যালঘু দলের উপযুক্তসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।" তাঁহার মতে, গণতন্ত্রের প্রথম সূত্র হইতেছে, সংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব ; সুতরাং সংখ্যালঘু দল যদি সর্ব্বত্র সংখ্যাগুরু দল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া একেবারে প্রতিনিধিত্ব হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে গণতন্ত্র বলিয়া কিছু রহিল না। সাধারণভাবে নির্ব্বাচন ব্যবস্থার ফলে সংখ্যাগুরু দল হয়ত সর্ব্বত্রই জয়লাভ করিতে পারে এবং সংখ্যালঘু দল হয়ত একটিও আসন না পাইতে পারে। মনে করা যাক, গড়ে শতকরা ৫১টি ভোট সংখ্যাগুরু দল পাইয়াছে এবং শতকরা ৪৯টি ভোট সংখ্যালঘু দল পাইয়াছে, এবং নির্ব্বাচকমণ্ডল-গুলি এমনভাবে সাজানো হইয়াছিল যে, সংখ্যালঘু দল কোনও একটি আসন দখল করিতে পারে নাই। এক্ষেত্রে ইহা অত্যন্ত অন্যায় মনে হয় যে, শতকরা ৪৯ জন ভোটারের কোনও প্রতিনিধি আইন সভায় রহিল না। আবার সংখ্যালঘু দল যদি কয়েকটি আসন দখলও করিতে পারে, তাহাদের মোট আসনের সংখ্যা তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে কম হইতে পারে ; সেক্ষেত্রে সংখ্যাগুরু দল তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে বেশী আসন দখল করিয়া লইবে। ইহাও ন্যায় ও যুক্তি অনু-মোদিত ব্যবস্থা নহে।

অতএব, সংখ্যালঘু দলের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কিত বিশেষ ব্যবস্থা করা একান্ত অবশ্যক। লেকি (Lecky) এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "দেশের দুই-তৃতীয়াংশ লোক যদি এক দলের পক্ষে ভোট দেয় এবং এক-তৃতীয়াংশ লোক যদি অপর দলের পক্ষে ভোট দেয়, তবে ইহাই উচিত যে, আইন সভায় সংখ্যাগুরু দল দুই-তৃতীয়াংশ এবং সংখ্যালঘু দল এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্বের অধিকার লাভ করিবে।" মিল এই প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে অবশ্যই সংখ্যাগুরু দল শাসনভার পরিচালন করিবে, তবে সংখ্যালঘু দলসমূহ যাহাতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব হইতে বঞ্চিত না হয়, তাহাও দেখিতে হইবে।

সংখ্যালঘু দলের বিশেষ প্রতিনিধিত্বের বিপক্ষে যুক্তি
(Arguments Against Special Representation of Minorities)

সিজ্‌ভিক (Sidgwick) প্রভৃতি কয়েকজন শক্তিশালী লেখক সংখ্যালঘু দলের প্রতিনিধিত্বের বিশেষ কোনও ব্যবস্থা করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহাদের মতে, এইরূপ ব্যবস্থার ফলে প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ দলগত স্বার্থে পরিচালিত হইয়া দেশের সামগ্রিক স্বার্থ ভুলিয়া যাইবে। ইহাতে দলাদলি ও তজ্জনিত তিক্ততা বৃদ্ধি পাইবে এবং প্রতিনিধিগণ সমগ্র দেশের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে কাজ না করিয়া শুধু নিজ নিজ দলের হইয়া কাজ করিবেন। ইহাতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে এবং শ্রেণী-বিদ্বেষমূলক আইন সৃষ্টি হইবে। তাহা ছাড়া সংখ্যালঘু দলের বিশেষ নির্ব্বাচন ব্যবস্থার ফলে বহু দল আইন সভায় স্থান পাইবে এবং কোনও একটি দল অন্য দল-নিরপেক্ষ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারিবে না। সংখ্যালঘু দলের বিশেষ নির্ব্বাচনের যতগুলি পরিকল্পনা আবিষ্কৃত হইয়াছে, সবগুলিই অতীব জটিল এবং সাধারণের বোধগম্য নহে। ইহাতে নির্ব্বাচন সম্পন্ন করা কষ্টসাধ্য হইবে।

সংখ্যালঘু দলের বিশেষ নির্ব্বাচন প্রণালী
(Modes of Special Representation of Minorities)

সংখ্যালঘু দলসমূহ যাহাতে প্রতিনিধিত্ব হইতে বঞ্চিত না হয়, তাহার জন্য বিবিধ পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

Limited Vote প্রথা দ্বারা নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে যতগুলি প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইবে, প্রত্যেক ভোটার তাহার সবগুলিকে ভোট দিবার অধিকার না পাইয়া, কম সংখ্যক প্রার্থীকে ভোট দিবার অধিকার পাইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোনও নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতে যদি তিনটি প্রতিনিধি পাঠাইতে পারা যায়, তাহা হইলে সেই নির্ব্বাচন কেন্দ্রের প্রত্যেক ভোটার দুইজনের বেশী প্রার্থীকে ভোট দিতে পারিবে না। ফলে সংখ্যালঘু দল অন্ততঃ একজন প্রার্থীকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠাইতে পারে।

Cumulative Vote প্রথা দ্বারা, নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে যতজন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারা যায়, প্রত্যেক ভোটার ততগুলি ভোট যেভাবে খুসী বিভিন্ন প্রার্থীর মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে পারে। ধরা যাক্, একটি কেন্দ্র হইতে পাঁচজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে। তাহা হইলে, এই প্রথা অনুসারে প্রত্যেক ভোটার পাঁচটি ভোট দিতে পারিবে এবং পাঁচটি ভোট সে একজনকেই দিতে পারে অথবা প্রার্থীদের মধ্যে যেমন খুসী বিলাইয়া দিতে পারে। এইভাবে একটি অত্যন্ত সংখ্যালঘু দলও তাহাদের ভোটগুলি একজন প্রার্থীকেই দিয়া তাহাকে জয়যুক্ত করিতে পারে।

Proportional Representation বা সংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব

ব্যবস্থা দ্বারা সংখ্যালঘু দল তাহাদের সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে। Preferential System বা Hare System বা Proportional Representation by single transferable vote এই প্রসঙ্গে উচ্চভাবে প্রশংশিত হইয়াছে। এই প্রথার দ্বারা প্রত্যেক ভোটার একটি বা দুইটি প্রার্থীর পক্ষে ভোট দিতে পারে এবং ভোট দিবার সময় প্রত্যেক প্রার্থীর নামের পাশে ১, ২, ৩, ৪ এইভাবে লিখিয়া তাহার পছন্দের ক্রম নির্ণয় করিয়া দিতে পারে, অর্থাৎ বুঝিতে হইবে—যে নামের পাশে ১ লেখা হইয়াছে, তাহাকেই সে সর্ব্বাগ্রে স্থান দেয়, তাহার পরেই স্থান দেয় তাহাকে, যাহার নামের পাশে ২ লেখা রহিয়াছে। ৩,৪ সম্পর্কেও এই রকম বুঝিতে হইবে। যতগুলি ভোট হইয়াছে, সেই সংখ্যাকে প্রতিনিধিদের সংখ্যা দিয়া ভাগ দিলে যে ভাগফল পাওয়া যাইবে, সেই সংখ্যক ভোট (quota) নির্ব্বাচিত প্রত্যেক প্রার্থীর পাওয়া চাই। ভোট গণনার সময় কোনও প্রার্থীর প্রথম স্থানের ভোটগুলি প্রথমে গণনা করিতে হইবে। কাহারও পক্ষে ভাগফলের সমান পরিমাণ ভোট (quota) গণনা হইলেই তাহাকে নির্ব্বাচিত গণ্য করিয়া তাহার জন্য আর অন্য ভোট গণনা করা বন্ধ রাখিতে হইবে। এই প্রার্থীর নাম অন্য যেসব ব্যালট পত্রে প্রথম স্থান পাইয়াছে, সেইগুলি দ্বিতীয় অধিকারী নামের জন্য গণনা হইবে। এইভাবে গণনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইবে।

সাম্প্রদায়িক ও পৃথক নির্ব্বাচন
(Communal and Separate Election)

ভারতবর্ষে বিদেশী শাসনের মহিমায় সংখ্যালঘু দল বলিতে সম্প্রদায় ও ধর্ম্মগত সংখ্যালঘিষ্ঠতাকেই বুঝায়। এই ভিত্তিতে হিন্দুরা পাকিস্থানের অন্তর্গত সকল প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং মুসলমানগণ ভারতীয় ডোমিনিয়নের সকল প্রদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এইভাবে শিখ ও ভারতীয় খৃষ্টানগণ সর্ব্বত্রই সংখ্যালঘু বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

বৃটিশ শাসকদের কূটনীতির চক্রে সম্প্রদায় ও ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভারতবাসীদিগকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করিয়া, সম্প্রদায় ও ধর্ম্মগত সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক ও সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অবশ্য বৃটিশ উস্কানির দ্বারা পরিচালিত এক শ্রেণীর অন্ধ সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ মুসলমানের জেদের ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। যাহা হউক, পৃথক ও সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ব্যবস্থার ফলে, হিন্দু শুধু হিন্দুকেই ভোট দিতে পারিত, মুসলমান শুধু মুসলমানকেই ভোট দিতে

পারিত। এইভাবে শিখ ও ভারতীয় খৃষ্টানদের জন্যও পৃথক ও সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা ছিল।

এই পৃথক ও সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার পক্ষে এই যুক্তি দেওয়া হয় যে, ইহাতে সম্প্রদায়সমূহ খাঁটি প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারে। যদি হিন্দু-মুসলমান যুক্তভাবে ভোট দেয়, তাহা হইলে হিন্দুর ভোটে হয়ত এমন মুসলমান নির্ব্বাচিত হইতে পারে, যে নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ না দেখিয়া হিন্দুর স্বার্থ বেশী করিয়া দেখিবে। হিন্দু প্রতিনিধির বেলায় এইরূপ হইতে পারে যে, সে হিন্দুর স্বার্থ না দেখিয়া মুসলমানের স্বার্থ বেশী করিয়া দেখিবে।

কিন্তু, ঠিক এই যুক্তিই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের বিপক্ষে দেওয়া যায়। এই ব্যবস্থার ফলে প্রতিনিধিরা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিবে। জাতির ও দেশের স্বার্থ তাহারা দেখিতে শিখিবে না। এমন কি সম্প্রদায়ের স্বার্থ উদ্ধার হইবে মনে করিয়া তাহারা দেশের ও জাতির স্বার্থ বলি দিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। এই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ব্যবস্থার ফলে, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পথে অলঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য ভুলিয়া গিয়া পরস্পরের ঘৃণ্য শত্রুতে পরিণত হইয়াছিল। আজও হিন্দু-মুসলমান বিরোধের অবসান ঘটাইয়া উভয়কে মিলনের সূত্রে গাঁথিয়া এক করিয়া গড়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য কার্য্য বলিয়া মনে হয়। এই সাম্প্রদায়িক ও পৃথক নির্ব্বাচন শুধু যে জাতীয়তা-বিরোধী তাহা নহে, ইহা সংখ্যালঘুদের স্বার্থের পরিপন্থী। সংখ্যালঘুরা চিরকাল সংখ্যা-গুরুদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপেই থাকিয়া যাইবে। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি আসন দখল করিয়া তাহারা কোনও দিন নিজেদের উন্নতিও করিতে পারিবে না। তাছাড়া এই ব্যবস্থার মধ্যে ধর্ম্ম ও রাজনীতি মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে। ফলে ধর্ম্ম ও রাজনীতি উভয়ই নীচু স্তরে নামিয়া আসিয়াছে। কোনও সভ্য দেশেই রাজনীতির ক্ষেত্রে ধর্ম্মের নামে মানুষকে উত্তেজিত করিতে দেওয়া হয় না।

দ্বাদশ অধ্যায়

আইন, স্বাধীনতা এবং সাম্য
(Law, Liberty and Equality)

আইন (Law), এই কথাটির একাধিক প্রচলিত অর্থ আছে। সমাজে যে বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হয়, তাহাকে আমরা অনেক সময় সামাজিক আইন বলিয়া উল্লেখ করি। আবার নীতি-শাস্ত্র-সম্মত কতকগুলি বিধি সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে, সেগুলিকে কখনও কখনও নৈতিক আইন বলিয়া অভিহিত করা হয়। কার্য্য কারণের সম্পর্ক বুঝাইতে পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ শাস্ত্র প্রভৃতি বিভাগেও 'আইন' কথাটির প্রয়োগ করা হয়। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে আইন (Law) কথাটির অর্থ কিন্তু ভিন্ন রূপ। আইনের যত প্রকার সংজ্ঞা আছে, তাহার মধ্যে হল্যাণ্ড (Holland) এর প্রদত্ত সংজ্ঞাই শ্রেষ্ঠ। তিনি বলিয়াছেন, আইন হইতেছে মানুষের বাহ্যিক কার্য্য-কলাপ সম্পর্কিত বিধি, যাহা সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রীয় শক্তি কর্ত্তৃক জোর করিয়া মানানো হয়। রাষ্ট্র পরিচালনের জন্য নাগরিকদের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম স্থির করিতে হয়। তাহা ছাড়া, গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া এবং গভর্ণমেণ্টের সহিত নাগরিকদের সম্পর্ক স্থির করিয়া লওয়াও আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যেই রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন ও প্রবর্ত্তন করিয়া থাকে। প্রথমতঃ, আইন মানুষের বাহ্যিক কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে, তাহার অন্তরের চিন্তার সহিত আইনের কোনও সম্পর্ক নাই। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র আইন-ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেয়। রাষ্ট্র তাহার শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া নাগরিককে আইন মানিতে বাধ্য করে।

আইনের সহিত মানুষের নৈতিক ধারণার সম্পর্ক কতটা?
(Relation between Law and Morality)

একদিক হইতে দেখিলে, আইনের ও নৈতিক ধারণা মানুষের ধর্ম সম্পর্কিত ধারণা হইতেই উদ্ভূত হয়। কালক্রমে উভয় ধারণা আইন প্রণয়নের ভিত্তি স্বরূপ হয়। ইহা ছাড়া আইনের মধ্যে আমাদের নীতিগত ধারণা প্রতি-ফলিত হয়। কোনও দেশের আইন দেখিয়া বুঝা যায়, সে দেশের নীতিজ্ঞান

কিরূপ। যাহা দেশের নীতি জ্ঞান দ্বারা নিন্দিত, প্রায়ই আইন দ্বারাও তাহা শাস্তির যোগ্য হইয়া থাকে। আইন যদি নীতিগত ধারণার সহিত সামঞ্জস্যহীন হয়, তবে আইন কার্য্যকরী হয় না। আইন যদি নীতিগত ধারণার অনেক বেশী অগ্রবর্ত্তী অথবা পশ্চাৎপদ থাকে, তাহা হইলে আইন বিফল হইতে বাধ্য। মনে করা যাক যে, দেশের লোক এখনও মদ্যপান তাহাদের নীতি জ্ঞানে একান্ত নিন্দনীয় মনে করে না, সেখানে আইন দ্বারা মদ্যপান বন্ধ করিলে কিছুই লাভ হইবে না। আবার একথাও মনে রাখা দরকার যে, আইন ও নীতিগত ধারণা পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। নীতিগত ধারণা কোনও বিষয়ের অনুকূল না হইলেও, আইন প্রণয়ন করিয়া মানুষের ধারণা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন সাধন করা যায়। বিধবা বিবাহ আইন যখন প্রবর্ত্তিত হয়, বিদ্যাসাগরকে বহু লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। দেশের নীতিগত ধারণা তখন বিধবা বিবাহের প্রতিকূল ছিল। আজ বিধবা বিবাহ সমাজে সাধারণভাবে নিন্দনীয় নহে ; অন্যান্য কারণ ছাড়া, বহুদিন বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্ত্তিত থাকা এই মনোভাব পরিবর্ত্তনের একটা কারণ। অতএব এক দিয়া বিচার করিলে বলা যায় যে আইন ও নীতি-জ্ঞানের মধ্যে বিশেষ যোগাযোগ রহিয়াছে।

কিন্তু, অন্য দিক দিয়া দেখিলে নৈতিক ধারণা এবং আইনের মধ্যে পার্থক্য চোখে পড়ে। প্রথমত, রাষ্ট্র কর্ত্তৃক আইন সমর্থিত ও রাষ্ট্রের শারীরিক শক্তির দ্বারা লোকজনকে মানিতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু নিছক নৈতিক অপরাধ রাষ্ট্র কর্ত্তৃক দণ্ডনীয় হয় না। যে ব্যক্তি শুধুমাত্র নৈতিক অপরাধে অপরাধী, সমাজ তাহার নিন্দা করে, কিন্তু রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি দেয় না। দ্বিতীয়তঃ, আইন মানুষের বাহ্যিক কার্য্য কলাপ নিয়ন্ত্রণ করে, নীতিশাস্ত্র কিন্তু মানুষের অন্তরের চিন্তাও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। তৃতীয়তঃ, এমন বহু জিনিষ আছে, যাহা বে-আইনী না হইতে পারে, অথচ নীতিশাস্ত্র বিগর্হিত ; যেমন, মিথ্যা কথা বলা বা লোকের প্রতি ঈর্ষা করা আইনে দণ্ডনীয় নহে, কিন্তু, এগুলি নীতিশাস্ত্র অনুমোদিত নহে। আবার এমন জিনিষ হইতে পারে যাহা বে-আইনী, কিন্তু নীতিশাস্ত্র-বিগর্হিত না হইতে পারে। রাস্তার ডান দিক দিয়া গাড়ী চালানো আইনে নিষেধ। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা নৈতিক অপরাধ নহে।

আইনের উৎপত্তি
(Origin of Law)

আইন সভা (Legislature) অবশ্য আইন সভার সর্ব্বপ্রধান উৎপত্তি স্থল। দেশের আইন সভা প্রয়োজন অনুসারে পুরাতন আইন রদ-বদল করে

এবং নূতন আইন প্রবর্ত্তন করে। এই ভাবেই বর্ত্তমান কালে সর্ব্বত্র আইন তৈরী হয়। তবে, আইন সভা ছাড়াও, অন্যভাবেও আইনের উৎপত্তি হইয়াছে।

দেশের প্রচলিত প্রথা (Custom) হইতে অনেক স্থলে আইনের উৎপত্তি হইয়াছে। কালক্রমে সামাজিক আচার-সম্পর্কে কতকগুলি নিয়ম প্রচলিত হইয়া প্রথায় পরিণত হইয়া পড়ে। এইগুলি আবার রাষ্ট্র কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়া আইনে পরিণত হয়। ধর্ম্মও (Religion) আইনের উৎপত্তি স্থল রূপে গণ্য হয়। ধর্ম্ম মানুষের কর্ত্তব্য নির্ণয় করে, কি ভাবে আচরণ করিতে হইবে, তাহা বলে। এইগুলি কালক্রমে আইনের দ্বারা সমর্থিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে, অতীতকালের প্রথাগুলি ধর্ম্ম আচরণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিচারকগণের সিদ্ধান্ত (Judicial Decision) হইতেও বহু আইনের উদ্ভব হয়। আদালতের বিচারকগণকে মামলার বিচারকালে আইনের ব্যাখ্যা করিতে হয়। আইনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কখনও কখনও বিচারকগণ আইনের মধ্যে নূতন সূত্র আবিষ্কার করেন, একেবারে সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিতে বিচার করিয়া নূতন আইনের সূত্রপাত করেন। তাছাড়া, এমন অনেক মামলার উদ্ভব হয়, যাহা বর্ত্তমান আইনের দ্বারা হয়ত ঠিকমত বিচার করা যায় না। সেক্ষেত্রে বিচারকগণ তাঁহাদের নির্দ্দেশ দ্বারা আইন সৃষ্টি করিতে পারেন। এসব কথা ছাড়াও, বিচার-পতিগণের সিদ্ধান্ত ও মন্তব্য আইন প্রণয়নের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

আইন-ব্যবস্থা সম্পকিত বৈজ্ঞানিক আলোচনা (Scientific discussion) আইনের গতি স্থির করে। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ অথবা বিচক্ষণ ভাষ্যকারগণ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত নীতির ব্যাখ্যা লইয়া আলোচনা করেন; এইসব আলোচনা বিচারালয় অনেক সময় গ্রহণ করিয়া লন এবং কালক্রমে ইহা আইনে পরিণত হইয়া যায়।

সময় সময় এমন নূতন বিষয়ের উদ্ভব হইতে পারে, যাহা প্রচলিত আইনের দ্বারা বিচার করা যায় না। সে রকম ক্ষেত্রে বিচারক অবস্থা অনুযায়ী ন্যায় ও বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে মামলার বিচার করিতে পারেন। ইংরাজীতে ইহাকে 'ইকুইটি' (equity) বলে। এইভাবেও নূতন আইনের উদ্ভব হইতে পারে।

স্বাধীনতা বলিতে কি বুঝায়?
(What is Liberty)

শব্দগত অর্থে স্বাধীনতা (Liberty) বলিতে যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার ক্ষমতা

বুঝায় ; নিজের খুসীমত যে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, যাহার স্বেচ্ছামত কার্য্যের উপর কেহ বাধা আরোপ করিতে পারে না, সেই স্বাধীন।

কিন্তু স্বাধীনতার এই অর্থ রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে অচল। রাষ্ট্রের মধ্যে অবাধ স্বাধীনতা বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। যদি সকলেই খুসীমত মারামারি কাটাকাটি করিতে পারে, তাহা হইলে ত স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই থাকে না। প্রাক্-রাষ্ট্রীয় যুগেই শুধু তথাকথিত অবাধ স্বাধীনতার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়। যখন রাষ্ট্র নাই, আইন নাই, মানুষ তখন নিজের খুসীমত কাজ করিতে পারে বলা যায়। সেই খুসীমত কাজ করার অধিকার ত সকলের থাকিতে পারিত না। যাহারা শারীরিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ, তাহারাই অপরকে দমন করিয়া যাহা খুসী করিতে পারে। আবার তাহাদের অপেক্ষা অধিক শারীরিক শক্তিশালী লোকের আবির্ভাব হইলে তাহারা পরাজিত হয়। কিন্তু ইহা ত স্বাধীনতা নহে, ইহা স্বাধীনতার অভাব। স্বাধীনতা বলিতে সকলের যাহা খুসী করিবার ক্ষমতা বুঝাইতে পারে না। সকলেই যদি খুসীমত কাজ করে, সকলেরই অধিকার বিপন্ন হইবে, কেহই নিজ অধিকার স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্ত মনে ভোগ করিতে পারিবে না। শক্তিমান লোক দুর্ব্বলের উপর আধিপত্য করিবে এবং পরস্পর বিবাদ ও সঙ্ঘর্ষ অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতে থাকিবে। যখন মানুষের অধিকারগুলির সীমা সুনির্দ্দিষ্ট থাকে, যে যাহার অধিকারের সীমার মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে কাজ করিবে এইরূপ ব্যবস্থা থাকে, কেহ যাহাতে অপরের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন না করে, তাহার জন্য উপযুক্ত বাধা-নিষেধের প্রাচীর থাকে, অর্থাৎ প্রত্যেকে যাহাতে নিজ নিজ অধিকার ভোগের স্বাধীনতা পায়, তাহার জন্য সকলের উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়, তখনই প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করা যায়। কাজের উপর বাধা আরোপ করিলেই যে, স্বাধীনতা খর্ব্ব হইল, রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে একথা বলে না। দেখিতে হইবে, এই বাধা অন্যায় ও অসঙ্গত কিনা। অন্যায় ও অসঙ্গত বাধা দ্বারাই মানুষের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু যখন সাধারণের মঙ্গলের জন্য যথেচ্ছা কাজে বাধা সৃষ্টি করা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে এই বাধার দ্বারাই প্রকৃত স্বাধীনতার উপভোগের পথ উন্মুক্ত হইল। সুতরাং স্বাধীনতা মানে বাধাহীন ভাবে যথেচ্ছা কাজ করিবার ক্ষমতা নহে। সকলের কার্য্যের উপর যথোচিত বাধা-নিষেধের দ্বারাই প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করা যায়। সকলের বাধাহীনভাবে খুসীমত কাজ করিবার ক্ষমতা স্বাধীনতার অভাব বুঝায়।

অতএব স্বাধীনতা ভোগের জন্য সকলের কাজের উপর ন্যায়সঙ্গত, সাধারণের কল্যাণকর বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে হইবে। তবে, বর্ত্তমান রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে

স্বাধীনতা বলিতে এমন অবস্থার সৃষ্টি বুঝায়, যাহাতে মানুষ নিজ বৃত্তিসমূহের চরম উন্নতি করিতে পারে, নিজের আদর্শ অনুযায়ী নিজ জীবনকে গঠন করিবার সুযোগ লাভ করে। লাস্কি (Laski) বলিয়াছেন, স্বাধীনতা বলিতে মানুষ যাহাতে তাহার নিজ শক্তির পূর্ণ বিকাশ লাভ করিতে পারে, তাহার সুযোগ করিয়া দেওয়া বুঝায়; এবং এই জন্যই আবার সরকারের কর্ত্তৃত্বে আসীন না হইয়া জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল হওয়া দরকার।

বিভিন্ন প্রকারের স্বাধীনতা
(Different Kinds of Liberty)

প্রাকৃতিক স্বাধীনতা (Natural Liberty)—প্রাক্-রাষ্ট্রীয় যুগে, যখন সমাজ বলিয়া কিছু ছিল না, সেই সময় মানুষ নাকি প্রাকৃতিক স্বাধীনতার অধিকারী ছিল। Rousseau প্রভৃতি লেখকগণ এই প্রাকৃতিক স্বাধীনতার বিভিন্ন বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন। রুশোর মতে, রাষ্ট্রের আধিপত্যহীন সেই প্রাক্-রাষ্ট্রীয় যুগেই মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিত, রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তাহার প্রকৃত স্বাধীনতা হারাইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের মতে রাষ্ট্রের উদ্ভবের পরেই মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিয়াছে। প্রাক্ রাষ্ট্রীয় যুগে মানুষ যে প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যে ছিল, তাহা শুধুমাত্র নৈরাজ্য, সেখানে শুধু দুর্ব্বলের উপর প্রবলের শাসন চলিত, স্বাধীনতা বলিয়া কিছুই ছিল না।

পৌর স্বাধীনতা (Civil Liberty)—জীবন ও ধন-সম্পত্তি রক্ষার অধিকার, ধর্ম্মাচরণের অধিকার প্রভৃতি পৌর অধিকার ভোগ করিবার স্বাধীনতা রাষ্ট্র কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয় এবং কেহ যাহাতে অপরের এই অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে, তাহার ব্যবস্থা করে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty)—বলিতে কোনও দেশের অধিবাসীদের নিজেদের অভিপ্রায় মত সরকার (Government) গঠন করিবার ক্ষমতা বুঝায়। যে দেশের লোক ভোট দিবার অধিকার প্রভৃতি রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে এবং সরকারের কাজে অংশ গ্রহণ করিতে পারে, সে দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে বলা যায়।

জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty)—বলিতে কোনও জাতির বৈদেশিক শাসনমুক্ত স্বাধীন অবস্থা বুঝায়। অন্য সকল প্রকার স্বাধীনতার মূলে জাতীয় স্বাধীনতা। জাতীয় স্বাধীনতা না থাকিলে, অন্য প্রকার স্বাধীনতা থাকাও সম্ভব নহে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty)—বলিতে অন্ন-বস্ত্রের অভাব হইতে মুক্তি বুঝায়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপযুক্ত কাজ দিতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবের তাড়না হইতে মুক্তি দিতে হইবে। অভাব ও বেকার সমস্যার হাত হইতে মুক্তি না পাইলে স্বাধীনতা নিরর্থক হইয়া পড়ে। সর্ব্বত্র এই দিকে বর্ত্তমান রাষ্ট্রনায়কগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। আমাদের ভারতীয় ডোমিনিয়নের নূতন শাসনতন্ত্রের খসড়ায় ইহাকে রাষ্ট্র পরিচালনার একটা মূলনীতি ধরা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যাহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রাষ্ট্র কর্ত্তৃত্ব ও স্বাধীনতা
(State and Liberty)

একদিক দিয়া দেখিলে অবশ্য মনে হইতে পারে, রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব মানেই ব্যক্তি-স্বাধীনতার সঙ্কোচ। রাষ্ট্র মানুষের কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিয়া আইন প্রণয়ন করে; কোন্ কোন্ কার্য্য করা যাইবে, এবং কোন্ কোন্ কার্য্য করা যাইবে না, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। অতএব, রাষ্ট্র এবং আইন থাকিবার ফলে মানুষের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইতেছে। কিন্তু এইরূপ বিচার ভ্রমাত্মক। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে স্বাধীনতা বলিতে বাধা-বন্ধনহীন যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার ক্ষমতা বুঝায় না। রাষ্ট্রহীন যুগে, যখন আইন বা রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব বলিয়া কিছু ছিল না, তখন প্রকৃত স্বাধীনতা বলিয়াও কিছু ছিল না। তখন ছিল 'জোর যার মুলুক তার', এই গায়ের জোরের নীতি। প্রবল ব্যক্তি দুর্ব্বলের উপর জুলুম করিত, অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করিবার কেহ ছিল না। কাহারও অধিকার বলিয়া কিছু ছিল না। যখন ক্রমশঃ রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল, তখনই রাষ্ট্র-কর্ত্তৃত্বের অধীনে মানুষের অধিকার জন্মলাভ করিল। রাষ্ট্র কর্ত্তৃত্বের অধীনেই মানুষ প্রথম স্বাধীনতার আস্বাদ পাইল। রাষ্ট্র-কর্ত্তৃত্ব বিবিধ আইন করিয়া মানুষের উপর অনেক বিধি-নিষেধ আরোপ করে। কিন্তু ইহার দ্বারা মানুষের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা হয় না; এবং সকলে যাহাতে প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা হয়। রাষ্ট্র সর্ব্বসাধারণের কল্যাণসাধন করিবার জন্য গঠিত এক সঙ্ঘবিশেষ। রাষ্ট্রকর্তৃপক্ষ নানারকম আইন করিয়া প্রত্যেকের অধিকার ও স্বাধীনতার গণ্ডী বিস্তৃত করে। কাহারও অধিকার ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে না। যাহাতে সকলে নিজ নিজ বৃত্তির বিকাশলাভ করিতে পারে এবং সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পূর্ণ সুযোগ লাভ করিতে পারে, তাহার জন্যই রাষ্ট্র

বিবিধ আইন করিয়া সকলের কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করে এবং সকলকে বিনা বাধায় নির্দ্দিষ্ট অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ দান করে।

অতএব বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্র আছে বলিয়াই মানুষের স্বাধীনতা আছে। রাষ্ট্রই প্রত্যেককে নিজ নিজ অধিকার দিয়াছে এবং অপরে সেই অধিকার ভোগের স্বাধীনতা যাহাতে ক্ষুণ্ণ না করে, তাহার জন্য আইন-কানুন করিয়াছে। আইনের দ্বারাই মানুষের অধিকার নির্দ্দিষ্ট হয়, আইন প্রয়োগের দ্বারাই মানুষের অধিকার অপরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা হয়। আইন এবং স্বাধীনতা পরস্পরের পরিপূরক, পরস্পর-বিরোধী নহে। রাষ্ট্র না থাকিলে, আইন না থাকিলে, স্বাধীনতা বলিয়াও কিছু থাকিত না, মানুষের অধিকার বলিয়াও কিছু থাকিত না। আইনের ফলে মানুষের অধিকার স্থির হইয়াছে, মানুষ স্বচ্ছন্দে নিজ নিজ অধিকার ভোগ করিতেছে। রাষ্ট্র আইন করিয়া এই ব্যবস্থা করে, যাহাতে সকলে সমান অধিকার ও সুযোগ পাইয়া নিজেদের শক্তির শ্রেষ্ঠ স্ফুরণ করিতে পারে।

স্বাধীনতার রক্ষা-কবচ
(Safeguards of Liberty)

রাষ্ট্র না থাকিলে মানুষ নিজ অধিকার ভোগের স্বাধীনতা পাইতে পারে না। সকলে যাহাতে নিজ নিজ অধিকার নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতে পারে, তজ্জন্য রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের আইন আবশ্যক হয়। কিন্তু সকল রাষ্ট্রই যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবে, তাহারও মানে নাই। যে রাষ্ট্র একনায়কত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, অথবা যেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থসাধনের জন্য রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, সেখানে স্বাধীনতা থাকিতে পারে না। যেখানে সর্ব্বসাধারণের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র পরিচালিত না হয়, সেখানে স্বাধীনতা ও অধিকার প্রতিষ্ঠাও সম্ভব নয়। সুতরাং একমাত্র গণ-তন্ত্রসম্মত রাষ্ট্রেই স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। তবু যে কোনও রাষ্ট্রের ন্যায় গণতন্ত্রসম্মত রাষ্ট্রেও, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালন ভার ত কয়েকজন মানুষের হাতেই থাকিবে। ক্ষমতা পরিচালকগণ হয়ত ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে পারে এবং নাগরিকের প্রকৃত স্বাধীনতা ও অধিকারের সঙ্কোচসাধন করিতে পারে, এই ভয় রহিয়াছে। এই ভয় নিবারণের জন্য স্বাধীনতার রক্ষা-কবচের কথা আলোচনা হওয়া দরকার।

শাসন বিভাগ হইতে বিচার-বিভাগের পৃথকীকরণ স্বাধীনতার একটি রক্ষা-কবচ বলিয়া অনেকে বলেন। বাস্তবিক, বিচার বিভাগ যদি শাসন বিভাগের

সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে, যদি বিচারকগণের কার্য্যকাল শাসন বিভাগ অথবা আইন বিভাগের উপর নির্ভর করে, তবে বিচারকগণ স্বাধীন মনোভাব লইয়া বিচার করিতে পারিবেন না এবং শাসন বিভাগের অন্যায় হস্তক্ষেপ হইতে নাগরিকগণের অধিকার রক্ষা করিতে পারিবেন না। বিচারকগণ যাহাতে নির্ভীক ভাবে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন তজ্জন্য বিচার বিভাগকে অন্যান্য বিভাগের প্রভাবমুক্ত রাখিতে হইবে।

নাগরিকদের অধিকারের একটি লিখিত তালিকা অনেক গঠনতন্ত্রে সন্নিবেশিত হইয়া থাকে। ইহা স্বাধীনতার রক্ষাকবচ রূপে গণ্য হইয়া থাকে। গঠনতন্ত্র কর্ত্তৃক এই অধিকারগুলি সুস্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে এবং কেহ যাহাতে এই সব অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে না পারে তাহার বিধান থাকে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের গঠনতন্ত্রে নাগরিক অধিকার-সমূহের তালিকা সন্নিবেশিত আছে। ভারতীয় ডোমিনিয়নের নব-রচিত গঠন-তন্ত্রে মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। এই অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হইলে আদালতের সাহায্যে প্রতিকার লাভের বিধান রহিয়াছে।

অনেক দেশে এই রকম বিধান থাকে যে, আইনের চোখে সকলেই সমান। উচ্চতম রাজকর্ম্মচারী অথবা শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি এবং দীনতম ব্যক্তি উভয়ের জন্য একই আইন-কানুন, আইনের দৃষ্টিতে কাহারও কোন বিশেষ সুবিধা পাইবার উপায় নাই। যে দেশে এইরূপ আইনের রাজত্ব (Rule of Law) রহিয়াছে, সেখানে স্বাধীনতার মস্ত রক্ষাকবচ রহিয়াছে বলা যায়।

স্বাধীনতার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হইতেছে জনসাধারণের মনোভাব ও স্বাধীনতা-স্পৃহা। জনসাধারণ যদি নিজ নিজ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিয়া সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত থাকে, নিজেদের অধিকারভোগে কেহ অন্যায় হস্তক্ষেপ করিলে তাহাকে বাধা দিতে এবং বাধা দিয়া ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত থাকে, তাহা হইলেই সেখানে স্বাধীনতা ও অধিকার বজায় থাকে। নাগ-রিকগণকে সদা জাগ্রত দৃষ্টি লইয়া নিজেদের অধিকার রক্ষা করিতে হইবে। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) যথার্থই বলিয়াছেন,"সদা সতর্ক দৃষ্টিই স্বাধীনতার মূল্য।"

সাম্য
(Equality)

সাম্যের আদর্শের উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। গঠনতন্ত্রে নাগরিকগণ যাহাতে সাম্যের অধিকার ভোগ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কিন্তু এই সাম্য কি ? সাম্যের অর্থ এই নহে যে, সকলকে একই ছাঁচে গড়িয়া উঠিতে হইবে ; ইহার অর্থ এই নহে যে, সকলের একই রকম ক্ষমতা রহিয়াছে, অথবা মানুষে মানুষে কোন দিক দিয়া কোনও প্রভেদ নাই। প্রকৃতপক্ষে সকলে সমান ক্ষমতাসম্পন্ন নহে, মানুষে মানুষে ক্ষমতার পার্থক্য রহিয়াছে। মানুষের মধ্যে বিভিন্ন গুণ ও বিভিন্ন শক্তির বিচিত্র বিকাশ দেখা যায়। তাহাছাড়া মানুষের মধ্যে রুচির প্রভেদ ত অনেক রকম রহিয়াছে। কিন্তু মানুষে মানুষে ক্ষমতার পার্থক্য স্বাভাবিক বলিয়া সমাজে যে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বৈষম্য দেখিতে পাই, তাহা অধিকাংশই অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম। একজন বিরাট ধন-সম্পত্তির মালিক, আর একজন দীনহীন দরিদ্র। একজন অর্থ ও পদ-মর্য্যাদার জোরে সকল রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করে, আর একজন অর্থ ও মর্য্যাদার অভাবে সকল রকম সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত, ইহা একান্ত অস্বাভাবিক এবং কখনও সমর্থনযোগ্য নহে। এই প্রকার বিভেদ দূর করাই সাম্যের আদর্শ। সাম্য বলিতে বুঝায়, কেহ কোনও প্রকার বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে না। রাষ্ট্রের সকল নাগরিক জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সমান পৌর ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিবে। আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান বলিয়া গণ্য হইবে। প্রত্যেকে যাহাতে তাহার ক্ষমতা সমূহের শ্রেষ্ঠ বিকাশ করিতে পারে, তাহার পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। ইহাই হইল সাম্যের আদর্শ। ইহার মানে এই নয় যে, সকলকে একই রকম ব্যবস্থার মধ্যে একই ভাবে থাকিতে হইবে। ইহার নিহিত অর্থ হইতেছে এই যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ গুণ ও বৃত্তিসমূহ বিকশিত করিয়া পূর্ণতা প্রাপ্তির উপযুক্ত সুযোগ পাইবে এবং বংশ বা অনুরূপ বিচার করিয়া কাহাকেও বিশেষ বা আলাদা সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইবে না।

সাম্যের এই আদর্শের সহিত স্বাধীনতার আদর্শের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা সম্ভব নহে, আবার স্বাধীনতা ব্যতীত সাম্য সম্ভব নহে।

স্বাধীনতা যেরূপ পাঁচ প্রকারের আছে, সাম্যও সেইরূপ পাঁচ প্রকারের আছে। যথা,—প্রাকৃতিক সাম্য (Natural Equality), পৌর সাম্য (Civil Equality), রাজনৈতিক সাম্য (Political Equality), সামাজিক সাম্য (Social Equality) এবং অর্থনৈতিক সাম্য (Economic Equality)।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাজনৈতিক দল বা পার্টি

(Party)

বর্ত্তমানে সকল রাষ্ট্রেই একাধিক পার্টি বা রাজনৈতিক দল রহিয়াছে। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে সকলেই একমতাবলম্বী হইতে পারে না। এই সব বিষয় সম্পর্কে সমমতাবলম্বিগণ মিলিত হইয়া দল বা পার্টি গঠন করে এবং তাহাদের নীতি এবং কার্য্যক্রম যাহাতে সফল হয় তাহার জন্য তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়। পার্টি গঠনের উদ্দেশ্য এই যে, তাহাদের নিজেদের ধারণা অনুযায়ী জাতীয় স্বার্থ যাহাতে সিদ্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা করা ; শুধু পার্টির নিজস্ব পৃথক কোনও স্বার্থ সিদ্ধি করা কোনও সুস্থ পার্টির উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। পার্টি তাহার কার্য্যতালিকা ও তাহাদের নীতি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে এবং জনসাধারণের সাহায্য ও আনুকূল্য লাভ করিবার চেষ্টা করে। পার্টিসমূহ নির্ব্বাচন সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া আইন সভায় আসন দখল করিবার ও জয়ী হইয়া গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবার চেষ্টা করে।

পার্টির কার্য্য

(Activities of a Party)

পার্টির প্রথম কার্য্য হইতেছে দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে নীতি সুনির্দ্দিষ্টরূপে স্থির করা। দেশের বিভিন্ন সমস্যা কিভাবে সমাধান হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে প্রথমেই পার্টিকে তাহাদের মতামত স্পষ্ট ভাবে স্থির করিতে হইবে। তাহার পরই, পার্টির কাজ হইতেছে নানা উপায়ে পার্টির নীতি দেশের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা। সংবাদ-পত্র, জনসভা, পুস্তক-প্রকাশ প্রভৃতির মধ্য দিয়া পার্টি তাহার মতামত জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করে। এইভাবে পার্টির নীতি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে এবং সমর্থকের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। এই প্রচার কার্য্যের ফলে আবার জনসাধারণের বিবিধ রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ হয় এবং রাষ্ট্রের উপকার সাধিত হয়। আইন সভায় প্রার্থী দাঁড় করানো ও নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করাও পার্টির কাজ। প্রত্যেক নির্ব্বাচনের আগে পার্টি ভাবিয়া-চিন্তিয়া প্রার্থী মনোনীত করিয়া নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। তাহার পর নানারূপ

প্রচারের দ্বারা নিজ প্রার্থীদের পক্ষে ভোট সংগ্রহ করে। নির্ব্বাচনের পর যদি দেখা যায় যে কোনও পার্টি আইন সভায় সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, তবে সেই পার্টির নেতাগণ গভর্ণমেণ্ট পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। যে পার্টি নির্ব্বাচনে অল্প সংখ্যক আসন মাত্র দখল করে, সে পার্টি আইন সভায় বিরোধী দল হিসাবে কার্য্য করে। আইন সভায় বিভিন্ন পার্টির প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর সহিত যোগাযোগ রাখেন এবং দেশের অভাব অভিযোগের কথা শাসন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন।

পার্টি গভর্ণমেণ্টের পক্ষে যুক্তি
(Arguments for a Party Government)

পার্টি না থাকিলে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না। গণতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে হইলে পার্টি অপরিহার্য্য। পার্টি থাকে বলিয়া, নির্ব্বাচন সঙ্ঘবদ্ধভাবে পরিচালিত হয়, নির্ব্বাচক-মণ্ডলী দেশের বিভিন্ন সমস্যাগুলি সুস্পষ্টভাবে বিবেচনা করিবার সুযোগ পায়। পার্টি সমূহ প্রত্যেকে কতকগুলি করিয়া গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেশের সম্মুখে উপস্থিত করে এবং নিজ নিজ বিশেষ সমাধানের প্রস্তাব করিয়া দেশবাসীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে। দেশবাসীও পার্টি সমূহের বিভিন্ন প্রচারের মারফত বিবিধ সমস্যার পরিচয় লাভ করে এবং বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা করিতে শিক্ষা লাভ করে। পার্টিতে পার্টিতে সঙ্ঘর্ষ সময় সময় হয়ত বিশ্রী-রূপ ধারণ করে, তবু, এই দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া দেশবাসী রাজনীতি ও অন্যান্য বহু বিষয়ক শিক্ষাও লাভ করে। পার্টি সমূহ যে সব জনসভার আয়োজন করে বা যে সব প্রচার-পত্র প্রকাশ করে, সেগুলির ফলে জনসাধারণের রাষ্ট্রিক কর্ত্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি পায়, রাষ্ট্রীয় কার্য্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য হয়।

সঙ্ঘবদ্ধ পার্টি না থাকিলে গভর্ণমেণ্ট দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। আইন সভার সদস্যগণ যদি যে যাহার ইচ্ছা মত ভোট দিতে থাকেন, পার্টির শৃঙ্খলা বলিয়া যদি কিছু না থাকে, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট পরিচালন অসম্ভব হইয়া উঠিবে। গভর্ণমেণ্ট যদি কোনও নীতি প্রবর্ত্তন করিতে চান, আইনসভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন ব্যতীত তাহা সফল হইতে পারে না। সঙ্ঘবদ্ধ পার্টি না থাকিলে, গভর্ণমেণ্ট বা মন্ত্রিবর্গ জানিতেই পারিবেন না যে তাহারা অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন পাইবেন বা পাইবেন না। সংখ্যাগরিষ্ঠ সুসংবদ্ধ পার্টি সমর্থক থাকিলে তখনই গভর্ণমেণ্ট উদ্যমসহকারে বিবিধ দেশহিতকর কার্য্যে হাত দিতে পারেন।

লাস্কি বলিয়াছেন যে দেশের মধ্যে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে পার্টিই হইতেছে

সবচেয়ে দৃঢ় প্রতিবন্ধক। সুসংবদ্ধ পার্টি থাকিলে, গভর্ণমেণ্ট কোনও অন্যায় করিতে পারেন না, কেহ কোনও ভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যদিও শাসনভার গ্রহণ করে, তবু সংখ্যালঘু বিরোধী দলের মতামত বিবেচনা করিয়া এবং দেশের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়। কারণ, কোনও ভুল ত্রুটি হইলেই বিরোধী দল তাহার সুযোগ গ্রহণ করিবে এবং পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে বিরোধী দল জয়লাভ করিবে, এই আশঙ্কা সর্ব্বদা থাকার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কখনও অন্যায় ও জবরদস্তিমূলক শাসন কার্য্য করিতে পারে না।

পার্টি গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে যুক্তি

(Arguments against a Party Government)

ইহার ফলে পার্টির প্রতি আনুগত্য দেশের প্রতি কর্ত্তব্য অপেক্ষা বড় হইয়া দেখা দেয়। দেশের স্বার্থ ভুলিয়া লোকে পার্টির স্বার্থকে বড় করিয়া দেখে। ইহাতে দলাদলি ও তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। লোকের মন সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। মানুষ কোনও সমস্যাকে দেশের ভাল-মন্দের দিক হইতে বিচার না করিয়া পার্টির ক্ষুদ্র স্বার্থের দিক হইতে বিচার করিয়া দেখে। যে-কোনও প্রকারে নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে নিজের পার্টির জয়লাভকেই একমাত্র লক্ষ্য মনে করা হয়। ভোট পাইবার লোভে পার্টিসমূহ এমন সব কার্য্য-তালিকা সমর্থন করে, যাহা দেশের পক্ষে হিতকর বা একেবারেই সম্ভব হউক বা না হউক, লোকের সহজে মনোহরণ করে। ফলে শেষ পর্য্যন্ত দেশের স্বার্থহানি হয়। যে পার্টি সংখ্যাধিক্যের জোরে গভর্ণমেণ্ট গঠন করে, সেই পার্টির নেতাগণ নিজেদের দলভুক্ত ব্যক্তি অথবা পার্টির সমর্থক ব্যক্তিদের উপর সরকারী সাহায্য, সম্মান প্রভৃতি দান করিয়া বশীভূত রাখে। নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখিবার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টি বিবিধ দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। এই ব্যবস্থার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নিজেদের মধ্য হইতেই লোক বাছিয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করে। সুতরাং অনেক যোগ্য ব্যক্তি, শুধু অপর দলভুক্ত বলিয়াই মন্ত্রী হইতে পারে না। কাজেই গভর্ণমেণ্টের যোগ্যতা হ্রাস পায়। যে পার্টি বা পার্টিসমূহ নির্ব্বাচনে সর্ব্বাধিক সংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে অক্ষম হয়, সেই পার্টি অনবরত সংখ্যাগরিষ্ঠ গভর্ণমেণ্ট-গঠনকারী পার্টির ছিদ্রান্বেষণ করিতে থাকে এবং সর্ব্বপ্রকার উপায়ে সরকারী কার্য্যে বাধা সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহাতে সাধারণের স্বার্থহানি ঘটিয়া থাকে। আর একটি বড় অভিযোগ এই যে, পার্টিভুক্ত সদস্যগণের ব্যক্তিত্ব বলিয়া কিছুই থাকে না। পার্টির

নির্দ্দেশের কাছে প্রত্যেককে নিজ ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিতে হয়। পার্টির নির্দ্দেশ বিনা প্রতিবাদে প্রত্যেককে মানিয়া লইতে হয়। নিজেদের স্বাধীন চিন্তা বা কার্য্য করার অধিকার সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিতে হয়। পার্টির নির্দ্দেশ অন্ধভাবে মানিতে অস্বীকার করিলে পার্টি হইতে বিতাড়িত হইতে হয়। পার্টি নিজ অস্তিত্ব ও প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অপ্রিয় সত্য চাপিয়া রাখিয়া মিথ্যা প্রচারের আশ্রয় গ্রহণ করে। বিশেষতঃ পার্টির নেতৃত্ব যখন কু-চক্রী লোকদের হস্তগত হয়, তখন পার্টি জনকয়েক লোকের স্বার্থসাধনের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়, দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া হয়।

পার্টি-প্রথার এতগুলি দোষ দেখিয়া অনেকে হতাশ হইয়া পার্টি প্রথার অবসান কামনা করেন। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধ পার্টি না থাকিলে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু পরিচালন সম্ভব নহে। তবে, পার্টির দোষ-ত্রুটিগুলিও উপেক্ষা করিবার বিষয় নহে, এগুলি দূর না করিতে পারিলে গণতন্ত্রই বিফল হইয়া পড়িবে। নাগরিকগণ যদি সদা সতর্ক দৃষ্টি লইয়া তাঁহাদের অধিকারসমূহ রক্ষা করিতে যত্নবান হন, অন্যায়কারী দল বা দলপতিকে যদি তাঁহারা দৃঢ় প্রতিরোধ করিতে প্রস্তুত থাকেন, তাহা হইলে পার্টি প্রথার দোষ-ত্রুটি ক্রমশঃ বিদূরিত হইবে। জাগ্রত জনমতই হইল পার্টি প্রথার বিশুদ্ধতার একমাত্র উপায়। নাগরিকগণ যদি রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হন এবং যাঁহারা দেশের স্বার্থকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দেন, সেইরূপ ত্যাগী ও অকৃত্রিম নেতাগণকেই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিতে প্রস্তুত থাকেন এবং যাহারা দেশের স্বার্থ অপেক্ষা পার্টির স্বার্থ বড় করিয়া দেখে, তাহাদের স্বরূপ বুঝিয়া প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হন, তবেই পার্টি-প্রথা ত্রুটিশূন্য হইবে এবং গণতন্ত্র জয়লাভ করিবে।

দেশে দুইটী মাত্র পার্টি, না বহু পার্টি থাকা উচিত?

(Two-Party System or Multiple Party System)

ইংলণ্ডে বহু দিন হইতে দুইটি প্রধান পার্টি রহিয়াছে। বর্ত্তমানেও ইংলণ্ডে প্রধানতঃ দুইটি পার্টি মাত্র আছে, যথা,—রক্ষণশীল দল (Conservative Party) এবং শ্রমিক দল (Labour Party); উদারনৈতিক দল (Liberal Party) নামমাত্র রহিয়াছে বলিয়া ইহার কথা বাদ দেওয়া যায়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রেও দুইটি পার্টি রহিয়াছে। যথা—ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (Democralic Party), এবং রিপাবলিক্যান পার্টি (Republican Party)। কিন্তু ফ্রান্সে অনেকগুলি পার্টি বিদ্যমান।

ভারতবর্ষে কংগ্রেস যদিও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী পার্টি, তাহা হইলেও অন্য বহু পার্টির অস্তিত্ব রহিয়াছে।

দুইটি মাত্র পার্টি থাকিলে, Parliamentary Government পরিচালনা বিশেষ সহজ হয়। দেশবাসীর কাছে দুইটি মাত্র পার্টি নির্ব্বাচন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, প্রত্যেক সমস্যার দুই দিক দিয়া আলোচনা করা হয়, দেশবাসীর সম্মুখে নির্ব্বাচন সমস্যা খুব জটিল ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে একটি দল সংখ্যাধিক্য লাভ করে, অন্যদল অল্পসংখ্যক আসন লাভ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া দেশের শাসনভার গ্রহণ করে। সংখ্যালঘিষ্ঠ দল বিরোধী দল হিসাবে আইন সভায় কার্য্য করে। মন্ত্রিসভা সংখ্যাগরিষ্ঠদলের সুনিশ্চিত সমর্থন লাভ করিয়া নির্ব্বাচনকালে প্রতিশ্রুত কার্য্যক্রম নিশ্চিন্ত মনে অনুসরণ করিতে পারে। ফলে, স্থায়ী সরকার গঠন করা সম্ভব হয়। মন্ত্রী সভার পতন সহজে হয় না।

দুইটি মাত্র পার্টি থাকার বিরুদ্ধে বলিবার কথা এই যে, ইহার ফলে জনমতের বিবিধ দিক প্রকাশিত হইতে পারে না। এক একটি সমস্যা বহু দিক হইতে আলোচনা করা চলে, এক একটি সমস্যার বহু রকম সমাধানের প্রস্তাব করা যায়। দুইটি মাত্র পার্টি থাকিলে ইহা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, দুইটি মাত্র পার্টি থাকিলে মন্ত্রী-সভার একাধিপত্য (Cabinet Dictatorship) প্রতিষ্ঠিত হয়, মন্ত্রী সভাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠে। মন্ত্রিসভা সংখ্যাগরিষ্ঠদলের সমর্থন লাভ করিয়া সমস্ত ক্ষমতা আয়ত্ত করিয়া ফেলে এবং যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। মন্ত্রিসভার সমর্থক-গণ, পাছে বিরোধী দল ক্ষমতায় আসীন হয়, এই ভয়ে কিছু বলিতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত ইহাতে আইন সভারই মর্য্যাদা নষ্ট হয়।

এইসব কারণে অনেক লেখক বহু পার্টি থাকার সমর্থন করেন। তাঁহারা বলেন, বহু পার্টি থাকিলে জনসাধারণ আইন সভায় বিভিন্ন মতের প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে; সুতরাং আইন সভায় জনমতের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হইবে। তাছাড়া, বহু পার্টি থাকার ফলে, দেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের জুলুম হইতে রক্ষা পাইবে। কারণ অনেকগুলি দল থাকার জন্য কোনও দলই আইন সভায় অন্য-নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারিবে না, কাজেই সাধারণতঃ দুই বা ততোধিক দলের মিলিত মন্ত্রিসভা (Coalition Government) গঠিত হইবে। এইরূপ মন্ত্রিসভা সকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে বাধ্য হইবে এবং দেশের অথবা সংখ্যালঘু দলের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া শাসন করিতে সাহসী হইবে না।

কিন্তু বহু পার্টি থাকার দোষও অনেক। বহু পার্টি থাকিলে ভোটদাতার

পক্ষে প্রার্থী স্থির করা দুরূহ হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, বহু পার্টি থাকার ফলে যে মিলিত মন্ত্রিসভা (Coalition Ministry) গঠন করিতে বাধ্য হইতে হয়, তাহা স্বভাবতই দুর্ব্বল হইয়া থাকে। অনেক সময় সাধারণ সমস্যাসমূহ সম্পর্কে মন্ত্রী-সভার বিভিন্ন দলগুলি কোনও সাধারণ নীতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, কারণ প্রত্যেক দলের আবার নিজস্ব বিভিন্ন মতামত আছে। মন্ত্রিসভা আইন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থন পাইবে, ইহার নিশ্চয়তা থাকে না। মন্ত্রিসভা নিশ্চিন্ত ভাবে কোনও কার্য্যক্রম অনুসরণ করিতে পারে না। মন্ত্রিসভা নানা বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্ঘাতে প্রায়ই ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে নূতন নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইতে থাকে। ইহাতে দেশের সুশাসন এবং কল্যাণকর কার্য্যতালিকা অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। রাজনীতির মধ্যে বহু কূটনীতি—এমন কি দুর্নীতির খেলাও চলিতে থাকে। তখন রাজনীতি অতি নিম্নস্তরের জিনিষ হইয়া পড়ে।

বহু পার্টি থাকিলে যেসব গুরুতর দোষ-ত্রুটি সুস্পষ্ট ভাবে আত্মপ্রকাশ করে, এবং দেশের স্বার্থহানি করে, তাহার জন্য অধিকাংশ লেখক বহু পার্টির বিরুদ্ধে এবং দেশে দুইটি মাত্র পার্টি রাখিবার পক্ষে দৃঢ় মত প্রকাশ করিয়াছেন।

জনমত
(Public Opinion)

গণতন্ত্র জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং জনমত অনুসারে পরিচালিত হয়। এখন, এই জনমত কি? সকলে ত কোনও বিষয়ে একটি মাত্র মত পোষণ করে না; সকল বিষয়েই মানুষের ভিন্ন ভিন্ন মত রহিয়াছে। প্রত্যেকটি বিষয়ে বিভিন্ন দলের বিরুদ্ধ মতামত রহিয়াছে। জনমত বলিতে সকলের একটি বিশেষ মত বুঝায় না। সমাজের শক্তিশালী প্রবল অংশ যে মত পোষণ করে, তাহাকে অনেক সময় জনমত বলা যায়। যত বেশী সংখ্যক লোক কোনও মত পোষণ করে, সেই মত তত বেশী জনমত-সম্মত বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

সমাজের মধ্যে সকলেই যে বিভিন্ন সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া, বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া কোনও বিষয়ে মত পোষণ করে তাহা নহে। সাধারণতঃ জনকয়েক উৎসাহী কর্ম্মঠ ও চিন্তাশীল ব্যক্তি সমস্যাগুলির সমাধান সম্পর্কে গবেষণা করিয়া মতামত স্থির করে এবং তাহা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়া জনপ্রিয় করিয়া তুলে। এইভাবে একটি মত যখন অধিক সংখ্যক লোক পোষণ করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহা জনমত বলিয়া গণ্য হয়। তাই বলিয়া, সংখ্যাগরিষ্ঠদল যদি কেবল নিজ

স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনও মত পোষণ করে, অপরাপর লোকের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত না হয়, তবে তাহাকেও প্রকৃত জনমত বলা চলে না। সর্ব্বসাধারণের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যখন কোনও মত পোষণ করে, তখন তাহাকে প্রকৃত জনমত বলা চলে।

জনমত গঠন ও প্রকাশের বিভিন্ন উপায়

নিম্নলিখিত উপায়ে জনমত গঠন ও প্রকাশ করা হইয়া থাকে, যথা,— জনসভা, সংবাদপত্র ও পুস্তক প্রকাশ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পার্টি গঠন, রেডিও, সিনেমা ও আইন সভা।

জনসভায় বিভিন্ন দল বিভিন্ন সমস্যার নানাদিক আলোচনা করে। ইহার দ্বারা জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষালাভ হয়, রাজনৈতিক চেতনা বিস্তার লাভ করে এবং বিভিন্ন বিষয়ে জনমত গঠিত হয়।

জনমত গঠনে সংবাদপত্রের গুরুত্ব সমধিক। সংবাদপত্রসমূহ বিভিন্ন বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন করে ; ইহার ফলে জনসাধারণ বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মত গঠন করিতে পারে। তাছাড়া সংবাদপত্রসমূহে বিভিন্ন দলের মত প্রকাশ ও প্রচার করে, আবার নিজেরাও বিশেষ বিশেষ মত প্রকাশ ও প্রচার করে। সংবাদপত্র বর্ত্তমান সভ্য-জীবনের প্রায় অপরিহার্য্য অঙ্গ। জনমত গঠনে ইহার প্রভাব অপরিসীম। নানাবিধ পুস্তক রচনা দ্বারাও জনমত প্রকাশ ও গঠন করা যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ জনমত গঠনে বিশেষ সহায়ক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিদ্যার্থিগণ বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে ভাবিতে এবং নিজেদের মতামত গঠন করিতে শিক্ষা লাভ করে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব মানুষের পরিণত জীবনে অতিশয় অধিক এবং ইহা বিশেষভাবে মতামত সৃষ্টি করিতে সাহায্য করে।

দেশের বিভিন্ন পার্টি বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট জনসভা, পুস্তক ও সংবাদপত্র প্রভৃতি মারফৎ নিজেদের বক্তব্য সম্পর্কে প্রচারকার্য্য চালাইয়া থাকে। ইহার ফলে জনসাধারণ বিভিন্ন সমস্যার সহিত পরিচয় লাভ করে এবং বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করিতে শিক্ষা করে। রাষ্ট্রের কার্য্যে দেশবাসীর কৌতূহল জাগ্রত হয়, তাহারা বিভিন্ন বিষয়ের সমস্যা সম্পর্কে জানিবার ও বুঝিবার আগ্রহ বোধ করে এবং নিজেদের মতামত গঠন করিতে আরম্ভ করে।

রেডিও ও সিনেমা মারফৎ নানা কথা দেশবাসীর গোচরীভূত হয়। ইহাদের মারফৎ অতি সহজে জনসাধারণের নিকট নানা বিষয়ে প্রচারকার্য্য চালানো হয়। এই দুইটিকে জনমত গঠনের জন্য অতি শক্তিশালী যন্ত্র বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

আইন-সভায় জনসাধারণের বিভিন্ন মতামত প্রতিফলিত হয়। আবার আইন-সভার আলোচনার দ্বারাও জনসাধারণ অনেক বিষয় জানিতে পারে এবং এইভাবে জনমত গঠিত হয়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

জাতি ও জাতীয়তাবাদ

(Nation and Nationalism)

জাতির সংজ্ঞা দেওয়া বড় কঠিন। জাতি গঠনের উপাদান কি, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। আদর্শ জাতির সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়া হয়,—স্বাভাবিক ভৌগলিক সীমার দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশ হইতে পৃথকীকৃত এক নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসিবৃন্দ যদি একই প্রবংশ (race) হইতে উদ্ভূত হয়, একই ভাষাভাষী হয়, একই সাধারণ সভ্যতার অধিকারী হয়, সাধারণ প্রথাসমূহ পালন করে, সাধারণ চারিত্রিক বিশেষত্বযুক্ত হয় এবং সাধারণ সাহিত্য ও ঐতিহ্যের অধিকারী হয়, তাহা হইলে তাহারা এক জাতি, একথা বলা যায়।

উপরে যে সকল উপাদানের কথা বলা হইল, তাহার মধ্যে সমস্তগুলি অথবা কোন কোনটিও জাতি গঠনের পক্ষে অপরিহার্য্য কিনা, এবং উহাদের মধ্যে কোন্‌টির কি গুরুত্ব সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। প্রথমতঃ ভৌগলিক ঐক্য জাতি গঠনের পক্ষে আবশ্যক, একথা বলা হইয়া থাকে। কতকগুলি লোক একই ভৌগলিক সীমার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করিলে, তাহাদের মধ্যে এক জাতীয়তা-বোধ জন্মলাভ করে। ভৌগলিক ঐক্য জাতি গঠনের পক্ষে সহায়ক, একথা অস্বীকার করা যায় না। ভৌগলিক ঐক্যবিশিষ্ট নির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসীরা সহজে এক জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। পাকিস্তান সহ ভারতবর্ষের মিলিত অধিবাসিবৃন্দ কৃত্রিম দেশ বিভাগ সত্ত্বেও ভৌগলিক ঐক্যের কথা এবং তজ্জনিত একজাতীয় সত্তার কথা ভুলিতে পারে না। ভৌগলিক ঐক্য অবশ্যই জাতি গঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং ইহা জাতিকে তাহার পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন করিয়া রাখে। কিন্তু ভৌগলিক ঐক্যও জাতি গঠনে অপরিহার্য্য নহে।

ইহুদি সম্প্রদায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে। সম্প্রতি তাহারা প্যালেষ্টাইনকে তাহাদের নিজস্ব রাষ্ট্র বলিয়া দাবী করিতেছে। ইহার আগে বহু দিন হইতে তাহাদের নিজস্ব কোনও বাসভূমি না থাকিলেও তাহারা একটি পৃথক জাতি বলিয়া পরিগণিত হইত।

জাতি একই প্রবংশ (race) হইতে উদ্ভূত, একথা বলা হয়। একই প্রবংশ উদ্ভূত লোকজন নিশ্চয়ই পারস্পরিক ঐক্য অনুভব করিবে, এবং এই ঐক্য-অনুভূতি

তাহাদিগকে এক জাতি হিসাবে গড়িয়া তুলিবে। এই কথার সত্যতা স্বীকার করিয়াও বলা যায় যে, জাতি গঠনের পক্ষে সাধারণ প্রবংশ অবশ্য প্রয়োজনীয় নহে। প্রথমতঃ, পৃথিবীর প্রবংশসমূহ মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে, কোনও জাতির লোক বলিতে পারে না যে, তাহারা কোনও বিশেষ একটি প্রবংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক জাতি বিভিন্ন প্রবংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা কয়েকটি বিভিন্ন প্রবংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা প্রবল ঐক্যবোধ-সম্পন্ন এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। সুইজারল্যাণ্ড, কানাডা প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরাও বিভিন্ন প্রবংশ হইতে উদ্ভূত হইলেও, তাহাদের প্রবল জাতিগত ঐক্যবোধ এই কথাই প্রমাণিত করে যে, প্রবংশ কখনও জাতির ভিত্তি হইতে পারে না।

একই ভাষাভাষী এবং একই সাহিত্যের অধিকারী লোকজন সহজেই জাতীয় ঐক্য অনুভব করে। অতএব সাধারণ ভাষা ও সাহিত্য জাতির প্রধান ভিত্তি-স্বরূপ বলা হয়। কিন্তু বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসমষ্টিও জাতিরূপে পরিগণিত হইতেছে, এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কানাডার অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে ইংরাজী ও ফরাসী, এই দুই ভাষাভাষী লোক আছে। ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও কানাডীয় জাতি গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপভাবে সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি ভাষাভাষীর লোক থাকিলেও, এক সুইস জাতি গড়িয়া উঠিতে বাধা হয় নাই। কাজেই এক জাতি হইতে হইলে একই ভাষা ও একই সাহিত্য থাকা চাই-ই, এমন কথা ঠিক নহে।

সাধারণ ঐতিহ্য ও প্রথাসমূহ জনসমষ্টিকে এক জাতি হিসাবে গড়িয়া তুলে, একথা বলা হয়। একই ইতিহাসের ধারায় যখন জীবন গড়িয়া উঠে, লোকে যখন একই ঐতিহ্যের অধিকারী হিসাবে গর্ব্ব অনুভব করে, সকলেই একই রকম প্রথা পালন করে, তখন সহজে জাতীয় ঐক্যবোধ প্রবল হয় এবং সকলে এক জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠে। কিন্তু ঐতিহ্য ও প্রথাসমূহ এক রকম না হইলে যে জাতি গঠিত হইতে পারে না, একথাও বলা যায় না। বিভিন্ন প্রথা এবং ঐতিহ্যের অধিকারী জনসমষ্টিও এক জাতিতে পরিগণিত হইতে পারে।

ধর্ম্ম জাতি-গঠনের প্রধান ভিত্তিস্বরূপ, একথা এক সময় বিশেষ জোরের সহিত বলা হইত। সম-ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে সহজে ঐক্যবোধ জন্মে, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শুধু ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়া কোথাও জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে না। ধর্ম্মই জাতির ভিত্তিস্বরূপ, এই মধ্যযুগীয় মতবাদ মুস্লিম লীগ সম্প্রতি প্রচার করিয়া এই কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের

পার্থক্য হেতু তাহারা দুই পৃথক জাতি। এই মত সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক থাকা স্বত্বেও বিভিন্ন দেশে এক একটি জাতি গড়িয়া উঠিতে বাধা হয় নাই। একই জাতির মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক রহিয়াছে। আবার, একই ধর্ম্মাবলম্বী লোক বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে। চীন দেশে বৌদ্ধ, ইসলাম প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক রহিয়াছে, কিন্তু তৎসত্বেও মহান চৈনিক জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে।

অতএব, জাতি গঠনের যেসব উপাদানের কথা বলা হয়, তাহার সবগুলি অথবা যে কোনও একটি বা কয়েকটি না থাকিলে যে জাতি হইতে পারে না, এমন কথা বলা যায় না এবং জাতি গঠনে ঐ জিনিষগুলির কোনও একটির গুরুত্ব অন্যগুলি অপেক্ষা বেশী, এমন কথাও বলা যায় না। অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে, যদি কোনও জনসমষ্টির মধ্যে উল্লিখিত জিনিষগুলি বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে জাতীয় মনোভাব সৃষ্টি সহজেই হইতে পারে। ঐ সমস্ত উপাদানগুলির একটি বা দুইটি থাকিলেও জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে, কিন্তু ঐগুলির অভাব্ সত্বেও জাতীয় মনোভাব সৃষ্টি হইতে পারে এবং জাতি গঠিত হইতে পারে। আজকাল রাজনীতিবিদ্দিগের মত এই যে, প্রবংশ, ধর্ম্ম, বাসভূমি, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতির ঐক্য হইতেই যে জাতির উদ্ভব হয়, তাহা নহে, বরং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি স্বার্থ ও আদর্শগত ঐক্য হইতেই জাতি গড়িয়া উঠিতে পারে। জাতীয় বোধ একটা মানসিক অনুভূতির ব্যাপার ; ভাষা, ধর্ম্ম প্রভৃতির অনৈক্য সত্বেও এক জনসমষ্টি জাতি হিসাবে পরিগণিত হইতে পারে। এই ঐক্যবোধ নানা কারণেই জন্মিতে পারে। একই ইতিহাসের পথে জীবন গড়িয়া উঠিবার জন্য, একটি ঐতিহ্য বা সভ্যতার অধিকারী হইবার জন্য, একই প্রবংশ উদ্ভূত বলিয়া, একই রকম দুঃখ-কষ্ট অভাব-নিপীড়ন ভোগ করিবার জন্য, একই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য বা আদর্শে উপনীত হইবার জন্য—জনসমষ্টি যখন নিজদিগকে অন্যান্য সকল হইতে পৃথক বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করে, নিজেদের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগরিত হইয়া সকলকে একতার সূত্রে গাঁথিয়া তুলে, তখনই জাতি গঠনের সূত্রপাত হয়। যতই দিন যায়, ততই একতার সূত্র দৃঢ় হইতে থাকে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় সম সুখ-দুঃখ ও সম-স্বার্থের টানে পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া জাতি গড়িয়া তুলে।

রাষ্ট্র ও জাতির মধ্যে পার্থক্য

(Difference between a State and a Nation)

রাষ্ট্র (state) ও জাতি (nation) সাধারণতঃ সম-অর্থবোধক শব্দ বলিয়া

মনে করা হয়। অনেক সময়, কথাবার্ত্তার মধ্যে মার্কিণ জাতি বলিতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংরাজ জাতি বলিতে গ্রেট ব্রিটেনের রাষ্ট্র, এই কথা বুঝিয়া থাকি। যখন জাতি-সঙ্ঘ (League of Nations) ছিল, ইহা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র-সঙ্ঘ এই অর্থে ব্যবহার করা হইত। বর্ত্তমানেও জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান (United Nations Organisasion) বলিতে আসলে কতকগুলি রাষ্ট্রের মিলিত প্রতিষ্ঠানকেই বুঝায়। অর্থাৎ রাষ্ট্র ও জাতি একই অর্থে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। কিন্তু রাষ্ট্র ও জাতি এই দুইটি কথার মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। রাষ্ট্র ও জাতি উভয় শব্দ দ্বারাই জনসমষ্টি বুঝায় বটে, কিন্তু রাষ্ট্রের যে প্রধান বিশেষত্ব, সার্ব্বভৌমত্ব (Sovereignty), তাহা জাতির থাকিতে হইবে, এমন কথা নাই। রাষ্ট্র বলিতে মুখ্যতঃ এক জনসমষ্টির রাজনৈতিক সংগঠনের কথা বুঝায়, কিন্তু জাতি বলিতে এক জনসমষ্টির কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঐক্যবোধক চিহ্ন সূচিত হয়। জাতি হইল আত্মগত (subjective) জিনিষ, মানসিক অনুভূতির বিষয়, আর রাষ্ট্র হইল বিষয়গত (objective) জিনিষ। রাষ্ট্র বলিতে এক সুনির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ডের কথা মনে পড়ে, জাতি বলিতে কোনও সুনির্দ্দিষ্ট ভূখণ্ড সূচিত হয় না। জাতি পৃথিবীর চারিদিকে ছড়াইয়া থাকিতে পারে। এক একটি জাতি লইয়াই যে রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, তাহা নহে। অনেক রাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক জাতি থাকিতে পারে এবং একই জাতি কতিপয় রাষ্ট্রে ছড়াইয়া বাস করিতে পারে।

২ ভারতীয়গণ কি এক জাতি?
(Are Indians one Nation ?)

বহুদিন হইতেই একদল পাশ্চাত্য লেখক অক্লান্তভাবে প্রচার করিয়া আসিয়াছেন যে, ভারতীয়গণ কখনও এক জাতি নহে, তাহারা বহু জাতির সমষ্টি। এই অপপ্রচার সত্ত্বেও ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় ভাব প্রতিদিন প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়াছে এবং ভারতীয়গণ এক মহান জাতিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকগণের ভেদ-বিভেদের উস্কানিপ্রসূত সাম্প্রদায়িক কলহ, ব্রিটিশ-শক্তি-পুষ্ট একদল মুশ্লিম রাজনৈতিকের কার্য্যকলাপ, মুশ্লিম লীগ প্রচারিত সর্ব্বনাশা দুই জাতি তথ্য (two-nation theory) এবং পরিশেষে, ভারত-বিভাগ ভারতীয়দিগের মধ্যে জাতীয়তা-বোধ অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। এ সকল সত্ত্বেও ভারতীয়গণকে এক জাতি বলিতে পারা যায়। অবশ্য জাতির ঐক্যসূচক বাহ্যিক চিহ্নগুলির কথা বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অনেকগুলিই বর্ত্তমান নাই। প্রথমতঃ, ভারতবর্ষে বহু প্রবংশ,

বহু ধর্ম্ম, বহু সম্প্রদায়, বহু ভাষা ও বহু সাহিত্য বিগুমান। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় দুই শত ভাষাভাষী, অসংখ্য প্রবংশ-উদ্ভূত বিভিন্ন সংস্কৃতিসম্পন্ন নরনারী বাস করে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন প্রথার প্রচলন দেখা যায়। এইসব পার্থক্য দেখাইয়া অনেক লেখক বলিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষে এক জাতি নহে, বহু জাতির বাস। ইহার উপর মুস্লিম লীগ দুই জাতি-তত্ত্ব প্রচার করিয়া দাবী করিয়া বসিল, মুসলমানগণ ধর্ম্মের ভিত্তিতে একটি পৃথক জাতি।

কিন্তু এই পার্থক্যগুলি সহজে চোখে পড়িলেও এইগুলির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা ঠিক নহে। অনুরূপ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ও সুইজারল্যাণ্ডে জাতি গড়িয়া উঠিতে বাধা হয় নাই। এইসব বাহ্যিক পার্থক্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র এক অন্তর্নিহিত মূল ঐক্যের সূত্র রহিয়াছে। ভারতীয়গণ সর্ব্বত্র একই ঐতিহ্যের অধিকারী। বহু শতাব্দী ভৌগলিক ঐক্যের মধ্যে অবস্থান করিয়া, একই সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া, একই আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া, একই রাষ্ট্রীয় শাসনের মধ্যে বাস করিয়া এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের সংগ্রামের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া, ভারতীয়গণ একই জাতিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। বহুকাল পাশাপাশি বাস করিয়া একই ভাগ্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া ভারতবাসীদের মধ্যে এক জাতীয়তাবোধ জন্মলাভ করিয়াছে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায় মোটামুটি একই প্রকার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অধিকারী। পূর্ব্বে সংস্কৃত ও ফারসী ভাষা এবং বর্ত্তমানে হিন্দী, উর্দ্দূ ও ইংরাজী ভাষার মারফৎ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের যোগসূত্র স্থাপিত করিয়াছে। ধর্ম্মের বিভিন্নতা আছে বলিয়া ভারতীয়গণ এক জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা পুরাতন অনগ্রসর যুগের প্রতিক্রিয়াশীল রাজ-নীতির বুলি আবৃত্তি করেন। ধর্ম্মের বিভিন্নতা পৃথিবীতে কোনও জাতি গঠনের অন্তরায় সৃষ্টি করে নাই। ভারতবর্ষেও শুধু ধর্ম্মের বিভিন্নতার উপর বিভিন্ন জাতি গড়িয়া উঠিবে না। ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জাতীয় জীবনের কলঙ্কস্বরূপ ; কিন্তু ইহা স্থায়ী জিনিষ নহে। কৃত্রিম অবস্থার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সৃষ্টি করা হইয়াছে। হিন্দু-মুসলমান বহু শতাব্দী ধরিয়া পাশাপাশি ভ্রাতৃভাবে ভারতবর্ষে বাস করার ফলে ধর্ম্মের বিভিন্নতা অতিক্রম করিয়া এক জাতীয়তার ক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছে। মুস্লিম লীগের ভারত বিভাগের দাবী, দুই জাতি-তত্ত্ব ও শেষ পর্য্যন্ত ভারত বিভাগ, সমগ্র ভারতবর্ষের একজাতীয়তার মূলে প্রচণ্ড আঘাত হানিলেও, একজাতীয়তার সূত্র একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। মুসলমান শুধু মুসলমান বলিয়াই ভারতীয় জাতি না হইয়া পৃথক জাতিতে পরিগণিত হইবে, একথা মনে করা ভুল।

তেমনি ভারত বিভাগের ফলে কেহ পাকিস্তানের মধ্যে পড়িয়া পাকিস্তানের নাগরিক হইলেও যে তাহার ভারতীয় জাতীয়তা চলিয়া গেল, তাহা মনে করাও ঠিক নহে। ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান—উভয় দেশের অধিবাসীরা ভৌগলিক ঐক্য ও অতীত ইতিহাসের স্মৃতি সহজে মুছিয়া ফেলিয়া পৃথক পৃথক জাতিতে পরিগণিত হইবে না। ✓2

জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার
(The Right of Self-determination of Nations)

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলিতে বুঝায় যে, প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ রুচি, আশা-আকাঙ্ক্ষা বা আদর্শ অনুযায়ী নিজেদের শাসনকার্য্য চালাইতে পারিবে, এবং তজ্জন্য পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবে। এক একটি জাতি লইয়া এক একটি রাষ্ট্র গঠিত হইবে। বহু জাতি-সমন্বিত রাষ্ট্র থাকিবে না। যদি একটি রাষ্ট্রে দুই বা ততোধিক জাতি থাকে, এবং তাহারা পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে নিজেদের শাসনকার্য্য চালাইতে চায়, তবে তাহাদিগকে সেই অধিকার দিতে হইবে।

জন ষ্টুয়ার্ট মিল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের একজন বড় সমর্থক ছিলেন। তিনি বলিতেন যে, সকলে যাহাতে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, এই জন্য সরকারের শাসন অধিকারের সীমা এবং জাতির সীমা একই হওয়া উচিত। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসন (Wilson) তাঁহার চৌদ্দ-দফা সর্ত্তের মধ্যে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারলাভও ধরিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে এই আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি বিশেষভাবে জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় কতকগুলি বৃহৎ রাষ্ট্র ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছিল।

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের নীতির পক্ষে একথা বলা যায় যে, ইহা গণ-তান্ত্রিক নীতিসম্মত। কারণ শাসিত প্রজাবৃন্দই সরকার গঠন করিবে, ইহার দ্বারা এই নীতি মানিয়া লওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, বহু জাতিবিশিষ্ট রাষ্ট্রে সাধারণতঃ বহু ভাষা প্রচলিত থাকিবে এবং তাহাদের মধ্যে পার্থক্যের প্রাচীর উঁচু হইয়া মিলনের পথে বাধা জন্মাইবে ; এই সকল কারণে ঐরূপ দেশে দৃঢ় জনমত গড়িয়া উঠিতে পারিবে না। জনমত গঠিত না হইলে, গণতন্ত্র বিফল হইবে। তাহা ছাড়া বহুজাতি সমন্বিত রাষ্ট্রে, জাতিতে জাতিতে অনবরত বিবাদ ও সজ্ঘর্ষের মধ্য দিয়া পারস্পরিক অনৈক্য প্রকাশ পাইবে। এক একটি জাতি লইয়া পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠিত হইলে এইসব বিবাদ ও সজ্ঘর্ষ এড়ানো যাইবে এবং প্রত্যেক জাতি স্ব স্ব শক্তি ও আদর্শ অনুযায়ী নিশ্চিন্ত মনে উন্নতিমূলক কাজে আত্মনিয়োগ

করিতে পারিবে। এসব ছাড়াও, আত্মনিয়ন্ত্রণ লাভের অধিকার-নীতি স্বীকার করিলে পৃথিবীর বহু পরাধীন, শোষিত ও নিপীড়িত জাতি মুক্তিলাভ করিয়া নিজেদের পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবে।

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণলাভের নীতির বিরুদ্ধেও বলিবার কথা অনেক আছে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল নিজেই এই নীতির প্রয়োগের পথে কয়েকটি বিঘ্ন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ভৌগলিক কারণে এই নীতির প্রয়োগ বাস্তবক্ষেত্রে সর্ব্বত্র সম্ভব না হইতে পারে। বিভিন্ন জাতিগুলি আবার এমনভাবে বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া মিশিয়া রহিয়াছে যে, তাহাদিগকে পৃথক করিয়া আলাদা আলাদা রাষ্ট্রে সংগঠিত করা অনেক স্থলে অসম্ভব। তাহা ছাড়া, অন্যান্য বিষয় নিরপেক্ষভাবে সর্ব্বদা প্রযোজ্য নহে। কোনও জাতিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিলে যদি সমগ্র রাষ্ট্রের বিপদসম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে এই নীতি মানা চলিতে পারে না। মিল যে বলিয়াছিলেন, বহু জাতিবিশিষ্ট রাষ্ট্রে জনমত গড়িয়া উঠিতে পারে না, একথা সত্য নহে। এসব কথা ছাড়াও, রাষ্ট্রে যদি বহু জাতি বিদ্যমান থাকে, বিভিন্ন জাতির লোকের ঘনিষ্ঠ মেলামেশার ফলে সকলের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা। বুদ্ধি ও সংস্কৃতিতে উন্নত জাতিদের সাহচর্য্যে অনুন্নত জাতিগুলির পরম উপকার হইবে। লর্ড এ্যাক্টন্ (Lord Acton) এই সম্পর্কে যথার্থ ই বলিয়াছেন যে, সমাজে বিভিন্ন লোকের সমবায় সভ্যতার পক্ষে যেরূপ আবশ্যক, রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির সমবায়ও সভ্যতার পক্ষে সেইরূপ আবশ্যক। আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভের নীতি মানিতে হইলে অনেকগুলি বর্ত্তমান রাষ্ট্রকে ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইতে পারে। তাহার ফলে আন্তর্জ্জাতিক জটিলতা বৃদ্ধি পাইবে। জাতিতে জাতিতে রেষারেষি বৃদ্ধির ফলে জগতের শান্তি বিপন্ন হইবে। সুতরাং একমাত্র পৃথক জাতীয়তার ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের নীতি সমর্থনীয় নহে। আক্রমণশীল জাতীয়তা (chauvinism-aggressive nationalism) বিশ্ব-শান্তির বিঘ্নস্বরূপ, একথা সকলেই স্বীকার করেন। বহু জাতিসমন্বিত রাষ্ট্রসমূহের সাফল্য আজ ক্ষুদ্র জাতীয়তার ভিত্তিতে রচিত রাষ্ট্রের প্রতিকূল মনোভাব সৃষ্টি করিয়াছে। সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ আশাজনক না হইলেও বিশ্ব-রাষ্ট্র বা বহু জাতি ও বহু রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্র গঠনের কথা তাই আজ আর স্বপ্নবিলাসীর অলস কল্পনামাত্র নহে।

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তা
(Nationalism and Internationalism)

প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতে জাতীয়তার যুগ আরম্ভ হইয়াছে। স্বায়ত্ত-

শাসন ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবোধ মানুষকে উন্নত করিয়াছে, উদার করিয়াছে, গণতন্ত্রের পথে পরিচালিত করিয়াছে। মিল প্রমুখ মনীষিগণের প্রচেষ্টায় জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি রাজনীতিতে ক্রমশঃ প্রবল শক্তিরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। নির্য্যাতিত পরাধীন জাতিগুলি মুক্তিলাভের চেষ্টায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক জাতি তাহার নিজ অভিপ্রায় অনুযায়ী পৃথক সরকার ও রাষ্ট্র গঠন করিবে, এই দাবী ক্রমশঃ প্রবল হইয়াছে। ইহারই ফলে কতকগুলি বহু-জাতি-বিশিষ্ট রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া একজাতীয়তার ভিত্তিতে ছোট ছোট রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষেও জাতীয়তাবোধের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে স্বায়ত্ত-শাসন লাভের দাবীতে রাজনৈতিক সংগ্রাম ক্রমশঃ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রনীতিতে জাতীয়তা একটি বিশিষ্ট আদর্শরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। ইহারই ফলে বহুস্থানে একনায়কত্বের অবসান এবং গণতন্ত্রের অভ্যুত্থান সম্ভব হইয়াছে।

সুতরাং, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে জাতীয়তার আদর্শ এক মহান আদর্শ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। জাতীয়তার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় স্বাধীনতা না হইলে জাতীয় উন্নতি বিধান সম্ভব নহে। মানব-সভ্যতার বিকাশের জন্যই প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া তাহাদের পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে দিতে হইবে। নতুবা, জাতিগুলি স্বকীয় বিশেষ গুণাবলী, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন করিতে পারিবে না। প্রত্যেক জাতির নিজের নিজের স্বতন্ত্র পথে উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা করিলে তবেই সমস্ত পৃথিবীর উন্নতি হইবে।

কিন্তু জাতীয়তা যদি বিকৃত, সঙ্কীর্ণ, স্বার্থ-বুদ্ধি-প্রণোদিত এবং আক্রমণাত্মক হয়, তাহা হইলে তাহা বিশ্বের কল্যাণের পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠে। বিকৃত জাতীয়তাবোধ নিজ জাতির প্রতি ভালবাসা মাত্র না হইয়া অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে (jingoism) পরিণত হয়। আক্রমণাত্মক জাতীয়তার ফলে, শক্তিশালী জাতি দুর্ব্বল জাতিসমূহকে গ্রাস করিয়া জাতীয় গর্ব্ব প্রচার করে। স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত জাতীয়তাই সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। বড় বড় শক্তিশালী জাতিগুলি নিজেদের উৎপন্ন মাল বিক্রয়ের জন্য বাজার এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য আবাস-ভূমি খুঁজিতে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে এবং পররাজ্য গ্রাস করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। শ্রমশিল্প-বিস্তার এবং জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির সহিত, জাতীয়তা সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হইয়াছে। এই অস্বাভাবিক বিদ্বেষমূলক জাতীয়তা-বোধের জন্যই, জার্ম্মাণী, ইটালী, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্র পররাজ্য গ্রাস করিতে দ্বিধা করে নাই। এইরূপ জাতীয়তাবোধের জন্যই প্রত্যেক জাতীয় রাষ্ট্র অতি বৃহৎ

সামরিক বাহিনী ও রণসম্ভার সংগ্রহ করিয়া থাকে, এবং সর্ব্বত্র সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা প্রচারের ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, যে-কোনও সময়ে সামান্য ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া সমরানল জ্বলিয়া উঠে। বিগত দুই মহা-সমর পর পর সমস্ত পৃথিবীকে অসংখ্য লোকের শোণিত ধারায় সিক্ত করিয়া এই শিক্ষাই দিয়াছে যে, এই বর্ব্বর জাতীয় বিদ্বেষের অবসান না হইলে মানব-সভ্যতাই ধ্বংস পাইবে। প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিশালী জাতিদের আক্রমণাত্মক নীতি ও স্বার্থের সঙ্ঘর্ষের জন্যই এই দুই মহাসমর ঘটিয়াছে। আজ রণক্লান্ত পৃথিবীতে তাই সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার বিরুদ্ধে মতবাদ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আজ জাতীয়তাবোধ পৃথিবীর সভ্যতার পক্ষে বিপদস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

ক্রমেই জাতীয়তা অপেক্ষা আন্তর্জ্জাতীয়তার পক্ষেই মত প্রবল হইতেছে। আদর্শ হিসাবে অবশ্য আন্তর্জ্জাতীয়তা জাতীয়তা অপেক্ষা মহত্তর আদর্শ। নিজের জাতির ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য জীবন ব্যয় না করিয়া মানবজাতির কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করা অবশ্যই বৃহৎ আদর্শ। বর্ত্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত ও যোগাযোগের ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আন্তর্জ্জাতীয়তার আদর্শ ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হইতেছে। সমস্ত জাতি যাহাতে পরস্পর সহযোগিতার দ্বারা সভ্যতার উন্নতি করে, পৃথিবীর জনমত আজ তাহাই চাহিতেছে। জাতীয় রাষ্ট্র-গুলির তাহাদের পূর্ব্বকালের ভীতি, ঘৃণা, ঈর্ষা ও প্রতিহিংসার ভাব এবং দুর্ব্বল জাতির শোষণ ত্যাগ করিয়া, পরস্পরের প্রতিযোগিতা ত্যাগ করিয়া সহযোগিতা করাই উচিত। জঙ্গী জাতীয়তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হইতেছে মহাসমর। সঙ্কীর্ণ জাতীয়তার পথ ত্যাগ করিয়া আজ আমাদিগকে উদার আন্তর্জ্জাতীয়তা এবং বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

আন্তর্জ্জাতীয়তার আদর্শ বলিতে কিন্তু একথা বুঝায় না যে, বর্ত্তমানে যে-সব জাতি পরাধীন আছে, সেই সব জাতি পরাধীন থাকিবে। পরাধীন জাতিগুলিকে মুক্তি দিতে হইবে, তাহাদের নিজেদের পথে জাতীয় বিকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। পৃথিবীর পরাধীন জাতিগুলি মুক্তি পাইলে এবং সেই সঙ্গে সবল জাতি-গুলির উগ্র ও সঙ্কীর্ণ জাতীয়তা দমন করা হইলে, জাতীয়তা আন্তর্জ্জাতীয়তার সোপানস্বরূপ হইবে; জাতীয়তার সহিত আন্তর্জ্জাতীয়তার কোনও বিরোধ থাকিবে না। √3·

জাতি-সঙ্ঘ
(The League of Nations)

প্রথম বিশ্ব মহাসমরের অবসানে জাতি-সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল। উদ্দেশ্য ছিল

আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা এবং আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে কতকগুলি রাষ্ট্রের সঙ্ঘ হিসাবে জাতি-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েট রাশিয়া এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রথম হইতে ইহাতে যোগদান করে নাই। শেষের দিকে সোভিয়েট রাশিয়া যোগ দিলেও, জার্ম্মাণী, জাপান ও ইটালী জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ করে। ভারতবর্ষ প্রথম হইতে জাতি-সঙ্ঘের সভ্য তালিকাভুক্ত হইয়াছিল। খুব আড়ম্বরের সহিত জাতি-সঙ্ঘের সূচনা হইলেও, শেষ পর্য্যন্ত উহা ব্যর্থ হইয়াছে বলা চলে। জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুরিয়া এবং ইটালী কর্ত্তৃক আবিসিনিয়া গ্রাসের বিরুদ্ধে জাতি-সঙ্ঘ কোনও কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে নাই। আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ ব্যতীত জাতি সঙ্ঘের উল্লেখযোগ্য কোনও কীর্ত্তি-ও নাই।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান
(United Nations Organisation : UNO)

দ্বিতীয় মহাসমরের শেষভাগে ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট-ব্রিটেনের প্রতিনিধিবর্গ মিলিত হইয়া স্থির করেন যে, সম্মিলিতভাবে পৃথিবীর শান্তিরক্ষা ও উন্নতিবিধানের জন্য একটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবে। তদনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। সম্মিলিতভাবে যাহাতে বিশ্বশান্তি রক্ষা হয়, যাহাতে পৃথিবীর সম্পদ বৃদ্ধি হয়, সামাজিক উন্নতি হয় এবং চতুঃ-স্বাধীনতা (Four Freedoms) রক্ষিত হয়, সেদিকে প্রতিষ্ঠান লক্ষ্য দিবে। জাতিতে জাতিতে বিবাদ উপস্থিত হইলে, এই প্রতিষ্ঠান তদন্ত করিয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিষ্পত্তির চেষ্টা করিবে। যাহাতে শান্তিরক্ষা হয়, তাহার জন্য এই প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতে এবং শেষে প্রয়োজন হইলে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে।

জাতি-পুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের একটি সাধারণ পরিষদ (General Assembly) এবং একটি নিরাপত্তা সভা (Security Council) রহিয়াছে। একান্নটি জাতি সাধারণ পরিষদের সদস্য। যে-কোনও শান্তিপ্রিয় জাতি ইহার সদস্য হইতে পারে। নিরাপত্তা সভা (Security Council) পাঁচটি স্থায়ী সদস্য এবং ছয়টি অস্থায়ী সদস্য লইয়া গঠিত। গ্রেট-ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীন—এই পাঁচটি স্থায়ী সদস্য। ইহাদের যে-কোনও একজন সদস্য নিরাপত্ত

সভার সিদ্ধান্ত নাকচ (veto) করিবার অধিকারী। জাতিপুঞ্জে একটি আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সভা (Economic and Social Council) রহিয়াছে।

জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান যদি পূর্ব্ববর্ত্তী জাতিসঙ্ঘের মতোই কেবলমাত্র বিতর্ক-সভায় পর্য্যবসিত হয়, এবং বড় বড় শক্তিমান জাতিগুলি কর্ত্তৃক নিজ নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য পরিচালিত হয়, তবে উহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল হইবে, বলা যায়। জাতি-পুঞ্জের সাফল্যের উপর বিশ্ব-শান্তি ও পৃথিবীর উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন

(Local Self-Government)

বর্ত্তমানে সকল দেশেই সরকারের কাজের পরিমাণ বাড়িয়াছে এবং ইহা রোজই বাড়িতেছে, বলা চলে। কাজের সংখ্যাও যেমন বাড়িয়াছে, তাহা তেমন জটিল হইয়াও উঠিয়াছে। তাই একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক সমস্ত সরকারী কর্ত্তব্য ভালভাবে পালিত হওয়া সম্ভব নহে। এইজন্য সমগ্র দেশকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করিয়া একান্ত স্থানীয় বিষয়গুলি স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আমাদের দেশে জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ।

দেশকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া, স্থানীয় সমিতির উপর স্থানীয় বিষয়গুলি পরিচালনার ভার দেওয়াকে ভারতবর্ষে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন (Local Self-Government) বলা হয়। অন্যান্য দেশে ইহাকে স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা (Local Government) বলে। স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বা স্থানীয় শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে জনস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ, স্থানীয় রাস্তাঘাট, খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল নিবারণ, সংক্রামক রোগ নিবারণ প্রভৃতি বিষয়ের ভার দেওয়া হয়। এগুলিকে একান্তভাবে স্থানীয় ব্যাপার বলা চলে। এগুলির উন্নতি-অবনতির সহিত স্থানীয় জনসাধারণের ভাল-মন্দ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। যদি কোনও স্থানের পথ-ঘাট মেরামতের অভাবে অব্যবহার্য্য হয়, অথবা, কোনও স্থানে পানীয় জলের অভাব উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, প্রত্যক্ষভাবে সেই অঞ্চলের লোককে কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। এইরূপ স্থানীয় লোকের প্রত্যক্ষভাবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির ভার স্থানীয় শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের উপর দেওয়া হয়। এই সব স্থানীয় বিষয়গুলির সমস্যা সকল স্থানে একই রকম নহে। স্থানীয় বিষয়গুলির পরিচালনও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম ভাবে করা দরকার হইয়া থাকে। স্থানীয় লোকজনই স্থানীয় বিষয়গুলির সমস্যা সম্পর্কে সম্যকরূপে পরিচিত থাকিতে পারে। এই জন্য স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের দ্বারাই স্থানীয় বিষয়গুলির সুষ্ঠু পরিচালন করা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দেশ-রক্ষা, পররাষ্ট্র সম্পর্কিত ব্যবস্থা প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণের স্বার্থজড়িত বিষয়গুলি অথবা, রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ প্রভৃতি যে সব বিষয় একই নীতিতে পরিচালিত করা দরকার, এমন সব বিষয়ের ভার থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার

নিতান্ত স্থানীয় বিষয়গুলি পরিচালনের মূল নীতি স্থির করিয়া খুঁটি-নাটি ব্যবস্থার ভার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের হাতে ছাড়িয়া দিতে পারে।

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের উপকারিতা

(Advantages of Local Self-Government)

সর্ব্বত্রই সরকারের কাজের চাপ বাড়িয়া চলিয়াছে। নিতান্ত স্থানীয় পথ-ঘাট নির্ম্মাণ ও রক্ষা, পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়গুলিও যদি সরকারকে দেখাশুনা করিতে হয়, তাহা হইলে সরকারকে বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িতে হইবে, এবং গুরুত্বপূর্ণ অত্যাবশ্যক সরকারী কার্য্যগুলিতে যতটা মনোযোগ ও যত্ন দেওয়া প্রয়োজন, সরকার তাহা হয়ত দিতে পারিবে না। স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা থাকিলে এই সব স্থানীয় কাজের ভার হইতে সরকার মুক্তি পাইয়া অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কাজগুলিতে বেশী মনোযোগ দিতে পারে।

স্থানীয় লোকজনই স্থানীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন থাকে। দূরবর্ত্তী সরকারী কর্ম্মচারিগণ বিভিন্ন স্থানের বিশেষ বিশেষ স্থানীয় অভাব সম্পর্কে সম্যকরূপে পরিচিত হইতে পারে না। স্থানীয় লোকজনের উপর ভার থাকিলেই স্থানীয় বিষয়গুলির সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচালনা সম্ভব হয়। স্থানীয় বিষয়গুলির সমস্যা সকল জায়গায় এক রকমও নহে। কোথাও হয়ত পানীয় জলের অভাব, কোথাও হয়ত রাস্তাঘাটের অভাব; কোথাও পুষ্করিণী খুঁড়িয়া পানীয় জলের অভাব মিটাইবার ব্যবস্থা করা দরকার। বিভিন্ন অঞ্চলে আবার বিভিন্ন ধরণের পথঘাটেরও প্রয়োজন। সুতরাং, স্থানভেদে স্থানীয় সমস্যা-গুলির রূপ বিভিন্ন রকম। স্থানীয় লোকজনই নিজেদের বিশেষ বিশেষ অভাব-অভিযোগের কথা ভাল রূপে জানে; কি করিয়া এই সব অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করা যায়, তাহাও তাহারাই ভাল করিয়া বুঝে। এই জন্য স্থানীয় লোকজনের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর স্থানীয় বিষয়গুলির ভার দিলেই সেই সব বিষয়ের উত্তমরূপে পরিচালনা সম্ভব হয়।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রধান উপকারিতা এই যে, ইহার দ্বারা গণতন্ত্র সম্পর্কিত শিক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপে প্রচারিত হয়। সরকারী কার্য্য পরিচালনায় দেশের অধিকাংশ লোক কোনও অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। যাহারা সরকারী কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকারী হয়, তাহাদের সংখ্যা স্বভাবতঃই কম। বর্ত্তমানের প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে, সাধারণ নির্ব্বাচনের পর ভোটদাতা-গণের সরকারী কার্য্যে অংশ গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ করিবার কোনও অধিকার

থাকে না; সামান্য সংখ্যক প্রতিনিধিই সরকার পরিচালনা করিয়া থাকেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ফলে, বহুসংখ্যক লোক সরকারী কার্য্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে এবং শাসন-কার্য্যের রহস্য অবগত হইতে পারে। ইহার ফলে, লোকে জনসাধারণের কল্যাণকর কার্য্যে আর উদাসীন হইয়া থাকিতে পারে না, উৎসাহ সহকারে যোগদান করিতে শিখে। স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান থাকিবার ফলে, অনেক লোক গণতন্ত্র কিভাবে পরিচালিত করিতে হয়, তাহা শিক্ষা পায়। স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিয়া লোকে মিলিয়া-মিশিয়া সাধারণের স্বার্থযুক্ত কার্য্যগুলি করিতে শিখে। আইন-সভায় অথবা শাসন বিভাগে, উচ্চ-স্তরের রাজনীতি সংক্রান্ত কাজ কিভাবে করা যাইতে পারে, তাহার প্রাথমিক পাঠ এই সকল প্রতিষ্ঠানেই লাভ করা যায়। ছোট ছোট স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়া যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানলাভ হয়, তাহাই উচ্চতর রাজনীতিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতার কাজে লাগে। স্থানীয় ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়াই লোকজন উৎসাহ-উদ্দীপনা বেশী করিয়া অনুভব করে। স্থানীয় রাজনীতিতে যোগদান করিয়াই মানুষ উচ্চতর রাজনীতিতে যোগদান করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিয়া লোকে সকলের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ভুলিয়া কাজ করিতে শিখে। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের জন্য মানুষ নিজেদের স্থানীয় অভাব নিজেরাই পূরণ করিয়া লইতে পারে। ইহা মানুষকে স্বাবলম্বন ও দায়িত্ব-জ্ঞান শিক্ষা দেয়। মানুষ অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করিয়া দশজনের উপকারের জন্য কাজ করিতে শিক্ষা পায়। মানুষ আলস্য ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করিয়া, স্বার্থবুদ্ধির উপরে উঠিয়া জনসেবার উদ্দেশ্যে কাজ করিতে শিখে এবং পরিণামে রাষ্ট্রীয় কাজের বৃহৎ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে। এইভাবে স্বায়ত্তশাসন লোকজনের মধ্যে গণতন্ত্রের সফলতার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় গুণসমূহকে বিকাশ লাভে সাহায্য করে।

লর্ড ব্রাইস (Bryce) এইজন্য বলিয়াছেন যে, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনই গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়।

স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের সংগঠন
(Organisation of Local Bodies)

সরকার ও স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, উভয়ই জনগণের কল্যাণজনক কাজ করিবার যন্ত্রস্বরূপ। উভয়ের গঠনতন্ত্র মোটামুটি একই রকম। স্বায়ত্ত-

শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী আইন অনুসারে গঠিত হয় এবং সরকারী আইন দ্বারাই ইহাদের গঠনতন্ত্র ও ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমতঃ স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির এলাকা কম করিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক এলাকায় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে একটি সাধারণ পরিষদ এবং একটি করিয়া কার্য্যকরী সমিতি থাকে। এই সাধারণ পরিষদকে আইন-সভারই প্রতিকৃতি বলা যায়। ইহার সভ্যগণ স্থানীয় করদাতাগণ কর্ত্তৃক অথবা স্থানীয় প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকবৃন্দ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের হাতে প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচনের দ্বারা স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্য নির্ব্বাচনের ভার থাকাই শ্রেয়। করদানের যোগ্যতা বা শিক্ষার যোগ্যতার উপর অনেক সময় ভোট দিবার অধিকার নির্ভর করে। সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে কার্য্যকরী সমিতি স্থির করিয়া দেন। ইহারা ইহাদের কার্য্যের জন্য সাধারণ পরিষদের নিকট দায়ী থাকেন। সরকারের বেলায় যেমন, স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের বেলাতেও তেমন, প্রতিদিনের সাধারণ কার্য্য বেতনভোগী কর্ম্মচারীরাই পরিচালনা করিয়া থাকেন। ইহারা সভাপতি, সম্পাদক প্রভৃতির নির্দ্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন।

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট দফায় আয়ের সুযোগ দেওয়া হইয়া থাকে। সরকার হইতেও অনেক সময় অর্থ-সাহায্য করা হয়। ইহারা মোট প্রাপ্ত অর্থ দিয়া নির্দ্দিষ্ট কার্য্যগুলি সম্পন্ন করে। নিজেদের কার্য্যের এবং অধিকারের সীমার মধ্যে স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান-গুলি যতটা সম্ভব অধিক স্বাধীনতা ভোগ করে। তাই বলিয়া যে ইহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যাহা-ইচ্ছা-তাহা করিতে পারে, এমন নহে। সরকারী আইনের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে ইহাদিগকে কাজ করিতে হয়। কিভাবে ইহাদের কার্য্যগুলি ইহারা সম্পন্ন করিবে, তাহার মূলনীতি সরকার সর্ব্বসাধারণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া থাকেন। স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সরকারী তত্ত্বাবধানের কম-বেশী ব্যবস্থা সর্ব্বত্র থাকে। ইহারা ইহাদের অধিকারের নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে অথবা ইহাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য অবহেলা বা অক্ষমতা-বশতঃ পালন করিতে না পারিলে, সরকার কর্ত্তৃক শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা থাকে এবং ঘোরতর অপব্যবস্থা ঘটিলে সরকার স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করিয়া নিজ-হস্তে কর্ম্মভার লইবার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য সরকার এই সব প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। সরকার শুধু লক্ষ্য রাখেন, ইহাদের কর্ত্তব্য ঠিকমত পালিত হইতেছে কি না।

প্রশ্নাবলী

(Questions)

পৌর-বিজ্ঞান

(CIVICS)

প্রথম অধ্যায়

1. What do you mean by Civics? Describe the relationship between (*a*) Civics and Sociology, (*b*) Civics and Politics, (*c*) Civics and Economics, (*d*) Civics and History and (*e*) Civics and Ethics.

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র

(The State)

1. Define State. (C. U. 30, 33, 37, 45).
2. "A State is a people organised for law within a definite territory". Explain. (C. U. 27).
3. Discuss the essential characteristics of the State.
4. Distinguish between the State and the Government. (C. U. 30, 31, 34, 37, 45.)
5. Distinguish between the State and other types of social organisation.
6. What do you mean by the Sovereignty of the State?
7. Distinguish between (*a*) Titular and Actual Sovereignty and (b) Legal and Political Sovereignty.

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি

(The Origin of the State)

1. Discuss the theory of Divine Origin of the State.
2. Discuss critically the Social Contract Theory of the origin of the State. (C. U. 39.)

3. "The State is the result of brute force." Discuss the validity of this theory of the State. (C. U. 41.)

4. "Will, not force, is the basis of the State". Discuss.

5. "The State is the result of the subjugation of the weaker by the stronger". Do you accept this theory of the origin of the State. (C. U. 44.)

6. What, according to you, is the true theory of the origin of the State?

7. Describe the Historical or Evolutionary Theory of the origin of the State.

8. "The State is neither a divine institution nor a deliberate human contrivance, it has come into existence as the result of natural evolution." Discuss this statement and indicate the processes through which the State has come into existence. (C. U. 44.)

9. Explain the Organic or Organismic Theory of the State.

Organic Theory (or Organismic Theory) of the State.

[কিভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে এই Organic Theory সে কথা কিছু বলে না। Organic Theory শুধু এই কথাই বলে যে রাষ্ট্র প্রাণবন্ত জীবদেহের অনুরূপ একটা জিনিষ। রাষ্ট্র ও জীবদেহের পরস্পরের মধ্যে অনেক সাহায্য রহিয়াছে। জীবদেহ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সমষ্টি, রাষ্ট্রও সেইরূপ কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি। জীবদেহের প্রত্যেকটি কোষ আলাদা আলাদা কার্য্য সম্পন্ন করে এবং সকলে মিলিয়া সমস্ত জীবদেহের রক্ষা ও বৃদ্ধির সহায়তা করে। রাষ্ট্রভুক্ত মনুষ্যগণও বিভিন্ন কাজে থাকে, অথচ রাষ্ট্রদেহের পোষণ ও উন্নতির সহায়তা করে। জীবদেহের হাত, পা, মুখ, চোখ ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রহিয়াছে, অনুরূপভাবে, রাষ্ট্রেরও বিভিন্ন বিভাগ রহিয়াছে। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) এই মতবাদের একজন বড় সমর্থক ছিলেন। তিনি রাষ্ট্র ও জীবদেহের সমপ্রকৃতি দেখাইবার উদ্দেশ্যে বহু রকমের তুলনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে রাষ্ট্র ও জীবদেহের সূচনা হয় সামান্য বীজাণুর আকারে, তাহার পর ইহারা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উভয়েরই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গঠনের জটিলতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের মতে, জীবদেহে যেমন শিরা-উপশিরা আছে, রাষ্ট্রদেহে সেইরূপ যাতায়াতের ব্যবস্থা রহিয়াছে। মনুষ্য-দেহে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রণকারী স্নায়ু-ব্যবস্থা (Nervous system) আছে, সেইরূপ রাষ্ট্রদেহের বিভিন্ন অংশের নিয়ন্ত্রণকর্ত্তা রহিয়াছে গভর্ণমেণ্ট।

জীবদেহের বিভিন্ন অংশ পরস্পর নির্ভরশীল ; রাষ্ট্রের অন্তর্গত মনুষ্যকুলও পরস্পর নির্ভরশীল।

সমালোচনা—রাষ্ট্র ও জীবদেহের মধ্যে যে বহু সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সাদৃশ্য বেশী দূর টানিয়া লইয়া গেলে ইহা অবাস্তব হইয়া পড়ে। যদিও রাষ্ট্র কতকগুলি মানুষের সমষ্টি, তবু মনুষ্যগণ জীবদেহের কোষ-গুলির সহিত তুলনীয় নহে। কোনও একটি কোষকে জীবদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রাণহীন জড়বস্তু হইয়া পড়ে। কিন্তু মনুষ্য রাষ্ট্র-বহির্ভূত হইলে মারা যাইবে, এমন কথা নাই। জীবদেহের কোষগুলি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব-বিহীন যান্ত্রিক শক্তিচালিত জড় বস্তুর সহিত তুলনীয়। তাহাদের নিজস্ব ইচ্ছা বলিয়া কিছু নাই। তাহারা নিজেদের কার্য্যকলাপ নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব বুদ্ধি, পৃথক ইচ্ছা ও পৃথক প্রচেষ্টা আছে। নিজ চেষ্টার দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার নিজেই বলিয়াছিলেন যে, জীবদেহের কোষগুলি পরস্পর দৃঢ়-সম্বন্ধ-যুক্ত ; রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মনুষ্যগণ এরূপ দৃঢ়ভাবে পরস্পর-সংশ্লিষ্ট নহে। তাহা ছাড়া, জীবদেহের চেতনা কেবল তাহার মস্তিষ্কে কেন্দ্রীভূত ; কিন্তু রাষ্ট্রের চেতনা তাহার সর্ব্ব অংশে ছড়াইয়া আছে। সব চেয়ে বড় কথা এই যে, এই Organic Theory-র দ্বারা রাষ্ট্রের উৎপত্তিসূচক কোনও তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত মনুষ্যগণ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল সন্দেহ নাই ; কিন্তু Organic Theory-তে বুঝায় যে, রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব অসম্ভব, ইহাতে ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের জুলুম হইবার সম্ভাবনা। Organic Theory-র মূল্য এইটুকু যে, ইহাতে রাষ্ট্রভুক্ত ব্যক্তিগণের পরস্পর নির্ভরশীলতা এবং রাষ্ট্রের ঐকিকতার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে।]

চতুর্থ অধ্যায়

রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র

(Constitution)

1. What do you mean by the term, 'constitution' of a State? (C. U. 26, 45.)

2. Classify constitutions.

3. Distinguish between (*a*) rigid and flexible constitutions, and (*b*) written and unwritten constitutions. Illustrate by examples.

Discuss their merits and demerits. (C. U. 29, 39, 43, 44, 46.)

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যক্তিতন্ত্রবাদ বনাম সমাজতন্ত্রবাদ

(Individualism vs. Socialism)

1. Discuss the Individualistic or Laissez-faire Theory.
2. Discuss the theory of Individualism.
3. Discuss the Socialistic Theory.
4. Discuss the theory of Socialism.
5. Enunciate the functions of a modern Government.
6. Distinguish between essential and optional functions of the State.
7. Classify and enumerate the functions undertaken by a modern State.
8. "Not command but service is the prominent characteristic of the State". Discuss in the light of this statement the functions of the State. (C. U. 44.)
9. What is the proper sphere of the State?

ষষ্ঠ অধ্যায়

সরকারের শ্রেণী-বিভাগ

(Classification of Government)

1. Discuss briefly the different forms of Government and their respective merits and demerits. (C. U. 36.)
2. Give a satisfactory and useful classification of Government. (Dacca 43.)
3. Define Democracy. (C. U. 27.)
4. Discuss the merits and demerits of a democratic form of Government, (C. U. 37, 41.)
5. Point out the merits and demerits of a representative democracy. (C. U. 28.)
6. In what sense is it true to say that representative Government is the best form of Government? (C. U. 34.)
7. Distinguish between Direct and Indirect Democracy. What are the conditions for the success of a Democracy? (C. U. 45.)

8. Distinguish between Cabinet and Presidential forms of Government. Point out their merits and demerits. (C. U. 46.)

9. What are the aims and ideals of totalitarian State? How do they differ from democratic State? (C. U. 44.)

10. Carefully distinguish between Federal and Unitary forms of Government. (C. U. 40.)

11. What are the main features of a Federal Government? Discuss its merits and drawbacks. (C. U. 39, 42, 43.)

12. What do you understand by responsible Government? (C. U. 26.)

(**Hints** :—Cabinet government-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য। Cabinet government-কেই responsible government বা দায়িত্বশীল সরকার বলে। এইরূপ সরকার শাসন-বিভাগ ও আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে—দায়িত্বশীল কথাটির দ্বারা তাহাই বুঝায়। এইরূপ সরকারকে Parliamentary government-ও বলা হয়। সরকারের উপর Parliament বা দেশের আইন সভার প্রভাব বুঝাইবার জন্যই Parliamentary কথাটি ব্যবহৃত করা হয়।)

সপ্তম অধ্যায়

বিভিন্ন সরকারী কার্য্যের পৃথকীকরণ

(Separation of Powers)

1. Explain the theory of separation of powers. What are its limitations? (C. U. 46.)

2. State and criticize the theory of separation of powers. (C. U. 48.)

3. Indicate the advantages of separation of powers. (C.U. 26.)

4. What are the organs of Government and what are their respective functions? (C. U. 27, 41.)

5. "The strict separation of powers is not only impracticable as a working principle of Government, but it is one not to be desired in practice." Comment on this statement (C.U. 34.)

6. Is it desirable in the interests of political liberty to have an absolute separation of powers? (C. U. 41.)

অষ্টম অধ্যায়

আইন সভা, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ

(The Legislative, the Executive and the Judiciary)

1. Discuss the arguments for and against a bicameral legislature. (C. U. 41.)

2. What are the arguments for and against a unicameral legislature?

3. 'The function of the legislature is not merely the making of laws'. What are other functions does the legislature in a democratic country discharge? (C. U. 42, 47.)

4. What are the functions of the Executive and the Judiciary?

5. Write a note on the independence of the Judiciary.

নবম অধ্যায়

নাগরিকত্ব

(Citizenship)

1. What do you understand by citizenship? Distinguish between a citizen and an alien. (C. U. 30.)

2. Distinguish between a natural citizen and a naturalised citizen. (C. U. 31, 33.)

3. Describe the various methods for the acquisition of citizenship. (C. U. 38.)

4. What are the rights and privileges of an alien?

দশম অধ্যায়

নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্ব

(Rights and Duties of Citizens)

1. What do you understand by the term right? What are the different kinds of rights?

2. Describe the different civil and political rights of a citizen. (C. U. 27, 28, 31, 32, 34, 35, 37, 40, 48.)

3. "Rights imply duties."

4. 'Rights and duties go together'—Explain. (C. U. 32.)

5. 'Rights of a citizen have their corresponding duties.' Explain. (C. U. 30.)

6. Write notes on (*a*) freedom of speech and (*b*) freedom of the press and (*c*) freedom of association. (C. U. 32, 33.)

7. Write a short essay on the rights and duties of citizenship. (C. U. 37.)

8. What are the qualities of good citizenship?

[**Hints :**—নাগরিকদের সদ্‌গুণের উপরই গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) নাগরিকদের তিনটি অত্যাবশ্যক গুণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; যথা—বুদ্ধি, আত্মসংযম ও বিবেক (intelligence, self-control and conscienee)।

নাগরিকগণকে উপযুক্ত শিক্ষিত হইতে হইবে। তাহাদিগকে বুদ্ধি-বিবেচনা সহকারে দেশের সমস্যাসমূহের সমাধান বাহির করিতে হইবে। আর, কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে চাই আত্মসংযম। নাগরিককে নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও ব্যক্তিগত স্বার্থকে সমষ্টিগত স্বার্থের কাছে বলি দিতে হইবে। তাহাকে সর্ব্বদা ধীর-নম্রভাবে দেশের আইন মানিয়া চলিতে হইবে ; সর্ব্বদা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মত অনুযায়ী চলিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সহিত মত-পার্থক্য ঘটিলে, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করা চলিবে, কিন্তু দেশের আইন মানিয়া চলিতে হইবে।

নাগরিককে সর্ব্বদা বিবেক-বুদ্ধি সহকারে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। ঠিক ঠিক ভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে হইবে, করভার বহন করিতে হইবে, আইন-কানুন মানিতে হইবে, সকলের কল্যাণের জন্য ও রাষ্ট্রের হিতার্থে, নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।]

9. What are the hindrances to good citizenship?

[**Hints :**—নাগরিককে সৎ নাগরিক হইতে হইলে বুদ্ধিমান, আত্মসংযমী ও বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হইতে হইবে। তাহা ছাড়া, তাহাকে অলসতা পরিহার করিতে হইবে, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও দলগত মনোবৃত্তি ত্যাগ করিতে হইবে। নাগরিককে অলসতা ত্যাগ করিয়া তাহার কর্ত্তব্য করিতে হইবে। অনেক নাগরিক রাষ্ট্র ব্যাপারে মাথা ঘামাইতে চায় না। অনেকে নিজ নিজ বৃত্তি অনুসরণ বা জীবিকা অর্জ্জনে ব্যস্ত থাকে, কেহ বা সাহিত্য ও শিল্প প্রভৃতিতে অনুরক্ত হওয়ায় অন্য দিকে মনোযোগ দেয় না। অনেকের আবার রাষ্ট্র ব্যাপারে অংশ লইবার মত শিক্ষার অভাব, এইসব কারণে অনেকে রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা প্রদর্শন করে। রাষ্ট্রের মঙ্গলের পক্ষে ইহা ক্ষতিকর। আবার নাগরিকগণ যদি যে যাহার নিজ নিজ স্বার্থসাধনে ব্যস্ত থাকে, দেশের ও রাষ্ট্রের স্বার্থের কথা যদি

চিন্তা না করে, তাহা হইলে রাজনীতি নিম্নস্তরের জিনিষ হইয়া পড়িবে। এই অবস্থার সুযোগ লইয়া হীন ও অযোগ্য ব্যক্তিরা ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া পড়িবে। ইহা ছাড়া, নাগরিকগণকে ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থের ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে। নাগরিক যেন সঙ্কীর্ণ দলগত স্বার্থের মোহে পড়িয়া দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভুলিয়া না যায়।]

একাদশ অধ্যায়

আইন সভার নির্ব্বাচন
(Election to the Legislative)

1. What do you consider to be the true basis of franchise? (C. U. 26.)

2. Is education the sole qualification for citizenship or are other qualifications necessary? If so, what are they? (C. U. 30.)

3. What do you understand by universal adult suffrage? Examine the arguments for and against universal adult suffrage. (C. U. 33, 36, 47.)

4. 'Universal teaching must precede universal enfranchisement'. Discuss. (C. U. 36.)

5. What in your opinion should be the qualification for the exercise of the franchise? (C. U. 39.)

6. 'The introduction of separate electorates is impeding the growth of Indian nationalism.' Discuss. (C. U. 41.)

7. "Seperate electorates are not only bad for the nation, but bad for the minorities themselves." Discuss.

8. Discuss the soundness of the policy of maintaining separate electorates for the election of representatives to the Indian Legislature. (C. U. 43.)

9. Discuss the expedients that have been suggested for the representation of minorities in the legislature. (C. U. 44.)

10. What do you understand by open and secret voting? Discuss the arguments for and against open and secret voting.

11. State the arguments for and against the franchise of women.

দ্বাদশ অধ্যায়

আইন, স্বাধীনতা ও সাম্য
(Law, Liberty and Equality)

1. Define Law. (C. U. 31.)

2. Can liberty exist without law? (C. U. 37.)

3. 'Law is the condition of liberty.' Explain. (C. U. 32.)

4. In what sense is liberty a creation of the law? (C. U. 35.)

5. Is liberty inconsistent with authority? (C. U. 26.)

6. 'The recognition of political liberty is the indespensable condition of liberty.' Explain. (C. U. 29.)

7. 'Civil liberty arises from the State.' Explain. (C. U. 48.)

8. Distinguish between civil and political liberty.

9. What are the safeguards of liberty in a modern democratic State? (C. U. 44.)

10. What is the relation between liberty and equality?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাজনৈতিক দল বা পার্টি

(Party)

1. Describe the functions of political parties in a democracy. (C. U. 35.)

2. Describe the advantages and disadvantages of the party system. (C. U. 26, 32, 40, 42.)

3. Should there be the two-party system or multiple party system in a country?

4. What is meant by public opinion? (C. U. 29.)

5. What are the chief agencies that mould public opinion? (C. U. 34, 48.)

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

জাতি ও জাতীয়তাবাদ

(Nation and Nationalism)

1. Define nation. Do Indians constitute one nation?

2. What do you understand by the right of self-determination of nations?

3. "Nationalism is a highway to internationalism." Discuss.

পঞ্চদশ অধ্যায়

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন

(Local Self Government)

1. What do you understand by Local Self-Government?

2. Estimate the value of local bodies as agencies for the training of the people in the art of Self-Government. (C. U. 34.)

3. 'The first lessons of Self-Government should be learnt in local institutions.' Explain. (C. U. 36, 42.)

পৌর-বিজ্ঞানে ব্যবহৃত পরিভাষা

Aristocracy—অভিজাততন্ত্র

Autocracy—স্বৈরতন্ত্র

Ballot vote—গোপন বা ব্যালট ভোট

Cabinet—মন্ত্রিমণ্ডল

Cabinet Government—মন্ত্রিমণ্ডল-শাসিত সরকার

Central Government—কেন্দ্রীয় সরকার

Central Executive—কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ

Central Legislative—কেন্দ্রীয় আইন সভা

Chief Commissioner—চীফ কমিশনার

Chief Commissoner's Province—চীফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশ

Citizen—নাগরিক

Citizenship—নাগরিকত্ব

Civics—পৌর-বিজ্ঞান

Civil Court—দেওয়ানী আদালত

Concurrent List—সমানাধিকার তালিকা

Constitution গঠনতন্ত্র

„ Written—লিখিত গঠনতন্ত্র

„ Unwritten—অলিখিত গঠনতন্ত্র

„ Rigid—পরিবর্ত্তনীয় নহে এরূপ গঠনতন্ত্র

„ Flexible—সহজে পরিবর্ত্তনীয় গঠনতন্ত্র

Constituent Assembly—গণ-পরিষদ

Constitutional Ruler—নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্ত্তা

Council of Ministers—মন্ত্রিসভা

Council of State (Past)—রাষ্ট্রীয় পরিষদ

Council of States (Future)—রাষ্ট্র-সভা

Cripps' Proposals—ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাব

Democracy—গণতন্ত্র

Representative—প্রতিনিধিমূলক
Dictatorship—একনায়কত্ব
Election—নির্ব্বাচন
Electorate—নির্ব্বাচকমণ্ডলী
„ Communal—সাম্প্রদায়িক
„ Separate—পৃথক
Federation—যুক্তরাষ্ট্র
Federal Government—যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার
Fundamental Rights—মৌলিক অধিকারাবলী
Government—সরকার
Government of India Act—ভারত-শাসন আইন
Governor—গভর্ণর, দেশপাল
Governor General—গভর্ণর জেনারেল, রাষ্ট্রপাল
High Court—হাইকোর্ট
House of the People—লোক-সভা
Indian Union—ভারতীয় ইউনিয়ন
Individualism—ব্যক্তিতন্ত্রবাদ
Internationalism—আন্তর্জ্জাতিকতা
Judicial System of India—ভারতের বিচার-ব্যবস্থা
Law—আইন
League of Nation—জাতি-সঙ্ঘ
Legislative Assembly—ব্যবস্থা পরিষদ
Legislative Council—ব্যবস্থাপক সভা
Legislative—আইন সভা
„ Bicameral—দুই পরিষদবিশিষ্ট
„ Unicameral—এক পরিষদবিশিষ্ট
Liberty—স্বাধীনতা
Local Self-Government—স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন
Minister—মন্ত্রী
Minority—সংখ্যালঘু দল
Monarchy—রাজতন্ত্র

Municipality—মিউনিসিপ্যালিটি
Native State—দেশীয় রাজ্য
Nation—জাতি
Nationalism—জাতীয়তাবাদ
Party—রাজনৈতিক দল, পার্টি
Politics—রাজনীতি
Presidential Government—প্রেসিডেন্ট-শাসিত সরকার ; প্রেসি-ডেন্সিয়্যাল গভর্ণমেন্ট
Primary Education—প্রাথমিক শিক্ষা
Provincial Autonomy—প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকার
Provincial Executive—প্রাদেশিক শাসন-বিভাগ
" Legislative—প্রাদেশিক আইন সভা
Public Opinion—জনমত
Public Service—পাব্লিক সার্ভিস ; সরকারী চাকরী
Public Service Commission—পাব্লিক সার্ভিস কমিশন
Residual Powers—অবশিষ্ট ক্ষমতা
Right—অধিকার
Safeguard—রক্ষাকবচ
Security Council—নিরাপত্তা পরিষদ
Socialism—সমাজতন্ত্রবাদ
Sovereignty—সার্ব্বভৌমত্ব, সার্ব্বভৌম অধিকার
State—রাষ্ট্র
U. N. O. Organisation—সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান
Vocational Education—বৃত্তিমূলক শিক্ষা
Wardha Scheme—ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা

পৌর-বিজ্ঞানের নির্ঘণ্ট

অধিকার— ৭০
—পৌর ১৭
—বিভিন্ন প্রকার ১৬
—রাজনৈতিক ৭৩
—ও কর্ত্তব্য ৭৫
—ও রাষ্ট্র ১৬
অভিজাততন্ত্র— ৩৯
আইন— ৮৯
—উৎপত্তি ৯০
—ও নৈতিক ধারণা ৮৯
আইন সভা— ৫৬
—এক পরিষদ বিশিষ্ট ৫৮
—দুই পরিষদ বিশিষ্ট ৫৯
—নির্ব্বাচন ৭৮
আন্তর্জ্জাতীয়তা— ১১২
—ও জাতীয়তা ১১৩
একরাষ্ট্রীয় সরকার— ৪৭
গঠনতন্ত্র— ২২
—সহজে পরিবর্ত্তনীয় ২৪
—সহজে পরিবর্ত্তনীয় নহে এরূপ ২৫
গণতন্ত্র— ৪০
—ও ডিক্টেটর-শিপ ৪৫
—বিপক্ষে যুক্তি ৪২
—সপক্ষে যুক্তি ৪১
—সফলতার সর্ত্ত ৪৩
জনমত— ১০৩
জাতি— ১০৭
—আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ১১১
—ভারতীয়গণ কি এক জাতি ১০৯
—ও রাষ্ট্র ১০৮
জাতিসঙ্ঘ— ১১৪
জাতীয়তা— ১১২
—ও আন্তর্জ্জাতীয়তা ১১৩
নাগরিক— ৬৯
—ভারতীয় ৭৩
নাগরিকত্ব অর্জ্জনের উপায়— ৬৭
নির্ব্বাচন— ৭৬
—আইন সভার ৭৬
—পরোক্ষ ৮১, ৮২
—প্রত্যক্ষ ৮১
—সংখ্যালঘু ৮৪
—সাম্প্রদায়িক ও পৃথক ৮৬
পৌর-বিজ্ঞান— ১
—ও অর্থ-শাস্ত্র ৩
—ও ইতিহাস ৪
—ও নীতি-শাস্ত্র ৩
—ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ৩
—ও সমাজ-বিজ্ঞান ২
পার্টি— ৯৮
—কার্য্য ৯৮
—গভর্ণমেন্টের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি ৯৯, ১০০
—এক পার্টি না বহু পার্টি ১০১

প্রেসিডেণ্ট
শাসিত সরকার— ৪৫, ৪৬
বিচার বিভাগ— ৫৭
বিচারক
নিয়োগের নিয়ম— ৬৪
ভোট— ৭০
—গোপন ৮৩
—প্রকাশ্য ৮৩
ভোটাধিকার— ৭৬
—প্রাপ্তবয়স্কদের ৭৭
—স্ত্রীলোকদের ৭৯
মন্ত্রিমণ্ডল শাসিত সরকার— ৪৫
রাষ্ট্র— ৪
—ও সরকার ৯
—উৎপত্তি ১২
—কার্য্য বিভাগ ৩৫
—ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে গঠিত ২০
—গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠিত ১৭
—চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ১৩
—প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র ৩৪
—সার্ব্বভৌমত্ব ১০
—Matriachal Theory ১৯
—Organic Theory of
—the State ১২২
—Patriarchal Theory ১৮
সমাজতন্ত্রবাদ— ৩১
সম্মিলিত
জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠান— ১১৫
সরকার— ৯
—ও রাষ্ট্র ৯
—শ্রেণী-বিভাগ ৩৬
সরকারী কার্য্যের
পৃথকীকরণ— ৫৩
সংখ্যালঘু সমস্যা— ৮৪
—বিশেষ প্রতিনিধিত্ব ৮৫
—বিশেষ নির্ব্বাচন প্রণালী ৮৬
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ১১৭
—উপকারিতা ১১৮
—সংগঠন ১১৯
স্বাধীনতা— ৯১
—ও রাষ্ট্র কর্ত্তৃত্ব ৯৪
—বিভিন্ন প্রকার ৯৩
—রক্ষা কবচ ৯৪

দ্বিতীয় খণ্ড

ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী

(Indian Administration)

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ভারতবর্ষের শাসন প্রণালী
(Indian Administration)

ভারতে ইংরাজ শাসনের প্রতিষ্ঠা ও ক্রম-পরিণতি
(Origin and Growth of British Rule in India)

তখন ভারতবর্ষে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল; ইংলণ্ড হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে বণিকসঙ্ঘ প্রাচ্য-জগতে ব্যবসা করিবার একচেটিয়া সনদ (Charter) লইয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হইল। কোম্পানি গঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া উপকথা-বর্ণিত প্রাচ্যের ধনরাশির কিছু অংশ আহরণ করা। কিন্তু…………

"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে শর্ব্বরী, রাজদণ্ড রূপে।"

রণজিৎ সিংহের কথায় বলা যায়, ক্রমে ক্রমে সারা ভারতবর্ষ লাল হইয়া গেল। এইভাবে একদিন ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হইল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে সুরাট, পরে মছলিপট্টম প্রভৃতি স্থানে কুঠি বা ব্যবসাকেন্দ্র খুলিল। কোম্পানি ১৬৪০ সালে মাদ্রাজে সেণ্ট জর্জ্জ নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করে এবং কয়েক বৎসর পরে বঙ্গদেশে হুগলী নদীর তীরে এক কুঠি স্থাপন করে। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ বোম্বাই শহর কোম্পানিকে ইজারা দেন, চার্লস্ ইহা পোর্টুগালের রাজার নিকট হইতে বিবাহের যৌতুকরূপে পাইয়াছিলেন। ১৬৯০ সালে জব চার্ণক (Job Charnock) সুতানুটি গ্রামে কলিকাতা সহরের পত্তন করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন মোগলের শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে, মোগল সাম্রাজ্যের সৌধ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, চারিদিকে অরাজকতার মধ্যে ক্ষমতা অধিকারের জন্য মারামারি কাড়াকাড়ি চলিতেছে, এমন সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বণিকরাও ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইতে বিলম্ব করিল না। প্রথম প্রথম ডুপ্লের অধীনে ভারতবর্ষে ফরাসীরাও ইংরাজদের

প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে লাগিল, কিন্তু ক্লাইভের নেতৃত্বে ক্রমশঃ ফরাসীদিগকে হটিয়া যাইতে হইল। কর্ণাট যুদ্ধে ভারতবর্ষে ফরাসী শক্তি চূর্ণ হইল, এবং ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই রহিল না। ইতিমধ্যে বঙ্গদেশে ১৭৫৭ সালের পলাসীর যুদ্ধে মীরজাফর প্রভৃতির বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হইলেন। অতঃপর বাঙ্গলার নবাব বলিয়া যিনি রহিলেন, তিনি কোম্পানির হাতের পুতুল মাত্র হইয়া রহিলেন; কোম্পানিই হইল আসল ক্ষমতার মালিক। ১৭৬৪ সালের বক্সারের যুদ্ধের পর ১৭৬৫ সালে কোম্পানি দিল্লীর মোগল-সম্রাটের নিকট হইতে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করিল, অর্থাৎ কোম্পানি এই সব স্থানের রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানি মামলার বিচারভার পাইল। ঠিক এই সময় কোম্পানি বাঙ্গলার নবাবের নিকট হইতে বাঙ্গলার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং ফৌজদারী বিচারের ভারও লাভ করিল। অতএব নবাব ও সম্রাটের অধিকার নামমাত্র রহিল, আসল ক্ষমতার অধিকারী হইল কোম্পানি। ইহাই হইল ক্লাইভের দ্বৈত শাসন (Double Government)।

দেশের পক্ষে এই শাসনের ফল হইল মারাত্মক। কোম্পানির হাতে প্রচুর ক্ষমতা ছিল, কিন্তু সুশাসনের দায়িত্ব ছিল না। তাছাড়া এই সময়ে কোম্পানির কর্ম্মচারীদের মত অসাধু ও অর্থগৃধ্নু লোক দেখা যায় না। ইহাদের অত্যাচার ও শোষণের ফলে দেশবাসীর দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিল এবং ১৭৭০ সালে যে মন্বন্তর দেখা দিল, তাহাতে বাঙ্গলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক ইহলীলা সংবরণ করিল। এমন দুর্বৎসরেও কোম্পানির শোষণ বন্ধ হয় নাই, এই বৎসরেও মোট রাজস্ব আদায় পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা বেশীই হইয়াছিল।

এই সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিলাতে জনমত গড়িয়া উঠিতে থাকে। ব্রিটিশ সরকার ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং এ্যাক্ট (Regulating Act, 1773) 'পাশ' করেন। এই আইন দ্বারা বাঙ্গলার গভর্ণর-জেনারেলের পদ হয় এবং তাঁহার একটি শাসন-পরিষদ (Executive Council) সৃষ্টি করা হয়। সপরিষদ গভর্ণর-জেনারেলের (Governor General-in-Council) উপর বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সীর শাসনভার এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের শাসন কার্য্যের তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়। গভর্ণর-জেনারেল তাঁহার শাসন-পরিষদের অধিকাংশের মত মানিতে বাধ্য থাকিতেন। এই আইনের ফলে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইল, ইহার উপর বিচার বিভাগের সকল কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হইল।

রেগুলেটিং এ্যাক্ট দ্বারা পার্লামেণ্ট প্রথম প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানির কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার লইলেন। ইহার পূর্ব্বে ক্লাইভ নিজেই এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে কোম্পানির কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করিবার ভার লওয়া উচিত। এ্যাডাম স্মিথও (Adam Smith) এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই ব্যবস্থা দ্বারা ইংরাজ-জাতির অর্থাগম হইবে। ১৭৭৩ সালের আইনের পর ব্রিটিশ সরকার পর পর কয়েকটি আইন প্রণয়ন করিয়া কোম্পানির হাত হইতে আসল ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। ১৭৭৩ সালের আইন এক হিসাবে দ্বৈত-শাসন প্রবর্ত্তন করিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে শাসনের ভাগাভাগি হইয়া গেল। এই আইনের দ্বারাই ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের জনসাধারণের অধিকার রক্ষা করিবার ও কল্যাণসাধন করিবার দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে লইয়া ভারত-বন্ধু সাজিয়া বসিল।

রেগুলেটিং এ্যাক্টের ত্রুটিগুলি নিম্নলিখিত রূপ ছিল—প্রথমতঃ সপরিষদ গভর্ণর-জেনারেল্ মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের শাসন কার্য্যে কতখানি কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিবেন, তাহা স্পষ্ট ছিল না। দ্বিতীয়তঃ—সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা কতটা, এবং সুপ্রীম কোর্ট ও গভর্ণমেণ্টের পারস্পরিক সম্বন্ধ কি, তাহারও কোনও স্পষ্ট উল্লেখ ছিল না। পরিষদের অধিকাংশের মত মানিতে গভর্ণর জেনারেল বাধ্য ছিলেন, ইহাও এই আইনের একটি ত্রুটি। এই বিধানের ফলে, গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার পরিষদগণের মধ্যে প্রায়ই সঙ্ঘর্ষ হইত এবং শাসন কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটিত।

রেগুলেটিং এ্যাক্টের কয়েকটি ত্রুটি ১৭৮৪ সালের ভারত আইন (Pitt's India Act, 1784) দ্বারা সংশোধিত হয়। এই আইনের দ্বারা গভর্ণর-জেনারেল প্রয়োজনবোধে তাঁহার শাসন-পরিষদের মতামত অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা লাভ করেন এবং সপরিষদ গভর্ণর-জেনারেল মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের শাসন ব্যাপারে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা লাভ করেন। পিটের ভারত-আইনের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিধান, ভারত-শাসন তত্ত্বাবধান করিবার জন্য ছয় জন সভ্য লইয়া একটি বোর্ড-অফ-কন্ট্রোল (Board of Control) গঠন। এই বিধান ভারত-সচিবের পদের ভিত্তি স্থাপন করে বলা যায়। বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ছাড়া অন্য সভ্যগণ তাঁহাদের কাজে আগ্রহ না দেখাইবার ফলে শীঘ্রই সমস্ত ক্ষমতা প্রেসিডেণ্টের করায়ত্ত হয়। এই সমুদয় ক্ষমতা, ১৮৫৮ সালে বোর্ড-অফ-কন্ট্রোল বিলোপের পর, ভারত-সচিব পাইয়াছিলেন। মোটামুটি পিটের ভারত-আইন অনুসারে শাসন-কার্য্য ১৮৫৮ সাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

ইহার পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইল ১৮১৩ সালের চার্টার আইন। এ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু কোম্পানির বহির্ভূত ব্যবসায়িগণ বহুদিন হইতে ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের অংশ লাভ করিবার জন্য আন্দোলন করিয়া আসিতেছিল। কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত বণিকগণের অপরিমিত অর্থাগম এবং তাহাদের নবাবী ধরণের ব্যয়বহুল জীবন-যাত্রা দেখিয়া ইংলণ্ডের অন্য বণিক-সম্প্রদায়ের ঈর্ষা উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহারা কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করিতেছিল। ১৮১৩ সালের চার্টার আইনে কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসায়ের অবসান ঘটে এবং কোম্পানির শুধু চা-ব্যবসায় ও চীনদেশের সহিত ব্যবসায় ছাড়া অন্যান্য ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার কাড়িয়া লওয়া হয় এবং এইভাবে সকল ইংরাজ ব্যবসায়ীর জন্য ভারতবর্ষের ব্যবসায়-পথ উন্মুক্ত করা হয়।

বিশ বৎসর পরে ১৮৩৩ সালে চার্টার আইনে কোম্পানির ব্যবসায়ের সকল অধিকার বিলুপ্ত করা হইল। বাঙ্গলার গভর্ণর-জেনারেলকে ভারতের গভর্ণর-জেনারেল নাম দেওয়া হইল এবং অন্য সকল প্রাদেশিক সরকারকে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন করা হইল। এই আইনে প্রথম শাসন-পরিষদের আইন-সদস্যের (Law Member) পদ সৃষ্টি হয়। মেকলে (Macaulay) প্রথম আইন-সদস্য হইয়াছিলেন। কোম্পানী তাহার অধীনস্থ সমস্ত ভূখণ্ড ব্রিটিশ-সম্রাটের ট্রাষ্টী (অছি) স্বরূপ শাসন করিবে, এই আইনও ইহা ঘোষণা করা হয়।

শেষ চার্টার আইন হয় ১৮৫৩ সালে। ইহার দ্বারা বাঙ্গলার জন্য একজন লেপ্টন্যাণ্ট গভর্ণর (Lieutenant Governor, ছোট লাট) নিযুক্ত হন এবং গভর্ণর-জেনারেল বাঙ্গলা প্রদেশের প্রত্যক্ষ শাসনভার হইতে মুক্তি পান। এই আইনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিধান, ১২ জন সরকারী সদস্য লইয়া আইন প্রণয়নের জন্য একটি বিশেষ সভা গঠন। আইন প্রণয়ন-কার্য্যের জন্য গভর্ণর জেনারেল তাঁহার শাসন-পরিষদের চার জন সদস্য, ভারতের প্রধান সেনাপতি ছাড়া আর ছয় জন সরকারী সদস্য মনোনীত করিবার অধিকার পাইলেন।

ইহার চার বৎসর পরে, ১৮৫৭ সালে বিদেশী শাসকদিগের হাত হইতে স্বাধীনতা ছিনাইয়া লইবার জন্য সমগ্র ভারতব্যাপী এক বিদ্রোহ হয়। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর এক বৃহৎ অংশ এই বিদ্রোহে যোগদান করে। ইহা ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহ বলিয়া বর্ণিত হইলেও, ইহাই বস্তুতঃ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-

সংগ্রাম। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে, ভারতীয় জনগণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার অভাবে এবং উন্নত অস্ত্র-শস্ত্র না পাওয়ায় এই সংগ্রাম ব্যর্থ হয়।

১৮৫৮ সালের ভারত-শাসন আইন,—The Act for the Better Government of India,—দ্বারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অস্তিত্ব বিলোপ করা হয় এবং ইংলণ্ডের রাজার হস্তে ভারত-শাসন ভার অর্পণ করা হয়। ভারত-শাসন ব্যাপারে পরামর্শ দিবার জন্য ইংলণ্ডে ভারত-সচিব (Secretary of State for India) নামে এক নূতন মন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করা হয়। এই আইন দ্বারা বোর্ড অফ্ কন্ট্রোল্ (Board of Control) উঠাইয়া দেওয়া হয়। বস্তুতঃ, ভারত-সচিব বোর্ড অফ্ কন্ট্রোল-এর সভাপতির সমূহ ক্ষমতা পাইলেন। ভারত-সচিবের কার্য্যে সাহায্যের জন্য এক পরিষদ (Council of India) সৃষ্টি করা হইল। বড়লাট (Governor General) রাজ প্রতিনিধি (Viceroy) রূপে অভিহিত হইলেন, তিনি সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে শাসন করিবার ভার পাইলেন। আগেকার মতই সপরিষদ-বড়লাট শাসনকার্য্য সংক্রান্ত ক্ষমতার অধিকারী রহিলেন।

ইহার পর গঠনতন্ত্রের দিক হইতে ১৮৬১ সালের India Councils Act বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮১৩ সালের চার্টার আইনে ভারতবর্ষে যে আইন-সভার সূত্রপাত হইয়াছিল, ১৮৬১ সালের আইনে সেই আইন-সভায় বে-সরকারী লোক গ্রহণ করিবার বিধান হইল। বড়লাটের উপর ভার দেওয়া হইল, তিনি আইন প্রণয়নের কার্য্যের জন্য তাঁহার শাসন-পরিষদের সভ্যগণ ছাড়াও ছয় হইতে বারজন সদস্য মনোনীত করিতে পারিবেন, এই মনোনীত সদস্যের মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক বে-সরকারী সদস্য হইবেন। এই আইন সভা বড়লাটের শাসন-পরিষদের বর্দ্ধিত সংস্করণের মত ছিল। ইহার ক্ষমতাও ছিল সীমাবদ্ধ। শাসন কর্তৃপক্ষ নিজেদের ইচ্ছামত কতকগুলি বিষয় এই সভায় উপস্থিত করিতেন, এবং এই বিষয়গুলি ছাড়া অন্য কিছু আলোচনার অধিকার এখানে ছিল না। এই সভার পরামর্শ শাসন-কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামত গ্রহণ করিতেন অথবা বর্জ্জন করিতেন। ১৮৬১ সালের আইন অনুসারে প্রদেশগুলিতেও অনুরূপ আইন সভার সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রত্যেক প্রদেশে গভর্ণর আইন প্রণয়ন কার্য্যের উদ্দেশ্যে চার হইতে আটজন সদস্য মনোনীত করিতে পারিতেন, ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক বে-সরকারী লোক হওয়া চাই, এই বিধান ছিল।

১৮৬১ সালের আইনের একটি উল্লেখযোগ্য বিধানের বলে বড়লাট জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে নিজ দায়িত্বে ছয় মাসের জন্য কার্য্যকরী থাকিবে এমন

জরুরী আইন (Ordinance) প্রণয়ন করিবার অধিকার পাইলেন। এই অধিকার শেষ পর্য্যন্ত ছিল।

১৮৯২ সালের India Councils Act পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। এই আইন দ্বারা ভারতীয় আইন সভার আয়তন আর-ও বৃদ্ধি করা হয় এবং বড়লাট বারজন সদস্যের স্থলে ১৬ জন সদস্য মনোনীত করিবার অধিকার পান। বণিক-সভা (Chamber of Commerce), জেলা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রভৃতির সুপারিশ অনুযায়ী সদস্য মনোনয়নের পরিকল্পনা-ও করা হয়। প্রাদেশিক সভাগুলিরও আয়তন এবং সদস্য মনোনয়ন প্রথার পরিবর্ত্তন হয়। এই সব সভার সদস্যগণ প্রশ্ন করিবার ও আয়-ব্যয় আলোচনা করিবার কিছু কিছু অধিকারও লাভ করেন।

১৮৯২ সালের মধ্যে ভারতের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ফলে শিক্ষার প্রসার হইয়াছিল। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব দিন দিন বাড়িতেছিল; দেশের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করিতেছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায় ক্রমশঃ অধিক রাজনৈতিক অধিকার দাবী করিতে লাগিলেন। এই সময় স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। স্বদেশী ভাব প্রতিদিন প্রবল হইতে থাকে।

মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার
(Morley-Minto Reforms)

এই রাজনৈতিক জাগরণের যুগে, ১৯০৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক India Councils Act নামক আইন 'পাশ' হয়। তৎকালীন ভারত-সচিব, লর্ড মর্লি এবং বড়লাট লর্ড মিণ্টো এই শাসন-সংস্কারের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাই ইহাকে মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার বলা হয়।

আইন সভার সদস্যদের নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা এই শাসন সংস্কারের উল্লেখযোগ্য অংশ। এই সর্ব্বপ্রথম সদস্যদের নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল। নীতি হিসাবে সদস্যদের নির্ব্বাচন ব্যবস্থা আগেকার মনোনয়ন ব্যবস্থা অপেক্ষা উন্নত হইলেও, এই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হয় বলিয়া ইহার কুফল আজও ভোগ করিতে হইতেছে। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ব্যবস্থার ফলে, নূতন আইন-সভাগুলির সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। এই আইনে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন-সভা সমূহের আয়তন বৃদ্ধি করা হয়; কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য সংখ্যা ৬০ এবং প্রদেশগুলির আইন সভার সদস্য সংখ্যা ৩০ হইতে

৫০ নির্দ্দিষ্ট হয়। ভারতীয় আইন পরিষদের সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশ সরকারী চাকুরিয়া ছিলেন, কিন্তু প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলির সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশ সদস্য বে-সরকারী লোক ছিলেন, তবে উভয় প্রকার আইন পরিষদেই অধিকাংশ সদস্য মনোনীত সদস্য ছিলেন, সর্ব্বত্র নির্ব্বাচিত সদস্য-সংখ্যা সরকারী ও মনোনীত সদস্য সংখ্যার তুলনায় কম ছিল। সরকারী ও মনোনীত সদস্য-সংখ্যা অধিক থাকায়, সরকারী মতের বিরুদ্ধে কোনও ভাল কাজও করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের কল্যাণে নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ঐক্যবোধ আসাও সম্ভব ছিল না। আইন পরিষদগুলিতে প্রস্তাব উত্থাপন করিবার, অতিরিক্ত (Supplementary) প্রশ্ন করিবার, এবং বাজেট আলোচনা করিবার ও বাজেটের উপর ভোট দান করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল।

১৯০৯ সালের Indian Councils Act স্বভাবতঃই ভারতীয় জনমতকে শান্ত করিতে পারিল না। ভারতে রাজনৈতিক চেতনা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল, এই সঙ্গে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব-ও বাড়িতেছিল। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের বিপ্লব-বাদী দলসমূহ কর্ম্মতৎপর হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং কংগ্রেসের মধ্যে মতবিরোধ সত্ত্বেও, সকল রাজনৈতিক দলই অধিকতর অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন তীব্র করিয়া তুলিতেছিলেন। এমন সময় ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ সুরু হইল। অল্পসংখ্যক বিপ্লবী ছাড়া অধিকাংশ ভারতীয় নেতা এই যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের সদিচ্ছার উপর বিশ্বাস করিয়া ব্রিটিশ সরকারকে সমর্থন করিতে স্থির করিলেন। যুদ্ধ চলিতে থাকার সময়ও ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠিতেছিল। এই জাগ্রত জনমতকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে ১৯১৭ সালে ১০শে আগষ্ট তৎকালীন ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু (Montague) ব্রিটিশ সরকারের তরফ হইতে হাউস্ অফ্ কমন্সে এক ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার দ্বারা ব্রিটিশ সরকারের ভারতীয় শাসন নীতির ব্যাখ্যা করা হয়। এই ঘোষণার সারমর্ম্ম এই যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ভারতবর্ষে ধাপে ধাপে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা করাই ব্রিটিশ সরকারের ভারত-শাসনের লক্ষ্য এবং এই উদ্দেশ্যে, দুইটি নীতি অনুসরণ করা হইবে। প্রথমতঃ, ভারতবাসীকে অধিক পরিমাণে সরকারী চাকুরীতে গ্রহণ করা হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষে অধিক পরিমাণে স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রসার করা হইবে।

এই ঘোষণার অংশগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে ইহাতে স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইলেও, কোন্ সময়ের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। শুধু বলা হইয়াছিল, একটু একটু করিয়া স্বায়ত্ত-

শাসন প্রবর্ত্তন করা হইবে ; কোন্ সময় কতটা পরিমাণ স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হইবে, তাহা নির্ভর করিবে ব্রিটিশ প্রভুদের মর্জ্জির উপর। ব্রিটিশ সরকারই স্থির করিবেন, ভারতবর্ষ স্বায়ত্ত-শাসনের কতটা যোগ্য হইয়াছে এবং তদনুযায়ী স্বায়ত্ত-শাসন দিতে থাকিবেন, ইহাই ছিল মূল কথা।

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্ব-সমর শেষ হইল। মিঃ মণ্টেগু ভারতীয় অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এখানে আসিলেন। তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ও ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু একযোগে ভারতীয় শাসন-সংস্কার সম্পর্কিত এক পরিকল্পনা বাহির করেন। পরিকল্পনা রচয়িতাদের নামে ইহাকে মণ্ট-ফোর্ড রিপোর্ট এবং রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া পার্লামেণ্টে ১৯১৯ সালে যে ভারত শাসন আইন পাশ হইল, তাহাকে মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার আইন বলা হয়।

১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইন

(The Government of India Act, 1919)

এই আইনে কেন্দ্রীয় আইন সভাকে দুই ভাগে ভাগ করা হইল, যথা, রাষ্ট্রীয় পরিষদ (The Council of State) এবং ব্যবস্থা পরিষদ (Legislative Assembly)। ব্যবস্থা পরিষদের ১৪৫ জন সদস্যের মধ্যে ১০৪ জন নির্ব্বাচিত, অবশিষ্ট মনোনীত হইবেন, স্থির হইল। আইন সভার নির্ব্বাচিত সদস্যগণ সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্ব্বাচিত হইবার ব্যবস্থা হইল। আইন সভার ক্ষমতাও বর্দ্ধিত হইল। ব্যবস্থা পরিষদের (Legislative Assemhly) সদস্যগণ বাজেট আলোচনা এবং ব্যয়ের বিভিন্ন দফাগুলির মধ্যে ভোটযোগ্য দফাগুলির উপর ভোটাভোটি করিয়া না-মঞ্জুর করিবার অধিকার পাইলেন। রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of State) ব্যয়বরাদ্দের ব্যাপারে ভোট দিবার অধিকার পাইলেন না। যে কোনও বিল আইনে পরিণত করিতে হইলে উভয় পরিষদের সম্মতির আবশ্যক ছিল। আইন সভার সকল কার্য্যের উপর বড়লাটের কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হইল ; বড়লাট আইন সভার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার অনেক অধিকার পাইলেন। কোনও বিল আইন সভা কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইলে তাহা আইনে পরিণত করিবার অধিকার, কোনও ব্যয় বরাদ্দের দাবী ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইলেও তাহা বহাল করিবার অধিকার, আইন সভার পরামর্শ না লইয়াই অর্ডিনান্স্ (Ordinance) জারী করিবার অধিকার প্রভৃতি এমন অনেক অধিকার বড়লাটের রহিল এবং আইন সভার অধিকারের সীমা এত সঙ্কীর্ণ হইল যে, প্রকৃত

পক্ষে আইন সভার ব্যাপারেও বড়লাটই রহিলেন সর্ব্বেসর্ব্বা, এবং আইন সভা অত্যন্ত অসার প্রহসন মাত্রে পরিণত হইল, একথা বলা চলে।

সরকারী কর্ত্তৃত্বাধীন বিষয়গুলি মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা হইল, যথা কেন্দ্রীয় বিষয় ও প্রাদেশিক বিষয়। দেশরক্ষা, রেল, মুদ্রানীতি, ডাক ও তার বিভাগ প্রভৃতি সর্ব্বভারতীয় বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় বিষয় বলিয়া স্থির হইল এবং এগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে রহিল। আর, বেশীর ভাগ প্রাদেশিক স্বার্থজড়িত বিষয়—যথা, ভূমিরাজস্ব, কৃষি, সেচ, শিক্ষা, আভ্যন্তরীন আইন ও শৃঙ্খলা, পুলিস, কারাগার প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রাদেশিক বিষয় বলিয়া গণ্য হইল।

দ্বৈত-শাসন
(Dyarchy)

প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে যে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইল, তাহাকে দ্বৈত-শাসন বা Dyarchy বলা হয়। প্রাদেশিক বিষয়গুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হইলঃ সংরক্ষিত (Reserved) বিষয়, এবং হস্তান্তরিত (Transferred) বিষয়। ভূমিরাজস্ব, বিচার বিভাগ, পুলিস, জেল, সেচ প্রভৃতি বিষয় সংরক্ষিত বিষয়রূপে গণ্য হইল। সপরিষদ প্রাদেশিক গভর্ণরের (Governor-in-Council) উপর এই সব সংরক্ষিত বিষয়ের পরিচালনার ভার রহিল। প্রাদেশিক আইন সভা এই সকল বিষয়ের উপর কোনও কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিতেন না। এই সকল বিষয়ের শাসন ব্যবস্থার জন্য সপারিষদ গভর্ণর (Governor-in-Council) ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী রহিলেন। সংরক্ষিত বিষয়গুলি ছাড়া অন্য বিষয়গুলি, যথা, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, সমবায়, অরণ্য প্রভৃতি বিষয় হস্তান্তরিত বিষয়রূপে গণ্য হইল। প্রাদেশিক গভর্ণর, প্রাদেশিক আইন সভার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য হইতে মন্ত্রী নিযুক্ত করিতেন ; মন্ত্রিগণ প্রত্যেকে এক বা একাধিক বিভাগের ভার পাইতেন। মন্ত্রিগণ তাঁহাদের অধীনস্থ বিভাগের শাসন কার্য্যের জন্য আইন সভার নিকট দায়ী থাকিতেন। আইন-সভা মন্ত্রিগণের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করিলে, তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হইত। প্রাদেশিক গভর্ণর ইচ্ছা করিলে মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া নিজের বিবেচনা অনুযায়ী শাসন করিতে পারিতেন।

প্রাদেশিক আইন সভাগুলির নির্ব্বাচিত সদস্য সংখ্যা মনোনীত সদস্য সংখ্যা অপেক্ষা বেশী করা হইল। সংরক্ষিত বিষয়গুলির উপর আইন সভার কোনও হাত রহিল না, কিন্তু হস্তান্তরিত বিষয়গুলি সম্পর্কে মন্ত্রিগণ প্রাদেশিক আইন

সভার নিকট দায়ী ছিলেন, এবং প্রাদেশিক আইন সভা হস্তান্তরিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অনেকখানি কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিতেন।

দ্বৈত-শাসনের বিফলতা
(Failure of Dyarchy)

১৯১৯ সালের আইনে প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে যে উল্লিখিত দ্বৈত-শাসন বা Dyarchy প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা সফল হয় নাই বলা চলে। প্রথমতঃ, সরকার এমন জিনিষ নহে যে ইহাকে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত করা চলে। সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত এই দুই কৃত্রিম ভাগে প্রাদেশিক সরকারকে ভাগ করার ফলে উভয় অংশের মধ্যে অনিবার্য্যরূপে সংঘর্ষ দেখা দিত। মন্ত্রীদের ক্ষমতাও ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সব সংরক্ষিত বিষয় ছিল; এগুলির উপর মন্ত্রীদের কোনও হাতই ছিল না। হস্তান্তরিত বিভাগগুলির উপরও তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাদেশিক গভর্ণর ইচ্ছা করিলে মন্ত্রীদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারিতেন। বিষয়গুলির বিভাগও অত্যন্ত অযৌক্তিক হইয়াছিল। কৃষিবিভাগ হস্তান্তরিত, অথচ সেচ বিভাগ ছিল সংরক্ষিত, ইহার মত অসঙ্গত ব্যাপার আর হইতে পারে না। মন্ত্রীদের হাতে অর্থের সংস্থান ছিল না। মন্ত্রিগণ ইচ্ছা করিলেও অর্থের অভাবে জাতীয় গঠন-মূলক কার্য্য কিছুই করিতে পারিতেন না; এবং ফলে তাঁহারা জনপ্রিয় হইতে পারিতেন না। মন্ত্রীদের সমর্থক দল বলিয়া কিছুই ছিল না। আইন সভায় তাঁহাদের কাজের সমর্থন লাভ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে সরকার মনোনীত সদস্য-দের উপর নির্ভর করিতে হইত। এ কারণে, মন্ত্রিগণ সরকারী লোক বলিয়া পরিগণিত হইতেন; তাঁহারা জনপ্রিয় মন্ত্রী বলিয়া কোন দিন খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্ব ছিল না। প্রাদেশিক গভর্ণর সকল মন্ত্রীর সহিত যৌথভাবে পরামর্শ না করিয়া এক একজন মন্ত্রীর সহিত পৃথকভাবে পরামর্শ করিতেন।

১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইনে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইবার মত কিছুই ছিল না। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অনেকে আশা করিয়া-ছিলেন, জার্ম্মাণ-যুদ্ধে ভারতবর্ষ ব্রিটেনকে সাধ্যাতীত সাহায্য করিয়া জয়যুক্ত করিয়াছে বলিয়া ব্রিটেন তাহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বায়ত্ত-শাসন দিবে। কিন্তু, ভারতবর্ষ লাভ করিল, ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে, জনসাধারণের প্রতি দায়িত্বহীন কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক দ্বৈত শাসন (Provincial

Dyarchy)। তাহার উপর আসিল রাউলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালা বাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ইহার প্রতিকারে কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন সুরু করিলেন। সকল প্রকার উপায়ে সরকারের সহিত অসহযোগিতা করা, মাদক দ্রব্য বর্জ্জন, বিদেশী বস্ত্র প্রভৃতি বর্জ্জন, আইন সভা, আদালত প্রভৃতি বর্জ্জন, অস্পৃশ্যতা পরিহার, খাদি ব্যবহার, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য—এই সব ছিল এই আন্দোলনের কর্ম্ম-সূচী। এই আন্দোলনের ফলে, ঈপ্সিত স্বরাজ লাভ হইল না বটে, কিন্তু দেশের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব রাজনৈতিক চেতনা জন্মিল।

১৯২৩ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেসের মধ্যে স্বরাজ্য দল গঠিত হইল; ইহার উদ্দেশ্য হইল আইন সভাসমূহে প্রবেশ করিয়া বাধাদানের নীতি অনুসরণ করিয়া নূতন শাসন-সংস্কার অচল করিয়া দেওয়া। এই নীতি অনুযায়ী স্বরাজ্য দল আইন সভার নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়া বহুস্থানে বিশেষ সাফল্য লাভ করিলেন। ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে (Indian Legislative Assembly) ভারতবর্ষের ডোমিনিয়ন-তুল্য মর্য্যাদা দাবী করিয়া এবং শাসনতন্ত্র রচনার জন্য গ্রেট ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষের মধ্যে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করিবার পরামর্শ দিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইল।

ইহার পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশনের (Simon Commission) নিয়োগ। ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার কতটা সফল হইয়াছে, তাহা তদন্ত করিবার জন্য এবং গঠনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন সম্পর্কিত সুপারিশ করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকার সার জন সাইমনের সভাপতিত্বে একটি রাজকীয় কমিশন (Royal Commission) নিযুক্ত করেন। সভাপতির নামেই ইহাকে সাইমন কমিশন বলা হয়। এই কমিশনে একটিও ভারতীয় সভ্য ছিলেন না। তাই এই কমিশন-নিয়োগ ভারতবর্ষের প্রতি অপমানসূচক বলিয়া মনে হইল। ভারতবর্ষের সকল উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলই এই কমিশন বর্জ্জন করেন। ১৯৩০ সালে এই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রিপোর্টে প্রাদেশিক দ্বৈত-শাসনের অবসান ঘটাইয়া প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের সুপারিশ করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রে দায়িত্বশীল শাসনের কোনও প্রস্তাব করা হয় নাই।

ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক জাগরণ ক্রমশঃ তীব্র হইতেছিল। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে, মহাত্মাজীর মধ্যস্থতায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ১৯২৯ সালের মধ্যে ভারতবর্ষ ডোমিনিয়ন-তুল্য মর্য্যাদা (Dominion

Status) লাভ না করিলে স্বাধীনতা আন্দোলন সুরু করা হইবে। ইহার পর ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড আরউইন ঘোষণা করেন যে, ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ক্রমপরিণতির লক্ষ্য হইতেছে—ডোমিনিয়ন-তুল্য মর্য্যাদা (Dominion Status) লাভ করা। ভাইসরয় ইহাও বলেন যে, শাসনতন্ত্র রচনার জন্য শীঘ্রই ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের ও গ্রেটব্রিটেনের প্রতিনিধিদের একটি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করা হইবে। লর্ড আরউইনের এই ঘোষণায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। ডোমিনিয়ন-তুল্য শাসন-ব্যবস্থা লাভ করিতে ভারতবর্ষের কতকাল লাগিবে, সে সম্বন্ধে এই ঘোষণাতে কিছুমাত্র উল্লেখ ছিল না। ইহাতে শুধু এই কথা বলা ছিল যে, ভবিষ্যতে কোনও একদিন ভারতবর্ষ ডোমিনিয়ন সদৃশ শাসন-তন্ত্র (Dominion Status) লাভ করিবে। অতএব, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মর্য্যাদালাভ সম্পর্কে হতাশ হইয়া ১৯২৯ সালে কংগ্রেস লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। বিদেশী সরকার হাজার হাজার লোককে জেলে দিয়া এবং দেশের মধ্যে বিবিধ অত্যাচারের স্রোত বহাইয়া দিয়া আন্দোলন দমন করিতে চেষ্টা করে।

এই অবস্থার মধ্যে লণ্ডনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক হয়। ইহাতে অবশ্য কংগ্রেসের কোনও প্রতিনিধি ছিলেন না। সরকারের মনোনীত কয়েক জন ভারতীয় ভারতবর্ষের প্রতিনিধি সাজিয়া ইহাতে যোগদান করেন। এই বৈঠকে রক্ষা-কবচ সংবলিত সর্ব্ব-ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটা মোটামুটি পরিকল্পনা করা হয়।

ইহার পর ১৯৩১ সালের গান্ধী-আরউইন চুক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। এই চুক্তি অনুযায়ী আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করা হয় এবং কংগ্রেস দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের সিদ্ধান্ত করেন। সরকার কর্তৃক কংগ্রেসী বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়, লবণ আইন শিথিল করিয়া, যে সকল স্থানে লবণ উৎপন্ন করা যাইতে পারে, সে সকল স্থানে জনসাধারণের লবণ প্রস্তুত করিবার অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, শান্তিপূর্ণ পিকেটিংএর অধিকার প্রভৃতি মানিয়া লওয়া হয়।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে বিলাতে শ্রমিক দলের পরাজয় ঘটিয়াছে এবং সংরক্ষণশীল দল পুনরায় ক্ষমতা পরিচালনের ভার পাইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার করিয়া লইবার জন্য ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ জন-

সাধারণের নিকট আবেদন জানান কিন্তু তিনি বিফল মনোরথ হইয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন এবং বোম্বাই-এ পদার্পণ করিতে না করিতে কারারুদ্ধ হন। পুনরায় আইন-অমান্য আন্দোলন সুরু হয়।

ইহার পর ১৯৩২ সালের মধ্যভাগে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামজে ম্যাক্‌ডোনাল্ড কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা Communal Award ঘোষণা করেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দিয়া হিন্দু সমাজকেও পৃথক নির্ব্বাচনের অস্ত্রে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। মহাত্মাজী তাহার প্রতিবাদে আমরণ অনশন সঙ্কল্প করেন, ফলে, পুণা চুক্তি অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সংশোধিত হয়।

১৯৩২ সালের শেষভাগে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক হয়, কংগ্রেসের কোনও প্রতিনিধি ইহাতে ছিলেন না। ১৯৩৩ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কার সম্পর্কিত তাঁহাদের প্রস্তাবসমূহ প্রকাশিত করেন। এই সকল প্রস্তাব, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের সদস্য লইয়া গঠিত এক যুক্ত কমিটি (Joint Select Committee) কর্ত্তৃক বিবেচিত হয় এবং ১৯৩৪ সালে এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। প্রধানতঃ এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্ত্তৃক ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন (The Government of India Act, 1935) গৃহীত হয়।

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের বিশেষত্বসূচক চিহ্নগুলি

(Characteristic Features of the Government of India Act, 1935.)

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহার দ্বারা এক সর্ব্ব-ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। ১১টি ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রদেশ, চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশসমূহ এবং যোগদানেচ্ছু দেশীয় রাজ্যসমূহকে লইয়া এই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবার কথা ছিল। ইহার পূর্ব্বে যে শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহা সরকারী বিষয়গুলির বিভাগ ও প্রাদেশিক সরকারের অস্তিত্ব থাকা স্বত্বেও যুক্তরাষ্ট্রমূলক ছিল না, তাহা এক-রাষ্ট্রীয় সরকার (Unitary Government) ছিল। প্রদেশগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন প্রতিনিধিস্থানীয় ছিল। তাহাদের নিজস্ব পৃথক কোনও অস্তিত্ব ছিল না।

প্রদেশে দ্বৈত-শাসন তুলিয়া দিয়া সম্পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল। বিবিধ রক্ষাকবচ কণ্টকিত হওয়ার জন্য এই প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষিত স্বায়ত্ত-শাসন হয় নাই। কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে দ্বৈত-শাসন প্রবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বড়লাটের খাস বিষয়রূপে তাঁহার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। অপর বিষয়গুলি বড়লাট মন্ত্রীদের সাহায্যে পরিচালনা করিবেন, এই প্রস্তাব করা হইয়াছিল।

এই আইনে উড়িষ্যা ও সিন্ধু, এই দুইটি প্রদেশ নূতন করিয়া গঠিত হয়।

ভারতবর্ষ যে ডোমিনিয়ন-তুল্য শাসন-ব্যবস্থা ও মর্য্যাদা (Dominion Status) লাভ করিবে, ইহা ১৯৩৫ সালের আইনে উল্লেখ করা হয় নাই। বস্তুতঃ, এই আইনে 'ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস' কথাটির উল্লেখ সযত্নেই পরিহার করা হইয়াছিল।

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষত্ব

(Characteristic Features of the Federation as contemplated in the Government of India Act, 1935.)

১৯৩৫ সালের আইনের পরিকল্পিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের তুলনা ইতিহাসে নাই। যুক্তরাষ্ট্র সাধারণতঃ দুই ভাবে গঠিত হইয়াছে। কতিপয় স্বয়ং-সম্পূর্ণ সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র, তাহাদের কর্ত্তৃত্বের কিছু কিছু ছাড়িয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে পারে, অথবা এক-কেন্দ্রিক (unitary) রাষ্ট্র কয়েকটি স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রাপ্ত অংশে বিভক্ত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে পারে।

ভারতবর্ষের বেলায় এই উভয় পন্থাই অনুসরণ করা হইয়াছে। স্বায়ত্ত-শাসন প্রাপ্ত প্রদেশসমূহ এবং দেশীয় রাজ্যসমূহ লইয়া, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিবার কল্পনা করা হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের ফলে প্রদেশসমূহের ক্ষমতা অনেকখানি বাড়িত এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের ক্ষমতা অনেকখানি কমিত। তাহা ছাড়া, অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে গঠনকারী রাষ্ট্র বা প্রদেশগুলিতে একই ধরণের সরকার থাকে। কিন্তু পরিকল্পিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রদেশগুলি ও দেশীয় রাজ্যগুলিতে বিভিন্ন প্রকার শাসন-ব্যবস্থা ছিল। প্রদেশগুলিতে মোটামুটি গণতন্ত্রসম্মত জনসাধারণের প্রতি দায়িত্বশীল সরকার ছিল; কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলিতে অধিকাংশ জায়গায় স্বৈরতন্ত্র (autocracy) বর্ত্তমান ছিল। অতএব, ১৯৩৫ সালের আইনের

পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্র কার্য্যকরী হইলে গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের এক অতি অদ্ভুত মিলন দেখা যাইত।

তৃতীয়তঃ, পৃথিবীর অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে, সম্মিলিত রাষ্ট্রগুলি বা প্রদেশগুলি সমভাবে কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রের অধীন থাকে, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার সমভাবে সাধারণ কতকগুলি ব্যাপারে রাষ্ট্র বা প্রদেশগুলির উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। কিন্তু ১৯৩৫ সালের আইনে পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত প্রদেশগুলি যদিও সমানভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীন হইত, যোগদানকারী দেশীয় রাজ্যগুলি কিন্তু সমানভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীন হইতে পারিত না, সেগুলিকে বিভিন্নভাবে অধীন হইতে হইত। দেশীয় রাজ্যগুলি আবার সরাসরি ব্রিটিশ সম্রাটের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবারও অধিকার পাইয়াছিল। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে, যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার উর্দ্ধ-পরিষদে সংযুক্ত রাষ্ট্রসমূহ সমভাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া থাকে। কিন্তু ১৯৩৫ সালের পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ উর্দ্ধ-পরিষদে সমসংখ্যক প্রতিনিধি না পাঠাইয়া বিভিন্ন সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাইবে, এইরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে অনুল্লিখিত অবশিষ্ট বিষয়গুলি (Residuary Subjects) হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ নতুবা যোগদানকারী প্রাদেশিক বা রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ পাইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের বেলায় এক অদ্ভুত ব্যবস্থা দ্বারা অনুল্লিখিত অবশিষ্ট বিষয়গুলিকে (Residuary Subjects) বিভাগের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। গভর্ণর জেনারেল নিজের খুসীমত এইসব বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রদেশিক সরকার ও যোগদানকারী দেশীয় রাজ্যসমূহকে দিতে পারিতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৯৩৫ সালের পরবর্ত্তী গঠনতান্ত্রিক পরিণতি

(Constitutional Development after the Government of India Act, 1935)

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্র সকল রাজনৈতিক দল কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। ইহা শেষ পর্য্যন্ত আর চালু হয় নাই। ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের কেন্দ্রীয় সরকার সংক্রান্ত অংশ একেবারেই প্রবর্ত্তন করা হয় নাই। শুধু প্রাদেশিক অংশটুকুই কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছিল।

১৯৩৭ সালে বিভিন্ন প্রদেশে আইন সভার নির্ব্বাচন শেষ হয়। বঙ্গদেশ, সিন্ধু ও পাঞ্জাব ব্যতীত সর্ব্বত্রই কংগ্রেস নির্ব্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ্জন করে এবং সেই আটটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে।

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন প্রকৃতপক্ষে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। কংগ্রেস এই আইন গ্রহণ করে নাই। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হইলে, ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের মতামতের অপেক্ষা না করিয়া ভারতবর্ষকে যুধ্যমান জাতি বলিয়া ঘোষণা করে। কংগ্রেস দাবী করে যে, যুদ্ধের লক্ষ্য কি—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এই যুদ্ধের একটি লক্ষ্য কিনা, এই যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অথবা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম,—তাহা ঘোষণা করা হউক। ব্রিটিশ সরকারের জবাব অসন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করে। পরে আবার ব্রিটিশ সরকারের তরফ হইতে বলা হয় যে, ভারতে ডোমিনিয়ন তুল্য শাসনতান্ত্রিক মর্য্যাদা (Dominion Status) দান ব্রিটিশ শাসনের লক্ষ্য, যুদ্ধের অন্তবর্ত্তীকালে বড়লাটের শাসন-পরিষদে অধিক সংখ্যক সদস্য গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র রচনা করিবার জন্য ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি সভা আহ্বান করা হইবে।

১৯৪০ সালের আগষ্ট মাসে ব্রিটিশ সরকার পুনরায় এই মর্ম্মে এক ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষ গ্রেট ব্রিটেন এবং ডোমিনিয়নের সমান শাসনতান্ত্রিক মর্য্যাদা লাভ করিবে এবং ভারতীয় প্রতিনিধিগণ ভারতবর্ষের প্রধান দলগুলির গ্রহণযোগ্য গঠনতন্ত্র রচনা করিতে পারিবেন।

ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাব
(Cripps' Proposal)

ইতিমধ্যে কংগ্রেস ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রতিদিন ভারতবর্ষে তীব্র অসন্তোষ ও সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মনোভাব বাড়িতেছিল। ১৯৪১ সালে জাপান যুদ্ধে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার দেশগুলি অতি সহজে একে একে জাপানের করতলগত হয়। ইহার পর ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌ (Sir Stafford Cripps) ভারতবর্ষে আসেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতার সহিত আলোচনার পর শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট সমাধান করিবার জন্য ব্রিটিশ সরকারের তরফ হইতে একটি প্রস্তাব করেন। ইহা ক্রিপ্‌স্‌-প্রস্তাব (Cripps' Proposals) নামে পরিচিত।

ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাবে যুদ্ধোত্তরকালের ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হইয়াছিল যে, যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের উপর ভারতবর্ষের নব-শাসনতন্ত্র রচনার ভার দেওয়া হইবে; দেশীয় রাজন্যগণের প্রতিনিধিরাও এই শাসনতন্ত্র রচনাকারী সভাতে যোগ দিতে পারিবেন। যে-কোনও প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য নব-রচিত শাসনতন্ত্রে যোগ না দিয়া পৃথক থাকিতে পারিবে। অন্তর্ব্বর্ত্তীকালের জন্য এই কথা বলা হইয়াছিল যে, যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হস্তে অধিকতর ক্ষমতা দিতে পারিবেন না, এবং ভারত রক্ষার সমস্ত ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকার নিজ হস্তে রাখিবেন।

এই প্রস্তাব অসন্তোষজনক বলিয়া কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করেন। মহাত্মা গান্ধী এই প্রস্তাবকে 'পরবর্ত্তী তারিখে দেয় চেক' (Post-dated cheque) বলিয়া বর্ণনা করেন। হিন্দু মহাসভা এই বলিয়া ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন যে, ভারতবর্ষের অংশসমূহকে বিচ্ছিন্নভাবে পৃথক থাকিবার অধিকার দেওয়ায় কার্য্যতঃ পাকিস্থান স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে মুস্লিম লীগ এই বলিয়া প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন যে, ইহার দ্বারা পাকিস্তান দেওয়া হয় নাই।

ইহার পর ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে বোম্বাই-এ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে 'ভারত ছাড়' (Quit-India) প্রস্তাব গৃহীত হইবার পরেই কংগ্রেস বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয় এবং নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র ভারতব্যাপী গণ-বিক্ষোভ দেখা দেয়। গভর্ণমেণ্ট দেশের উপর নিষ্ঠুর নির্য্যাতনের স্রোত বহাইয়া এই আন্দোলন দমন করিবার চেষ্টা করে।

মন্ত্রী-মিশন
(Cabinet Mission)

ইহার পর ১৯৪৬ সালের প্রথম ভাগে ইংলণ্ডের শ্রমিক সরকার ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধান করিবার উদ্দেশ্যে এক মন্ত্রী-মিশন (Cabinet Mission) প্রেরণ করেন। ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ এবং মিঃ আলেক্‌জাণ্ডার, এই তিনজন 'ক্যাবিনেট' (Cabinet) মন্ত্রী লইয়া এই দল গঠিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহিত আলোচনা করিয়া মন্ত্রী-মিশন ১৯৪৬ সালের ১৬ই মে, নিম্নলিখিতরূপ প্রস্তাব প্রকাশিত করেন।

১। সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে, মুস্লিম লীগের দাবী অনুসারে পাকিস্থান বা ভারত বিভাগ মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না।

২। ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহকে লইয়া একটি ভারতীয় ইউনিয়ন গঠিত হইবে। এই ভারতীয় ইউনিয়ন দেশরক্ষা (Defence), পররাষ্ট্র বিভাগ (External Affairs) এবং যান-বাহন ব্যবস্থা (Communications) পরিচালনা করিবে। ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট অংশসমূহের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত একটি শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ থাকিবে। ইউনিয়নের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য উপযুক্ত রাজস্ব সংগ্রহ করিবার ভার ইউনিয়নের থাকিবে। উল্লিখিত নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতাগুলি ব্যতীত অন্য সমুদয় ক্ষমতা প্রদেশের হাতে থাকিবে।

৩। প্রদেশগুলিকে নিম্নলিখিত রূপ তিনটি ভাগে বা 'সেক্‌শনে' (Section) ভাগ করা হইবে। যথা,—সেক্‌শন (ক)—মাদ্রাজ, বোম্বাই, সংযুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্য-প্রদেশ ও উড়িষ্যা; সেক্‌শন (খ)—পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ; সেক্‌শন (গ)—বাঙ্গালা ও আসাম। প্রত্যেক সেক্‌শন হইতে নির্ব্বাচিত গণ-পরিষদের সদস্যগণ প্রদেশগুলির শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন এবং সেক্‌শনের প্রদেশ-গুলি লইয়া গঠিত 'গ্রুপের' (Group) জন্য আলাদা শাসনতন্ত্র রচনা হইবে কিনা, তাহাও স্থির করিবেন। সেক্‌শনের অনুরূপভাবে প্রদেশগুলি 'গ্রুপ' গঠন করিতে পারিবে এবং প্রত্যেক 'গ্রুপ' স্থির করিবে কোন্ কোন্ বিষয় 'গ্রুপের' আইন সভার হাতে দেওয়া হইবে। কোনও প্রদেশ ইচ্ছা করিলে, প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচনের পর 'গ্রুপ' ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে।

৪। প্রদেশগুলি ও দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিবর্গ লইয়া একটি গণ-পরিষদ

গঠিত হইবে। (Constitution-making Body—এই কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছিল, Constituent Assembly কথাটি ব্যবহৃত হয় নাই।) এই গণ-পরিষদ ব্রিটিশ ভারত হইতে ২৯৬ জন প্রতিনিধি এবং দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে ৯৩ জন প্রতিনিধি, মোট ৩৮৯ জন প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইবে। প্রদেশসমূহের প্রতিনিধিবর্গ আইন সভার নিম্ন-পরিষদসমূহ কর্তৃক আনুপাতিক নির্ব্বাচনের (proportional representation) ভিত্তিতে নির্ব্বাচিত হইবেন। দেশীয় রাজ্যসমূহের নির্ব্বাচন কিভাবে হইবে, তাহা দেশীয় রাজ্যসমূহের সহিত আলোচনা দ্বারা নির্ণয় করা হইবে।

৫। গণ-পরিষদ যে-কোনও রকম শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিবেন এবং ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে কিনা তাহা স্থির করিবার অধিকার পাইবেন।

৬। গণ-পরিষদ ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত কয়েকটি ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের সহিত একটি চুক্তি করিবেন।

মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশ হইতে গণপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন করা হয়; কংগ্রেস ২০৭টি আসন অধিকার করিয়া অন্য দল নিরপেক্ষ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অর্জ্জন করেন। মুস্লিম লীগ ৭৩টি আসন দখল করেন। ১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন হয়। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণপরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

কংগ্রেস গণপরিষদকে সার্ব্বভৌম পরিষদ বলিয়া মনে করিয়া স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্র রচনা করিবার উদ্দেশ্যে গণপরিষদকে গ্রহণ করিতে স্থির করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে মুস্লিম লীগ গণপরিষদ দ্বারা পাকিস্থান অর্জ্জন করা যাইবে না এবং ইহা সার্ব্বভৌম প্রতিষ্ঠান নহে, এই মনে করিয়া গণপরিষদ বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত করেন এবং ১৬ই আগষ্ট কুখ্যাত 'প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষ' আরম্ভ করেন। এই দিন হইতে ভারতবর্ষে বর্ব্বরতম সাম্প্রদায়িক হত্যা, লুণ্ঠন প্রভৃতি আরম্ভ হয়।

অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার

(Interim Government)

ইহার পর ২রা সেপ্টেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার (Interim Government) গঠন করেন। মুস্লিম লীগ প্রথমে ইহাতে যোগ না দিলেও কিছু পরে ইহাতে যোগদান করেন। অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার সম্পর্কে চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

ব্রিটিশ সরকারের ভারত ছাড়িবার সিদ্ধান্ত
(British Government's declaration to Quit-India)

ইহার পর ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলি এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, ভারতীয় গণপরিষদ যেভাবে কাজ করিতে পারিবেন আশা করা হইয়াছিল, মুশ্লীম লীগ যোগ না দেওয়ায় তাহা সম্ভব হয় নাই। এদিকে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ভারতীয়দের হস্তে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে যদি সর্ব্বসম্মত কোনও শাসনতন্ত্র রচিত না হয়, তাহা হইলে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের স্বার্থরক্ষা যেভাবে হইবে বুঝিবেন, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, নতুবা প্রাদেশিক সরকারের হাতে, অথবা অন্য যে-কোনও ভাবে শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন, ইহা মনস্থ করিয়াছেন। এই নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউন্টব্যাটেন বড়লাট হইয়া আসিলেন।

মাউণ্ট ব্যাটেন্ পরিকল্পনা
(Mountbatten Plan)

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলসমূহের সহিত আলোচনার পর ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন নিম্নলিখিত পরিকল্পনা প্রকাশিত করেন।

ভারতবর্ষকে পাকিস্থান ও ভারতীয় ইউনিয়ন—এই দুই ভাগে ভাগ করা হইবে। এক ভাগে থাকিবে সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান এবং পাঞ্জাব, বাঙ্গলা ও আসামের অংশ। অপর দিকে ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশ। বাঙ্গলা ও পাঞ্জাব প্রদেশকে মুসলমান প্রধান অঞ্চল ও অমুসলমান প্রধান অঞ্চল, এই দুই ভাগে ভাগ করা হইবে। আসামের শ্রীহট্ট জেলাতে গণভোট দ্বারা স্থির হইবে—ইহা পূর্ব্ব পাকিস্থানে যুক্ত হইবে, না, আসামের অঙ্গ হিসাবে থাকিবে। একটি সীমানা-কমিশন (Boundary Commission) কর্ত্তৃক বাঙ্গলা, পাঞ্জাব ও আসামের মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলির সীমানা নির্দ্দিষ্ট করা হইবে। মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলি পাকিস্থানের সহিত সংযুক্ত হইবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্থানে যোগ দিবে কিনা, তাহা গণভোট দ্বারা নির্ণয় করা হইবে। বেলুচিস্থানের অভিপ্রায়ও জানিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭
(Indian Independence Act, 1947)

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট মাউণ্টব্যাটেন-পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন 'পাশ' করেন। এই আইন অনুসারে ভারতবর্ষে দুইটি ডোমিনিয়ন (Dominion), যথা—ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান সৃষ্টি করা হইয়াছে। সিন্ধু, বেলুচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সীমানা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট পশ্চিম পাঞ্জাব এবং (আসামের অংশসহ) পূর্ব্ব বাঙ্গলা—এই সমস্ত অংশ লইয়া পাকিস্থান গঠিত হইয়াছে। ব্রিটিশ-ভারতের অবশিষ্ট অংশসমূহ লইয়া ভারতীয় ডোমিনিয়ন গঠিত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে পাকিস্থান গণপরিষদ ও ভারতীয় গণপরিষদের হাতে সংশ্লিষ্ট অংশসমূহের সম্পূর্ণ শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়াছে। প্রত্যেক গণ-পরিষদ নিজ নিজ ডোমিনিয়নের জন্য নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিতেছেন। গণ-পরিষদ ইচ্ছা করিলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে পারেন। যতদিন পর্য্যন্ত না নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইয়া চালু হইতেছে, ততদিন প্রত্যেক ডোমিনিয়নে নূতন অবস্থা অনুযায়ী সংশোধিত ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন [The Government of India Act, 1935, as adapted by the India (Provisional Constitution) Order 1947] বলবৎ থাকিবে।

দেশীয় রাজ্যগুলি ক্ষমতা হস্তান্তরের দিবস হইতে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী ভারতীয় ডোমিনিয়ন অথবা পাকিস্থান—এই দুইটির যে-কোনওটিতে যোগ দিবার অধিকার অথবা ইচ্ছা করিলে স্বাধীন থাকিবার অধিকার পাইয়াছে। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য ভৌগলিক অবস্থান এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিয়াছে।

গণ-পরিষদ
(The Constituent Assembly)

বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় নেতৃবৃন্দ গণপরিষদ কর্তৃক ভারতীয় শাসন-তন্ত্র রচনার কথা ভাবিয়াছিলেন। ১৯৩৪ সালে স্বরাজ্য পার্টি দাবী করিয়াছিলেন যে, সর্ব্বশ্রেণীর ভারতীয়দের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া গঠিত গণপরিষদ ভারতবর্ষের জন্য গ্রহণযোগ্য শাসন-তন্ত্র রচনা করিবেন। ঐ বৎসরই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি

প্রাপ্তবয়স্কমাত্রের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত গণ-পরিষদ কর্তৃক শাসন-তন্ত্র রচনার প্রস্তাব করেন। পুনরায় ১৯৩৬ সালের ফৈজপুর অধিবেশন এবং ১৯৪০ সালের রামগড় অধিবেশনে, কংগ্রেস ভারতীয়গণের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া গঠিত গণ-পরিষদের দাবী করেন। প্রথমে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় কংগ্রেসের এই যুক্তি-সঙ্গত দাবীতে কর্ণপাত করেন নাই। ১৯৪২ সালে ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবে প্রথম গণ-পরিষদের দাবী স্বীকার করা হয়। ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবে বলা হয় যে, যুদ্ধ অবসানে ভারতের শাসন-তন্ত্র রচনার জন্য একটি নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি সভা গঠিত হইবে। ইহার পর মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনায় গণ-পরিষদ রচনার প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রত্যেক প্রদেশ এবং যোগদানকারী দেশীয় রাজ্য প্রতি দশ লক্ষ অধিবাসীতে একজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন। প্রাদেশিক আইন সভার নিম্ন-পরিষদের সদস্যগণ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে (by the method of proportional representation with single transferable vote) প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন। যোগদানকারী দেশীয় রাজ্য সমূহের সহিত আলোচনার পর স্থির করা হয় কি ভাবে দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবে। প্রথমে গণ-পরিষদ গঠনের পর বিভিন্ন দলের সদস্য সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ ছিল—

কংগ্রেস—২০৬
মুস্লিম লীগ—৭৪
স্বতন্ত্র—৮ (হিন্দু ৭, মুসলমান ১)
ইউনিয়নিষ্ট পার্টি—৩ (হিন্দু ২, মুসলমান ১)
আকালি দল—৩
কমিউনিষ্ট—১
তপশীলী জাতি ফেডারেশন—১

১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর নয়া দিল্লীতে কন্‌ষ্টিটিউশন হলে প্রথম গণ-পরিষদের অধিবেশন বসে। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বসম্মতিক্রমে গণ-পরিষদের স্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

মুস্লিম লীগ সদস্যগণ গণ-পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করেন নাই। প্রকৃত-পক্ষে মুস্লিম লীগ কংগ্রেসের গণ-পরিষদের দাবী কোনও দিন সমর্থন করে নাই। শেষ পর্য্যন্ত যখন কংগ্রেসের গণ-পরিষদের দাবী পূরণ হইবার উপক্রম হইল, তখন মুস্লিম লীগ দাবী করিয়া বসিল যে, পাকিস্তান অঞ্চলের জন্য আলাদা গণ-পরিষদ গঠন করিতে হইবে।

১৯৪৬ সালের ১৩ই জানুয়ারী পণ্ডিত নেহেরু গণ-পরিষদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বহু আলোচনার পর ২১শে জানুয়ারী এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। গণ-পরিষদ কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি গঠন করিয়াছেন যথা, (Negoti ating Committee—ইহাদের কার্য্য, যোগদানকারী দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত বিবিধ বিষয় আলোচনা করা), উপদেষ্টা সমিতি (Advisory Committee—ইহাদের উদ্দেশ্য, সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা, নাগরিকদের অধিকার প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া), ইউনিয়ন গঠনতন্ত্র কমিটি (Union Constitution Committee—ইহাদের কার্য্য, ভারতীয় ইউ-নিয়নের কেন্দ্রীয় শাসন-তন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন, প্রাদেশিক গঠনতন্ত্র কমিটি (Provincial Constitution Committee—ইহাদের কার্য্য, প্রদেশ-গুলির শাসন-তন্ত্রের খসড়া প্রণয়ণ) প্রভৃতি।

১৯৪৭ সালে ৩রা জুন প্রকাশিত মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুযায়ী গণ-পরিষদ দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে ; পাকিস্তান অঞ্চলের জন্য পাকিস্তান গণ-পরিষদ ও ভারতীয় ইউনিয়নের জন্য ভারতীয় গণ-পরিষদ গঠিত হইয়াছে। পাকিস্তান গণ-পরিষদ ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে করাচীতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। কায়েদ-এ-আজম জিন্না পাকিস্তান গণ-পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতীয় গণ-পরিষদ ভারতীয় ইউনিয়নের শাসন-সংক্রান্ত সার্ব্বভৌম ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। ঐ তারিখ হইতে পাকিস্তান গণ-পরিষদ পাকিস্তান শাসন-সংক্রান্ত সার্ব্বভৌম ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন।

ভারতীয় গণ-পরিষদের সদস্য সংখ্যা নিম্নলিখিত রূপ :—

গভর্ণর শাসিত প্রদেশ ও চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশসমূহ

পশ্চিম বঙ্গ	...	২১	মধ্য প্রদেশ ও বেরার	...	১৭
মাদ্রাজ	...	৪৯	আসাম	...	৮
বোম্বাই	...	২১	উড়িষ্যা	...	৯
যুক্তপ্রদেশ	...	৫৫	দিল্লী	...	১
পূর্ব্বপাঞ্জাব	...	১৬	আজমীর মারওয়ারা	...	১
বিহার	...	৩৬	কূর্গ	...	১
			মোট	...	২৩৫

দেশীয় রাজ্যসমূহ

মহীশূর ...	৭	ত্রিবাঙ্কুর ...	৬
গোয়ালিয়র ...	৪	অন্যান্য ...	৪৯
বরোদা ...	৩	মোট ...	৬৯

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী গণ পরিষদের উপর ডোমিনিয়ন আইন-সভার (Dominion Legislature) উপর সকল ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মবলঙ্কর ডোমিনিয়ন আইন-সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ডোমিনিয়ন আইন-সভা ডোমিনিয়ন সংক্রান্ত যে কোনও আইন করিবার অধিকারী। ডোমিনিয়ন আইন সভার কোনও আইন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কোনও আইনের বিরোধী হইলেও, তাহা বলবত হইবে।

ভারতীয় গণ-পরিষদ ভবিষ্যৎ ভারতীয় শাসন-তন্ত্রের যে খসড়া রচনা করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭
(15th. August, 1947)

এই স্মরণীয় দিবসে ব্রিটিশ শাসকদিগের হস্ত হইতে ভারতীয়দিগের হস্তে শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। এই দিন ভারতীয় গণ-পরিষদ ভারতীয় ডোমিনিয়নের সার্ব্বভৌম শাসন-ক্ষমতা এবং পাকিস্তান গণ-পরিষদ পাকিস্তানের সার্ব্বভৌম শাসন-ক্ষমতা লাভ করেন। ১৪ই আগষ্ট রাত্রি দ্বিপ্রহরে নয়া দিল্লীতে ভারতীয় গণ-পরিষদের সদস্যগণ মিলিত হইয়া যথোচিত গাম্ভীর্য্য সহকারে ভারতীয় ডোমিনিয়নের পূর্ণ শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সকল সদস্য ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর প্রতি সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন বলিয়া নম্রভাবে প্রতিজ্ঞা করেন। পণ্ডিত জওহরলাল এই উপলক্ষে বলেন, “এই দ্বিপ্রহর রাত্রিতে, যে সময় সমগ্র বিশ্ব নিদ্রামগ্ন, সে সময় ভারতবর্ষ স্বাধীনতার স্পন্দনে নবজীবন লাভ করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে।” এই দিন সর্ব্বত্র বিপুল অদৃষ্টপূর্ব্ব উৎসাহ উদ্দীপনা ও আড়ম্বর সহকারে উৎসব পালন করা হয়।

ভারত ডোমিনিয়নের গভর্ণর জেনারেল
(The Governor General of the Dominion of India)

ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী ভারত ডোমিনিয়নের জন্য লর্ড মাউন্টব্যাটেন প্রথম গভর্ণর জেনারেল রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তান উভয় ডোমিনিয়নের জন্য একজন গভর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত হইতে পারিতেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন উভয় ডোমিনিয়নের গভর্ণর-জেনারেল রূপে কাজ করিবেন, এইরূপ কথা প্রথমে স্থির হইয়াছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে মুশ্লিম লীগ আপত্তি উত্থাপন করায়, তাহা না হইয়া পাকিস্তানের জন্য কায়েদ-এ-আজম জিন্না বড়লাট রূপে নিযুক্ত হন। লর্ড ম্যাউন্টব্যাটেন ১৯৪৮ সালের জুন মাসে কার্য্যভার ত্যাগ করিয়াছেন এবং তৎস্থলে চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন।

পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাগুলিতে ভারত-শাসন ব্যবস্থা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল এবং বর্ত্তমানে কিরূপ চলিতেছে, তাহা বর্ণিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারত-সচিব

(The Secretary of State for India)

১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে ভারতশাসন আইন পাশ করেন, তাহার ফলে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে, এবং ভারত-শাসন ভার ইংলণ্ডের রাজা অর্থাৎ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করেন। এই আইনেই বোর্ড অফ্ কন্ট্রোল (Board of Control) উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং বোর্ড অফ্ কন্ট্রোলের সভাপতির সমুদয় কার্য্যভার সপারিষদ ভারত-সচিবের উপর ন্যস্ত করা হয়। সেই সময় হইতে ভারত-সচিবের পদ সৃষ্ট হয়। ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (Indian Independence Act, 1947) প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত-সচিবের পদ লোপ পাইয়াছে।

ভারত-সচিব ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ইংলণ্ডের রাজা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। তিনি ব্রিটিশ মন্ত্রি-সভার (Cabinet) একজন সদস্য ছিলেন। ভারত-সচিবের কাজ ছিল ইংলণ্ডের রাজাকে ভারতীয় ব্যাপার সম্পর্কে পরামর্শ-দান। ভারতীয় নীতি সম্পর্কে তিনি পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী ছিলেন। ভারত-সচিব যদিও ইংলণ্ডের একজন মন্ত্রী ছিলেন, তথাপি ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইন প্রবর্ত্তনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার বেতন ভারত-সরকারকে বহন করিতে হইত। কিন্তু তৎপরবর্ত্তী কাল হইতে ভারত-সচিবের বেতন ব্রিটিশ সরকার বহন করিতেন।

ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের উপর ভারত-সচিবের অনেক ক্ষমতা ছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে ভারত-শাসনের যে চিত্র দেখিতে পাই, তাহাতে সপারিষদ বড়লাট (Governor-General-in-Council) সম্পূর্ণরূপে ভারত-সচিবের অধীন ছিলেন বলা চলে। ভারত-সচিব সাগর-পারে বসিয়া ভারত-শাসন সম্পর্কে যে সব নির্দ্দেশ বা আদেশ পাঠাইতেন, সপারিষদ বড়লাটকে তাহা মানিয়া চলিতে হইত। অর্থাৎ এক কথায় ভারত-সরকার সম্পূর্ণরূপে ভারত-সচিবের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলেন। অবশ্য ভারত-সচিব যে প্রকৃত-পক্ষে সদা-সর্ব্বদা বড়লাটকে হুকুম করিয়া পাঠাইতেন, আর বড়লাট মুখ বুজিয়া

সব হুকুম মানিয়া চলিতেন, তাহা ঠিক নহে, কারণ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সাধারণতঃ বড়লাটকে অনেকখানি স্বাধীনতা দিতেন, এবং ভারত-শাসনের মূলনীতি ঠিক করিয়া দেওয়া ছাড়া সাধারণ শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তবে, একথা মনে রাখা দরকার যে, গঠনতন্ত্রের দৃষ্টিতে ভারত-সচিব বড়লাটের উর্দ্ধতন কর্ত্তা ছিলেন এবং ভারত-সচিব যখন যাহা আদেশ করিতেন, বড়লাট তাহা মানিতে বাধ্য থাকিতেন, এবং ভারত সচিবের সহিত বড়লাটের মতের মিল না হইলে বড়লাটকেই শেষে বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত।

প্রাদেশিক সরকারের কাজে ভারত-সচিবের ক্ষমতা অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিল। প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য দেওয়ার জন্য, আইনের দৃষ্টিতে ভারত সচিব প্রাদেশিক ব্যাপারে কর্তৃত্ব করিতে পারিতেন না। কিন্তু, প্রাদেশিক লাটসাহেবগণ যে সমস্ত ক্ষমতা তাঁহাদের ব্যক্তিগত বিচারে (in his individual judgement) অথবা ব্যক্তিগত বিবেচনায় (in his discretion) প্রয়োগ করিতেন, সেসব ক্ষেত্রে তাঁহারা বড়লাটের পরামর্শ প্রার্থনা করিতে এবং বড়লাটের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য থাকিতেন, এবং বড়লাট আবার তাঁহার দিক হইতে ভারত সচিবের অধীন ছিলেন। কাজেই পরোক্ষভাবে ভারত সচিব প্রাদেশিক ব্যাপারে কর্তৃত্ব করিতে পারিতেন।

অন্য একদিক দিয়া ভারত-সচিব ভারত-শাসন ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিতেন। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ও ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্ভিস, এই সব চাকরীর লোক নিয়োগের ভার ভারত-সচিবের ছিল। তিনি এই সব চাকরীতে লোক নিয়োগ করিতেন এবং এই সব চাকরীর নিয়ম-কানুন, বেতন, পেন্সন, সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি ব্যাপার তাঁহার পরিষদের পরামর্শমত স্থির করিয়া দিতেন।

ভারত-সচিব ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারত-সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং ভারত সম্পর্কিত বিতর্কের জবাব দিতেন। ভারত-সম্পর্কিত Order-in-Council এবং লাট ও বড়লাটকে যে Instrument of Instruction দেওয়া হইত, তাহা, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অনুমোদনের জন্য তিনিই উপস্থিত করিতেন।

ভারত-সচিবের উপদেষ্টা সমিতি

(Advisory Committee to the Secretary of State for India)

১৮৫৮ সালে ভারত-সচিবের পদ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহার জন্য একটি পরিষদও সৃষ্টি করা হইয়াছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন অনুযায়ী

এই পরিষদ লোপ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কয়েকজন উপদেষ্টা (Advisers) নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ভারত-সচিব নিজে ৮ হইতে ১২ জন উপদেষ্টা নিযুক্ত করিতে পারিতেন। ইঁহাদের কার্য্যকাল পাঁচ বৎসর ছিল। ইঁহারা পার্লামেন্টের সভ্য হইতে পারিতেন না। উপদেষ্টাগণের মধ্যে অন্ততঃ অর্দ্ধেক ভারত-সরকারের অধীনে অন্যূনকাল দশ বৎসর ভারতে চাকরী করিয়াছেন এবং উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত হইবার দুই বৎসর পূর্ব্বে ভারত ত্যাগ করিয়া যান নাই, এইরূপ হওয়া চাই, এই বিধান ছিল।

উপদেষ্টাগণের প্রধান কাজ ছিল ভারত-সচিবকে ভারত-শাসন সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করা। ভারত-সচিব যে ইঁহাদের উপদেশ মানিতে বাধ্য ছিলেন তাহা নহে, এমন কি তিনি ইঁহাদের পরামর্শ চাহিতে পারিতেন অথবা নাও চাইতে পারিতেন, এবং কোনও বিষয়ে পরামর্শ চাহিলেও, পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা না করা তাঁহার ইচ্ছাধীন ছিল। তবে, সিভিল সার্ভিসের লোকদের চাকুরীর ব্যাপারে, ভারতীয় রাজস্ব হইতে ব্যয় সম্পর্কে এবং ইংলণ্ডে ষ্টার্লিং ঋণ গ্রহণ করা ব্যাপার সম্পর্কে তাঁহাকে উপদেষ্টাগণের মতামত মানিয়া চলিতে হইত। উপদেষ্টা সমিতি বৃদ্ধ সিভিলিয়ানদের দ্বারা পূর্ণ থাকিত। ইহা একটি অনাবশ্যক প্রতিষ্ঠান ছিল।

ভারত-সচিবের কাজে সাহায্য করিবার জন্য উপদেষ্টা সমিতি ছাড়া দুইজন আণ্ডার সেক্রেটারী (Under Secretary-অবর কর্ম্মসচিব) থাকিতেন। এই দুইজন আণ্ডার সেক্রেটারীর মধ্যে একজন ছিলেন পার্লামেন্টারী আণ্ডার সেক্রেটারী। ভারত সচিবের মত ইঁহাকে পার্লামেন্টের সভ্য হইতে হইত এবং প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ইংলণ্ডের রাজা ইঁহাকে নিযুক্ত করিতেন। আর একজন আণ্ডার সেক্রেটারী ছিলেন স্থায়ী আণ্ডার সেক্রেটারী, ইনি ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসের একজন চাকুরীয়া ছিলেন। ইঁহার কার্য্যকাল পার্লামেন্টারী আণ্ডার সেক্রেটারীর মত অস্থায়ী ছিল না। ইনি পার্লামেন্টের সভ্য হইতে পারিতেন না। ইনি ভারত-সচিবের দপ্তরখানা, ইণ্ডিয়া অফিসের (India Office) কর্ত্তা ছিলেন এবং এই অফিস পরিচালনার কর্ত্তৃত্ব করিতেন।

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত-সচিব

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তিত হয় নাই। যদি হইত, তাহা হইলে ভারত-সচিবের ক্ষমতার অনেক পরিবর্ত্তন দেখিতে

পাইতাম। প্রথমতঃ, ভারত-সচিব যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রী-পরিষদের উপর কোনও ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। তবে, বড়লাট যে-স্থলে নিজ ব্যক্তিগত বিচার (in his individual judgment) এবং নিজ ইচ্ছাধীন ক্ষমতা (in his discretion) অনুযায়ী কাজ করিতে পারিতেন, সেক্ষেত্রে মন্ত্রীদিগের নিকট হস্তান্তরিত বিষয় সম্পর্কেও বড়লাটের উপর ভারত সচিব কর্তৃত্ব করিতে পারিতেন। যে চারটি বিষয় বড়লাটের সংরক্ষিত বিষয় বলিয়া ভারত শাসন আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেইগুলি সম্পর্কে ভারত-সচিব বড়লাটের উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। আর্থিক ব্যাপারে, ভারত-সচিব যুক্তরাষ্ট্রের আয়ের উপর দায়বদ্ধ ব্যয়গুলি (Expenditure Charged on the Revenues of Federation) সম্পর্কে সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী হইতেন।

উপদেষ্টা সমিতি সম্পর্কে এই পরিবর্ত্তন হইত যে, ভারত সচিব ৩ হইতে ৬ জন উপদেষ্টা নিযুক্ত করিতে পারিতেন।

ইণ্ডিয়া অফিস

ইহা লণ্ডনের হোয়াইট হলে অবস্থিত ভারত সচিবের দপ্তরখানা ছিল, এবং স্থায়ী আণ্ডার-সেক্রেটারী এই দপ্তরখানার প্রধান কর্ত্তা ছিলেন। ইহা কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বিভাগে একজন করিয়া সেক্রেটারী ও কয়েকজন করিয়া কেরাণী ছিলেন। ইণ্ডিয়া অফিসের খরচপত্র ব্রিটিশ সরকার ও ভারত সরকার উভয়ে বহন করিতেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বড়লাট বা রাষ্ট্রপাল

(The Governor General of India)

১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং আইন অনুযায়ী প্রথম গভর্ণর জেনারেলের পদ সৃষ্টি হয়। তখন তাঁহার নাম ছিল গভর্ণর জেনারেল অব্ বেঙ্গল। ১৮৩৩ সালে চার্টার আইন (Charter Act) অনুযায়ী গভর্ণর জেনারেল অব্ বেঙ্গল নাম বদলাইয়া গভর্ণর জেনেরেল অব্ ইণ্ডিয়া রাখা হয় এবং প্রাদেশিক সরকারগুলিকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অধীন করা হয়।

বড়লাট ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে ইংলণ্ডের রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। কোনও আইনে তাঁহার কার্য্যকাল সম্পর্কে নির্দ্দেশ না থাকিলেও, বহুদিনের প্রথা অনুযায়ী বড়লাট পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইতেন। ইংলণ্ডের রাজা Royal Sign Manual-এর Commission দ্বারা (by a Commission under the Royal Sign Manual) বড়লাটকে নিযুক্ত করিতেন। ১৯৪৭ সালের Indian Independence Act অনুযায়ী ভারত-শাসন আইনের অদল-বদল হইবার পরেও বড়লাট ইংলণ্ডের রাজা কর্তৃক (by a Commission under the Royal Sign Mannual) নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে বড়লাটের যে পদমর্য্যাদা ও আইনগত ক্ষমতা ও অধিকার ছিল, ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে, সে সমস্তের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলা চলে। প্রথমে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের অবস্থা বর্ণনা করা হইতেছে।

পূর্ব্বে বড়লাট অবিভক্ত ভারতের গভর্ণমেণ্টের শাসন বিভাগের প্রধান কর্ত্তা ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডের সম্রাটের নামে ভারত শাসন পরিচালনা করিতেন। দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে সম্রাটের ক্ষমতাসমূহ পরিচালন করিবার জন্য বড়লাট সম্রাটের প্রতিনিধি (Crown Representative) নিযুক্ত হইতেন। সম্রাট ইচ্ছা করিলে এসম্পর্কে অপর কাহাকেও প্রতিনিধি (Crown Representative) নিযুক্ত করিতে পারিতেন। যে কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবার বিশেষ অধিকার (prerogative) তাঁহার ছিল।

বড়লাটের হাতে অগাধ ক্ষমতা ছিল। বড়লাট তাঁহার ক্ষমতা পরিচালন

ব্যাপারে ভারত সচিবের কর্ত্তৃত্বাধীন ছিলেন। ভারত সচিব তাঁহাকে কোনও নির্দ্দেশ দিলে, তাহা তিনি পালন করিতে বাধ্য ছিলেন।

বড়লাটের ক্ষমতাসমূহকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়, শাসন বিষয়ক (executive), অর্থ-বিষয়ক (financial) এবং আইন বিষয়ক (legislative)।

শাসন বিষয়ক ক্ষমতা
(Executive Powers)

বড়লাট শাসন বিভাগের প্রধান কর্ত্তা ছিলেন। ভারতের দেশরক্ষা বিভাগের উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব তাঁহার ছিল। তিনি ভারতের এ্যাডভোকেট জেনারেল (Advocate General), কাউন্সিল অব্ ষ্টেটের প্রেসিডেন্ট, ফেডারেল ও হাইকোর্টসমূহের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি প্রভৃতি বড় বড় পদে লোক নিযুক্ত করিতে পারিতেন। তিনি তাঁহার শাসন পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করিবার জন্য তিনি একজনকে সহ-সভাপতি (Vice-President) নিযুক্ত করিতে পারিতেন। তিনি শাসন পরিষদের অধিকাংশের মত অনুযায়ী শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেন, তবে ব্রিটিশ ভারতের নিরাপত্তা বা স্বার্থের অজুহাতে তিনি ইচ্ছা করিলে শাসন পরিষদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া নিজের খুসীমত শাসন করিতে পারিতেন। তিনি নিজে বৈদেশিক বিভাগ ও রাজনৈতিক বিভাগের (External Affairs Department এবং Political Department) দেখাশুনা করিতেন।

বড়লাটের আইন বিষয়ক ক্ষমতা
(Legislative Powers of Governor General)

বড়লাট আইন সভার অঙ্গস্বরূপ ছিলেন। তিনি আইন সভার অধিবেশন আহ্বান করিতেন, তিনি আইন সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচনের আদেশ দিতে পারিতেন, তিনি আইন সভার কার্য্যকাল বাড়াইয়া দিতে পারিতেন এবং আইন সভার অধিবেশন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি (prorogue) করিতে পারিতেন। তিনি আইন সভায় যে কোনও পরিষদে বক্তৃতা দিতে পারিতেন, অথবা আইন সভায় তাঁহার বাণী পাঠাইয়া দিতে পারিতেন। ভারতীয় মুদ্রা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, বড়লাটের অর্ডিনান্স প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে পূর্ব্বে হইতে বড়লাটের সম্মতি না লইয়া কোনও বিল আইন সভায় উপস্থিত করিতে পারা যাইত না।

কোনও বিল আইন সভায় উপস্থিত করিবার পরও, বড়লাট ইচ্ছা করিলে, ব্রিটিশ ভারতের শান্তিরক্ষার কারণে, তাহার আলোচনা বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। কোনও বিল আইন সভা কর্ত্তৃক যথারীতি গৃহীত হইবার পর, বড়লাটের সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইত। বড়লাট এই বিলে সম্মতি দিলে তবে ইহা আইনে পরিণত হইত। বড়লাট সম্মতি নাও দিতে পারিতেন। তিনি যদি বিলে সম্মতি না দিতেন, তবে বিলটি কোনও কাজে আসিত না। বিলটি সেক্ষেত্রে আইনে পরিণত হইতে পারিত না। আইন সভা কর্ত্তৃক গৃহীত বিল তিনি আইন সভার পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইতে পারিতেন, অথবা সম্রাটের মতামতের জন্য পাঠাইতে পারিতেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে সম্রাট সম্মতি দিলে তবেই বিল আইনে পরিণত হইত।

কোনও বিল আইন সভাকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলে, বড়লাট যদি এইভাবে সুপারিশ (certify) করিতেন যে বিলটি আইনে পরিণত করা ভারতের শান্তি বা স্বার্থরক্ষার জন্য আবশ্যক, তাহা হইলে বিলটি আইনে পরিণত হইয়া যাইত। অর্থাৎ আইন সভা কোনও আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিলেও, আইন সভার মত অগ্রাহ্য করিয়া বড়লাট সেই আইন নিজে করিতে পারিতেন। তাছাড়া, বড়লাট আইন সভার অগোচরে নিজেই জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে বিবেচনা করিলে অর্ডিনান্স (ordinance) জারী করিতে পারিতেন।

অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা
(Financial Powers)

কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ও ব্যয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার অনেক ক্ষমতা বড়লাটের ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার বৎসরে যে কোটী কোটী টাকা বিবিধ খাতে ব্যয় করিতেন, তাহার শতকরা প্রায় আশীভাগের বেশী বড়লাট নিজ ক্ষমতা বলে আইন সভার সম্মতি ব্যতীত খরচ করিতেন। মোট ব্যয় দুইভাগে ভাগ হইত। একভাগ আইন সভার সম্মতির জন্য আইন সভার নিকট উপস্থিত করা হইত। অপর ভাগ আইন সভার সম্মতির জন্য উপস্থিত করা হইত না। প্রথমোক্ত ব্যয়গুলি ছিল ভোট যোগ্য (votable items of expenditure)। শেষোক্ত ব্যয়গুলি ভোটযোগ্য ব্যয় নহে (non-votable items of expenditure), এগুলির উপর আইন সভার কোনও হাত ছিল না। কোন্ কোন্ ব্যয় আইন সভার সম্মতির জন্য আইন সভার নিকট উপস্থিত করা হইবে, তাহা বড়লাট স্থির করিতেন। বড়লাট ও তাঁহার নিজস্ব কর্ম্মচারীদের এবং তাঁহার শাসন পরিষদের

সভ্যদের বেতন ও ভাতা, দেশরক্ষা, বৈদেশিক বিভাগ প্রভৃতি বিষয়ের খরচপত্র এইরূপ ছিল। এগুলি আইন সভার ভোটের জন্য উপস্থিত করা হইত না। অবশিষ্ট ব্যয় গুলি অনুমোদনের জন্য আইন সভার নিকট উপস্থিত করা হইত।

আইন সভা যদি সেগুলির মধ্যে কোনও ব্যয়-বরাদ্দের দাবী অগ্রাহ্য করিতেন অথবা দাবী কতক পরিমাণ কমাইয়া দিবার প্রস্তাব করিতেন তাহা হইলে বড়লাট তাঁহার দায়িত্ব পালনের যুক্তি দেখাইয়া আইন সভার মতের বিরুদ্ধে প্রত্যাখ্যাত দাবী পূরাপূরি মঞ্জুর করিয়া দিতে পারিতেন। অর্থাৎ ব্যয়-মঞ্জুরীর ব্যাপারে আমাদের কেন্দ্রীয় আইন সভার অধিকার অতি সামান্যই ছিল। কংগ্রেসী দলের নেতৃত্বে শাসন কর্তৃপক্ষের উপর অনাস্থা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে বহুবার সরকারী ব্যয়-বরাদ্দের দাবী অগ্রাহ্য করা হইত; কিন্তু বড়লাট প্রতিবার প্রত্যাখ্যাত দাবী পূরাপূরী মঞ্জুর করিয়া জনমত-বিরোধী শাসনের মহিমা প্রচার করিতেন। ব্যয়ের বেলাতেও যেরূপ, আয়ের ব্যাপারেও সেইরূপ বড়লাটের অনেক ক্ষমতা ছিল। ট্যাক্স্ বসাইবার প্রস্তাব-কারী কোনও বিল আইন সভা কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইলেও, বড়লাট সুপারিশ করিয়া (certify) তাহা আইনে পরিণত করিতে পরিতেন।

অবশিষ্ট অনুল্লিখিত বিষয় (Residuary Subject) কেন্দ্রীয় সরকার অথবা প্রাদেশিক সরকার যে কাহাকেও তিনি দিতে পারিতেন।

বড়লাট ও প্রাদেশিক সরকার

(Governor General and Provincial Governments)

প্রাদেশিক লাটগণ যখন তাঁহাদের নিজ ব্যক্তিগত বিচার (in their individual judgment) অথবা নিজ ইচ্ছাধীন ক্ষমতা (in their discretion) অনুসারে কাজ করিতেন। তখন তাঁহাদিগকে বড়লাটের উপদেশ বা আদেশ মানিয়া চলিতে হইত। ব্রিটিশ ভারতের শান্তি রক্ষার জন্য বড়লাট প্রাদেশিক লাটগণকে শাসন পরিচালনার প্রণালী সম্পর্কে আদেশ দিতে পারিতেন।

বড়লাটের শাসন-পরিষদ

(The Executive Council of the Governor General)

১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং আইনের সময় হইতে বড়লাটের শাসন-পরিষদ সৃষ্টি করা হইয়াছিল। প্রথমে শাসন-পরিষদের চারজন মাত্র সভ্য ছিল। পরে সভ্য-

সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। রেগুলেটিং আইনের বিধান ছিল যে বড়লাট শাসন-পরিষদের সদস্যদের অধিকাংশের মত অনুযায়ী শাসন করিতে বাধ্য থাকিবেন। পরে ১৭৮৪ সালে পিটের ভারত আইনে (Pitt's India Act, 1784) এই বিধান বদলানো হয় এবং বড়লাটকে ভারতের শান্তি ও স্বার্থের কারণে সদস্যদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া কাজ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

বড়লাটের শাসন-পরিষদের সভ্যগণ ইংলণ্ডের সম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইতেন। তাঁহাদের সদস্য-সংখ্যা স্থির নির্দ্দিষ্ট ছিল না, ইংলণ্ডের সম্রাট কর্ত্তৃক স্থির হইত। সদস্যদিগের মধ্যে তিন জন যাঁহারা দশ বৎসর ভারত সরকারের অধীন চাকরী করিয়াছেন এবং একজনের আইন বিষয়ক বিদ্যা থাকা চাই, এইরূপ বিধান ছিল।

বড়লাট শাসন-পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার স্থলে কার্য্য করিবার জন্য তিনি একজন সহকারী সভাপতি নিযুক্ত করিতে পারিতেন। শাসন পরিষদের প্রত্যেক সদস্য ভারত সরকারের এক বা ততোধিক বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইতেন। বিভাগীয় ছোটখাট বিষয়গুলি সদস্যগণ বিভাগীয় সেক্রেটারীর সহায়তায় নিজেরাই ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলির সিদ্ধান্ত শাসন পরিষদের সভায় করা হইত। সাধারণতঃ বড়লাট সদস্যগণের অধিকাংশের মত মানিয়া চলিতেন। তবে ব্রিটিশ ভারতের শান্তি, নিরপত্তা ও স্বার্থের কারণে তিনি সদস্যগণের মতামত অমান্য করিতে পারিতেন। প্রত্যেক সদস্য কেন্দ্রীয় আইন-সভায় যে কোনও একটি গৃহে সদস্য হিসাবে মনোনীত হইতেন। প্রত্যেক সদস্য আইন সভার উভয় পরিষদে অধিবেশনে যোগ দিবার ও বক্তৃতা করিবার অধিকারী ছিলেন। তবে,ভোট দিবার বেলায় তিনি শুধু যে পরিষদের সদস্য, সেই পরিষদেই ভোট দিতে পারিতেন, অন্য পরিষদে নহে। সদস্যগণ নিজ নিজ বিভাগ সংক্রান্ত বিল সমূহ আইন সভায় উপস্থিত করিতেন, বিভাগ সংক্রান্ত প্রশ্ন ও সমালোচনার উত্তর দিতেন। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে শাসন পরিষদের সদস্যগণ আইন সভার কাছে দায়ী ছিলেন না; আইন সভা তাঁহাদের উপর অনাস্থা জ্ঞাপন করিলেও তাঁহারা পদত্যাগ করিতেন না। আইনতঃ তাঁহারা বড়লাট এবং ভারতসচিবের নিকট দায়ী ছিলেন। অতীতে কতবার কেন্দ্রীয় আইনসভা শাসন পরিষদের সদস্যদের প্রস্তাব সমূহ সরাইয়া দিয়া এবং অন্যবিধ উপায়ে তাঁহাদের উপর আস্থাহীনতা প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু সদস্যগণ আইন সভার মতামতের প্রতি দৃকপাত না করিয়া নিজ নিজ পদে সমাসীন থাকিতেন।

অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার
(Interim Government)

ক্ষমতা হস্তান্তরের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে বড়লাটের শাসন পরিষদের গুরুতর পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ক্যাবিনেট মিশন (Cabinet mission) পরিকল্পনা অনুযায়ী শাসন পরিষদ ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া সাজাইয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী (Interim Government) সরকার গঠন করা হইয়াছিল।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠিত হয়। মুস্লিম লীগ ইহাতে প্রথমে যোগ না দিলেও কিছু পরে যোগ দিয়াছিলেন। শাসনতান্ত্রিক বিচারে, অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার ১৯৩৫ সালের আইনের গণ্ডীর মধ্যে গঠিত বড়লাটের শাসন পরিষদের অনুরূপ একটি সভা ছিল, বলা যায় শাসন পরিষদের সদস্যদের মত, অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের সদস্যগণ সম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তথাপি, অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার বড়লাটের শাসন পরিষদের অনুরূপ মর্য্যাদা ও ক্ষমতাযুক্ত একটি সভামাত্র ছিল, এমন কথা ঠিক নহে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ লইয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠিত হইয়াছিল। আগে, শাসন পরিষদের সদস্যগণের, কি দেশের মধ্যে, কি আইন সভার মধ্যে, সমর্থক দল বলিয়া কিছু ছিল না। কিন্তু অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের সদস্যগণের পশ্চাতে বড় বড় রাজনৈতিক দলের এবং সাধারণভাবে সমগ্র দেশের সমর্থন ছিল। পূর্ব্ব-গঠিত কেন্দ্রীয় আইন সভারও অধিকাংশ সদস্য অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারকে সমর্থন করিতেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে, প্রকৃত ক্ষমতা ও দায়িত্ব লইয়া কাজ করিতে পারিবেন, এই সর্ত্তে পণ্ডিত নেহেরু অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠন করেন। শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিতে অবশ্য বড়লাট অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের অভিপ্রায় নাকচ করিতে পারিতেন; কার্য্যতঃ তাঁহার সে ক্ষমতা ছিল না। প্রকৃত পক্ষে, অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার ডোমিনিয়ন সরকারের মন্ত্রি-সভায় অনুরূপ মর্য্যাদা ভোগ করিতেন।

বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ
(Present Central Executive)

ভারতীয় ডোমিনিয়নের বড়লাট বা রাষ্ট্রপাল
(The Governor General of India)

ক্ষমতা হস্তান্তরের পরবর্ত্তী কালেও, বড়লাটই কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের প্রধান কর্ত্তা রহিয়াছেন। তবে পূর্ব্বকালের বড়লাট ও বর্ত্তমানের বড়লাটের শাসন-

তান্ত্রিক ক্ষমতার মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। বর্ত্তমানেও বড়লাট ইংলণ্ডের রাজা কর্ত্তৃক (by a Commission under the Royal Sign Mannual) নিযুক্ত হন। প্রকৃতপক্ষে ডোমিনিয়ন মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে ইংলণ্ডের রাজা ভারতের বড়লাট নিযুক্ত করিতে পারেন। বড়লাটের বেতন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বার্ষিক ২,৫০,৮০০ টাকা। ইহা ছাড়া ডোমিনিয়ন আইন সভা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ভাতা বড়লাট পাইয়া থাকেন। ইংলণ্ডের রাজার তরফে, ভারতীয় ডোমিনিয়নের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা বড়লাট প্রয়োগ করেন। বড়লাটের নামে ভারতীয় ডোমিনিয়নের শাসন বিভাগীয় সকল কার্য্য করা হয়। বড়লাটকে তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য ও পরামর্শ দিবার জন্য, মন্ত্রিমণ্ডলী নিযুক্ত করিতে হয়। কোনও মন্ত্রী যদি একাধিক্রমে ছয় মাস পর্য্যন্ত ডোমিনিয়ন আইন সভায় সদস্য না থাকেন, তবে তিনি আর মন্ত্রী হিসাবে থাকিতে পারেন না। মন্ত্রীদের নির্ব্বাচন করিবার ক্ষেত্রে বড়লাট যে তাঁহার ইচ্ছামত কাজ করিতে পারেন তাহা নহে; নিয়মতান্ত্রিক বড়লাট হিসাবে, তাঁহাকে সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতার পরামর্শক্রমে মন্ত্রিমণ্ডলী নিযুক্ত করিতে হইবে। মন্ত্রীদের হাতেই ভারতীয় ডোমিনিয়নের সকল বিভাগের শাসন ভার অর্পণ করা হইয়াছে। কোনও বিশেষ দায়িত্ব বা বিশেষ ক্ষমতা তাঁহার নাই।

পূর্ব্বে বড়লাটের আইন সংক্রান্ত বহু ক্ষমতা ছিল। আগেকার মত বড়লাট এখন আইন সভার অধিবেশন আহ্বান করিতে, আইন সভার কার্য্যকাল বৃদ্ধি করিতে বা আইন সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন না। তবে, বড়লাট আইন সভায় ভাষণ দিতে অথবা বাণী (Message) পাঠাইতে পারেন। কোনও বিল আইন সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার পর বড়লাটের সম্মতির জন্য উপস্থিত করিতে হয়। বড়লাটকে ঘোষণা করিতে হইবে, তিনি সম্মতি দিবেন অথবা সম্মতি দিবেন না। সম্মতি না দিলে সেই বিল তিনি পুনরালোচনার জন্য আইনসভার নিকট ফেরৎ পাঠাইতে পারেন। কোনও বিলের আলোচনা মধ্যপথে বন্ধ করা অথবা কোনও বিল অগ্রাহ্য হইলে তাহা আইনে পরিণত করা, এসব ক্ষমতা আর বড়লাটের নাই। বড়লাট সম্মতি না দিলে কোন বিল আইন বলিয়া গণ্য হইবে না।

জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে ভারতীয় ডোমিনিয়নের শান্তি ও সুশাসনের জন্য অনধিক ছয় মাস কালের জন্য বড়লাট অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারেন। তবে, এই অর্ডিন্যান্স আইনসভা (Dominion Legislature) ইচ্ছা করিলে বদলাইয়া বা একেবারে নাকচ করিয়া দিতে পারেন।

অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে বড়লাটের ক্ষমতা এই যে বড়লাট প্রতি আর্থিক বৎসরে

সরকারী আয় ব্যয়ের সম্ভাব্য পরিমাণের বিবরণ আইন সভার নিকট উপস্থিত করিবেন। বড়লাটের সুপারিশ ক্রমে বিভিন্ন বিভাগের ব্যয়ের বরাদ্দ আইন সভায় মঞ্জুরীর জন্য উপস্থিত করা হইবে। আইন সভা কোনও ব্যয়বরাদ্দের দাবী না-মঞ্জুরও করিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে বড়লাটের আগেকার মত হস্তক্ষেপের অধিকার নাই। কোনও অর্থবিষয়ক বিল (Finance Bill) বড়লাটের সুপারিশ ছাড়া আইন সভায় উথাপিত করা যাইবে না। এইরূপ অথবা অন্য বিল আইনসভা কর্তৃক অগ্রাহ্য হইলে বড়লাট কিছু করিতে পারেন না। আগেকার আমলে বড়লাট এইরূপ প্রত্যাখ্যাত বিলকে আইনে পরিণত করিতে পারিতেন।

বড়লাটের যে সব ক্ষমতার কথা বলা হইল, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে বড়লাট নিজে খুসীমত প্রয়োগ করিতে পারেন না। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর হইতে বড়লাট নিয়মতান্তিক শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন। প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রিসভা প্রয়োগ করেন। বড়লাট মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কার্য্য করেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

(The Council of Ministers of the Dominion)

বর্ত্তমান শাসন-তন্ত্রে বড়লাট, তাঁহার কার্য্যে সাহায্য ও পরামর্শ দিবার জন্য একটি মন্ত্রিসভা নিযুক্ত করেন। বড়লাট নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী মন্ত্রিদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন। বড়লাটের ইচ্ছার উপর মন্ত্রিদের কার্য্যকাল নির্ভর করে। মন্ত্রিদিগকে ডোমিনিয়ন আইন সভার সদস্য হইতে হয়। কোনও মন্ত্রী যদি একাধিক্রমে ছয়মাস কাল আইন সভার সদস্য না থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মন্ত্রিত্বের আসন ছাড়িতে হয়। সুতরাং কেহ মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হইবার সময় যদি ডোমিনিয়ন আইন সভার সদস্য না থাকেন, তাঁহাকে নিযুক্ত হইবার ছয়মাসের মধ্যে ডোমিনিয়ন আইন সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে হইবে। মন্ত্রিগণ ডোমিনিয়ন আইন সভা কর্তৃক রচিত আইন অনুযায়ী বেতন পাইয়া থাকেন। বড়লাট মন্ত্রিগণের পরামর্শ অনুযায়ী ভারতের শাসন কার্য্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রিগণ বড়লাটকে কোন্ বিষয়ে কি পরামর্শ দিয়েছেন তাহা আদালতে প্রশ্ন করা চলিবে না। যদিও বড়লাটের নামেই শাসন কার্য্য চলে, তবু বড়লাট নিয়মতান্ত্রিক শাসন কর্ত্তা মাত্র। তিনি মন্ত্রিদিগের পরামর্শ ব্যতীত কোনও কার্য্য করিতে পারেন না। মন্ত্রিসভা নির্ব্বাচন কালেও, বড়লাট নিজের খেয়াল খুসীমত কাজ

করিতে পারেন না। তাঁহাকে ডোমিনিয়ন আইন সভার সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতার পরামর্শক্রমে মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে হইবে। মন্ত্রিগণই আসল শাসন-ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। বড়লাট নিয়মতান্ত্রিক শাসন কর্ত্তা হিসাবে মন্ত্রিদিগের পরামর্শ অনুযায়ী চলিয়া থাকেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে প্রথম ভারতীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। পাকিস্তানে মিঃ লিয়াকত আলি খানের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় আইন সভা

(Central Legislature)

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর হইতে পূর্ব্ব-গঠিত গণপরিষদ ভারতীয় ডোমিনিয়নের আইন সভা হিসাবে কাজ করিতেছে। ভারতীয় ডোমিনিয়নের পার্লামেণ্টের মর্য্যাদা আগেকার কেন্দ্রীয় আইন সভার মর্য্যাদা অপেক্ষা অনেক বেশী। আগেকার আইন সভা ছিল সম্পূর্ণ পরাধীন দেশের সীমাবদ্ধ-ক্ষমতাসম্পন্ন আইন সভা। ভারতীয় ডোমিনিয়নের পার্লামেণ্ট স্বাধীন দেশের সত্যকার ক্ষমতাসম্পন্ন আইন সভা। আমরা প্রথমে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্ববর্ত্তীকালের কেন্দ্রীয় আইন সভার গঠনতন্ত্র ও ক্ষমতা আলোচনা করিতেছি।

ভারতীয় কেন্দ্রীয় আইন সভা ভারতের বড়লাট এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of State) ও ব্যবস্থা পরিষদ (Legislative Assembly) এই দুই পরিষদ লইয়া গঠিত ছিল।

রাষ্ট্রীয় পরিষদ

(The Council of State)

ইহা আইন সভার উর্দ্ধতন পরিষদ ছিল এবং ইহার সদস্যসংখ্যা ছিল ৫৮ জন। তন্মধ্যে সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে ৩২ জন নির্ব্বাচিত হইতেন, বাকী ২৬ জন সরকারী ও বে-সরকারী লোকদিগের মধ্য হইতে বড়লাট কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। এই পরিষদের সভাপতি বড়লাট কর্ত্তৃক মনোনীত হইতেন। পরিষদের কার্য্যকাল পাঁচ বৎসর ছিল, তবে, বড়লাট ইহার কার্য্যকাল বাড়াইয়া দিতে পারিতেন অথবা স্বাভাবিক কার্য্যকালের আগেও ভাঙ্গিয়া দিতে পারিতেন।

ব্যবস্থা পরিষদ

(Legislative Assembly)

ইহা আইন সভার নিম্ন-পরিষদ ছিল এবং ইহার সদস্যসংখ্যা ছিল ১৪০ জন। নির্ব্বাচিত সদস্যসংখ্যা ছিল ১০০ জন। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে প্রত্যেক প্রদেশ হইতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য নির্ব্বাচিত হইতেন। বড়লাট ৪০ জন সদস্য

মনোনীত করিতেন। পরিষদের সভাপতি সদস্যগণ কর্তৃক নিজেদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইতেন।

কেন্দ্রীয় আইন সভার ক্ষমতা
(Powers of the Central Legislature)

কেন্দ্রীয় আইন সভার আইন করিবার ক্ষমতা ভারত-শাসন আইন দ্বারা অতিমাত্রায় সীমাবদ্ধ ছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal Subjects) অথবা কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি এবং যুগপৎ বিষয়গুলি (Concurrent Subjects) সম্পর্কে আইন করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইন সভার ছিল। বড়লাট জরুরী অবস্থার ঘোষণা করিলে অথবা সংশ্লিষ্ট প্রদেশ সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া অনুরোধ করিলে কেন্দ্রীয় আইন সভা প্রাদেশিক বিষয়েও আইন করিতে পারিতেন।

কতকগুলি বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইন সভা একেবারেই কোনও আইন করিতে পারিতেন না। যেমন, সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে আইন করিবার কোনও অধিকার কেন্দ্রীয় আইন সভার ছিল না। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, বড়লাটের কোনও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি এমন কতকগুলি বিষয় ছিল যেগুলি সম্পর্কে বড়লাটের সম্মতি না লইয়া কোনও বিল আইন সভায় উপস্থিত করা যাইত না। আইন সভায় উত্থাপিত কোনও বিলের আলোচনা বড়লাট ব্রিটিশ-ভারতের নিরাপত্তা অথবা শান্তির অজুহাতে বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন কোনও বিল আইন সভায় যথারীতি গৃহীত হইবার পর বড়লাটের নিকট সম্মতির জন্য উপস্থিত করিতে হইত, বড়লাট সম্মতি দিলে তবে ইহা আইনে পরিণত হইত। তিনি সম্মতি না-ও দিতে পারিতেন। সেক্ষেত্রে বিলটি কোনও কাজে আসিত না, বিলটি আইনে পরিণত হইতে পারিত না। বড়লাটের সম্মতির জন্য উপস্থিত বিল বড়লাট আবার আইন সভার নিকট পাঠাইয়া পুনরালোচনা করিতে বলিতে পারিতেন। অথবা এইরূপ বিল সম্রাটের বিবেচনার জন্য পাঠাইয়া দিতে পারিতেন। সেক্ষেত্রে সম্রাটের সম্মতি ব্যতীত বিল আইনে পরিণত হইতে পারিত না। আইন সভা কর্ত্তৃক কোনও বিল অগ্রাহ্য হইলে বড়লাট যদি এই মর্ম্মে সুপারিশ (certify) করিতেন যে, বিলটি ব্রিটিশ-ভারতের নিরাপত্তা বা শান্তির জন্য প্রয়োজনীয়, তবে আইন সভার প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাহা আইনে পরিণত হইয়া যাইত। এসব ছাড়াও বড়লাট নিজ ক্ষমতাবলে আইন সভাকে না জানাইয়া অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তন করিতে পারিতেন। সুতরাং আইন বিষয়ক ক্ষমতা আইন সভার পরিষদগুলির হাতে না থাকিয়া বড়লাটের হাতে সমধিক ন্যস্ত ছিল।

সরকারের আয়-ব্যয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা

(Powers over the Income and Exrenditure of the Government)

সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ করিবার এবং ব্যয় করিবার সকল রকম প্রস্তাব বড়লাটের অনুমোদন লাভ করিয়া তবে আইন সভায় উপস্থিত হইত। দেশ-রক্ষা বিভাগ, বৈদেশিক বিভাগ, বড়লাট ও তাঁহার খাস কর্ম্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ের ব্যয়-বরাদ্দ আইন সভার সম্মতির জন্য উপস্থিত করাই হইত না। অথচ এই বিষয়গুলির জন্য ব্যয়ের পরিমাণ মোট সরকারী বাৎসরিক ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগের বেশী ছিল। অবশিষ্ট খাতের ব্যয়গুলির বরাদ্দ আইন পরিষদের মঞ্জুরীর জন্য উপস্থিত করা হইত। এইসব ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরীর প্রস্তাব-গুলি নিম্ন পরিষদের (Legislative Assembly) নিকট উপস্থিত করা হইত। ঊর্দ্ধ পরিষদের (Council of State) নিকট এগুলি মোটেই উপস্থিত করা হইত না। এই স্বল্প পরিমাণ ব্যয়ের ব্যাপারেও বড়লাটেরই প্রভুত্ব শেষ পর্য্যন্ত খাটিত।

আইন সভা যদি কোনও বরাদ্দ মঞ্জুর না করিতেন অথবা কোনও বরাদ্দের পরিমাণ হ্রাস করিয়া দিতেন, তাহা হইলে বড়লাট নিজ ক্ষমতাবলে তাহা মঞ্জুর করিয়া দিতে পারিতেন। তাহা ছাড়া, বড়লাট জরুরী অবস্থা বিবেচনা করিলে যে-কোনও বিষয়ে যে-কোনও পরিমাণ ব্যয় মঞ্জুর করিয়া দিতে পারিতেন, আইন সভার নিকট তাহা উপস্থিত করিবার দরকারই হইত না।

রাজস্ব অর্জ্জনের প্রস্তাবসমূহ বিলের আকারে আইন সভার সম্মুখে উপস্থিত করা হইত। এইরূপ বিল আইন সভা যদি গ্রহণ না করিতেন, তবে বড়লাট তাঁহার সুপারিশ করিবার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া তাহাকে আইনে পরিণত করিতে পারিতেন।

শাসন বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা

(Powers over the Executive)

যেসব দেশে পার্লামেণ্টারী গভর্ণমেণ্ট বা দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে, সে-সব দেশে আইন সভা শাসন বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় আইন সভার শাসন কর্ত্তৃপক্ষের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার কোনও অধিকার ছিল না। বড়লাট বা তাঁহার শাসন পরিষদ আইন সভার নিকট দায়ী

অথবা জবাবদিহী করিতে বাধ্য ছিলেন না। তিনি আইন সভার মতামত অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার কাজ করিতে পারিতেন।

আইন সভার উভয় পরিষদের পরস্পরের সম্পর্ক
(Relation between the two Houses of the Legislature)

কেন্দ্রীয় আইন সভার উভয় পরিষদ আইন প্রণয়ন ক্ষমতায় প্রায় তুল্য অধিকারী ছিলেন। অর্থ-বিষয়ক বিল (Money Bill) ছাড়া অন্যান্য সকল বিল যে-কোনও পরিষদে প্রথম উত্থাপিত করা যাইত। একটি পরিষদে বিলটি যথারীতি গৃহীত হইবার পর, অন্য পরিষদে বিলটি উত্থাপিত করা হইত। অর্থ-বিষয়ক বিল (Money Bill) শুধু নিম্ন-পরিষদ অর্থাৎ Legislative Assembly-তেই প্রথম উত্থাপিত করা যাইত। এখানে গৃহীত হইবার পর উর্দ্ধ-পরিষদে অর্থাৎ Council of State-এ উপস্থিত করা হইত।

মোটের উপর সকল বিলই উভয় পরিষদে গৃহীত হওয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু ব্যয়-বরাদ্দের মঞ্জুরী করিবার ক্ষমতা উর্দ্ধ পরিষদের (Council of State) ছিল না, ইহা শুধু নিম্ন পরিষদের (Legislative Assembly) একচেটিয়া অধিকার ছিল। কোনও বিল সম্পর্কে উভয় পরিষদের মধ্যে মত-বিরোধ উপস্থিত হইলে বড়লাট উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিতেন এবং যুক্ত অধিবেশনে অধিক সদস্যের মতানুসারে বিলটি গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য হইবে, এইরূপ বিধান ছিল।

বর্ত্তমান ভারতীয় ডোমিনিয়নের আইন সভা
(Present Parliament of the Indian Dominion)

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতীয় ডোমিনিয়নের গণপরিষদ ভারতীয় ডোমিনিয়নের আইন সভা হিসাবে কাজ করিবার অধিকার পাইয়াছেন। অবশ্য গণপরিষদ ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (Indian Independenee Act, 1947) অনুযায়ী ভারতীয় আইন সভার কার্য্য করিবার জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থাও করিতে পারেন। এই নূতন ভারতীয় আইন সভাকে ভারতীয় ডোমিনিয়ন আইন সভা (Dominion Legislaturee) অথবা ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্ট (Dominion Parliament) বলা হয়। ভারতীয় ডোমিনিয়ন আইন সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন শ্রীযুক্ত মভলঙ্কর। সভাপতি ডোমিনিয়ন আইন সভার অধিবেশন বৎসরে অন্ততঃ একবার তাঁহার ইচ্ছামত নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে আহ্বান

করিবেন ; তাঁহার (বড়লাটের নহে) সভার অধিবেশন অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ (prorogue) করার অধিকার আছে। সভার মোট সদস্যের এক ষষ্ঠাংশ লইয়া 'কোরাম' (quorum) হয়। সদস্যগণ ডোমিনিয়ন আইন সভা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বেতন ও ভাতা পাইবার অধিকারী। বড়লাট ডোমিনিয়ন আইন সভায় ইচ্ছা করিলে বক্তৃতা করিতে পারেন, অথবা কোনও বাণী (message) পাঠাইতে পারেন। কোনও বিল ডোমিনিয়ন আইন সভায় গৃহীত হইবার পর তাহা বড়লাটের সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে বড়লাটকে ঘোষণা করিতে হইবে যে, তিনি বিলে সম্মতি দিতেছেন, অথবা বিলে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন ; অসম্মতি থাকিলে বড়লাট এইরূপ বিল তাঁহার প্রস্তাব অনুযায়ী পুনরালোচনার জন্য আইন সভার নিকট ফেরত পাঠাইতেও পারেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আইন সভাকে পুনরায় বিলটি বড়লাটের প্রস্তাব অনুযায়ী আলোচনার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বড়লাট প্রতি আর্থিক বৎসরে ডোমিনিয়ন আইন সভায় সম্ভাব্য সরকারী আয় ও ব্যয়ের বিবরণ উপস্থিত করাইবেন। ইহাকে বাৎসরিক আর্থিকবিবরণী (Annual Financial Statement) বলা হইয়াছে। এই বিবরণীর মধ্যে যে সমস্ত ব্যয় ডোমিনিয়নের আয়ের উপর দায়বদ্ধ (expenditure charged upon the revenues of the Dominion) * এবং অন্যান্য ব্যয় পৃথক পৃথক ভাবে দেখানো হইবে। যে সমস্ত ব্যয় ডোমিনিয়নের আয়ের উপর দায়বদ্ধ, সে সমূহ ডোমিনিয়ন আইন সভার সম্মতির জন্য উপস্থিত করা হইবে না। অন্যান্য ব্যয় আইন সভার সম্মতির জন্য উপস্থিত করা হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পূর্ব্বে বড়লাট মোট সরকারী ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগের বেশী ভোটযোগ্য ব্যয় নহে বলিয়া নিজেই

---

* নিম্নলিখিত ব্যয়গুলি ডোমিনিয়নের আয়ের উপর দায়বদ্ধ বলিয়া স্থির হইয়াছে। (১) বড়লাটের বেতন ও ভাতা। বড়লাটের বেতন ২,৫০,৮০০ টাকা। এই বেতন ছাড়া তিনি ভাতা পাইবার অধিকারী। ডোমিনিয়ন আইন সভা ভাতার পরিমাণ আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। (২) ডোমিনিয়নের সরকারী ঋণের সুদ, Sinking Fund বাবদ ব্যয়, ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধের জন্য বিবিধ ব্যয়। (৩) ডোমিনিয়ন মন্ত্রিমণ্ডলী, ডোমিনিয়নের Advocate General এবং Chief Commissioner-গণের বেতন ও ভাতা। (৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা এবং হাইকোর্টের বিচারপতিদিগকে দেয় পেন্সন। (৫) আদালতের ডিক্রি বা রায় জারী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়। (৬) ডোমিনিয়ন আইন সভা কর্ত্তৃক অন্য যে-কোনও ব্যয় ডোমিনিয়নের আয়ের উপর দায়বদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

স্থির করিতে পারিতেন এবং বাকী অংশ ভোটযোগ্য ব্যয়রূপে আইন পরিষদের নিকট উপস্থিত করা হইত। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর, মোট সরকারী ব্যয়ের সামান্য অংশ ছাড়া সমস্তই আইন সভার সম্মতির জন্য উপস্থিত করা হয়। ডোমিনিয়ন আইন সভা এই সকল ব্যয় বরাদ্দের দাবী মঞ্জুর করিতে পারেন অথবা না-মঞ্জুর করিতে পারেন, অথবা পরিকল্পিত ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়াও দিতে পারেন। আগেকার মত ডোমিনিয়ন আইন সভার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বড়লাট ব্যয় মঞ্জুর করিতে পারেন না। অর্থ-বিষয়ক বিল (Finance Bill) * বড়লাটের সম্মতি লইয়া আইন সভায় উপস্থিত করা হয়।

জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে বড়লাট, ডোমিনিয়নের শান্তি ও সুশাসনের জন্য অর্ডিন্যান্স (ordinance বা জরুরী আইন) প্রণয়ন ও প্রয়োগ করিতে পারেন। এইরূপ অর্ডিন্যান্স ছয় মাসকাল পর্য্যন্ত ডোমিনিয়ন আইন সভা কর্ত্তৃক রচিত যে কোনও আইনের তুল্য মর্য্যাদা পাইবে। তবে ডোমিনিয়ন আইন সভা আইন করিয়া এই অর্ডিন্যান্সকে অদল-বদল অথবা একেবারে বাতিল করিয়া দিতে পারেন।

* যে বিলে নূতন কর বসানো হয় অথবা বর্ত্তমান কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়, সেই বিলকে ফিন্সান্স বিল (Finance Bill) বলে। যদি কোনও বিলের দ্বারা সরকারের ঋণ গ্রহণ ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করা হয় অথবা কোনও ব্যয়কে সরকারী আয়ের উপর দায়বদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা হয়, তাহাকেও ফিন্সান্স বিল বলে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাদেশিক সরকার
(Provincial Government)

ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে
(Before the Transfer of Power)

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন অনুযায়ী এগারটি গভর্ণরের প্রদেশ (Governor's Provinces) সৃষ্টি করা হইয়াছিল, যথা—বাঙ্গলা, আসাম, উড়িষ্যা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, সিন্ধু, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। এই প্রদেশগুলিতে যে ধরণের শাসন-ব্যবস্থা ছিল, তাহা বর্ণনা করা হইতেছে।

প্রাদেশিক গভর্ণর বা দেশপাল
(Governor)

প্রাদেশিক গভর্ণর ইংলণ্ডের রাজা কর্তৃক (by a Commission under the Royal Sign Mannual) নিযুক্ত হইতেন। নিয়োগকালে গভর্ণরকে তাঁহার ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিবার প্রণালী সম্পর্কে নির্দ্দেশ দিয়া একটি Instrument of Instructions দেওয়া হইত।

গভর্ণর প্রাদেশিক শাসন বিভাগের প্রধান কর্ত্তা ছিলেন। তিনি সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে শাসন বিভাগীয় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিতেন। লাট সাহেবের নামেই প্রাদেশিক সরকারের সকল শাসন-সংক্রান্ত কাজ করা হইত। গভর্ণর তাঁহার কাজে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য মন্ত্রিমণ্ডলী নিযুক্ত করিতে পারিতেন। মন্ত্রিগণ কতকগুলি ক্ষেত্র ছাড়া শাসনকার্য্য সম্পর্কে পরামর্শ দিবার অধিকারী ছিলেন। কতকগুলি ক্ষেত্রে লাট সাহেবকে স্বেচ্ছামত কাজ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, এইগুলি সম্পর্কে মন্ত্রীদিগের পরামর্শ দিবার কোনও শাসনতান্ত্রিক অধিকার ছিল না। এসব ক্ষেত্রে মন্ত্রিগণ দাবী করিতে পারিতেন না যে, লাট সাহেব তাঁহাদের পরামর্শ না মানিলেও অন্ততঃ শুনিতে হইবে। গভর্ণর যখন এইসব ক্ষেত্রে কাজ করিতেন তখন বলা হইত গভর্ণর "acting in his discretion" (লাট সাহেব নিজ বিচার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেছেন।) এই

ক্ষমতাগুলিকে "dicretionary powers" বলা যাইত। এইসব ব্যাপার ছাড়া অন্য সকল ব্যাপারে মন্ত্রিগণ গভর্ণরকে পরামর্শ দিবার অধিকারী ছিলেন। সাধারণতঃ, গভর্ণর এই সকল ব্যাপারে মন্ত্রীদিগের পরামর্শ মানিয়া চলিতেন; তবে কতকগুলি অবস্থায় গভর্ণর মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা মত কাজ করিতে পারিতেন। এইসব ক্ষেত্রে, গভর্ণর যখন মন্ত্রীদিগের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া নিজ বুদ্ধিমত কাজ করিতেন, তখন বলা হইত গভর্ণর exercising his individual judgment (লাট সাহেব তাঁহার ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করিতেছেন)।

গভর্ণরের শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা
(Executive Powers of the Governor)

গভর্ণর সাহেব শাসন-বহির্ভূত অঞ্চলসমূহ নিজ বিবেচনা (discretion) অনুযায়ী বিচার করিতেন। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী মন্ত্রিগণ এই ব্যাপারে কিছু বলিতে পারিতেন না। গভর্ণর মন্ত্রীদিগকে নিয়োগ ও বরখাস্ত করিবার অধিকারী ছিলেন। লাট সাহেব Public Service Commission-এর সদস্যসমূহ নিযুক্ত করিতেন। হিংসাত্মক কার্য্যের দ্বারা সরকারকে হঠাইয়া দিবার যে সব কার্য্য-কলাপ হইত, তৎসম্বন্ধে পুলিশ বিভাগ হইতে যাহাতে কোনও সংবাদ বাহির হইতে না পারে, তজ্জন্য গভর্ণর নিজ ক্ষমতাবলে নিয়ম-কানুন করিতে পারিতেন।

গভর্ণরের আইন বিষয়ক ক্ষমতা
(Legislative Powers of the Governor)

আইন প্রণয়ন কার্য্যেও গভর্ণরের অনেক কর্তৃত্বের অধিকার ছিল। গভর্ণর প্রাদেশিক আইন সভা আহ্বান করিবার অথবা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী (prorogue) করিবার অধিকারী ছিলেন। যে যে প্রদেশে আইন সভার দুইটি পরিষদ ছিল, সেসব প্রদেশে প্রাদেশিক গভর্ণর নিম্ন পরিষদকে ভাঙ্গিয়া দিবার অধিকারী ছিলেন। আইন বা অর্ডিন্যান্স অথবা পুলিসী আইন প্রত্যাহার বা সংশোধন প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় সংক্রান্ত বিল গভর্ণরের সম্মতি ব্যতীত আইন সভায় উপস্থিত করিতে পারা যাইত না। তিনি যদি মনে করিতেন যে, কোনও বিল তাঁহার শান্তি ও নিরাপত্তা-রক্ষা সম্পর্কিত বিশেষ দায়িত্ব পালনে বাধা জন্মাইবে, তবে তিনি সেই বিলের আলোচনা বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। কোনও বিল আইন সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার পর, তাঁহার সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত

করা হইত। তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিলে তবে বিলটি আইনে পরিণত হইত। যদি তিনি সম্মতি না দিতেন, তবে বিল আইন রূপে গণ্য হইতে পারিত না। তিনি এই বিলকে পুনরালোচনার জন্য আইন সভার নিকট ফেরত পাঠাইতে পারিতেন, অথবা বড়লাটের মতামতের জন্য বিলটি বড়লাটের নিকট পাঠাইতে পারিতেন। এসব ছাড়াও, গভর্ণর নিজেই আইন করিতে পারিতেন। ভারত-শাসন আইন অনুযায়ী গভর্ণর যে-স্থলে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী (in his discretion) অথবা নিজ ব্যক্তিগত বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী (in his individual judgment) কাজ করিতে অধিকারী ছিলেন, সেস্থলে তিনি নিজে আইন করিতে পারিতেন; ইহাকে Governor's Act (লাট সাহেবের আইন) বলা হইত। ইহা ব্যতীত লাট সাহেব জরুরী অবস্থায় অর্ডিন্যান্স (জরুরী আইন) প্রণয়ন ও প্রয়োগ করিতে পারিতেন। অর্ডিন্যান্স দুই প্রকার ছিল। এক প্রকার অর্ডিন্যান্স আইন সভার বিরামকালে, তাড়াতাড়ি আইন করিবার দরকার হইলে প্রণয়ন করা হইত। এইরূপ অর্ডিন্যান্স আইন সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপস্থিত করিতে হইত। আইন সভা এই অর্ডিন্যান্সকে বাতিল করিয়া দিতে পারিতেন এবং আইন সভার নিকট এইরূপ অর্ডিন্যান্স উপস্থিত করা না হইলে ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই অর্ডিন্যান্স বাতিল হইয়া যাইত। আর এক রকম অর্ডিন্যান্স লাটসাহেব যখন খুসী, যে যে স্থলে তাঁহার ইচ্ছা (discretion) অনুযায়ী অথবা নিজ বিচার-বুদ্ধি (individual judgment) অনুযায়ী কাজ করিবার অধিকার ছিল, সেই সেই স্থলে তাঁহার দায়িত্ব পালনের জন্য, প্রণয়ন ও প্রয়োগ করিতে পারিতেন। এইরূপ অর্ডিন্যান্স প্রথমতঃ ছয় মাসকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারিত এবং পুনরায় ছয় মাসকালের জন্য বলবৎ করা যাইতে পারিত।

গভর্ণরের অর্থ-বিষয়ক ক্ষমতা

(Financial Powers of the Governor)

প্রাদেশিক সরকারের আর্থিক ব্যাপারে গভর্ণরের অনেক কর্তৃত্ব ছিল। প্রাদেশিক সরকারের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব লাট সাহেবের সুপারিশক্রমে আইন সভার নিকট উপস্থিত করা হইত, কোনও বিভাগের জন্য ব্যয়বরাদ্দের দাবী অথবা কোনও ট্যাক্স সংক্রান্ত কোনও বিল লাট সাহেবের সুপারিশ ছাড়া আইন সভার নিকট উপস্থিত করা যাইত না। কতকগুলি ব্যয় প্রদেশের আয়ের উপর দায়বদ্ধ

(expenditure charged upon the revenues of the Province) * রূপে গণ্য হইত। এইগুলি আইন সভার অনুমোদনের জন্য উপস্থিত করা হইত না। অন্যান্য ব্যয় আইন সভার মঞ্জুরীর জন্য হাজির করা হইত। কোনও ব্যয় প্রদেশের আয়ের উপর দায়বদ্ধ কিনা, এ প্রশ্ন উঠিলে লাট সাহেব তাঁহার নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী (in his discretion) তাহা স্থির করিতেন। আইন সভা যদি কোন ব্যয় বরাদ্দের দাবী অগ্রাহ্য করিতেন, তবে লাট সাহেব তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব পালনের অধিকারে পরিকল্পিত পরিমাণ ব্যয় মঞ্জুর করিয়া দিতে পারিতেন।

লাট সাহেব যদি কখনও দেখিতেন যে, শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে এবং ভারত-শাসন আইন অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করা যাইবে না, তাহা হইলে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে তিনি এক ঘোষণা বলে সমস্ত শাসন ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারিতেন। এই ৯৩ ধারা অনুযায়ী বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা প্রভৃতি কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলির শাসন-ভার বিগত যুদ্ধকালে লাট সাহেবরা স্বহস্তে নিজ বিচার-বুদ্ধি (in his discretion) অনুযায়ী শাসন করিবার অধিকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এ পর্য্যন্ত লাট সাহেবের ইচ্ছামত প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতার (discretionary powers) কথা বলা হইয়াছে। এসব ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক আইনের বিচারে মন্ত্রিগণ কোনও পরামর্শ দিবার অধিকারী ছিলেন না। অন্যান্য সকল ব্যাপারে সাধারণতঃ লাট সাহেব মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতেন ; তবে লাট সাহেব তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব (special responsibility) পালনের জন্য এইসব ব্যাপারেও মন্ত্রিবর্গের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া নিজের ব্যক্তিগত বিচার (in his individual judgment) প্রয়োগ করিয়া কাজ করিতে পারিতেন।

প্রাদেশিক গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্ব
(Special Responsibilities)

গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্বগুলি (special responsibilities) এইরূপ ছিল :

১। প্রদেশের অথবা প্রদেশের যে কোনও অংশের শান্তির গুরুতর বিঘ্ন নিবারণ করা।

---

* নিম্নলিখিত ব্যয়গুলি expenditure charged upon the revenues of the Province বলিয়া গণ্য হইত। (১). লাট সাহেবের বেতন ও ভাতা, (২) প্রাদেশিক সরকারের ঋণ সংক্রান্ত ব্যয়, (৩) মন্ত্রিগণ ও এ্যাড্ভোকেট জেনারেলের বেতন ও ভাতা, (৪) হাইকোর্টের বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা বাবদ ব্যয়, (৫) কোনও আদালতের রায় বা ডিক্রীজারী করিবার জন্য ব্যয়, (৬) প্রাদেশিক আইন সভা কর্তৃক প্রাদেশিক আয়ের উপর দায়বদ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট যে-কোনও ব্যয়।

২। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির বৈধ স্বার্থ রক্ষা।

৩। সরকারী চাকুরিয়াদের বৈধ স্বার্থ রক্ষা।

৪। ইংরাজদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ নিবারণ।

৫। আংশিকভাবে শাসনবহির্ভূত অঞ্চলের শান্তিরক্ষা ও সু-শাসনের ব্যবস্থা।

৬। দেশীয় রাজ্যের অধিকার রক্ষা এবং দেশীয় রাজ্যের রাজার মর্য্যাদা রক্ষা।

৭। বড়লাটের আদেশ ও নির্দ্দেশ যথাযথ পালনের ব্যবস্থা।

গভর্ণর যদি মনে করিতেন যে, মন্ত্রীদিগের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিলে তিনি তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না, তবে তিনি মন্ত্রিদিগের কথা অগ্রাহ্য করিয়া নিজ বিচার মতে কাজ করিতে পারিতেন। এইভাবে কাজ করিলে বলা হইত, Governor exercising his individual judgment।

আমরা দেখিয়াছি, লাট সাহেব ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করিবার অনেক ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। তাহার উপর এই বিশেষ দায়িত্বের অজুহাতে তাঁহারা যে ক্ষমতা পাইয়াছিলেন, তাহার কোনও সীমা ছিল না। প্রথমতঃ, বিশেষ দায়িত্বগুলি এমনভাবে রচিত যে, ইহার অর্থ সুস্পষ্ট নহে। অনেক স্থলে বিশেষ দায়িত্বগুলির অর্থ দ্ব্যর্থবোধক বলা চলে। এই বিশেষ দায়িত্বের অজুহাতে গভর্ণরগণ যথেচ্ছা শাসন চালাইবার সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়াছিলেন। মন্ত্রীদের কোনও বিশেষ পরামর্শ অনুসারে কাজ করিলে গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্ব পালনে বাধা জন্মিবে কিনা, ইহা বিচার করিবার ভার সম্পূর্ণরূপে গভর্ণর জেনারেলের অধীন গভর্ণরের ছিল। তিনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের স্বার্থসাধনের জন্য অথবা নিজের খেয়াল-খুসীমত তাঁহার বিশেষ দায়িত্বসমূহের অর্থ করিতেন। এই বিশেষ দায়িত্বের অজুহাত দেখাইয়া কোনও কোনও গভর্ণর প্রতি পদে প্রাদেশিক শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারকে প্রহসনে পরিণত করিয়াছিলেন। ১৯৪২ সালের ঘূর্ণিবাত্যায় মেদিনীপুর জেলায় এক রাত্রির মধ্যে বহু সহস্র লোকের প্রাণনাশ হয়। তৎকালীন এক কুখ্যাত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই জেলাবাসীর "রাজনৈতিক কু-কার্য্যের" (Political Misdeeds) শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে সরকারী ও বে-সরকারী সকল প্রকার সাহায্য বন্ধ করিয়া দিবার জন্য গভর্ণরকে এক গোপনীয় পত্র লিখেন। তৎকালীন মন্ত্রিমণ্ডলী দুর্গতদের সাহায্য দানের মত ব্যাপারেও নিজেরা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। গভর্ণর সর্ব্বদাই তাঁহার বিশেষ

দায়িত্বের অজুহাতে মন্ত্রীদিগকে নিবৃত্ত করিতেন। মেদিনীপুরের উক্ত হৃদয়হীন ম্যাজিষ্ট্রেটকে অপসারিত করিবার মত প্রস্তাবও গভর্ণর তাঁহার বিশেষ দায়িত্বের অজুহাতে অগ্রাহ্য করেন। বস্তুতঃ গভর্ণর বিশেষ দায়িত্বের আবরণে যথেচ্ছা শাসন চালাইতে পারিতেন।

প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা

(Provincial Cabinet or Ministry)

প্রাদেশিক গভর্ণরের শাসনকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে কয়েকজন করিয়া মন্ত্রী থাকিতেন। প্রাদেশিক গভর্ণর নিজ ইচ্ছাধীন ক্ষমতা (discretionary powers) প্রয়োগ করিয়া নিজ খুসীমত মন্ত্রীদিগকে নিয়োগ করিতে পারিতেন। গভর্ণর যতদিন খুসী মন্ত্রিগণকে তাঁহাদের পদে বহাল রাখিতে পারিতেন ; তিনি ইচ্ছা করিলে মন্ত্রীদিগকে বরখাস্তও করিতে পারিতেন। গভর্ণর সাহেব তাঁহার নিয়োগকালে তাঁহার ক্ষমতাবলীর প্রয়োগ বিষয়ক যে নির্দ্দেশ-পত্র (Instrument of Instructions) পাইতেন, তদনুযায়ী তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডল গঠন সম্পর্কে নিম্নলিখিতরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিতেন। প্রাদেশিক আইন সভার নির্ব্বাচন শেষ হইবার পর তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে ডাকিয়া মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার অনুরোধ করিতেন এবং তাঁহারই পরামর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রী নিয়োগ করিতেন। মন্ত্রিমণ্ডলের মধ্যে যাহাতে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি থাকেন, তাহার চেষ্টা করা গভর্ণরের কর্ত্তব্য ছিল। আইন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধান মন্ত্রী হইতেন। গভর্ণর প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী বিভিন্ন দপ্তর মন্ত্রীদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেন। প্রত্যেক মন্ত্রী এক বা একাধিক দপ্তরের ভার প্রাপ্ত হইতেন। প্রত্যেক মন্ত্রী তাঁহার বিভাগ বা বিভাগসমূহের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে গভর্ণরকে পরামর্শ দিতেন। গভর্ণর যেস্থলে তাঁহার ইচ্ছাধীন ক্ষমতা (discertionary powers) প্রয়োগ করিতে পারিতেন, সেস্থলে মন্ত্রিগণের পক্ষে লাট সাহেবকে কোনও পরামর্শ দিবার কোনও শাসনতান্ত্রিক অধিকার ছিল না। অবশ্য গভর্ণর ইচ্ছা করিলে এইসব ক্ষেত্রে মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিতে পারিতেন। কিন্তু ইহা তাঁহার মর্জ্জির উপর নির্ভর করিত ; গঠনতন্ত্রের দিক হইতে এইসব ব্যাপারে মন্ত্রীদিগের এমন কোনও অধিকার ছিল না, যাহার বলে মন্ত্রিগণ বলিতে পারিতেন যে গভর্ণরকে তাঁহাদের পরামর্শ দিবার ক্ষমতা আছে। এইসব ব্যাপার ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে মন্ত্রিগণ গভর্ণরকে পরামর্শ দিবার অধিকারী ছিলেন। সাধারণতঃ গভর্ণর এইসব ক্ষেত্রে মন্ত্রীদিগের পরামর্শ মানিয়া চলিতেন। প্রকৃত-

পক্ষে এইসব ব্যাপারে মন্ত্রীগণ তাঁহাদের স্ব স্ব বিভাগের শাসন পরিচালনার ব্যবস্থা করিতেন এবং গভর্ণর সচরাচর মন্ত্রীদিগের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু গভর্ণর তাঁহার বিশেষ দায়িত্বসমূহ (special responsibilities) পালন করিবার অজুহাতে এইসব ক্ষেত্রেও মন্ত্রিগণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া নিজে কাজ করিতে পারিতেন। এইরূপ কাজ করিলে বলা হইত গভর্ণর Governor exercising his individual judgment। গভর্ণর কর্ত্তৃক এই অধিকার বহুল ভাবে প্রয়োগের ফলে অনেক সময় মন্ত্রীদের শাসন হাস্যকর অভিনয়ে পরিণত হইত।

মন্ত্রিমণ্ডল ও আইন সভা

(Cabinet and the Legislature)

মন্ত্রিগণকে আইন সভার সদস্য হইতে হইত। কোনও মন্ত্রী যদি একাধিক্রমে ছয় মাস আইন সভার সদস্য না থাকিতেন, তবে তাঁহাকে মন্ত্রীর গদী ছাড়িতে হইবে, এই বিধান ছিল। সুতরাং কেহ আইন সভার সদস্য না হইয়াও মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত হইতে পারিতেন, তবে তাঁহাকে নিয়োগের ছয় মাসের মধ্যে আইন সভার সদস্য হইতে হইত। যে প্রদেশে আইন সভার দুইটি পরিষদ ছিল, প্রাদেশিক মন্ত্রিগণ যে-কোনও পরিষদের সদস্য হইতে পারিতেন। তাঁহারা উভয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে পারিতেন, তবে ভোট দিবার বেলায় তাঁহারা যে যে পরিষদের সদস্য, শুধু সেই গৃহে ভোট দিবার অধিকারী ছিলেন। আইন সভায় মন্ত্রিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব বিভাগ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং তাঁহাদের শাসন বিভাগীয় নীতি সমর্থন করিতেন। মন্ত্রিগণ আইন সভায় যাবতীয় সরকারী বিল এবং বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করিতেন এবং আইন সভার সমর্থন লাভের ব্যবস্থা করিতেন। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে মন্ত্রিসভা আইন সভার প্রতি দায়িত্বশীল ছিলেন। যতদিন তাঁহারা আইন সভার সমর্থন লাভ করিতেন, ততদিন তাঁহারা মন্ত্রিত্বের আসনে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। আইন সভা যদি কোনও ভাবে তাঁহাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে পদত্যাগ করিতে হইত।

প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডল ও প্রাদেশিক আইন সভার বর্ত্তমান সম্পর্ক এখনও উল্লিখিত রূপ রহিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

বর্ত্তমান প্রাদেশিক সরকার

(Present Provincial Government)

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর

(After the Transfer of Power)

ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় হইতে প্রাদেশিক লাট সাহেব ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার গঠনতান্ত্রিক অবস্থা অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় যাঁহারা লাটসাহেবের গদিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা ইংলণ্ডের রাজা কর্ত্তৃক (by a Commission under the Royal Sign Mannual) নিযুক্ত হইয়াছেন ; কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে বড়লাটের হাতে প্রাদেশিক গভর্ণর নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। প্রাদেশিক গভর্ণর মোট ৬৬,০০০৲ টাকা বাৎসরিক বেতন পাইবেন এবং বড়লাট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ভ্রমণ এবং বিবিধ খাতে ভাতা পাইবেন। গভর্ণর নিয়োগকালে তাঁহার ক্ষমতাসমূহ পরিচালন সম্পর্কিত নির্দ্দেশপত্র (Instrument of Instructions) আর দেওয়া হয় না।

প্রাদেশিক গভর্ণর প্রাদেশিক শাসন বিভাগের প্রধান কর্ত্তা। ইনি সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে প্রাদেশিক শাসন কার্য্য পরিচালনা করেন। গভর্ণরের নামেই শাসনকার্য্য পরিচালিত হয়। গভর্ণর তাঁহার কাজে সাহায্য ও পরামর্শ দিবার জন্য মন্ত্রী-মণ্ডলী নিযুক্ত করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে, মন্ত্রিগণ সমস্ত ব্যাপারে গভর্ণরকে পরামর্শ দিবার অধিকারী ছিলেন না। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর এই বিধান তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন মন্ত্রিসংসদ শাসনকার্য্য সংক্রান্ত সকল কাজেই গভর্ণরকে পরামর্শ দিবার অধিকারী। অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিবেচনা অনুসারে কাজ করিবার ক্ষমতা (discretionary powers) বলিয়া আর কিছু নাই। পূর্ব্বে প্রাদেশিক গভর্ণর বহুস্থলে এই discretionary powers প্রয়োগ করিবার অধিকারী ছিলেন। মন্ত্রিগণ এসব ক্ষেত্রে কোনও কথা বলিবার অধিকারী ছিলেন না। এই সব discretionary powers ছাড়া, অন্যান্য ক্ষেত্রেও গভর্ণর মন্ত্রীদের কথা মানিতে বাধ্য ছিলেন, তাহা নহে ; লাটসাহেব তাঁহার বিশেষ দায়িত্বের (special responsibili-

ties) অজুহাতে মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া নিজ বিচার মতে (in his individual judgment) কাজ করিতে পারিতেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণরকে তাঁহার বিশেষ দায়িত্বসমূহ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। গভর্ণরও মন্ত্রীদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া কাজ করিবার ক্ষমতা হারাইয়াছেন। আগে, প্রাদেশিক গভর্ণর তাঁহার ইচ্ছাধীন ক্ষমতা অনুসারে (in his discretion) মন্ত্রীদিগকে নিয়োগ ও বরখাস্ত করিবার অধিকারী ছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার সে ক্ষমতা নাই। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর হইতে প্রাদেশিক গভর্ণর নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্ত্তায় পরিণত হইয়াছেন, শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তাঁহার যতটুকু ক্ষমতা আছে সেটুকুও তিনি মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ীই প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

গভর্ণরের আইন সংক্রান্ত ক্ষমতারও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। শাসনতান্ত্রিক বিচারে এখনও আইন সভার অধিবেশন আহ্বান করিতে, যেখানে আইন সভার দুইটি পরিষদ আছে, সেখানে নিম্ন পরিষদকে ভাঙ্গিয়া দিতে এবং আইন সভার অধিবেশন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী (prorogue) করিতে পারেন। গভর্ণর আইন সভায় যাইয়া বক্তৃতা করিতে বা 'বাণী' (message) পাঠাইতে পারেন। আগে এমন কতকগুলি ব্যাপার ছিল, যেগুলি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করিতে হইলে লাটসাহেবের সম্মতি লইয়া বিল উপস্থিত করিতে হইত; এখন সে রকম কোনও পৃথক বিষয় নাই। আগে তিনি যদি মনে করিতেন যে কোনও বিল তাঁহার শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিশেষ দায়িত্ব পালনে বাধা জন্মাইবে, তাহা হইলে সেই বিলের আলোচনা বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। এখন তাঁহার সে ক্ষমতা নাই। তবে, এখনও, কোনও বিল আইন সভায় গৃহীত হইবার পর গভর্ণরের সম্মতির জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হয়। তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিলে তবে বিলটি আইনে পরিণত হইবে। তিনি এইরূপ বিলে সম্মতি নাও দিতে পারেন। বিল গভর্ণরের কাছে উপস্থিত করিতে হইলে তাঁহাকে ঘোষণা করিতে হইবে, তিনি বিলে সম্মতি দিতেছেন অথবা সম্মতি দিবেন না, অথবা, বিলটি বড়লাটের বিবেচনার জন্য পাঠাইতেছেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে বড়লাট সম্মতি জ্ঞাপন করিলে তবে, আইনে পরিণত হইবে। এই সব ক্ষমতা ছাড়াও, গভর্ণর ইচ্ছা করিলে বিলটিকে পুনরালোচনার জন্য আইন সভার নিকট ফেরৎ পাঠাইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত গভর্ণর অর্ডিনান্স্ (জরুরী আইন) জারী করিতে পারেন। যে সময় প্রাদেশিক আইন সভার অধিবেশন চলিতেছে না, অথচ, এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যে, অবিলম্বে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে অবস্থা অনুযায়ী অর্ডিনান্স্ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারেন। এই অর্ডিনান্স্ আইন পরিষদে গৃহীত

এবং গভর্ণরের সম্মতিপ্রাপ্ত আইনের সমতুল্য মর্য্যাদা পাইবে। তবে, এই অর্ডিনান্স্ আইন সভার পুনরধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে পেশ করিতে হইবে ; আইন সভা এইরূপ অর্ডিনান্স্ সমর্থন করিতে পারেন অথবা নাকচ করিয়া দিতেও পারেন। আইন সভার পুনরধিবেশনের ছয় সপ্তাহকালের মধ্যে অর্ডিনান্স্ আইন সভায় পেশ করা না হইলে, ইহা অকার্য্যকরী হইয়া যায়। গভর্ণরও ইচ্ছা করিলে যে কোনও সময় এই অর্ডিনান্স্ প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারেন। পূর্ব্বে, গভর্ণর উপরোক্তরূপ অর্ডিনান্স্ ছাড়াও যে সব ক্ষেত্রে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী (in his discretion) অথবা নিজ ব্যক্তিগত বিচার অনুযায়ী (in his individual judgmeut) কাজ করিবার অধিকারী ছিলেন, সে সব ক্ষেত্রে তাঁহার দায়িত্ব পালনের জন্য নিজে অর্ডিনান্স্ প্রণয়ন ও জারী এবং গভর্ণরের আইন (Gevernor's Act) প্রণয়ন করিতে পারিতেন। এইরূপ অর্ডিনান্স্ ও আইন সম্পর্কে কোনও কথা বলিবার অধিকার আইন সভার ছিল না। এইরূপ অর্ডিনান্স্ ও আইন সম্পর্কিত অধিকার গভর্ণরের আর নাই।

পূর্ব্বে প্রাদেশিক সরকারের আয় ও ব্যয়ের উপরও গভর্ণরের অনেক কর্তৃত্ব ছিল। এখন বাহ্যতঃ, যে কর্তৃত্ব রহিয়াছে, তাহা গভর্ণর মন্ত্রীমণ্ডলের অভিপ্রায় অনুসারে প্রয়োগ করেন। প্রাদেশিক সরকারের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বিবরণ (Annual Financial Statement) গভর্ণরের সুপারিশক্রমেই আইন সভার নিকট উপস্থিত করা হয়। এই বিবরণের মধ্যে প্রাদেশিক রাজস্বের উপর দায়বদ্ধ ব্যয়গুলি (Sums charged on the revenues of the Province) এবং অন্যরূপ ব্যয়গুলি (Sums not so charged) পৃথক পৃথক ভাবে দেখানো হয়।* যে ব্যয়গুলি প্রাদেশিক রাজস্বের উপর দায়বদ্ধ, সেগুলি আইন

---

* নিম্নলিখিত দফাগুলির ব্যয় প্রাদেশিক রাজস্বের উপর দায়বদ্ধ (Expenditure charged upon the revenues of the Province) বলিয়া গণ্য হয়:—

(১) গভর্ণরের বেতন ও ভাতা।

(২) প্রাদেশিক সরকারের ঋণ এবং ঋণের দরুণ দেয় সুদ।

(৩) প্রাদেশিক মন্ত্রিগণ ও এ্যাডভোকেট জেনারেলের বেতন ও ভাতা।

(৪) হাইকোর্টের বিচারকদের বেতন ও ভাতা।

(৫) শাসন-সংস্কার বহির্ভূত অঞ্চলের শাসন-সংক্রান্ত ব্যয়।

(৬) আদালতের ব্যয়, ডিক্রী প্রভৃতি জারী করিবার ব্যয়।

(৭) প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক, রাজস্বের উপর দায়বদ্ধ বলিয়া ঘোষিত অন্য যে কোনও ব্যয়।

সভার সম্মতির জন্য আইন সভার নিকট উপস্থিত করা হয় না। অন্য ব্যয়গুলি, ব্যয় বরাদ্দের দাবীর আকারে (in the form of demands for grants) আইন সভার ব্যবস্থা পরিষদের নিকট লাটসাহেবের সুপারিশক্রমে উপস্থিত করা হয়। ব্যবস্থা পরিষদ কোনও ব্যয়বরাদ্দের দাবী সমর্থন না করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন। পূর্ব্বে এরূপ ক্ষেত্রে গভর্ণর নিজ বিশেষ দায়িত্ব পালনের অজুহাতে আইন সভার ব্যবস্থা পরিষদের মত অগ্রাহ্য করিয়া বরাদ্দের দাবী পুরোপুরি মঞ্জুর করিয়া দিতে পারিতেন। বর্ত্তমানে গভর্ণরের সেরূপ ক্ষমতা নাই। অর্থসংক্রান্ত বিল (Financial Bill), (যদ্দ্বারা করধার্য্য হয়, অথবা পুরাতন করের ভার বা করপ্রণালী প্রভৃতি পরিবর্ত্তন করা হয়), লাটসাহেবের সুপারিশ ক্রমে আইন সভায় উপস্থিত করা হইত। এইরূপ কোনও বিল আইন সভা কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইলে, আগেকার দিনে লাট সাহেব সুপারিশ (Certify) করিয়া তাহা আইনে পরিণত করিতে পারিতেন ; বর্ত্তমানে লাট সাহেবের সে ক্ষমতা নাই।

মন্ত্রিসভা
(The Council of Ministers)

প্রত্যেক প্রদেশে গভর্ণর তাঁহার শাসনকার্য্যে সাহায্য ও পরামর্শ দান করিবার জন্য মন্ত্রিমণ্ডলী নিযুক্ত করেন। গভর্ণর মন্ত্রিগণকে নিয়োগ ও বরখাস্ত করিবার অধিকারী। তবে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে গভর্ণর তাঁহার ইচ্ছাধীন ক্ষমতা ক্ষমতা অনুযায়ী (in his discretion) মন্ত্রীদিগকে নিযুক্ত ও বরখাস্ত করিবার অধিকারী ছিলেন। বর্ত্তমানে ভারত শাসন আইনে গভর্ণরের এই ইচ্ছাধীন ক্ষমতা (discretionary powers) নাই। আগে, গভর্ণরের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে মন্ত্রিগণ তাঁহাকে পরামর্শ দিবার অধিকারী ছিলেন না। বর্ত্তমানে এই বিধান তুলিয়া দেওয়ায় মন্ত্রিমণ্ডলী প্রাদেশিক সরকারের সকল ব্যাপারেই পরামর্শ দিবার অধিকারী। আগে, মন্ত্রীরা যেক্ষেত্রে পরামর্শ দিবার অধিকারী ছিলেন, গভর্ণর সেক্ষেত্রেও মন্ত্রীদের অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব (special responsibilities) পালনের অজুহাতে নিজ বিচার প্রয়োগ করিয়া (in his individual judgment) কাজ করিতে পারিতেন। বর্ত্তমানে লাটসাহেবের বিশেষ দায়িত্ব (special responsibilities) নাই। নিয়মতান্ত্রিক শাসন হিসাবে লাটসাহেবকে মন্ত্রীদের কথা মানিয়া চলিতে হয়।

———

অষ্টম অধ্যায়

প্রাদেশিক আইন সভা

(Provincial Legislature)

(ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে)

প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক আইন সভা ছিল। ইংলণ্ডের সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে প্রাদেশিক লাট এবং এক বা দুই পরিষদ (Chamber) লইয়া আইন সভা গঠিত হইত। বাঙ্গালা, আসাম, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই ছয়টি প্রদেশে দুই পরিষদ বিশিষ্ট আইন সভা এবং অন্যান্য প্রদেশে এক পরিষদ বিশিষ্ট আইন সভা ছিল। বর্ত্তমানে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেও প্রাদেশিক আইন সভা ইংলণ্ডের প্রতিনিধি হিসাবে প্রাদেশিক লাট এবং এক বা দুই পরিষদ লইয়া গঠিত হয়। ভারতীয় ডোমিনিয়নে, মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশে এবং বিহারে দুই গৃহবিশিষ্ট আইন সভা এবং অন্যান্য প্রদেশে এক পরিষদ বিশিষ্ট আইন সভা আছে। যে সব প্রদেশে দুই পরিষদ আইন সভা ছিল, সেখানে একটি পরিষদের নাম ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council) এবং অপরটির নাম ব্যবস্থা পরিষদ (Legislative Assembly) ছিল ; এখনও এইরূপ আছে। ব্যবস্থাপক সভা উচ্চ পরিষদ এবং ব্যবস্থা পরিষদ নিম্ন পরিষদ বলিয়া গণ্য হয়। যে সব প্রদেশে একটি পরিষদ লইয়া আইন সভা গঠিত, সেখানে ঐ পরিষদটির নাম ব্যবস্থা পরিষদ (Legislative Assembly)।

ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের কতক অংশ প্রত্যক্ষভাবে ভোটদাতাগণ কর্ত্তৃক এবং কতক অংশ পরোক্ষভাবে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন। এখনও সেই ব্যবস্থা আছে। কয়েকজন সদস্য লাট সাহেব কর্ত্তৃক মনোনীত হইবার বিধান ছিল, এখনও আছে। ব্যবস্থাপক সভা একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, লাটসাহেব ইহাকে ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন না। ব্যবস্থাপক সভার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রতি তিন বৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করিতেন এবং এই সংখ্যক সদস্য নূতন নির্ব্বাচিত হইবার বিধান ছিল এবং এখনও আছে। প্রত্যেক সদস্যের কার্য্যকাল নয় বৎসর। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি (Prssident) নির্ব্বাচিত করিতেন।

ব্যবস্থা পরিষদের (Legislative Assembly) সদস্যগণের সকলেই

ভোটদাতাগণ কর্ত্তৃক সাম্প্রদায়িক ও পৃথক নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্ব্বাচিত হইতেন এবং এখনও সেই বিধান আছে। ব্যবস্থা পরিষদের (Legislative Assembly) কার্য্যকাল পাঁচ বৎসর ছিল। তবে, প্রাদেশিক লাট সাহেব ব্যবস্থা পরিষদের কার্য্যকাল বাড়াইয়া দিতে পারিতেন অথবা ইহার কার্য্যকাল শেষ হইবার পূর্ব্বে ইচ্ছা করিলে (In his discretion) পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিতেন। ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিতেন, ইহাকে Speaker বলা হইত।

প্রাদেশিক মন্ত্রিগণ আইন সভার পরিষদ বা পরিষদদ্বয়ের অধিবেশনে যোগ দিতে পারিতেন, তবে, তাঁহারা যে পরিষদের সদস্য থাকিতেন, সেই পরিষদের অধিবেশনেই ভোট দিবার অধিকারী ছিলেন। আইন সভার অধিবেশন বৎসরে অন্ততঃ একবার আহ্বান করিতে হইত।

আইন সভার ক্ষমতা

(Powers of the Legislature)

প্রাদেশিক আইন সভা বলিতে যদিও লাটসাহেবকেও বুঝাইত, তথাপি আইন সভার যোগ্যতা-অযোগ্যতা, অথবা ক্ষমতা-অক্ষমতা প্রভৃতির বিচার করিতে গিয়া আমরা আইন সভার পরিষদ বা পরিষদদ্বয়ের যোগ্যতা-অযোগ্যতা, ক্ষমতা-অক্ষমতা প্রভৃতির বিচার করিয়া থাকি। এই দিক দিয়া বিচার করিলে বলা যায় যে আমাদের প্রাদেশিক আইন সভার ক্ষমতা অতি সীমাবদ্ধ ছিল এবং প্রাদেশিক লাটসাহেবের হাতেই শেষ পর্য্যন্ত প্রভূত ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছিল।

প্রথমতঃ জানা দরকার যে প্রাদেশিক আইন সভা প্রাদেশিক আইন বিষয়ক তালিকার (Provincial Legislative List) অন্তর্গত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন করিবার অধিকারী ছিলেন। সমানাধিকার আইন বিষয়ক তালিকায় (Concurrent Legislative List) অন্তর্গত বিষয়গুলি সম্পর্কেও প্রাদেশিক আইন সভার আইন করিবার ক্ষমতা ছিল, তবে, এইরূপ কোনও আইন কেন্দ্রীয় আইনের বিপরীত হইলে, সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় আইন বলবৎ হইবে, এই বিধান ছিল। এই বিধান এখনও আছে।

যেখানে দুই পরিষদ বিশিষ্ট আইন সভা ছিল, সেখানে যে কোনও বিল উভয় পরিষদের অধিবেশনে গৃহীত না হইলে, তাহা আইন সভা কর্ত্তৃক গৃহীত বলিয়া গণ্য হইত না।

একটু বিবেচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, প্রাদেশিক আইন সভার পরিষদ বা

পরিষদ দ্বয়ের আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা অতিশয় সীমাবদ্ধ ছিল। প্রথমতঃ, ইহার কয়েকটি বিষয়ে কোনও আইন করিবার ক্ষমতা ছিল না। বড়লাটের কোনও অর্ডিনান্স সম্পর্কিত বিল বড়লাটের অনুমতি ব্যতীত আইন সভার কোনও গৃহে উপস্থিত করাই যাইত না। গভর্ণরের আইন (Governor's Act) অথবা অর্ডিনান্স সম্পর্কিত কোনও বিল গভর্ণরের অনুমতি ব্যতীত আইন সভার কোনও গৃহে আলোচনা করা যাইত না। প্রদেশের শান্তিরক্ষা সম্পর্কিত বিশেষ দায়িত্ব পালনে বাধা ঘটাইবে এই অজুহাত দেখাইয়া লাটসাহেব যে কোনও বিলের আলোচনা বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। কোনও বিল আইন সভার গৃহে বা গৃহদ্বয়ে গৃহীত হইবার পর গভর্ণরের নিকট উপস্থিত করা হইত, এবং গভর্ণর তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী বিলে সম্মতি দিতে পারিতেন অথবা অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারিতেন। তিনি সম্মতি দিলে তবেই বিলটি আইনে পরিণত হইত, তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে বিলটি আইনে পরিণত হইতে পারিত না। লাটসাহেব এইরূপ কোনও বিল প্রয়োজন মনে করিলে পুনরালোচনার জন্য আইন সভার পরিষদ বা পরিষদদ্বয়ের কাছে ফেরত পাঠাইতে পারিতেন। অথবা তিনি বড়লাটের কাছে তাঁহার বিবেচনার জন্য পাঠাইতে পারিতেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, গভর্ণর আইন সভার পরিষদ বা পরিষদদ্বয়কে না জানাইয়া নিজেই Governor's Act অথবা Ordinance জারী করিয়া আইন করিতে পারিতেন।

প্রাদেশিক আইন সভার পরিষদ বা পরিষদদ্বয়ের আর্থিক ক্ষমতাও বিশেষ সীমাবদ্ধ ছিল। যে সব প্রাদেশিক ব্যয় প্রাদেশিক সরকারের আয়ের উপর দায়বদ্ধ ছিল (Expenditure charged on the revenues of the Province), সেগুলি আইন সভার কোনও পরিষদের নিকট মঞ্জুরীর জন্য উপস্থিত করা হইত না। অন্য প্রকার ব্যয়গুলি ব্যবস্থা পরিষদের (Legislative Assembly-র) মঞ্জুরীর জন্য উপস্থিত করা হইত। ব্যবস্থাপক সভার (Legislative Council-এর) নিকট কোনও ব্যয় বরাদ্দের দাবী মঞ্জুরীর জন্য উপস্থিত করা হইত না। ব্যবস্থা পরিষদ (Legislative Assembly) যদি কোনও ব্যয় বরাদ্দের দাবী অগ্রাহ্য করিতেন অথবা কমাইয়া দিতেন, তথাপি লাটসাহেব তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব পালনের অজুহাতে সেই দাবী মঞ্জুর করিয়া দিতে পারিতেন।

প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা প্রাদেশিক আইন সভার নিকট দায়ী ছিলেন। প্রাদেশিক আইন সভার গৃহে মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ পাইলে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন। মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ, নিম্নলিখিত যে কোনও উপায়ে

করা যাইত—(ক) সোজাসুজি অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করা ; (খ) মন্ত্রিসভা সমর্থিত কোনও বিল অগ্রাহ্য করা ; (গ) মন্ত্রীসভার কোনও ব্যয়বরাদ্দের দাবী অগ্রাহ্য করা ; (ঘ) মুলতুবী প্রস্তাব গ্রহণ করা।

আইন সভায় দুই পরিষদের পরস্পরের সম্পর্ক
(Relation between the two Chambers)

ভারতবিভাগের পূর্ব্বে ছয়টি প্রদেশে আইন সভা দুই-পরিষদ-বিশিষ্ট ছিল। উভয় পরিষদের সকল ক্ষমতাই প্রায় সমান সমান ছিল। কোনও বিল উভয় পরিষদে গৃহীত না হইলে আইন সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইত না। তবে, দুইটি বিষয়ে পরিষদদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য ছিল। প্রথমতঃ, অর্থসংক্রান্ত বিল (Money Bill)—যে বিলে নূতন কর ধার্য্য অথবা পুরাতন করের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে—ব্যবস্থা পরিষদে (Legislative Assembly) প্রথমে উত্থাপিত করিতে হইত। এরূপ বিল ব্যবস্থাপক সভায় (Legislative Council) প্রথমেই উত্থাপিত করা যাইত না। এসব বিল প্রথমেই ব্যবস্থা পরিষদে (Legislative Assembly) গৃহীত হইবার পর ব্যবস্থাপক সভায় (Legislative Council) উপস্থিত করা হইত। অন্যান্য সকল প্রকার বিল যে কোনও পরিষদে প্রথম উত্থাপিত করা যাইতে পারিত। দ্বিতীয়তঃ, ব্যয় বরাদ্দের দাবী সমূহ ব্যবস্থা পরিষদের (Legislative Assembly) নিকট মঞ্জুরীর জন্য উপস্থিত করা হইত, ব্যবস্থাপক সভার (Legislative Council) নিকট ব্যয়বরাদ্দের দাবী মঞ্জুরীর জন্য উপস্থিত করা হইত না। ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কিত ভোট দিবার ক্ষমতা একমাত্র ব্যবস্থা পরিষদেরই (LegislativeAssembly) ছিল, ব্যবস্থাপক সভার (Legislative Council) ছিল না। এই দুই দিক হইতে দেখিলে বলা যায় যে ব্যবস্থা পরিষদের (Legislative Assembly) মর্য্যাদা ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council) অপেক্ষা বেশী ছিল, যদিও সাধারণতঃ ব্যবস্থা পরিষদকে (Legislative Assembly) নিম্ন পরিষদ এবং ব্যবস্থাপক সভাকে (Legislative Council) উচ্চ পরিষদ বলা হইত।

যেখানে ব্যবস্থা পরিষদ (Legislative Assembly) ও ব্যবস্থাপক সভার (Legislaitve Council) মধ্যে কোনও বিল সম্পর্কে মতানৈক্য ঘটিত, সেখানে গভর্ণর উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিতেন ; যুক্ত অধিবেশনের ভোটে বিলটি গৃহীত হইলে,লাটসাহেবের সম্মতির জন্য উপস্থিত করা হইত।

নবম অধ্যায়

প্রাদেশিক আইন সভা

(Provincial Legislature)

(ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে)

ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেও প্রাদেশিক আইন সভা ইংলণ্ডের সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে প্রাদেশিক লাট, এবং এক বা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইয়াছে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে আইন সভার দুইটি করিয়া পরিষদ এবং অন্যান্য প্রদেশে একটি করিয়া পরিষদ আছে। আগেকার মতই, যেখানে আইন সভার দুইটি পরিষদ আছে, সেখানে একটি পরিষদকে ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council) এবং অপরটিকে ব্যবস্থা পরিষদ (Legislative Assembly) বলা হয়। যেখানে আইন সভার মাত্র একটি পরিষদ আছে, সেখানে ইহাকে ব্যবস্থা পরিষদ (Legislative Assembly) বলা হয়।

ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণের কতক অংশ আগেকার মতই ভোটদাতাগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে, এবং কতক অংশ পরোক্ষভাবে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবার এবং অল্প কয়েকজন মনোনীত হইবার বিধান আছে। ব্যবস্থাপক সভা একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান এবং প্রতি তিন বৎসর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য পদত্যাগ করিবেন এবং সেই স্থলে নূতন সদস্য গৃহীত হইবেন, এইরূপ বিধান এখনও আছে। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ একজন সভাপতি (President) নির্ব্বাচিত করিতে পারেন।

ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণের নির্ব্বাচন প্রথা, ও কার্য্যকাল আগেকার মতই রাখা হইয়াছে। এখনও লাটসাহেব ইচ্ছা করিলে ব্যবস্থা পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ একজন সভাপতি (Speaker) নির্ব্বাচিত করিতে পারেন।

গণ-পরিষদ কর্তৃক রচিত নূতন গঠনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের সম্ভাবনার জন্য বর্ত্তমানে ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থাপরিষদের কার্য্যকাল, ইহাদের উপর লাট সাহেবের নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয় অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাদেশিক মন্ত্রিগণ আইন সভার পরিষদ বা পরিষদদ্বয়ের অধিবেশনে যোগ

দিতে পারেন, তবে, তাঁহারা যে পরিষদের সদস্য, শুধু সেই পরিষদেই ভোট দিবার অধিকারী। আইন সভার অধিবেশন বৎসরে অন্ততঃ একবার আহ্বান করিতে হইবে।

আইন সভার ক্ষমতা

(Powers of the Legislature)

প্রাদেশিক আইন সভা প্রাদেশিক আইন সংক্রান্ত তালিকার (Provincial Legislative List) অন্তর্গত বিষয়গুলি এবং সমানাধিকার আইন সংক্রান্ত তালিকার (Concurrent Legislative List) অন্তর্গত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন করিবার অধিকারী। তবে, শেষোক্ত বিষয়ের কোনও আইন কেন্দ্রীয় আইনের বিরোধী হইলে কেন্দ্রীয় আইনই বলবৎ হইবে।

যেখানে দুই-পরিষদ-বিশিষ্ট আইন সভা আছে, সেখানে কোনও বিল দুই পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত না হইলে আইন সভা কর্ত্তৃক গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে না।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর গভর্ণরের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা (discretionary powers) এবং বিশেষ দায়িত্ব (special responsibilities) সম্পর্কিত বিশেষ ক্ষমতা না থাকায়, আইন সভার পরিষদ বা পরিষদদ্বয়ের প্রকৃত ক্ষমতা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিশেষ দায়িত্বের অজুহাতে কোনও বিলের আলোচনা বন্ধ করার ক্ষমতা আগে গভর্ণরের ছিল, বর্ত্তমানে তাহা নাই। কোনও বিল আইন সভার পরিষদ বা পরিষদদ্বয়ে গৃহীত হইবার পর গভর্ণরের সম্মতির জন্য উপস্থিত করা হয়। তাঁহাকে ঘোষণা করিতে হয়, তিনি বিলে সম্মতি দিতেছেন অথবা সম্মতি দিবেন না অথবা বিলটি বড়লাটের বিবেচনার জন্য পাঠাইতেছেন। গভর্ণর সম্মতি দিলে বিল আইনে পরিণত হইবে, সম্মতি না দিলে বিলটি আইনে পরিণত হইতে পারে না। বিলটি বড়লাটের বিবেচনার জন্য পাঠাইলে, বড়লাট সম্মতি দিলে তবে আইনে পরিণত হইবে, নতুবা আইনে পরিণত হইবে না। গভর্ণর এইরূপ কোনও বিল প্রয়োজন মনে করিলে আইন সভার নিকট পুনরালোচনার জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন। গভর্ণর আগেকার যুগে নিজেই আইন (Governor's Act) এবং দুই রকম অর্ডিন্যান্স প্রবর্ত্তন করিতে পারিতেন। বর্ত্তমানে আইন (Governor's Act) করিবার ক্ষমতা গভর্ণরের নাই। তবে যে সময় আইন সভার অধিবেশন চলিতেছে না, সে সময় গভর্ণর যদি বুঝেন যে, তাঁহার পক্ষে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার, তাহা হইলে তিনি অবস্থানুযায়ী

অর্ডিন্যান্স (Ordinance—জরুরী আইন) প্রবর্ত্তন করিতে পারেন। এইরূপ অর্ডিন্যান্স প্রাদেশিক আইন সভার পরবর্ত্তী অধিবেশনকালে আইন সভার নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। আইন সভা এই অর্ডিন্যান্স বাতিল করিয়া দিতে পারেন। আইন সভার নিকট উপস্থিত করা না হইলে, অধিবেশনের ছয় সপ্তাহের মধ্যে এইরূপ অর্ডিন্যান্স নিজে নিজেই বাতিল হইয়া যায়।

প্রাদেশিক আইন সভার পরিষদ বা পরিষদদ্বয়ের আর্থিক ক্ষমতাও আগেকার দিনের অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবশ্য এখনও প্রাদেশিক সরকারের রাজস্বের উপর দায়বদ্ধ প্রাদেশিক ব্যয় (Expenditure charged on the revenues of the Province) আইন সভার কোনও পরিষদের নিকট উপস্থিত করা হয় না, এবং অন্যান্য ব্যয় প্রাদেশিক আইন সভার নিম্ন পরিষদ, ব্যবস্থা পরিষদের (Legislative Assembly) নিকট উপস্থিত করা হয়। তবে, আগে ব্যবস্থা পরিষদ (Legislative Assembly) কোনও খাতে ব্যয় বরাদ্দের দাবী অগ্রাহ্য করিলে বা কমাইয়া দিলে গভর্ণর তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য এই ব্যয় মঞ্জুর করিয়া দিতে পারিতেন। বর্ত্তমানে লাট সাহেবের বিশেষ দায়িত্ব না থাকায় আইন সভার মতের বিরুদ্ধে কোনও ব্যয়বরাদ্দের দাবী মঞ্জুর করিতে পারেন না।

প্রাদেশিক আইন সভার নিকট প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা দায়ী। সুতরাং প্রাদেশিক আইন সভা যদি কোনও ভাবে প্রাদেশিক মন্ত্রী সভার উপর আস্থাহীনতা প্রকাশ করেন, তবে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করিতে হইবে।

বর্ত্তমানে লাটসাহেব সম্পূর্ণভাবে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্ত্তায় পরিণত হইয়াছেন। আইন সভার পরিষদ বা পরিষদদ্বয়ের উপর তাঁহার আগেকার প্রভূত ক্ষমতাসমূহ এখন আর নাই। বর্ত্তমানে প্রাদেশিক আইন সভা প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছেন।

বর্ত্তমান

প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদসমূহের আসন সংখ্যার তালিকা

(Table of Seats—Provincial Legislative Assembly)

প্রদেশের নাম	মোট সংখ্যা	সাধারণ আসন সংখ্যা: মোট সাধারণ আসনসংখ্যা	সাধারণ আসন সংখ্যা: সাধারণ আসন সমূহের মধ্যেতপশীলী হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত আসন-সংখ্যা	শিখ আসন সংখ্যা	অনুন্নত সম্প্রদায় সমূহের প্রতিনিধিদের আসন সংখ্যা	মুসলমান আসন সংখ্যা	এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আসনসংখ্যা	ভারতীয় খ্রীষ্টান আসন সংখ্যা	ব্যবসা, বাণিজ্য, শিল্প, খনি এবং চা-বাগানের মালিকদের প্রতিনিধিদের আসন সংখ্যা	ভূস্বামীদের আসন সংখ্যা	বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন সংখ্যা	শ্রমিক আসন সংখ্যা	নারীদিগের আসন: সাধারণ	নারীদিগের আসন: শিখ	নারীদিগের আসন: মুসলমান	নারীদিগের আসন: এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান	নারীদিগের আসন: ভারতীয় খ্রীষ্টান
পশ্চিমবঙ্গ	৯০	৪৪	১৪	...	...	২১	৩	১	৭	২	১	৮	১	...	১	১	...
মাদ্রাজ	২১২	১৪৬	৩০	...	১	২৮	২	৮	৬	৬	১	৬	৬	...	১	...	১
বোম্বাই	১৭২	১১৪	১৫	...	১	২৯	২	৩	৭	২	১	৭	৫	...	১	...	...
যুক্তপ্রদেশ	২২৬	১৪০	২০	...	...	৬৪	১	২	৩	৬	১	৩	৪	...	২	...	...
বিহার	১৫০	৮৬	১৫	...	৭	৩৯	১	১	৪	৪	১	৩	৩	...	১	...	...
মধ্যপ্রদেশ, বেরার	১১১	৮৪	২০	...	১	১৪	১	...	২	৩	১	২	৩	...	...	...	...
পূর্ব্ব-পাঞ্জাব	৮১	৩১	৬	২০	...	২৩	...	...	১	২	১	২	...	১	...	...	...
আসাম	৭১	৩৭	৫	...	৯	১৬	...	১	৪	...	...	৩	১	...	...	...	...
উড়িষ্যা	৬০	৪৪	৬	...	৫	৫	...	১	১	২	...	১	২	...	...	...	...

বর্ত্তমান

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের আসন-সংখ্যার তালিকা

(Table of Seats—Provincial Legislative Council)

প্রদেশ	মোট আসন সংখ্যা	সাধারণ আসন সংখ্যা	মুসলমান আসন সংখ্যা	ভারতীয় ক্রীষ্টান আসন সংখ্যা	ব্যবস্থা পরিদ কর্ত্তৃক যে সংখ্যক আসন পূর্ণ করা হয়	প্রাদেশিক গভর্ণর কর্ত্তৃক মনোনীত আসন সংখ্যা
মাদ্রাজ ...	অন্যূন ৫৩ অনধিক ৫৫	৩৫	৭	৩	...	অন্যূন ৮ অধিনক ১০
বোম্বাই ...	অন্যূন ২৮ অনধিক ২৯	২০	৫	...	...	অন্যূন ৩ অনধিক ৪
যুক্তপ্রদেশ ...	অন্যূন ৫৭ অনধিক ৫৯	৩৪	১৭	...	...	অন্যূন ৬ অনধিক ৮
বিহার ...	অন্যূন ২৮ অনধিক ২৯	৯	৪	...	১২	অন্যূন ৩ অনধিক ৪

দশম অধ্যায়

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকার
(Provincial Autonomy)

ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকারের দাবীও জড়িত ছিল। প্রত্যেক প্রদেশকে প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে বাহিরের কর্তৃত্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে হইবে—ইহাই হইল এই দাবীর মূল কথা। বাহিরের শাসন কর্তৃত্ব অবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার সর্ব্বস্তরে গণতন্ত্র-সম্মত নীতি অনুযায়ী জনসাধারণের প্রতিনিধির হাতে শাসনভার দিতে হইবে—ইহাও ছিল এই দাবীর অন্তর্গত।

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকার (Provincial Autonomy) বলিতে একথা বুঝায় যে, প্রদেশগুলি তাহাদের নিজ নিজ শাসনক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি পাইবে। প্রত্যেক প্রদেশকে কতকগুলি বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে এবং সেই সেই বিষয়গুলির শাসন ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব হইতে মুক্ত থাকিবে। প্রাদেশিক সরকারগুলি সুনির্দ্দিষ্ট শাসন-বিষয়ক, আইন-বিষয়ক ও অর্থ-বিষয়ক ব্যাপারগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এইসব ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

১৯১৯ সালের শাসন সংস্কারে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকারের পরিবর্ত্তে প্রাদেশিক দ্বৈত-শাসন (Dyarchy) প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল। ইহার ফলে প্রাদেশিক সরকারগুলি হস্তান্তরিত বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব হইতে আংশিকভাবে মুক্তি পাইয়াছিল।

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সাল হইতে ভারতবর্ষের ১১টি প্রদেশের প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ১৯৩৫ সালের আইনে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের গঠনকারী অংশগুলিকে স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দেওয়া প্রয়োজন স্থির হইয়াছিল। যাহাতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সেজন্য প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রত্যেকটি গভর্ণর-শাসিত প্রদেশে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগকে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে স্বাধীনভাবে

কাজ করিতে দেওয়া হইয়াছে। প্রাদেশিক বিষয়গুলি মোটামুটিভাবে প্রাদেশিক মন্ত্রীদিগের হাতে অর্পণ করা হইয়াছে। প্রাদেশিক আইন সভাগুলিকেও নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে আইন করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। এইসব বিষয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় আইন সভার কর্তৃত্ব থাকিবে না।

কিন্তু তাই বলিয়া ১৯৩৫ সালের আইনে যে সম্পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহা নহে, প্রাদেশিক শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ বহুল পরিমাণে গভর্নর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণাধীনে রহিয়াছে। ১৯৩৫ সালের আইনে গভর্ণর জেনারেলকে নানাভাবে প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে হস্তপেক্ষ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিলে কেন্দ্রীয় আইন সভা প্রাদেশিক বিষয়গুলি সম্পর্কেও আইন করিতে পারিবেন। কতকগুলি ব্যাপারে গভর্ণর জেনারেল তাঁহার সম্মতি না দিলে প্রাদেশিক আইন সভায় তৎসম্পর্কিত বিল উত্থাপন করা যাইবে না। প্রদেশে শান্তিরক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে গভর্ণর জেনারেল প্রাদেশিক মন্ত্রীদের কাজে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। তাহা ছাড়া, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে প্রাদেশিক গভর্ণর তাঁহার ব্যক্তিগত বিবেচনায় (in his discretion) এবং তাঁহার ব্যক্তিগত বিচার অনুসারে (in his individual judgment) কাজ করিবার নামে অনেক বিশেষ ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। এইসব ক্ষেত্রে তিনি নিজের খুশীমত কাজ করিতে পারিতেন। যখন তিনি তাঁহার ইচ্ছামত (in his discretion) কার্য্য করিতেন, তখন মন্ত্রীদের কোন কথা বলিবারই অধিকার ছিল না। অন্যান্য ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের পরামর্শ দিবার অধিকার থাকিলেও গভর্ণর তাঁহার বিশেষ দায়ীত্ব (Special Responsibilities) পালনের অজুহাতে মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া নিজ ব্যক্তিগত বিচার প্রয়োগ করিয়া (in his individual judgment) কাজ করিতে পারিতেন।

এই সব ক্ষেত্রে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে গভর্ণর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া পড়িত। কাজেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বলিয়াও কিছু থাকিত না। এইসব ক্ষেত্রে প্রাদেশিক গভর্ণরগণ সম্পূর্ণভাবে গভর্ণর জেনারেলের ও ভারত সচিবের নিয়ন্ত্রণাধীন হইতেন। কাজেই গভর্ণর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিলে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকার শূন্যে বিলীন হইত। বস্তুতঃ কোন কোনও গভর্ণরের এই সমস্ত বিশেষ ক্ষমতার বহুল প্রয়োগের ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকার এক বিরাট প্রহসনে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ১৯৪৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অনুসারে প্রাদেশিক গভর্ণরের নিজ ব্যক্তিগত বিবেচনামত

(in his discretion) এবং বিশেষ দায়িত্ব পালনের অজুহাতে নিজ ব্যক্তিগত বিচার অনুসারে (in his individual judgment) কাজ করিবার অধিকার লোপ পাইবার ফলে বর্ত্তমানে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকার আগেকার অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় বস্তু হইয়াছে বলা যায়।

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকারের পক্ষে যুক্তি

(Arguments for Provincial Autonomy)

প্রত্যেক প্রদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাবিষয়ক ও ভৌগলিক অবস্থা বিভিন্ন। বিভিন্ন প্রদেশের অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজন একই রকম নহে। প্রাদেশিক সমস্যাগুলি প্রদেশভেদে বিভিন্ন রকম। তাহা ছাড়া প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য-বোধও ক্রমশঃ বাড়িতেছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। সর্ব্ব-ভারতীয় ঐক্যের উপরই প্রধান গুরুত্ব দিতে হইবে, কিন্তু প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্যবোধের সুস্থ ও স্বাভাবিক প্রকাশ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকারের ভিতর দিয়া করিতে দিলে সব দিক দিয়া লাভ হইবে। বর্ত্তমানে সরকারের ক্রমবর্দ্ধমান কর্ত্তব্যের জটিলতার জন্যও ভারত-বর্ষের মত বিশাল দেশে বিভিন্ন প্রদেশে স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দেওয়া উচিত। ইহার ফলে প্রত্যেক প্রদেশের লোকে নিজেদের অভিপ্রায়, রুচি ও আদর্শ অনুযায়ী নিজেদের প্রাদেশিক বিষয়গুলির শাসন পরিচালনা করিতে পারিবে, ফলে প্রাদেশিক জীবনের বলিষ্ঠ ও সুন্দর বিকাশ সম্ভব হইবে, অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তির হ্রাস হইবে না।

একাদশ অধ্যায়

১৯৩৫ সালের আইনের প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র

(The Federation which was Proposed by the Government of India Act, 1935 as originally enacted)

১৯৩৫ সালের আইনের প্রাদেশিক সরকার সংক্রান্ত অংশটুকু প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সংক্রান্ত অংশ প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ১৯৩৫ সালের আইনে যে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইতেছে।

গভর্ণর-শাসিত প্রদেশ ও চীফ্ কমিশনার-শাসিত প্রদেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী দেশীয় রাজ্য সমূহকে লইয়া এই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবার কথা ছিল। যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার আগে দুইটি সর্ত্ত পূরণ আবশ্যক ছিল। প্রথমতঃ, যোগদানকারী দেশীয় রাজ্য সমূহের জনসংখ্যা সমস্ত দেশীয় রাজ্যের জনসংখ্যার অন্ততঃ অর্দ্ধেক হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যোগদানকারী দেশীয় রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্রের আইন সভার উচ্চপরিষদে অন্ততঃ ৫২টি আসন দখল করিতে পারিবে—এমন হওয়া চাই।

১৯৩৫ সালের আইনের পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগ

(The Executive of the Government of India Act, 1935 as originally enacted)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগে দ্বৈত শাসনের (Dyarchy) কল্পনা করা হইয়াছিল। পরিকল্পনাটি মোটামুটি এইরূপ : গভর্ণর জেনারেল কতকগুলি বিষয়ের পরিচালনায় সম্পূর্ণ কর্ত্ত্ব রাখিবেন এবং অপর বিষয়গুলি গভর্ণর জেনারেল মন্ত্রীদিগের পরামর্শ ক্রমে পরিচালনা করিবেন। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রবিভাগ, উপজাতীয় অঞ্চল এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক সম্পর্কিত বিভাগ—এইগুলি বড়লাট সাহেবের সম্পূর্ণ শাসনাধীন বিষয় হইবে স্থির হইয়াছিল। অপর বিষয়গুলি দশজনের অনধিক মন্ত্রিমণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত হইবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ব্বোক্ত চারিটি বিষয় সম্পর্কে

Miss Aparna Chakravarti
class-X
Hooghly Girls' S

বড়লাট তাঁহার ইচ্ছাধীন ক্ষমতা অনুসারে (in his diseretion) কাজ করিতে পারিতেন ; অপর বিষয়গুলি সম্পর্কে বড়লাট সাধারণতঃ মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে চলিবেন এইরূপ বিধান ছিল। কিন্তু বড়লাট তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব (Special Responsibilities) পালনের জন্য মন্ত্রীদিগের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া নিজ ব্যক্তিগত বিচার প্রয়োগ করিয়া(in his individual judgment)কাজ করিতে পারিবেন এই বিধান ছিল। মোটের উপর গভর্ণর জেনারেলের হাতে অগাধ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার শাসন-বিভাগীয়, আইন-বিভাগীয় এবং অর্থ-বিভাগীয় ক্ষমতাগুলি অপরিসীম ছিল, বলা যায়। মন্ত্রীদিগের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল, বড়লাট ইচ্ছা করিলে বিশেষ দায়িত্ব পালনের অজুহাতে তাঁহাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া নিজের খুশীমত কাজ করিতে পারিতেন। মন্ত্রীদিগকে আইনসভার সদস্য হইতে হইবে এবং আইন সভার নিকট দায়ী থাকিতে হইবে—ইহাও পরিকল্পনার অন্তর্গত ছিল।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা
(Federal Legislature)

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে গভর্ণর জেনারেল এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদ (Council of State) এবং ব্যবস্থা পরিষদ (House of Assembly) লইয়া গঠন করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয় পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ২৬০ হইবে এবং তন্মধ্যে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধি ১৫৬ জন এবং দেশীয় রাজ্য-সমূহের প্রতিনিধি অনধিক ১০৪ জন হইবেন—এরূপ স্থির হইয়াছিল। এই পরিষদ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান রূপে থাকিবে এবং প্রতি ৩ বৎসর অন্তর এক তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করিবেন। ব্যবস্থা পরিষদে মোট ৩৭৫ জন সদস্য থাকিবেন। তন্মধ্যে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধি ২৫০ জন এবং দেশীয় রাজ্য সমূহের প্রতিনিধি অনধিক ১২৫ জন হইবেন। এই পরিষদের আয়ুষ্কাল হইবে ৫ বৎসর। পরিষদ সমূহের আইন বিষয়ক অধিকার গভর্ণর জেনারেলের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। গভর্ণর জেনারেল আইন পরিষদগুলির ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজেই আইন (Governor-General's Act) এবং অর্ডিন্যান্স করিতে পারিবেন। আইন পরিষদসমূহ কোন আইন করিতে চাহিলে গভর্ণর জেনারেল তাহা নাকচ করিয়া দিতে পারিতেন। আইন পরিষদগুলির আর্থিক ক্ষমতাও অতি সীমাবদ্ধ ছিল, গভর্ণর জেনারেল অনেকগুলি ব্যয়ের দফা আইন পরিষদের নিকট উপস্থিত না করিয়া নিজেই মঞ্জুর করিয়া দিতে পারিবেন। যে সব ব্যয়ের

দফা আইন পরিষদের নিকট উপস্থিত করিবার কথা ছিল সেগুলিও গভর্ণর জেনারেল ইচ্ছা করিলে আইন পরিষদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মঞ্জুর করিয়া দিতে পারিতেন। আইন পরিষদগুলি মন্ত্রীদের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিতে পারিতেন।

প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রের দোষ

(Defects of the Federation Proposed in the Government of India Act, 1935, as originally enacted)

প্রথমতঃ যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার মধ্যে ভারতীয়দের হস্তে আসল ক্ষমতা অর্পণ করা হয় নাই। গভর্ণর জেনারেলের হস্তে এত অধিক ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল যে মন্ত্রীদের হাতে বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না। ভারতবাসীরা ডোমিনিয়ন তুল্য শাসন মর্য্যাদা পাইলে কিছু পরিমাণে সন্তুষ্ট হইতেন; কিন্তু পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ডোমিনিয়ন তুল্য শাসনতন্ত্রের (Dominion Status) ছায়া মাত্র নাই বলা চলে। এমন কি ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস এই কথাটির উল্লেখও বর্জ্জন করা হইয়াছে। আসল ক্ষমতা ভারতবাসীর হস্তে না দিয়া ব্রিটিশ সরকার গভর্ণর জেনারেলের মারফৎ নিজেদের হস্তেই রাখিয়াছিলেন। শুধু যে দেশরক্ষা প্রভৃতি বিশেষ গুরত্বপূর্ণ বিষয়গুলি গভর্ণর জেনারেলের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন রাখা হইয়াছিল তাহা নহে, বিশেষ দায়িত্ব ও তৎসহ বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করিয়া গভর্ণর জেনারেলকে মন্ত্রীদের বিষয়গুলি সম্পর্কেও প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দায়িত্বশীল সরকার অথবা স্বায়ত্তশাসন অধিকার নামমাত্র ছিল।

যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার মধ্যে দেশীয় রাজ্যগুলিকে অযথা অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভার উচ্চ পরিষদে দেশীয় রাজ্যগুলিকে শতকরা ৪০টি আসন এবং নিম্ন পরিষদে এক-তৃতীয়াংশ আসন দেওয়া হইয়াছিল। জনসংখ্যার ভিত্তিতে অথবা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যুক্তিতে, কোনও দিক দিয়াই দেশীয় রাজ্যগুলির এত অধিক সংখ্যক আসন লাভ সমর্থন করা যায় না। স্বৈরতন্ত্রযুক্ত দেশীয় রাজ্যসমূহকে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভায় এতগুলি আসন দিবার ফলে ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের সাফল্যের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইত। স্বৈরতান্ত্রিক দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতবর্ষের উন্নতির পথে সহায়ক না হইয়া বিঘ্নকারী হইত। তাহা ছাড়া দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে কোন্ প্রণালীতে আইন সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট না থাকায় দেশীয় রাজ্যগুলির নৃপতিবর্গ প্রজাসাধারণের মতামতের দিকে লক্ষ্য না করিয়া নিজেরাই প্রতিনিধি মনোনীত

করিয়া দিতে পারিতেন। ইহার ফলে দেশীয় রাজ্যের তথাকথিত প্রতিনিধিগণ প্রজাদের প্রতিনিধি না হইয়া দেশীয় রাজ্যসমূহের নৃপতিদের স্বার্থরক্ষায় যত্নবান হইতেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভার নিম্ন পরিষদে পরোক্ষ নির্ব্বাচনের পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, ইহা মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভার উভয় পরিষদই সমান ক্ষমতা পাইবে, এমন কি ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী সম্পর্কেও উচ্চ পরিষদ নিম্ন পরিষদের তুল্য অধিকার লাভ করিবে, এইরূপ পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, ইহা সম্পূর্ণ গণতন্ত্রবিরোধী ব্যবস্থা।

পৃথিবীর বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী রাষ্ট্র বা প্রদেশ সমূহে একই রকম শাসনতন্ত্র প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ১৯৩৫ সালের যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনায় স্বৈরতান্ত্রিক দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য প্রদেশগুলির এক অদ্ভুত মিলনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এইরূপ পরস্পর বিরোধী শাসনতন্ত্রযুক্ত অংশসমূহ লইয়া পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্র বিফল হইতে বাধ্য।

ভারতবর্ষের সকল রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কারণে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল বিরোধিতা করায় উহা কার্য্যকরী হইতে পারে নাই।

দ্বাদশ অধ্যায়

সরকারী বিষয়সমূহের বিভাগ

(Division of Subjects)

বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই সরকার কর্তৃক পরিচালিত বিষয়গুলিকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মোটামুটি এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। সর্ব্বভারতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি : যথা দেশ রক্ষা, ডাক ও তার বিভাগ, মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, আমদানী রপ্তানী শুল্ক প্রভৃতি বিষয় কেন্দ্রীয় বিষয়রূপে পরিগণিত হইত এবং প্রধাণতঃ প্রাদেশিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি : যথা, প্রাদেশিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রভৃতি বিষয় প্রাদেশিক বিষয়রূপে (Provincial Subjets) গণ্য হইত। কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন কার্য্যকরী হইবার আগে প্রাদেশিক সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিস্থানীয় ছিল এবং সর্ব্বতোভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ছিল।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা হয় এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হয়। এই কারণে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের মধ্যে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়গুলির বিভাগ একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। উক্ত আইনে বিষয়গুলির তিনটি তালিকা করা হইয়াছে : যথা, (১) যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সংক্রান্ত তালিকা (Federal Legislative List), (২) প্রাদেশিক আইন সংক্রান্ত তালিকা (Provincial Legislative List), (৩) সমানাধিকার আইন সংক্রান্ত তালিকা (Concurrent Legislative List)

উক্ত তিনটি তালিকার অনুরূপ তিনটি তালিকা বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে [অর্থাৎ Government of India Act, 1935 as adapted by the India (Provisonal Constitution) Order, 1947] সন্নিবেশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সরকারী বিষয়সমূহ কিভাবে বিভাগ হইয়াছে, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল :—

যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সংক্রান্ত তালিকা

(Federal Legislative List)

১। দেশ রক্ষা, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ,

২। বৈদেশিক সম্পর্ক,

৩। মুদ্রানীতি,

৪। ডোমিনিয়নের সরকারী ঋণ,

৫। ডাক ও তার বিভাগ, টেলিফোন, বেতার এবং অনুরূপ আদান-প্রদান ব্যবস্থা,

৬। সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল, বড় বড় বন্দর ও বিমানপথ,

৭। বৈদেশিক বাণিজ্য, আমদানী-রপ্তানী শুল্ক,

৮। ব্যাঙ্কিং ও ইন্সিওরেন্স,

৯। কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়,

১০। অহিফেন, লবণ ও পেট্রল,

১১। আয়কর,

১২। উৎপন্ন শুল্ক, প্রভৃতি।

উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন করিবার অধিকার একমাত্র ডোমিনিয়ন আইন সভার (Dominion Legislature) আছে। প্রাদেশিক আইন সভা উক্ত তালিকাভুক্ত বিষয় সম্পর্কে কোনরূপ আইন করিবার অধিকারী নহে।

প্রাদেশিক আইন সংক্রান্ত তালিকা
(Provincial Legislative List.)

১। প্রাদেশিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা,

২। প্রাদেশিক বিচার বিভাগ, কারা বিভাগ,

৩। প্রাদেশিক সরকারী ঋণ,

৪। প্রাদেশিক পাব্‌লিক্ সার্‌ভিস্ কমিশন,

৫। শিক্ষা,

৬। কৃষি,

৭। অরণ্য,

৮। খনি,

৯। ফিসারী,

১০। সমবায় সমিতি,

১১। ভূমি রাজস্ব,

১২। কৃষি-আয়-কর,

১৩। প্রাদেশিক পূর্ত্তবিভাগ,

১৪। বিলাস দ্রব্য বা আমোদ প্রমোদের উপর কর, প্রভৃতি।

প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রাদেশিক আইন সভার আইন করিবার অধিকার আছে এবং সাধারণতঃ ডোমিনিয়ন আইন সভার এই সম্পর্কে আইন করিবার ক্ষমতা নাই। তবে গভর্ণর জেনারেল যদি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন, তাহা হইলে ডোমিনিয়ন আইন সভা প্রাদেশিক বিষয়গুলি সম্পর্কেও আইন করিবার অধিকারী হইবে।

সমানাধিকার আইন সংক্রান্ত তালিকা

(Concurrent Legislative List.)

১। ফৌজদারী আইন ও দণ্ডবিধি,
২। দেওয়ানী দণ্ডবিধি,
৩। বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ,
৪। চুক্তি আইন,
৫। ছাপাখানা,
৬। ইলেক্‌ট্রিসিটি,
৭। ট্রেড ইউনিয়ন,
৮। কারখানা আইন, প্রভৃতি।

উক্ত তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে ডোমিনিয়ন আইনসভা ও প্রাদেশিক আইন সভা উভয়েই আইন করিবার অধিকারী। কিন্তু ডোমিনিয়ন আইন সভার আইন যদি প্রাদেশিক আইন সভার আইন হইতে পৃথক হয় তাহা হইলে ডোমিনিয়ন আইন সভার আইন বলবৎ হইবে এবং প্রাদেশিক আইন সভার আইন অগ্রাহ্য হইবে।

অবশিষ্ট বিষয়গুলি

(Residuary Subjects)

উল্লিখিত তিনটি আইন সংক্রান্ত তালিকা যথাসম্ভব দীর্ঘ করা হইয়াছে। তথাপি যদি এমন কোন বিষয়ের উদ্ভব হয়, যাহা উক্ত তিনটি তালিকার কোথাও সন্নিবেশিত হয় নাই, তবে সেই বিষয়কে অবশিষ্ট বিষয় (Residuary Subject) বলা যাইবে। এইরূপ বিষয় সম্পর্কে ভারত শাসন আইনে একটি বিচিত্র বিধান রহিয়াছে। এইরূপ বিষয় সম্পর্কে গভর্ণর জেনারেল, ফেডারেল আইন সভা বা প্রাদেশিক আইন সভার যে কোনটিকে আইন করিবার অধিকার

দিতে পারেন। বর্ত্তমান গভর্ণর জেনারেল, ডোমিনিয়ন আইন সভা অথবা প্রাদেশিক আইন সভা, যে কোনওটিকে, অবশিষ্ট বিষয় (Residuary Subject) সম্পর্কে আইন করিবার অধিকার দিতে পারেন। অবশ্য পূর্ব্বে তিনি এসম্পর্কে তাঁহার ইচ্ছাধীন ক্ষমতা অনুযায়ী (in his discretion) কাজ করিতে পারিতেন, বর্ত্তমানে তাঁহার ইচ্ছাধীন ক্ষমতা না থাকায়, তিনি এবিষয়ে মন্ত্রিসভার কথা মানিয়া চলিবেন। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের বেলায় আমরা দেখিতে পাই যে, অবশিষ্ট বিষয়গুলি হয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, নয় প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের বেলায় পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে অনুসৃত নীতি না মানিয়া, গভর্ণর জেনারেলের উপর অবশিষ্ট বিষয় বণ্টনের ভার দিয়া এক অভিনব পরিকল্পনা করা হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রাদেশিকগুলিকে শক্তিশালী করিবার একটি উপায় হিসাবে অবশিষ্ট বিষয়গুলি প্রদেশকে অর্পণ করার পক্ষে প্রবল দাবী ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অবশিষ্ট বিষয়গুলির ভার দিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকেই অধিক শক্তিশালী ও কার্য্যকরী করিবার পক্ষে রাষ্ট্রীয় নেতাদের মত প্রবল হইয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আইন সভার নির্ব্বাচন

(Election to the Legislature)

ভারতীয় গণ-পরিষদ স্থির করিয়াছেন আগামী নির্ব্বাচনে প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেই ভোটাধিকার পাইবে। প্রাপ্ত বয়স্ক মাত্রের ভোটাধিকার (Universal Adult Suffrage) গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থা। (ইহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা অন্যত্র দ্রষ্টব্য)। এই পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা এদেশে প্রবর্ত্তিত ছিল না। এ পর্য্যন্ত ভোট দিবার অধিকার,—কর দিবার ক্ষমতা, সম্পত্তি এবং শিক্ষার উপর নির্ভর করিত। আমাদের দেশে অধিকাংশ ব্যক্তি দরিদ্র ও নিরক্ষর। সুতরাং, অনেক প্রদেশে ভোট দিবার জন্য শিক্ষা, করদান এবং সম্পত্তির মান খুব কম করিয়া ধার্য্য করিলেও, জন সংখ্যার বৃহত্তর অংশ ভোটাধিকার বঞ্চিত ছিল। মোট অধিবাসীর শতকরা মাত্র ১৪ ভাগ ভোটাধিকার ভোগ করিত।

আমাদের আইন সভাসমূহের নির্ব্বাচনের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল, পৃথক ও সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা। ১৯০৯ সালের মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কারে এই দুষ্ট ব্যবস্থার প্রথম প্রয়োগ হয়। এই ব্যবস্থা যে ইংরাজ শাসকগণ দেশের মধ্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে স্থায়ী ভেদ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের পূর্ব্ব হইতে কংগ্রেস শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। জাতীয় আন্দোলনও দিন দিন তীব্র হইতেছিল। কি করিয়া কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলন ধ্বংস করা যায়, কর্তৃপক্ষ তাহারই ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ১৯০৬ সালে তৎকালীন বড়লাট লিখিয়াছিলেন, "কংগ্রেস ভবিষ্যতে বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইবে। আমি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিষ্ঠান খাড়া করিবার কথা ভাবিতেছি।" এই সময় বিষাক্ত সাম্প্রদায়িকতার কেন্দ্র স্বরূপ আলিগড় কলেজের অধ্যক্ষ আর্কিবোল্ড সাহেব নবাব মহসিন-উল-মুল্‌ককে এই মর্ম্মে পত্র দিলেন, "আপনারা বিভিন্ন প্রদেশের মুসলমান লইয়া গঠিত এক ডেপুটেশন লইয়া বড়লাট বাহাদুরের সহিত দেখা করিয়া বলুন যে নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন হইলে মুসলমানদের স্বার্থহানি হইবে, ইহার পরিবর্ত্তে মনোনয়ন প্রথা অথবা ধর্ম্ম অনুযায়ী প্রতিনিধি প্রেরণ করার ব্যবস্থা যেন হয়। আমি আপনাদের আবেদনটি লিখিয়া দিতে পারি, তবে আমার নাম যেন প্রকাশিত না হয়।" ইহারই পরে আগা

যাঁর নেতৃত্বে একদল মুসলমান লর্ড মিণ্টোর সহিত দেখা করিয়া মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্ব্বাচন চাহিলেন। লর্ড মিণ্টো আনন্দে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজের সম্মতি জানাইলেন। ইহাই হইল পৃথক ও সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের গোড়ার কথা। এইরূপ নির্ব্বাচন-প্রথার ভয়ঙ্কর কুফলের কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

গণ-পরিষদ কর্ত্তৃক রচিত নব-শাসন-তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে নির্ব্বাচন ব্যবস্থা বলবৎ আছে, তাহাতে যে শুধু হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক ও সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা আছে, তাহা নহে ; ইহা ছাড়া, ভারতীয় খৃষ্টান, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, শিখ এবং ইউরোপীয়দের জন্যও পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা আছে। ইহার উপর ভূস্বামী, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিক, ইহাদের জন্যও বিশেষ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা আছে।

এই নির্ব্বাচন ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৯৩২ সালের মধ্যভাগে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ র‍্যামেজ ম্যাকডোন্যাল্ড ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব স্থির করিয়া এক ঘোষণা করেন ; ইহাই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বা Communal Award নামে খ্যাত। এই বাঁটোয়ারা দ্বারা বিভিন্ন আইন সভায় কোন্ সম্প্রদায় কতজন প্রতিনিধি পাঠাইবে, তাহা স্থির করিয়া দেওয়া হয়। এই বাঁটোয়ারা দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা কায়েম করা ছাড়াও, অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্যও পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা করা হয়। হিন্দুদের মধ্যে তপশীলভুক্ত জাতিদের জন্যও এবং সকল সম্প্রদায়ের নারীদের জন্যও পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা করা হয়।

হিন্দুদিগের মধ্যেও পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া দ্বিখণ্ডিত করিবার চেষ্টার প্রতিরোধ করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধী আমরণ অনশন সঙ্কল্প করেন। হিন্দু নেতৃবৃন্দ পুনাতে সমবেত হইয়া এক চুক্তি করিয়া পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে স্থির করেন ; ইহাই পুনা চুক্তি (Poona Pact) নামে খ্যাত। এই চুক্তি দ্বারা তপশীলভুক্ত হিন্দু সম্প্রদায় পৃথক নির্ব্বাচনের অধিকার ত্যাগ করিয়া আসন সংরক্ষণসহ যুক্তনির্ব্বাচন ব্যবস্থা মানিয়া লন ; ইহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা অনুসারে যতগুলি আসন পাইয়াছিলেন, তাহার অনেক বেশী আসন আদায় করিয়া লইয়াছিলেন, যেমন, অবিভক্ত বাঙ্গলায় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা অনুসারে তপশীলী সম্প্রদায় মোট ১০টি আসন পাইয়াছিলেন, কিন্তু পুনা চুক্তি অনুযায়ী তাঁহারা ৩০টি আসন পাইবেন স্থির হইল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

দেশীয় রাজ্য

(Native States)

ব্রিটিশ আমলে ব্রিটিশ ভারত এবং দেশীয় রাজ্য, এই দুই কৃত্রিম ভাগে ভারতবর্ষ বিভক্ত ছিল, ব্রিটিশ ভারত ভারত-সরকার কর্তৃক শাসিত হইত। ভারত-সরকার ব্রিটিশ সরকারের অধীন ছিল এবং ব্রিটিশ সরকারের হাতেই ভারত শাসনের চূড়ান্ত ক্ষমতা ছিল। দেশীয় রাজ্যগুলির শাসনতান্ত্রিক অবস্থা ব্রিটিশ-ভারতের অনুরূপ ছিল।

দেশীয় রাজ্যগুলির মোট সংখ্যা ছয় শতের কাছাকাছি ছিল। ইহাদের মোট লোকসংখ্যা ছিল নয় কোটীর বেশী, অর্থাৎ ভারতবর্ষের মোট লোকসংখ্যার শতকরা ২৪ ভাগের কাছাকাছি এবং ইহাদের মোট আয়তন সমগ্র ভারতবর্ষের আয়তনের শতকরা ৪৫ ভাগ ছিল। দেশীয় রাজ্যগুলি সমগ্র ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া ছিল। আয়তন ও জনসংখ্যার দিক দিয়া দেশীয় রাজ্যগুলির বিভিন্নতার সীমা ছিল না। দেশীয় রাজ্য কাশ্মীরের আয়তন অখণ্ড বাঙ্গলার অপেক্ষাও বেশী ছিল। হায়দ্রাবাদ দেশীয় রাজ্যই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। আবার কাথিয়াবাড়ে অনেকগুলি অতি ক্ষুদ্র আয়তনের দেশীয় রাজ্য ছিল, কোনও কোনওটির আয়তন ছিল সামান্য কয়েক একর মাত্র। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে মহীশূরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুশাসিত এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়া উন্নত। কাশ্মীর, বরোদা, গোয়ালিয়র, ত্রিবাঙ্কুর, হায়দ্রাবাদ, কোচিন প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলির আয়তন, শাসন-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি প্রভৃতির দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য ছিল। কতকগুলি দেশীয় রাজ্যে নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সদস্য লইয়া গঠিত আইন-সভা ছিল। কোচিন দেশীয় রাজ্যে কতকটা ১৯১৯ সালের ভারত-শাসন আইনের দ্বৈত-শাসনের অনুকরণে শাসন-তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। হায়দ্রাবাদ, মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুর, এই তিনটি দেশীয় রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ত্রিবাঙ্কুরে শিক্ষার বিস্তার ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে।

দেশীয় রাজ্যগুলির রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অতি

শোচনীয় ছিল। দেশীয় রাজ্যগুলির কোথাও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ছায়া মাত্রও ছিল না। সর্ব্বত্রই কম-বেশী স্বৈরতন্ত্রই প্রচলিত ছিল। প্রজা-সাধারণের নাগরিক অধিকার নামমাত্র ছিল। রাজ্যের রাজস্বের অধিকাংশই রাজার ও তাঁহার অনুচরবর্গের আড়ম্বর-বহুল জীবন-যাত্রার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে শেষ হইয়া যাইত, আর প্রজাগণ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করিত।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ দেশীয় রাজ্যগুলিকেও প্রবলভাবে আঘাত দিয়াছে। দেশীয় রাজ্যের প্রজাদিগের রাজনৈতিক অধিকার লাভের আন্দোলন ক্রমশঃ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে।

দেশীয় রাজ্যগুলির শাসন-তান্ত্রিক মর্য্যাদা
(Constitutional Status of the Native States)

দেশীয় রাজ্যগুলি ব্রিটিশ রাজত্বের অংশ বলিয়া গণ্য হইত না। দেশীয় রাজ্যের প্রজারাও ব্রিটিশ প্রজারূপে গণ্য হইত না। ব্রিটিশ ভারতের আইন দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে খাটিত না। দেশীয় রাজ্যগুলি নিজেদের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন করিত। দেশীয় রাজ্যগুলি ব্রিটিশ ভারতীয় আদালতের এলাকাধীন ছিল না। দেশীয় রাজ্যগুলির নিজস্ব পুলিশ বাহিনী ছিল।

দেশীয় রাজ্যের রাজারা অনেক সময় স্বাধীন রাজার মর্য্যাদালাভ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বড় রাজারা (মোট ১০৮ জন) ব্রিটিশ ভারতে আসিলে তাঁহাদের সম্মানার্থে সরকার হইতে তোপধ্বনি করা হইত। দেশীয় রাজ্যের কোনও রাজা ইংলণ্ডের কোনও আদালতে অভিযুক্ত হইলে, স্বাধীন নৃপতির ন্যায় দাবী করিতে পারিতেন যে, তাঁহার সম্মতি না থাকিলে আদালতে তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা চলিতে পারিবে না।

কিন্তু, স্বাধীনতার এই সব বাহ্যিক চিহ্ন সত্ত্বেও, দেশীয় রাজ্যগুলিকে রাষ্ট্র (State) এবং দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদিগকে স্বাধীন নৃপতি বলা যায় না। ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা কালে, বিভিন্ন সময়ে দেশীয় রাজ্যগুলির সহিত ইংলণ্ডের সম্রাটের চুক্তি ও সন্ধিপত্র রচিত হইয়াছিল। এই সব চুক্তি ও সন্ধিপত্র দ্বারা দেশীয় রাজ্যের শাসন-তান্ত্রিক মর্য্যাদা নিরূপণ করা হইত। দেশীয় রাজ্যগুলির ক্ষমতা আসলে অতিশয় সীমাবদ্ধ ছিল। দেশীয় রাজ্যগুলির সার্ব্বভৌমত্ব (Sovereignty)

ছিল না। ব্রিটিশ সম্রাটই দেশীয় রাজ্যগুলির উপর সার্ব্বভৌম শক্তিরূপে বিরাজ করিতেন। দেশীয় রাজ্যগুলির নৃপতিদিগকে ব্রিটিশ সম্রাটের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিতে হইত। ব্রিটিশ সম্রাটই দেশীয় রাজ্যগুলির দেশ-রক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। বাহিরের কোনও রাজ্যের সহিত সন্ধি করিবার বা যুদ্ধ ঘোষণা করিবার অথবা পররাষ্ট্র সম্পর্কিত অন্য যে কোনও ব্যবস্থা করিবার অধিকার দেশীয় রাজ্যগুলির ছিল না। কোনও দেশীয় রাজ্য কোনও বৈদেশিক শক্তির সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিত না। এই সব কারণে দেশীয় রাজ্যগুলিকে (Native States) রাষ্ট্র (State) বলা যাইতে পারিত না। ব্রিটিশ সম্রাট দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে যে সমস্ত অধিকার প্রয়োগ করিতেন, সেগুলিকে এক কথায় বলা হইত Paramountcy (বা সর্ব্বময় প্রভুত্ব); এবং ব্রিটিশ সম্রাটকে দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে বলা হইত Paramount Power (বা সর্ব্বময় প্রভু)। [লর্ড রীডিং এই সম্পর্কে উক্তি করিয়াছিলেন, Paramountcy knows no limitation.] ব্রিটিশ সম্রাটের অধিকারগুলি দেশীয় রাজ্যের সার্ব্বভৌমত্বকে বহুল পরিমাণে খর্ব্ব করিয়া তাহাদিগকে সম্রাটের অধীনতার স্তরে নামাইয়া রাখিয়াছিল। দেশীয় রাজ্যগুলির নৃপতিদের কাহারও উত্তরাধিকারীহীন অবস্থায় মৃত্যু হইলে ব্রিটিশ সম্রাট উত্তরাধিকার স্থির করিয়া দিতেন। দেশীয় রাজ্যের নৃপতি দত্তক গ্রহণ করিলে সম্রাটের অনুমোদন প্রয়োজন হইত। দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, সম্রাট তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। দেশীয় রাজ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা বা কুশাসন চলিতে থাকিলে, অথবা, আনুগত্যের অভাব দেখিলে, ব্রিটিশ সম্রাট দেশীয় রাজ্যের নৃপতিকে গদীচ্যুত বা রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত পর্য্যন্ত করিতেন। সাধারণতঃ দেশীয় রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায় ব্রিটিশ সম্রাট হস্তক্ষেপ করিতেন না; কিন্তু কুশাসন বা বিশৃঙ্খলা প্রভৃতির কারণে সম্রাট বিবিধরূপে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন।

প্রত্যেক দেশীয় রাজ্যে বা কয়েকটি ছোট দেশীয় রাজ্যের সমষ্টিতে, একজন করিয়া 'রেসিডেন্ট' বা 'এজেন্ট' থাকিতেন। ইনি ছিলেন সম্রাটের প্রতিনিধি। ইনি রাজ-প্রতিনিধির (ভাইসরয়ের) অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিতেন। প্রকৃতপক্ষে অনেক ক্ষেত্রে 'রেসিডেন্ট' বা 'এজেন্ট'ই ছিলেন আসল শাসনকর্ত্তা; ইঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও রাজা কিছু করিতে সাহস করিতেন না। ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পর দেশীয় রাজ্যগুলি সম্রাটের প্রতিনিধি (Crown Representative) হিসাবে বড়লাটের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আসিয়াছিল।

নরেন্দ্র মণ্ডল

(Chamber of Princes)

দেশীয় রাজ্যগুলির স্বার্থসংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিবার জন্য ১৯২১ সালে নরেন্দ্রমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হয়। বড়লাট ইহার সভাপতি ছিলেন। নরেন্দ্র-মণ্ডলে একজন নির্ব্বাচিত চ্যান্সেলার এবং একজন ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন। হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর প্রভৃতি কয়েকটি বড় বড় দেশীয় রাজ্য ইহাতে যোগ না দেওয়ায় ইহার গুরুত্ব বেশী হয় নাই।

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের প্রস্তাবিত যুক্ত-রাষ্ট্র ও দেশীয় রাজ্য

(Native States in the proposed scheme of Federation under the Government of India Act, 1935, as originally enacted)

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের প্রস্তাবিত যুক্ত-রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় দেশীয় রাজগুলিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হইয়াছিল। যথেষ্টসংখ্যক দেশীয় রাজ্য যোগ না দিলে, প্রস্তাবিত যুক্ত-রাষ্ট্র গঠন হইতেই পারিত না। দেশীয় রাজ্যগুলিকে যুক্ত-রাষ্ট্রে যোগ দিবার সময় এক দলিল (Instrument of Accession) সই করিতে হইবে, এই প্রস্তাব ছিল। দেশীয় রাজ্যগুলির কোন্ কোন্ বিষয় সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ও বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণাধিকার পাইবে, ইহা সেই দলিলে উল্লেখ করা হইবে, এইরূপ বিধান করা হইয়াছিল। ইহার ফলে, দেশীয় রাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের দ্বারা ভারতবর্ষের যাহা লাভ হইত, দেশীয় রাজ্যগুলির তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী লাভ হইত। স্বৈরতান্ত্রিক দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় গণতন্ত্রের পথে বাধাস্বরূপ হইত।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দেশীয় রাজ্যগুলির শাসন-তান্ত্রিক অবস্থা

(The Constitutional Position of the Natite States after the Transfer of Power)

ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে ব্রিটিশ সম্রাটের সর্ব্বময় প্রভুত্বেরও (Paramountcy) অবসান ঘটিয়াছে। ব্রিটিশ সম্রাটের সহিত দেশীয় রাজ্যগুলির যে সব চুক্তি ও সন্ধিপত্রের ফলে ব্রিটিশ সম্রাট সর্ব্বময় প্রভু (Paramountcy Power) রূপে বিরাজ করিতেন, সেইগুলির বিলোপ

ঘটিয়াছে ; সেই সমস্ত থাকিবার জন্য ব্রিটিশ সম্রাটের সহিত দেশীয় রাজ্যগুলির যে বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক ছিল, তাহা আর নাই। ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে দেশীয় রাজ্যগুলি তাঁহাদের ইচ্ছামত ভারতীয় ইউনিয়ন অথবা পাকিস্তান, যে কোনও ডোমিনিয়নে, যোগদান করিতে পারে, অথবা ইচ্ছা করিলে, তাহারা স্বাধীন থাকিতেও পারে। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য ভৌগলিক ঐক্য ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করিয়াছে। ক্যাবিনেট-মিশন-পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যগুলি মোট ৯৩ জন প্রতিনিধি গণপরিষদে পাঠাইবার অধিকারী। যে সব দেশীয় রাজ্য ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিয়াছে, তাহারা ভারতীয় গণপরিষদে এবং যে সব দেশীয় রাজ্য পাকিস্তানে যোগ দিয়াছে, তাহারা পাকিস্তান গণপরিষদে প্রতিনিধি পাঠাইবার অধিকারী হইয়াছে।

ব্রিটিশ সম্রাটের সর্ব্বময় প্রভুত্ব (Paramountcy) ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দেশীয় রাজ্যগুলির নৃপতিদিগের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে। অতএব, দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণই সার্ব্বভৌম নৃপতি হিসাবে গণ্য হইবার যোগ্য, এমন যুক্তি অধিকাংশ নৃপতি দিয়া থাকেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক দলসমূহের বক্তব্য এই যে, দেশীয় রাজ্যের প্রজাবর্গই সার্ব্বভৌম প্রভুত্বের অধিকারী হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের সম্পত্তি ও অনুমতি লইয়াই শাসন সম্পর্কিত সমুদয় ব্যবস্থা করিতে হইবে। পক্ষান্তরে, ডাঃ আম্বেদকর বলেন যে ব্রিটিশ সম্রাটের সর্ব্বময় প্রভুত্ব আজ দেশীয় রাজ্যের রাজাদেরও নহে, প্রজাদেরও নহে, ইহা ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান গভর্ণমেণ্টের উপর বর্ত্তাইয়াছে। তাঁহার মতে ব্রিটিশ সম্রাটের সর্ব্বময় প্রভুত্ব (Paramountcy) সম্রাটের বিশেষ অধিকার (Prerogative) সমূহের অন্যতম ; সম্রাট মন্ত্রীদের পরামর্শ ক্রমে ইহা প্রয়োগ করিতেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের লোপ পাইবার সঙ্গে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত সরকারই ইহা ভোগ করিবার অধিকারী।

শাসনতান্ত্রিক বা আইনগত দৃষ্টির বিচারে যাহাই স্থির হউক না কেন, স্বাধীন ভারতবর্ষে দেশীয় রাজ্যগুলির পৃথক অস্তিত্ব রাখিতে দেওয়া চলে না। এগুলি অতীতকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্রীড়া-ক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। আজও, পৃথক অস্তিত্বের সুযোগ পাইলে, এগুলি বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আশ্রয়স্থল হইয়া থাকিবে। পণ্ডিত জওহরলাল এ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে কোনও দেশীয় রাজ্য যদি স্বাধীনতা ঘোষণা করে, তবে, তাহা শত্রুতামূলক কার্য্য (hostile act) বলিয়া গণ্য করা হইবে।

১৯৪৭ সালের জুলাই হইতে ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের মধ্যে দেশীয় রাজ্যসমূহের রূপান্তর

(Transformation of the Native States between July, 1947 to July, 1948)

১৯৪৭ সালের ৫ই জুলাই ভারত গভর্ণমেণ্টের দেশীয় রাজ্য দপ্তর প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ দিবস হইতে ১৯৪৮ সালের জুলাই পর্য্যন্ত ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের যে অশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্ট তাহার এক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। দুই প্রকারে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। (১) দেশীয় রাজ্যগুলিকে যুক্ত করিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে আনিয়া আত্মনির্ভরশীল করিয়া এবং (২) দেশীয় রাজ্যগুলিতে গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া—এই দুই পথে দেশীয় রাজ্যগুলির রূপান্তর সাধন করা হইয়াছে। ভারতীয় ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইয়া দেশীয় রাজ্যগুলি ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত এক নূতন ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে। দেশীয় রাজ্যসমূহের ভারত-ভুক্তির ফলে, গভর্ণমেণ্ট এখন সমগ্র দেশের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যকরী সম্মিলিত পন্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। এযাবৎ কাল দেশীয় রাজ্যসমূহ সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তির ক্রীড়াক্ষেত্র রূপে ব্যবহৃত হইত। ভারতের রাজনৈতিক অন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গ বরাবর রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। তাই ভারতীয় ডোমিনিয়ন সরকার যখন দেশীয় রাজ্যসমূহে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তখন প্রথম হইতে প্রবল বাধার সৃষ্টি করা হয়। এমন কি একাধিক রাজস্থান গঠনের প্রস্তাবও করা হয়। ত্রিবাঙ্কুর ও কাশ্মীর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে থাকিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করে। হায়দ্রাবাদ ত শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় ডোমিনিয়নের বাহিরে থাকিয়া, গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি না অনুসরণ করিয়া পুরাতন স্বৈরতন্ত্র চালাইয়াছে। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত শাসকগোষ্ঠীকে গণতন্ত্রের দাবী মানিয়া লইতে হইবেই, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে সব দেশীয় রাজ্য ভারতীয় ডোমিনিয়নের উদ্দেশ্যে বাধা দিয়াছে, তাহাদের কেহই রাজ্যের জনগণের ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা স্বার্থের কথা ভাবে নাই। এই সব কথা বিবেচনা করিলে, দেশীয় রাজ্যগুলিকে এত অল্প সময়ের মধ্যে ভারতভুক্ত করিয়া গণতন্ত্রের পথে পরিচালিত করা কম প্রশংসনীয় নহে।

কতকগুলি দেশীয় রাজ্যকে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, এবং

কতকগুলি দেশীয় রাজ্যকে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের শাসনভুক্ত করা হইয়াছে। এই সব দেশীয় রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রজাদের নিকট ক্ষমতা আপনা হইতেই হস্তান্তরিত হইয়াছে, কারণ এই সকল অঞ্চল জনপ্রিয় প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে চলিয়া আসিয়াছে। প্রদেশ বা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, এমন বড় বড় দেশীয় রাজ্যগুলিতে অনেক স্থলে ক্ষমতা জনগণের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে; অনেক স্থলে অদূর ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা হইবে, ইহা ঘোষণা করা হইয়াছে।

মোট ২১৯টি দেশীয় রাজ্যকে সন্নিহিত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের মোট আয়তন ৮৪৭৭৪ বর্গমাইল। নিম্নপ্রদর্শিত তালিকা অনুসারে দেশীয় রাজ্যগুলি বিভিন্ন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে :—

প্রদেশ		যে কয়টি রাজ্য অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে	আয়তন বর্গ মাইল	জনসংখ্যা লক্ষে	রাজস্ব লক্ষে
উড়িষ্যা	...	২৩	২৩,৬৩৭	৪০·৪৬	৯৮·৭৪
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	...	১৫	৩১,৭৪৯	২৮·৩৪	৮৮·৩১
বিহার	...	২	৬২৩	২·০৮	৬·৪৫
মাদ্রাজ	...	২	১,৪৪৪	৪·৮৪	৩০·৮১
পূর্ব্ব পাঞ্জাব	...	৩	৩৭০	·৮০	১০·৩৮
বোম্বাই	...	১৭৪	২৬,৯৫১	৪৩·৬৭	৩০৭·১৫
মোট	...	২১৯	৮৪,৭৭৪	১২০·১৮	৫৪১৮৪

আবার প্রয়োজন মত কতকগুলি করিয়া দেশীয় রাজ্যের সমবায়ে গঠিত অঞ্চলকে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের অধীন করা হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুসারে ২২টি রাজ্য দুইটি ইউনিটে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে এবং ইহাদিগকে চীফ কমিশনার শাসিত অঞ্চল করা হইয়াছে।

নূতন অঞ্চলের নাম		যে কয়টি দেশীয় রাজ্য অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে	আয়তন বর্গ মাইল	জনসংখ্যা লক্ষে	রাজস্ব লক্ষে
হিমাচল প্রদেশ	...	২১	১০,৬০০	৯·৩৬	৮৪·৫৬
কচ্ছ	...	১	৮,৪৬১	৫·০১	৮০·০০
মোট	...	২২	৯৯,০৬১	১৪·৩৭	১৬৪·৫৩

দেশীয় রাজ্যগুলির সংহতি রক্ষার জন্য নূতন আত্মনির্ভরশীল রাজ্যসঙ্ঘ গঠনও করা হইয়াছে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী নিম্নলিখিতরূপ রাজ্যসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে :—

রাজ্য	যে কয়টি রাজ্য অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে	আয়তন বর্গমাইলে	জনসংখ্যা লক্ষে	রাজস্ব লক্ষে
সৌরাষ্ট্র	২১৭	৩১৪৪৫	৩৫.২২	৮০০.০০
মৎস্য	৪	৭৫৩৬	১৮.৩৮	১৮৩.০৬
বিন্ধ্যপ্রদেশ	৩৫	২৪,৬১০	৩৫.৬৯	২৪৩.৩০
রাজস্থান	১০	২৯,৯৭৭	৪২.৬১	৩১৬.৬৭
মধ্যভারত	২০	৪৬,২৭৩	৭১.৫০	৭৭৬.৪২
পাতিয়ালা ও পূর্ব্ব পাঞ্জাব রাজ্য সঙ্ঘ	৮	১০,১১৯	৩৪.২৪	৫০০.০০
মোট—	২৯১	১৫০,৪০০	২৩৭.৬৪	২৮১৯.৪৫

উল্লিখিত দেশীয় রাজ্যসমূহ ছাড়া, মহীশূর, বরোদা, ত্রিবাঙ্কুর, ভূপাল প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় দেশীয় রাজ্য আত্মনির্ভরশীল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে এবং তাহাদের পৃথক সত্তা বজায় আছে।

পাকিস্তানে দেশীয় রাজ্যসমস্যা বিশেষ কিছু নাই। কালাত, লাসবেলা, খারাণ, বাহওয়ালপুর ও খয়েরপুর মাত্র এই কয়টি রাজ্য পাকিস্তান সংলগ্ন এলাকার মধ্যে পড়িয়াছে। ইহারা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভারতের বিচার ব্যবস্থা

(The Judical Sytem of India)

ভারতবর্ষে বিচার ব্যবস্থার মোটামুটি দুইটি বিভাগ রহিয়াছে ; ফৌজদারী ও দেওয়ানী। ফৌজদারী মামলা বিচারের জন্য পৃথক বিচারালয় ও পৃথক বিধি এবং দেওয়ানী মামলা বিচারের জন্য পৃথক বিচারালয় ও পৃথক বিধি রহিয়াছে।

দেওয়ানী বিচার

(Civil Cases)

দেওয়ানী মামলা বিচারের জন্য ইউনিয়ন কোর্ট সর্ব্বনিম্ন আদালত। কতকগুলি উন্নত ইউনিয়ন বোর্ডের উপর ছোটখাটো দেওয়ানী মামলা বিচারের ভার দেওয়া হয়, কোন কোন প্রদেশে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের উপর ছোটখাটো মামলা বিচারের ভার দেওয়া হইয়াছে। ইহার উপর চৌকীতে অথবা মহকুমা শহরে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের বিষয় সংক্রান্ত বিবাদের বিচার করিবার ভার মুনসেফী আদালতের রহিয়াছে। ইহার অধিক টাকার বিষয়ের মামলা হইলে জেলা জজ্ বা সব্-জজ্এর আদালতে বিচার হইবে। প্রত্যেক জেলায় একজন করিয়া জেলা জজ রহিয়াছেন। ইনি জেলার অন্তর্গত সমস্ত আদালতের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন, মুনসেফী আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে জেলা জজের আদালতে নালিশ করা চলে। প্রদেশের মধ্যে হাইকোর্টই সর্ব্বোচ্চ আদালত। পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, এলাহাবাদ, পাটনা, নাগপুর, আসাম ও উড়িষ্যায় হাইকোর্ট রহিয়াছে। শেষোক্ত দুইটি প্রদেশে সম্প্রতি হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাকিস্তানে পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে হাইকোর্ট আছে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং অযোধ্যায় চীফ কোর্ট এবং আজমীর, মারওয়ারা ও কুর্গে হাইকোর্টের মর্য্যাদাযুক্ত জুডিসিয়াল কমিশনারের কোর্ট রহিয়াছে। ইহাদেরও মর্য্যাদা হাইকোর্টের মর্য্যাদার সমান। প্রত্যেক হাইকোর্টে একজন প্রধান বিচারপতি ও কয়েকজন বিচারপতি থাকেন। কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই এই তিনটি হাইকোর্টের একটি প্রারম্ভিক বিভাগ (Original Side) ও আপীল বিভাগ রহিয়াছে। অন্য সমস্ত হাইকোর্টে আপীল বিভাগ রহিয়াছে। আদিম বিভাগ (Original Side) থাকায় কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই এর হাইকোর্টে নিজ নিজ

প্রেসিডেন্সি এলাকার মধ্যে কতকগুলি দেওয়ানী মামলার সরাসরি বিচার হয়। দশ হাজার টাকা বা তদূর্দ্ধ মূল্যের মামলা সম্পর্কে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করিবার নিয়ম ছিল। ১৯৪৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করা চলিবে না। দেওয়ানী মামলা সম্পর্কে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আগে যেখানে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল চলিত, এখন সেখানে ফেডারেল কোর্টে আপীল চলিবে। ফেডারেল কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল চলিবে। প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের অধিকার শীঘ্র উঠিয়া যাইবে। কলিকাতা মাদ্রাজ ও বোম্বাই এই তিনটি শহরে অল্প মূল্যের দেওয়ানী মামলা বিচারের জন্য প্রেসিডেন্সি ছোট আদালত (Presidency Small Cause's Courts) রহিয়াছে। এই সব আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে নালিশ করা চলে।

ফৌজদারি বিচার
(Criminal Cases)

ফৌজদারি মামলা বিচারের সর্ব্বনিম্ন আদালত হইতেছে ইউনিয়ন বেঞ্চ (Union Bench)। উন্নত ইউনিয়ন বোর্ডসমূহকে ছোটখাট ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার দেওয়া হয়। সহরে ফৌজদারি মামলার বিচারের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত রহিয়াছে। তিন শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত রহিয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও হাজার টাকা জরিমানা, দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছয়মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও দুইশত টাকা জরিমানা এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট এক মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও পঞ্চাশ টাকা জরিমানা বিধান করিতে পারেন। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত বেতনভোগী এই তিন শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়াও অবৈতনিক এই তিন শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বর্ত্তমানে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ অবাঞ্ছনীয় বলিয়া উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ডাকাতি, নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার জেলা ও দায়রা বিচারকের আদালতে হইয়া থাকে। এই সব অভিযোগের বিচার সাধারণতঃ জুরীদের সাহায্যে (Trial by Jury) হইয়া থকে। জুরারগণ (Juror) ঘটনার বিচার করিয়া থাকেন, দায়রা বিচারক আইনের বিচার করিয়া থাকেন। জুরীদের অধিকাংশের অভিমত দায়রা বিচারক মানিতে বাধ্য থাকেন। তবে, তিনি জুরিদের মতের সহিত একমত না হইলে মামলাটি

হাইকোর্টে পাঠাইতে পারেন। কোনও কোনও জেলায় জুরী বিচার প্রবর্ত্তিত হয় নাই; সেখানে, গুরুতর অপরাধসমূহের বিচার এসেসরগণের (Assessors) সাহায্যে হইয়া থাকে। বিচারক এসেসরগণের পরামর্শ মানিতে বাধ্য নহেন। জিলা ও দয়রা জজ অধীনস্থ ম্যাজিষ্ট্রেটগণের বিচারের বিরুদ্ধে আপীলের বিচার করিয়া থাকেন। আবার জেলা ও দায়রা জজের রায়ের বিরুদ্ধে, হাইকোর্টে আপীল ও মোশন হইয়া থাকে। হাইকোর্টে বিচারের পর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আইন ঘটিত প্রশ্ন জড়িত থাকিলে মামলায় আপীল প্রিভি কাউন্সিল (Privy Council) পর্য্যন্ত চলিতে পারে।

কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই সহরে ফৌজদারী বিচারের জন্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট রহিয়াছে। এই সব স্থানে নরহত্যা, ডাকাতি প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার হাইকোর্টের দায়রা বিচারে হইয়া থাকে।

ফেডারেল কোর্ট

(Federal Court)

১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন অনুযায়ী ফেডারেল কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। উক্ত আইনে একজন প্রধান বিচারপতি এবং ছয়জনের অনধিক বিচারপতি লইয়া ফেডারেল কোর্ট গঠিত হইবার বিধান আছে। বর্ত্তমানে একজন প্রধান বিচারপতি এবং দুইজন বিচারপতি লইয়া ফেডারেল কোর্ট গঠিত হইয়াছে। দুই বা ততোধিক প্রদেশের মধ্যে, প্রদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানকারী দেশীয় রাজ্যের মধ্যে অথবা যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাষ্ট্রের গঠনকারী অংশ প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্যের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, ফেডারেল কোর্টে প্রারম্ভিক বিভাগে (original jurisdiction) তাহার সরাসরি বিচার হইবে। ইহার আপীল বিভাগে হাইকোর্টসমূহের বিচারে ভারতীয় গঠনতান্ত্রিক আইন সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন জড়িত থাকিলে, হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারে। এই সব কাজ ছাড়া, গভর্ণর জেনারেল কোনও বিষয়ে পরামর্শ চাহিলে, ফেডারেল কোর্ট সেই বিষয়ে ইহার পরামর্শ দান করিবে। ১৯৪৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ফেডারেল কোর্টের ক্ষমতার সীমা বিস্তৃত করা হইয়াছে। দেওয়ানী মামলা সম্পর্কিত হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আগে যে-সব ক্ষেত্রে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল চলিত, বর্ত্তমানে ফেডারেল কোর্টে সেই সব ক্ষেত্রে আপীল চলিবে। ফেডারেল কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে (Privy

Council) আপীল হইতে পারে। প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের বিধান শীঘ্র উঠিয়া যাইবে।

প্রিভি কাউন্সিল
(Privy Council)

এখনও (জুলাই, ১৯৪৮) ইহা সর্ব্বোচ্চ আদালত। ইহার আসল নাম Judicial Committee of the Privy Council ; লণ্ডনে ইহার অধিবেশন বসে। হাইকোর্টে কোনও ফৌজদারী মামলায় গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জড়িত থাকিলে, হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে নালিশ হইতে পারে। অন্যান্য মামলায় ফেডারেল কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল হইতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের ব্যবস্থা লোপ পাইবে।

ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার সমালোচনা
(Criticism of the Indian Judicial System)

ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার একটি ত্রুটি এই যে ইহা দরিদ্র ও গ্রাম প্রধান ভারতের জীবন যাত্রার অনুপযোগী ব্যয়বহুলতা ও আড়ম্বরে পরিপূর্ণ। একথা বলা অন্যায় নহে যে এখনও দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে আদালতের সাহায্যে সুবিচার পাওয়া প্রায় অসম্ভব। গ্রাম্য পঞ্চায়েত গঠন করিয়া তাহাদের হাতে বেশীর ভাগ ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার মীমাংসার ভার দিলে সুবিচার সহজলভ্য হইবে।

জুরীর সাহায্যে বিচার এদেশে এখনও প্রসারলাভ করে নাই। গুরুতর অপরাধের জন্যই জুরীবিচারের ব্যবস্থা আছে। তা-ও সকল স্থানে এই সীমাবদ্ধ জুরী বিচারও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। জুরী বিচারের নিয়ম আরও ব্যাপক হইলে ভাল হইবে।

ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার সর্ব্বপ্রধান ত্রুটি এই যে এখানে জেলার ও মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট একাধারে বিচারক ও অভিযোক্তা উভয় হিসাবে কাজ করিতে পারেন। ইহাদের আদেশেই আসামী গ্রেপ্তার হইতে পারে, আবার ইহাদের দ্বারাই বা অধীনস্থ ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারা ইহাদেরই আদেশে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার হইতে পারে। বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের এই অপবিত্র মিলনের ফল সুবিচারের পক্ষে মারাত্মক হইয়া পড়ে। ইহার প্রতিকার প্রয়োজন। জেলা ও মহকুমার শাসন কর্ত্তাদের হাতে বিচারের ভার না দিয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচারকদের হাতে বিচারের ভার ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগের প্রথা ছিল। ইহার ফলে সরকারের আশ্রিত-বাৎসল্য অশোভন ভাবে প্রকাশ পাইত। অনেক স্থানে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যাইত। মোটের উপর এই ব্যবস্থা সুবিচারের পরিপোষক হয় নাই বলা হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, এই প্রথা সম্প্রতি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভারতের সুপ্রীম কোর্ট

(The Supreme Court of India)

ভারতীয় ইউনিয়নের জন্য রচিত খসড়া শাসনতন্ত্রে (Draft Constitution) সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্ট একজন প্রধান বিচারপতি এবং অন্যূন সাতজন বিচারপতি লইয়া গঠিত হইবে। ভারতীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করিবেন।

সুপ্রীম কোর্টের অধিবেশন সাধারণতঃ দিল্লীতে হইবে, তবে, প্রধান বিচারপতি প্রেসিডেণ্টের অনুমোদনক্রমে অন্য স্থানেও অধিবেশন করিতে পারেন।

সুপ্রীম কোর্টের আদিম বিভাগ ও আপীল বিভাগ থাকিবে। কোনও আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারে যদি (১) ভারত সরকার এবং এক বা একাধিক যোগদানকারী ষ্টেটের (State) মধ্যে, অথবা, (২) যদি একদিকে ভারত সরকার ও এক বা একাধিক ষ্টেট (State) এবং অন্যদিকে এক বা একাধিক ষ্টেটের (State) মধ্যে, অথবা, (৩) যদি দুই বা ততোধিক ষ্টেটের (State) মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার সরাসরি বিচার সুপ্রীম কোর্টে হইবে। ভারতীয় গঠনতন্ত্রে উল্লিখিত মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে, প্রতিকারের জন্য সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করা চলিবে।

কোনও মামলায় যদি ভারতীয় গঠনতন্ত্রের (Constitution) ব্যাখ্যার প্রশ্ন জড়িত থাকে, তাহা হইলে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলিবে। তাহা ছাড়া, মামলায় বিষয়ের মূল্য যদি কুড়ি হাজার বা তদূর্দ্ধ টাকা হয়, তাহা হইলেও হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলিবে। হাইকোর্ট যদি বলেন, অন্য কোনও মামলা সুপ্রীম কোর্টে আপীল করিবার উপযুক্ত তাহা হইলেও সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলিবে।

ষোড়শ অধ্যায়

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন

(Local Self-Government)

ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল হইতে স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব কালে পৌর শাসনের সুব্যবস্থা ছিল। প্রাচীন হিন্দু রাজত্ব কালে গ্রাম্য পঞ্চায়েতের উপর গ্রামের সমূহ ব্যবস্থার ভার থাকিত। এই পঞ্চায়েতগুলি গ্রামের পূর্ণবয়স্ক পুরুষগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইতেন।

ব্রিটিশ শাসন কালে ১৬৮৭ সালে প্রথম মাদ্রাজ সহরে স্বায়ত্ত শাসন মূলক পৌর শাসনের ব্যবস্থা করা হয়। কলিকাতা ও বোম্বাই সহরে পরে এইরূপ ব্যবস্থা হয়। ১৮৪২এবং ১৮৫০ সালে যে কোনও সহরে মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপনের জন্য আইনপ্রচার করা হয়। এ সময় নির্ব্বাচনের কোনও কল্পনা করা হয় নাই। ১৮৭০ সালে লর্ড মেয়ো এক প্রস্তাবে স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়া জোর সুপারিশ করেন। ক্রমে কিছু কিছু আসন নির্ব্বাচন দ্বারা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা হয়; কলিকাতা কর্পোরেশনের দুই তৃতীয়াংশে এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজ কর্পোরেশনের অর্দ্ধেক আসন নির্ব্বাচন দ্বারা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

ইহার পর ১৮৮২ সালে লর্ড রিপন একটি প্রস্তাবে স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ অধিকতর ব্যাপক ভাবে প্রতিষ্ঠার সমর্থন করেন। তিনি বলিয়াছিলেন ইহার দ্বারাই মানুষ স্বাবলম্বন শিক্ষা পাইবে এবং নিজেদের দ্বারা বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারিবে। ইহার দ্বারাই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞান বিস্তার লাভ করিবে। ইহার পর কতকগুলি আইন নির্ব্বাচন নীতির অধিকতর প্রয়োগ করা হয় এবং বেশী সংখ্যক আসন নির্ব্বাচনের দ্বারা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করা হয়। কোথাও কোথাও বে-সরকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন, এই সুযোগ দেওয়া হয়।

১৯১০ সালে ভারত শাসন আইনের ফলে স্বায়ত্ত শাসন বিভাগ আইন সভার নিকট নির্ব্বাচিত প্রাদেশিক মন্ত্রীদের নিকট হস্তান্তরিত করা হয়। প্রাদেশিক মন্ত্রিগণের হাতে স্বায়ত্ত শাসনের বিশেষ উন্নতি হয়। শীঘ্রই বিভিন্ন প্রদেশে

বিবিধ আইনের ফলে মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলাবোর্ডে প্রকৃত নির্ব্বাচিত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়, স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা ও অধিকারের সীমাও বাড়ানো হয়, এবং ইহাদিগকে বহু পরিমাণে সরকারী কর্তৃত্বের নাগপাশ হইতে মুক্ত করা হয়। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার (Provincial Autonomy) প্রবর্ত্তনের পর বিভিন্ন প্রদেশে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের আরও অধিক উন্নতিমূলক আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে।

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রেণী বিভাগ

(Classification of Local Self-Governing Bodies)

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যায়, পৌর (urban) স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান এবং গ্রাম্য (rural) স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান। পৌর স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির দৃষ্টান্ত—কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি এবং ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ড। এগুলি সহর এলাকার জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্ত জেলা বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড বা গ্রাম্য পঞ্চায়েত। গ্রাম্য এলাকার জন্য গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান থাকে।

করপোরেশন

(Corporation)

কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও করাচী সহরে করপোরেশন আছে। ইহাদের মধ্যে কলিকাতা ও বোম্বাই করপোরেশনের গুরুত্বই অধিক।

কলিকাতা করপোরেশন

(Calcutta Corporation)

১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী কলিকাতা করপোরেশনের গঠনতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আইনের জন্য প্রশংসার অধিকারী। ১৯২৩ সালের আইন পরবর্ত্তীকালে অনেক সংশোধন হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৯৩৯ সালের সংশোধন আইনই সর্ব্বাপেক্ষা

গুরুত্বপূর্ণ। বর্ত্তমানে ইহার ৯৩ জন কাউন্সিলার (Councillor) এবং কাউন্সিলারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত পাঁচজন অল্ডারম্যান (Alderman), এই ৯৮ জন সভ্য লইয়া গঠিত। কাউন্সিলারগণের মধ্যে ৮৫ জন নির্ব্বাচিত এবং ৮ জন মনোনীত কাউন্সিলার থাকেন। হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য লীগ আমলে পৃথক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। পৃথক নির্ব্বাচনের দুষ্ট ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়া আসন সংরক্ষণ সহ যুক্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা হইবে স্থির হইয়াছে। বিভিন্ন বণিক সঙ্ঘ এবং শ্রমিকদের বিশেষ নির্ব্বাচক মণ্ডলী রহিয়াছে। কাউন্সিলার এবং অল্ডারম্যানগণ নিজেদের মধ্য হইতে মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচন করেন। মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের কার্য্যকাল এক বৎসর। তিন বৎসর অন্তর করপোরেশনের পুনর্গঠন হয়।

করপোরেশনের প্রধান কর্ম্ম-সচিবের (Chief Executive Officer) অধীন অনেক কর্ম্মচারী আছেন। প্রধান কর্ম্ম-সচিব, সম্পাদক প্রভৃতি কয়েকটি বড় বড় পদের কর্ম্মচারী সদস্যগণের ভোটে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। করপোরেশন প্রতি বৎসর কার্য্য পরিচালনার জন্য দশটি ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি নিয়োগ করেন।

করপোরেশনের উপর বহু কাজের ভার রহিয়াছে। এই কাজগুলিকে মোটামুটি জনস্বাস্থ্য, নিরপত্তা বিধান, এবং শিক্ষা, এই কয় ভাগে ভাগ করা যায়। পানীয় জল ও অপরিশ্রুত জল সরবরাহ, নগরের জল নিকাশের ব্যবস্থা, পথ, পার্ক, উদ্যান প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, পথে আলোকের ব্যবস্থা, বাজার, হাসপাতাল, ডিসপেন্সারি, লাইব্রেরি প্রভৃতির নির্ম্মাণ ও পরিচালন, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি রোগ নিবারণের জন্য টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা এবং প্রতিরোধমূলক অন্য ব্যবস্থা করা, খাদ্য ও পানীয়ে ভেজাল নিবারণ এবং জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যবস্থা করা, জন্ম ও মৃত্যুর রেজিষ্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা, প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করা প্রভৃতি করপোরেশনের কাজ।

করপোরেশনের বাৎসরিক মোট আয় প্রায় আড়াই কোটী টাকা। নগরের জমি ও বাড়িসমূহের উপর ধার্য্য কর, বৃত্তি ও ব্যবসায়ের উপর ধার্য্য কর, গাড়ী ও জীব-জন্তুর উপর কর, বাজার ও করপোরেশনের সম্পত্তিসমূহ হইতে আয়—এই সকল হইতে করপোরেশনের মোট আয় হইয়া থাকে। করপোরেশনের আয় বিবিধ কার্য্যে ব্যয় হইয়া যায়।

নানাবিধ গলদ ও দুর্নীতির অভিযোগে পশ্চিম বঙ্গ সরকার কলিকাতা করপোরেশনের কার্য্যভার ইহার সদস্যদের হাত হইতে লইয়া সরকারী কর্ত্তৃত্বে গ্রহণ করিয়াছেন।

বোম্বাই কর্পোরেশন
(Bombay Corporation)

বোম্বাই কর্পোরেশন ১১৭ জন সদস্য লইয়া গঠিত, তন্মধ্যে তিন জন পদাধিকারবলে সদস্য হইয়া থাকেন। এইখানে প্রাপ্তবয়স্কমাত্রের ভোটাধিকারের উপর নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। কর্পোরেশনের কার্য্যকাল চার বৎসর। প্রধান কর্ম্ম-সচিব সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন।

মিউনিসিপ্যালিটি
(Municipality)

কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও করাচী ছাড়া অন্যান্য সহরে মিউনিসিপ্যালিটি রহিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের অধিকাংশ সদস্যই নির্ব্বাচিত এবং কমসংখ্যক সদস্য মনোনীত হইয়া থাকেন। বাঙ্গালা দেশে মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই আইন অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গের হাওড়া এবং পূর্ব্ব বঙ্গের ঢাকা ও চট্টগ্রাম সহরে তিন পঞ্চমাংশ সদস্য নির্বাচিত এবং বাকী দুই পঞ্চমাংশ সদস্য মনোনীত হইবার বিধান আছে। অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে তিন-চতুর্থাংশ সদস্য নির্ব্বাচিত এবং এক-চতুর্থাংশ সদস্য মনোনীত হইবার বিধান আছে। করদান ও শিক্ষার যোগ্যতার উপর ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আসন-সংরক্ষণসহ যুক্ত-নির্ব্বাচন ব্যবস্থা রহিয়াছে। কমিশনারগণ নিজেদের মধ্য হইতে চেয়্যারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত করেন। চেয়ারম্যান মিউনিসিপ্যালিটির প্রধান কর্ত্তা, তিনি অন্যান্য কমিশনারগণের পরামর্শক্রমে মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য
(Functions of a Municipality)

মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, পথে আলোক দানের ব্যবস্থা করা, আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা করা, জল-নিকাশের ব্যবস্থা করা, পুষ্করিণী, টিউবওয়েল প্রভৃতি তৈরী করিয়া পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, বস্তী-উন্নয়ন করা, সংক্রামক রোগ নিবারণ-ব্যবস্থা, হাসপাতাল ও দাতব্য ঔষধালয়ের ব্যবস্থা, খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের ভেজাল নিবারণ করা, জন্ম-মৃত্যু রেজিষ্ট্রেশনের ব্যবস্থা করা, শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা প্রভৃতি মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য-তালিকার অন্তর্গত।

মিউনিসিপ্যালিটির আয়-ব্যয়
(Income & Expenditure of a Municipality)

মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার ভিতর বাড়ী ও জমির উপর কর, ব্যবসা ও বৃত্তির উপর কর, জীব-জন্তুর উপর, গাড়ী-ঘোড়ার উপর কর, ফেরী ঘাট ও পুলের উপর কর প্রভৃতি হইতে মিউনিসিপ্যালিটির আয় হইয়া থাকে। পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব্ব বঙ্গ প্রদেশ ছাড়া অন্যান্য অনেক প্রদেশে মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা হইতে এবং এলাকার ভিতর মালপত্র লইয়া যাইতে হইলে কর আদায় করা হয়। ইহাতেও বেশ আয় হয়। প্রাদেশিক সরকারও মাঝে মাঝে মিউনিসিপ্যালিটিসমূহকে অর্থ সাহায্য করেন। প্রয়োজন হইলে সরকারের অনুমতি লইয়া মিউনিসিপ্যালিটি-সমূহ টাকা কর্জ্জও করিতে পারেন।

উক্ত কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করিতে এবং কর্ম্মচারীদের বেতন দিতে ও অফিস চালাইতে মিউনিসিপ্যালিটির আয় খরচ করা হয়।

ক্যান্টনমেণ্ট বোর্ড
(Cantonment Board)

যে সব সহরে সেনা নিবাস থাকে, সেই সব স্থানে স্থানীয় ব্যাপারগুলির তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ক্যান্টনমেণ্ট বোর্ড থাকে। এগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে সরকারী কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে।

গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন
(Rural Self-Government)

মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যের অনুরূপ কার্য্য করিবার জন্য গ্রাম-অঞ্চলে জেলা বোর্ড, লোক্যাল বা তালুক বোর্ড এবং ইউনিয়ন বোর্ড বা গ্রাম্য পঞ্চায়েতসমূহ রহিয়াছে।

জেলা বোর্ড
(District Board)

গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন পরিকল্পনার মধ্যে জেলা বোর্ডের স্থান সর্ব্বাগ্রে। জেলা বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচনে আসন সংরক্ষণসহ যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা অনুসরণ করা হয়।

সদস্যগণের কার্য্যকাল চার বৎসর। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে জেলা বোর্ডের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্ব্বাচিত এবং এক-তৃতীয়াংশ সদস্য মনোনীত হইতেন। সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ সরকার সরকারী মনোনয়ন-প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশে বহুদিন হইতেই জেলা বোর্ডে মনোনয়ন প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জেলাবোর্ডের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত করেন। চেয়ারম্যান জেলা বার্ডের প্রধান কর্ত্তা। ইনি অপরাপর সদস্যের পরামর্শক্রমে জেলা বোর্ডের কর্ত্তা নির্ব্বাচন করেন।

জেলাবোর্ডের কার্য্য
(Functions of a District Board)

জেলা বোর্ড জেলার মিউনিসিপ্যাল এলাকার বহির্ভূত গ্রাম্য অঞ্চলে নিম্নলিখিতরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন:—১। পথঘাট, পুল প্রভৃতি নির্ম্মাণ ও মেরামত; ২। দাতব্য হাসপাতাল ও ঔষধালয় স্থাপন ও পরিচালনা; ৩। স্বাস্থ্যরক্ষামূলক ব্যবস্থা; সংক্রামক রোগ নিবারণের ব্যবস্থা, টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা; স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কিত প্রচার কার্য্য প্রভৃতি; ৪। পুষ্করিণী, টিউবওয়েল প্রভৃতি দ্বারা পানীয় জল সরবরাহ; ৫। বিবিধ উপায়ে শিক্ষা-বিস্তার; প্রাথমিক ও মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের সাহায্য দান, নূতন নূতন বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি, ৬। খোঁয়াড় ও ফেরীঘাটের ব্যবস্থা, ৭। পশু-চিকিৎসালয় স্থাপন ও পরিচালন; ৮। বাজার, খেলা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি।

জেলাবোর্ডের আয়-ব্যয়
(Income & Expenditure of the District Board)

রোড্ ও পাব্লিক ওয়ার্কস্-সেস্ (Road and Public Work Cess) হইতে জেলা-বোর্ডের প্রধান আয় হইয়া থাকে। প্রাদেশিক সরকার এই সেস বা কর আদায় করিয়া জেলা-বোর্ডের হস্তে দিয়া থাকেন। মোটর গাড়ীর উপর আদায়ী কর হইতেও একটা অংশ প্রাদেশিক সরকার জেলা বোর্ডকে দিয়া থাকেন। ফেরীঘাট ও খোঁয়াড় হইতেও জেলা বোর্ডের একটা আয় হইয়া থাকে। জেলা বোর্ড প্রাদেশিক সরকারের নিকট হইতেও নির্দ্দিষ্ট কাজ করিবার জন্য অনেক সময় অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকেন। জেলা বোর্ড প্রয়োজন হইলে প্রাদেশিক সরকারের অনুমতিক্রমে ঋণ করিয়া টাকা তুলিতে পারেন।

জেলা বোর্ডের আয় উল্লিখিত কার্য্যের জন্য এবং কর্ম্মচারীদের বেতন ও অফিস সংক্রান্ত অন্যান্য খরচের জন্য ব্যয় করা হয়।

লোক্যাল বোর্ড অথবা তালুক বোর্ড
(Local Board)

লোক্যাল বোর্ডের অধীন মহকুমাতে লোক্যাল বোর্ড বা তালুক বোর্ড থাকে। এগুলি জেলা বোর্ডের প্রদত্ত অর্থে জেলা বোর্ডের নির্দ্দেশমত কার্য্য পাইয়া থাকে। ইহাদের নিজস্ব পৃথক আয় বা পৃথক কাজ করিবার ক্ষমতা থাকে না। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশে লোক্যাল বোর্ড তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশেও লোক্যাল বোর্ড নাই। আসামে লোক্যাল বোর্ডগুলি জেলা বোর্ডের অনুরূপ কার্য্য করেন।

ইউনিয়ন বোর্ড
(Union Board)

পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশে ইউনিয়ন বোর্ড ছয় হইতে নয় জন সদস্য লইয়া গঠিত। পূর্ব্বে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য মনোনীত হইতেন। বর্ত্তমানে মনোনয়ন প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সদস্যগণের কার্য্যকাল চার বৎসর। ইউনিয়ন বোর্ডে যুক্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সমস্ত ইউনিয়নই ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্যের এলাকাভুক্ত। ইউনিয়নের অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা ছয় আনা ইউনিয়ন রেট অথবা আট আনা রোড সেস দিয়া থাকেন, তাঁহারাই ভোট দাতা হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন। শিক্ষাবিষয়ক যোগ্যতাও ভোটদানের যোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত করেন। প্রেসিডেণ্টই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা; তিনি সদস্যগণের পরামর্শক্রমে বোর্ডের কার্য্য পরিচালনা করেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্য
(Functions of a Union Board)

ইউনিয়ন বোর্ডের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হইতেছে গ্রাম্য শান্তি-রক্ষার ব্যবস্থা এবং চৌকিদার ও দফাদারদের বেতন দেওয়া। ইহা ছাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্য নিম্নরূপ:—১। গ্রামের রাস্তাঘাট ও স্কুল নির্ম্মাণ ও মেরামত; ২। খোঁয়াড়ের

ব্যবস্থা ; ৩। প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সাহায্য করা ; ৪। দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন ও পরিচালন ; ৫। টিউবওয়েল ও পুষ্করিণী প্রভৃতি দ্বারা পানীয় জলের ব্যবস্থা ; ৬। গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা মূলক ব্যবস্থা ; ৭। জন্ম-মৃত্যু রেজিষ্টারী করা প্রভৃতি। সরকার কর্তৃক কোনও কোনও ইউনিয়ন বোর্ডের উপর ইউনিয়ন বেঞ্চ ও ইউনিয়ন কোর্ট হিসাবে কাজ করিবার অধিকার দেওয়া হয়। তখন ইহারা ছোট-খাট ফৌজদারী ও দেওয়ানি মামলার বিচার করিতে পারেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের আয়-ব্যয়
(Income and Expenditure of a Union Board)

ইউনিয়ন রেট হইতেই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রধান আয় হইয়া থাকে। ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকাভুক্ত জমি অথবা বাড়ীর উপর এই কর ধার্য্য করা হইয়া থাকে। বার্ষিক ছয় আনা হইতে চুরাশী টাকা পর্য্যন্ত এই কর ধার্য্য করা যাইতে পারে। ফেরীঘাট ও খোঁয়াড় হইতেও কিছু টাকা আয় হইয়া থাকে। জেলা বোর্ড ও প্রাদেশিক সরকারের নিকট হইতে ইউনিয়ন বোর্ড অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকেন। যেখানে ইউনিয়ন বেঞ্চ ও কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে, সেখানে এইগুলি হইতেও কিছু আয় হইয়া থাকে।

ইউনিয়ন বোর্ডের আয়ের অধিকাংশ চৌকিদার ও দফাদারদের বেতন যোগাইতে ব্যয় হইয়া যায়। বাকী অংশ রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও মেরামত, পানীয় জল সরবরাহ প্রভৃতি কার্য্য এবং অফিস সংক্রান্ত খরচের জন্য ব্যয়িত হয়।

গ্রাম্য পঞ্চায়েত
(Rural Pauchayet)

বোম্বাই প্রদেশে গ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রের ভোটাধিকারের উপর গ্রাম্য পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসনের অনেকগুলি অধিকার এবং বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার কতক পরিমাণ অধিকার ইহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। মধ্য প্রদেশে পঞ্চায়েতদিগকে বিচারের কোনও ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই এবং এগুলি প্রাপ্ত বয়স্কমাত্রের ভোটাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। সম্প্রতি উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, আসাম প্রভৃতি প্রদেশে অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে।

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন মূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সমালোচনা

(Criticism of the Local Self-Governing Institutions)

ভারতবর্ষে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ যে খুব সাফল্যলাভ করিয়াছে তাহা নহে, তবে, এগুলি যে বিফল হইয়াছে একথাও বলা সঙ্গত হইবে না। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত স্থানীয় ব্যাপারগুলির পরিচালনা করিয়াছে এবং স্থানীয় জনসাধারণের চিত্তে স্বাবলম্বনের দৃঢ় মনোভাব সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু মোটের উপর বলা যায় যে—ভারতবর্ষের স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে অধিকাংশই গতানুগতিক ভাবে অতি সাধারণ স্তরের কার্য্য করিয়াছে, অধিকাংশই স্বায়ত্ত শাসনের মূল তত্ত্ব মোটেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অনেক প্রতিষ্ঠানেরই কার্য্য আশানুরূপ হয় নাই। সহর ও বিশেষভাবে গ্রামগুলির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই ইহাদের স্থানীয় অভাবগুলি চোখে পড়ে। পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট ও জনস্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রাথমিক কর্ত্তব্যগুলিও সর্ব্বনিম্ন যোগ্যতার সহিত সর্ব্বত্র পালিত হইয়াছে একথা বলা যায় না।

এই ব্যর্থতার মূলে রহিয়াছে আমাদের পৌর-কর্ত্তব্যবোধের অভাব। জনসাধারণ নিজেরাও যেমন, তাঁহাদের প্রতিনিধিবর্গও তদ্রূপ, তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অবহেলা ও ঔদাসিন্য দেখাইয়া থাকেন। স্বায়ত্ত-শাসনমূলক-প্রতিষ্ঠান সমূহের নির্ব্বাচন কালে ভোটদাতারা যে সব সময় বুদ্ধি-বিবেচনা ও আগ্রহ সহকারে প্রার্থীদের গুণাগুণ চিন্তা করিয়া ভোট দেন, তাহা নহে। তাহা ছাড়া, নির্ব্বাচনের সময় গ্রাম্য বা স্থানীয় সঙ্কীর্ণ দলাদলির সহিত রাজনৈতিক দলগত বিরোধ আমদানি করা হয়; এবং ভোট যুদ্ধের ধূলিজালে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ সব সময় তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করেন না। অনেক স্থলে স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থসিদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রতিনিধিবর্গের বিরুদ্ধে বহু রকম দুর্নীতির অভিযোগ শুনা যায়, যাহা অপ্রিয় হইলেও কঠোর সত্য বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। জনসাধারণও পৌর-কর্ত্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ঔদাসিন্যবশতঃ প্রতিনিধিবর্গকে তাঁহাদের কর্ম্মে সচেতন করিবার জন্য কোনও সক্রিয় চেষ্টা করেন না, এমন কি দুর্নীতির অভিযোগ উঠিলেও প্রতিকারের উদ্দেশ্যে প্রতিবাদের মিলিত কণ্ঠ শুনা যায় না। করদাতাগণের কষ্টার্জ্জিত অর্থের

অপব্যয় ও অপচয়ের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমতের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি বিরল বলা চলে।

উপযুক্ত শিক্ষিত কর্ম্মচারীর অভাবেও অনেক স্থলে স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহে ভালরূপ কাজ হয় না। অনেক সময় এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষের অসঙ্গত স্বজন-প্রিয়তার জন্য অযোগ্য ব্যক্তি কর্ম্মচারী হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, স্বায়ত্ত শাসনমূলক কার্য্যে অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত লোকও অনেক সময় পাওয়া যায় না।

এইসব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ অনেক সময় নিয়মভঙ্গকারী লোকজনের বিরুদ্ধে দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করেন। অনেকে ভয় করেন, পাছে তাঁহাদিগকে লোকের অপ্রীতিভাজন হইতে হয়, পাছে পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনের সময় তাঁহাদিগকে ভোট হারাইতে হয়। এই দুর্ব্বলতার জন্য অনেক মিউনিসিপ্যালিটির বহু পরিমাণ প্রাপ্য অর্থ অনাদায়ী পড়িয়া থাকে, এবং বহু লোক এইসব প্রতিষ্ঠানের আইন-কানুন ভঙ্গ করিয়াও নিশ্চিন্ত মনে বাস করে।

স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির উপযুক্ত অর্থাভাবও তাহাদের সাফল্যের পথে বড় বাধা। ইঁহাদের উপর বহুসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সেই পরিমাণে অর্থ ইহাদের হাতে নাই। ইঁহাদের অর্থাগমের বিষয়গুলি এমন নহে যে, সেইগুলি হইতে ইহাদের প্রয়োজন মত অর্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ইউনিয়ন বোর্ডগুলির উপর চৌকিদার ও দফাদারদিগের বেতন দিবার ভার আছে। ইহা মিটাইয়া ইউনিয়ন বোর্ডগুলির হাতে এমন কিছু থাকে না যাহাতে পানীয় জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাট, প্রভৃতি বিষয়ের প্রকৃত কোনও উন্নতি করা সম্ভব হইতে পারে। অন্যান্য প্রকার প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধেও বলা চলে যে, প্রয়োজনের তুলনায় সকলেরই আয় অত্যন্ত কম।

স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ

(How to improve the working of the Local Self-Governing Bodies)

উপযুক্ত স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়াই মানুষের স্বাবলম্বন শক্তির স্ফুরণ হয় এবং মানুষ স্বাধীনভাবে, গণতন্ত্রসম্মত ভাবে দেশ-শাসনের উপযুক্ত করিয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিতে পারে। আমাদের স্বায়ত্তশাসনমূলক

প্রতিষ্ঠানগুলিকে দোষ-ত্রুটি মুক্ত করিয়া দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে সহায়ক করিয়া তুলিতে হইবে।

প্রথমতঃ, সকলকে পৌর-কর্ত্তব্য ও পৌর-অধিকার সম্পর্কে সচেতন করিতে হইবে। স্থানীয় প্রতিনিধিগণকে সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থের ঊর্দ্ধে উঠিয়া জন-সেবার মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। বেতনভোগী কর্ম্মচারীরাও শিক্ষিত জন-সেবকরূপে কাজ করিবেন। দৃঢ় চরিত্র, সৎপ্রকৃতি ও সেবা মনোবৃত্তিযুক্ত ব্যক্তিগণকে প্রতিনিধি হইয়া নির্ভীকভাবে জন-স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থাগমের উপায়ও বাড়াইতে হইবে। যেখানেই সম্ভব স্থানীয় করের হার বৃদ্ধি করিয়া অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে। কর দিবার বিরুদ্ধে মানুষের স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা আছে। বহুকালব্যাপী বিদেশী শাসনের ফলে আবার এই অভিযোগ ব্যাপক হইয়াছিল যে, কর বৃদ্ধির প্রস্তাব মাত্রই প্রতিবাদযোগ্য। কারণ, ইহাতে শুধু বিদেশী সরকার কায়েম হইবে। আজ এইরূপ মনোভাব বিদূরিত হওয়া উচিত এবং স্বেচ্ছায় সাধ্যমত কর দিবার আগ্রহবোধ হওয়া উচিত। তবে, যেখানে ইতিমধ্যে যথেষ্ট করভার চাপানো হইয়াছে, সেখানে অধিকতর কর ধার্য্য করা হৃদয়হীনতা ও পরিণামে প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষেই অনিষ্টকর হইবে। যাহারা কর ফাঁকি দিতেছে, বা যতটা পরিমাণ দেওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা কম দিতেছে, তাহাদের উপযুক্ত কর ধার্য্য ও আদায় ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মিউনিসিপ্যালিটি ও ইউনিয়ন বোর্ডগুলির আয় বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব করা যাইতে পারে ; ইহারা যাহাতে স্ব স্ব এলাকার মধ্যে বড় বড় ব্যবসায়ীর নিকট হইতে প্রাপ্য করের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা ; গভর্ণমেণ্ট ও রেলওয়ের সম্পত্তির উপর কর ধার্য্য করিবার অধিকার দান ; প্রমোদ কর, যানবাহন কর, বৈদ্যুতিক কর এবং বিক্রয় কর বাবদ গভর্ণমেণ্ট যে অর্থ পান, তাহার একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ ইহাদিগকে দেওয়া, সরকারী সাহায্য ও বিনা সুদে বা অল্প সুদে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

সপ্তদশ অধ্যায়

ভারতীয় পাব্‌লিক সার্ভিস

(Public Services in India)

পূর্ব্বে সরকারী চাকুরিয়াদিগকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইত। যথা,—ইম্পিরিয়াল বা ইণ্ডিয়ান সার্ভিস (Imperial or Indian Service), প্রাদেশিক সার্ভিস (Provincial Service) এবং সাব-অর্ডিনেট সার্ভিস (Subordinate Service)। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (Indian Civil Service, I. C. S.), ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্ভিস (Indian Polic Service, I. P. S.)—এইসব চাকুরীতে ভারত-সচিব লোক নিয়োগ করিতেন। ভারত-সচিব তাঁহার উপদেষ্টাদের (Advisors) পরামর্শক্রমে এইসব চাকুরীর বেতন, ভাতা, পেন্সন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত নিয়ম প্রণয়ন করিতে পারিতেন। এই সব চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের পদোন্নতি বা শাস্তি প্রভৃতি সম্পর্কে চাকুরীয়ারা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন হইলে গভর্ণর জেনারেল এবং প্রাদেশিক সরকারের অধীন হইলে প্রাদেশিক গভর্ণর ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিতেন। এইসব চাকুরীয়া তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে শেষ পর্য্যন্ত ভারত সচিবের নিকটও আবেদন করিতে পারিতেন।

ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের (Indian Civil Service) গুরুত্বই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। ভারতীয় শাসনযন্ত্রে ইঁহারাই "লৌহ-কাঠামোর" (Steel Frame) কাজ করিতেন। সমস্ত বিভাগে বড় বড় কর্ত্তৃত্বের পদগুলি ইঁহারাই অধিকার করিতেন। বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বাদে সমস্ত প্রদেশের গভর্ণরের পদগুলিতে ঝুনা আই, সি, এস নিযুক্ত হইতেন। লণ্ডন ও দিল্লীতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা এইসব চাকুরীতে লোক নিযুক্ত হইত। ভারত-সচিব পরীক্ষার্থীদের মধ্য হইতে মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের জন্য লোক মনোনীত করিতেন।

ভারত-সচিব কর্ত্তৃক নিযুক্ত চাকুরীয়াদের সম্পর্কে নূতন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্থির হইয়াছে যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ডোমিনিয়ন সরকারের অধীন তাঁহাদের পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট বেতন ও ভাতা প্রভৃতি লইয়া চাকুরীতে বহাল থাকিতে পারিবেন, অথবা তাঁহারা অবসর গ্রহণ করিতেও পারিবেন।

উল্লিখিত চাকুরীগুলি ছাড়া আরও অনেক সর্ব্ব-ভারতীয় চাকুরী ছিল। যেমন,

ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট সার্ভিস (Indian Forest Service), ফিন্যান্স সার্ভিস (Finance Sirvice) প্রভৃতি। ফেডারেল পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের (Federal Public Service Commission) পরামর্শক্রমে সপারিষদ গভর্ণর জেনারেল (Governor-General in Council) এই সব চাকুরীতে লোক নিযুক্ত করিতেন। ফেডারেল পাব্লিক সার্ভিস কমিশন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা এই সব চাকুরীর জন্য প্রার্থী বাছাই করিতেন।

প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের (Provincial Service) চাকুরীয়ারা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে প্রাদেশিক পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের পরামর্শক্রমে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। এখনও এই ব্যবস্থা আছে। সাব-অর্ডিনেট সার্ভিসের (Sub-ordinate Sirvice) লোকজন শাসনযন্ত্র পরিচালনার কাজে প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসের নিম্নস্তরে কাজ করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমানে ভারত-সচিবের পদগুলি অবশ্য উঠিয়া গিয়াছে। এখন ডোমিনিয়নের সিভিল সার্ভিসে গভর্ণর জেনারেল লোক নিযুক্ত করিতে পারেন এবং এই সব চাকুরী সম্পর্কে নিয়ম-কানুন করিতে পারেন। প্রদেশের সিভিল সার্ভিস ব্যাপারে গভর্ণর লোক নিযুক্ত করিতে পারেন এবং এই সব চাকুরী সম্পর্কে নিয়ম-কানুন করিতে পারেন। ডোমিনিয়নের বেলায় ফেডারেল পাব্লিক সার্ভিস কমিশন এবং প্রদেশের বেলায় প্রাদেশিক পাব্লিক সার্ভিস কমিশন চাকুরীতে লোক নিয়োগ সম্পর্কে যথাক্রমে গভর্ণর জেনারেল ও গভর্ণরকে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

ইণ্ডিয়ান এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিস (Indian Administrative Service) ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস (Indian Polic Service) রেলওয়ে সার্ভিস, কাষ্টমস্ সার্ভিস (Customs Service) প্রভৃতি পদ ভারতীয় ডোমিনিয়ন গভর্ণমেণ্টের অধীন। এইগুলিতে ফেডারেল পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী গভর্ণর জেনারেল লোক নিয়োগ করেন।

পাব্লিক সার্ভিস কমিশন

(Public Service Commission)

ডোমিনিয়নের চাকুরীগুলিতে লোক নিয়োগের জন্য ফেডারেল পাব্লিক সার্ভিস কমিশন (Federal Publice Service Commission) এবং প্রাদেশিক চাকুরীতে লোক নিয়োগের জন্য প্রাদেশিক পাব্লিক সার্ভিস কমিশন (Provincial Public Service Commission) রহিয়াছেন। ফেডারেল পাব্লিক সার্ভিস্ কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য গভর্ণর জেনারেল

কর্তৃক নিযুক্ত হন। প্রাদেশিক পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য প্রাদেশিক গভর্ণর কর্তৃক নিযুক্ত হন। ইচ্ছা করিলে দুই বা ততোধিক প্রদেশ একসঙ্গে একটি পাব্লিক সার্ভিস কমিশন নিয়োগ করিতে পারেন। ফেডারেল পাব্লিক সার্ভিস কমিশন ডোমিনিয়নের চাকুরীতে লোক নিয়োগের জন্য এবং প্রাদেশিক পাব্লিক সার্ভিস কমিশন প্রাদেশিক চাকুরীতে লোক নিয়োগের জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ সকল রকম সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্ভিসে লোক নিয়োগের নিয়মকানুন, রীতিনীতি স্থির করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে পাব্লিক সার্ভিসের পরামর্শ শুনিতে হয়। প্রাদেশিক সার্ভিসের বেলায় কোনও চাকুরিয়ার কোনও অভিযোগ থাকিলে প্রাদেশিক পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের নিকট এবং ডোমিনিয়নের সার্ভিসের বেলায় কোনও চাকুরিয়ার কোনও অভিযোগ থাকিলে ফেডারেল পাব্লিক সার্ভিসের নিকট জানাইতে পারা যায়। ফেডারেল পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের জন্য ব্যয় ডোমিনিয়ন সরকারকে বহন করিতে হয় এবং ইহা ডোমিনিয়ন সরকারের আয়ের উপর দায়বদ্ধ ব্যয় (expenditure charged on the revenues of the Dominion) রূপে গণ্য হয়। অনুরূপ ভাবে প্রাদেশিক পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের ব্যয় প্রাদেশিক সরকারকে বহন করিতে হয় এবং ইহা প্রাদেশিক সরকারের আয়ের উপর দায়বদ্ধ ব্যয় (expenditure charged on the revenues of the Province) রূপে গণ্য হয়।

চাকুরীসমূহের ভারতীয়-করণ
(Indianisation of Service)

এই সেদিন পর্য্যন্ত বড় বড় সরকারী চাকুরীর অধিকাংশ ইংরাজদেরই একচেটিয়া ছিল। ভারতীয়রা বহুদিন হইতে শাসন ব্যবস্থায় যথাযোগ্য অংশ পাইবার আন্দোলন চালাইয়া আসিয়াছেন। বড় বড় চাকুরীতে মোটা বেতনের ইংরাজ নিযুক্ত করায় শুধু যে আমাদের দেশের শাসন ব্যবস্থা ব্যয়বহুল হইয়া পড়িত তাহা নহে, আমাদের শাসন কার্য্যও দেশের স্বার্থের ও প্রয়োজনের অনুকূল হইতে পারিত না। বিদেশী কর্ম্মচারী স্বভাবতঃ কখনও দেশের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে পারে না। বিদেশী ভাষা ও আচার ব্যবহারের ব্যবধান থাকার জন্য বিদেশী কর্ম্মচারীরা দেশের লোকের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারিত না, দেশের লোকের অভাব অভিযোগের কথা বুঝিতে পারিত না। তাহারা দেশের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রবিহীন অবস্থায় বিদেশী শাসনযন্ত্র

চালাইয়া যাইত; ইহার নিষ্পেষণে দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইলে অথবা দেশের ঘোরতর অকল্যাণ হইলেও বিদেশী চাকুরিয়া বিন্দুমাত্র বেদনা অনুভব করিত না। বিদেশী কর্ম্মচারীর পরিবর্ত্তে দেশীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ করিলে, দেশের কিছু পরিমাণ সুশাসন সম্ভব হইত এবং শাসনব্যবস্থার ব্যয় অনেক কম পড়িত।

ভারতীয় সরকারী চাকরীগুলিতে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকারের দাবী বহুদিনের। বস্তুতঃ, ভারতীয়গণের এই মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, ভারতীয়গণকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ১৮৩৩ ও ১৮৫৩ সালের চার্টার আইনে (Charter Acts, 1833 and 1853) এবং ১৮৫৮ সালের রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় বলা হইয়াছিল যে, সরকারী চাকুরীতে জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যোগ্য ভারতীয়গণকে গ্রহণ করা হইবে। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর ভারতীয়গণের সরকারী চাকরীসমূহে প্রবেশ সম্পর্কে দুইটি কমিশন বসানো হয়। ইহার পর ১৯১৭ সালে ২০শে আগষ্ট তৎকালীন ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় বলেন যে ভারতীয়গণকে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় সরকারী চাকরীতে লওয়া হইবে। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মুখবন্ধে (Preamble) এই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়। ১৯২০ সালে লী কমিশন (Lee Commission) প্রস্তাব করেন যে, বড় বড় সরকারী চাকরীতে আরও অধিক সংখ্যক ভারতীয় লইতে হইবে। এই সব প্রস্তাব ও তৎসংক্রান্ত ব্যবস্থার ফলে সরকারী চাকরীতে ক্রমশঃ ভারতীয়দের অনুপাত বাড়িতে থাকে। ১৯৪৩ সালে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে মোট কর্ম্মচারীর অর্দ্ধেকের কিছু বেশী ভারতীয় এবং ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্ভিসে অর্দ্ধেকের কিছু কম ভারতীয় দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পর হইতে দ্রুতবেগে সরকারী চাকরীগুলির ভারতীয় করণ (Indianisation) হইয়াছে। বহু ইংরাজ কর্ম্মচারী অবসর গ্রহণ করায় ভারতীয়গণ আরও সহজে বড় বড় পদগুলি অধিকার করিয়াছেন। দেশরক্ষা বিভাগে (Defence Services) এতদিন পর্য্যন্ত বড় বড় চাকরীগুলি হইতে সযত্নে ভারতীয়গণকে দূরে রাখা হইয়াছিল। এগুলিতে ভারতের স্বার্থের প্রয়োজনে, বিশেষ পারদর্শী (expert) হিসাবে বড় বড় পদে কিছু বিদেশী থাকিলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্রুত ভারতীয়করণ হইয়াছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রাদেশিক শাসন

(The Provincial Administration)

প্রদেশের প্রধান শাসনকর্ত্তা হইলেন গভর্ণর বা দেশপাল। গভর্ণরের নামেই প্রদেশের শাসনকার্য্য পরিচালিত হয়। তবে, বর্ত্তমানে তিনি প্রদেশের নিয়মতান্ত্রিক (constitutional) শাসনকর্ত্তা মাত্র। তিনি মন্ত্রীদিগের পরামর্শমত শাসন কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। মন্ত্রিগণই আসল ক্ষমতার মালিক। প্রত্যেক মন্ত্রী এক বা একাধিক প্রাদেশিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হন।

বিভাগীয় কমিশনার

(Divisional Commissioner)

শাসন কার্য্যের সুপরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রদেশ কয়েকটি বিভাগে (Division) বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক বিভাগের (Division) ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্ত্তা হইলেন বিভাগীয় কমিশনার (Divisional Commissioner)। বিভাগের ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার কমিশনারের নিয়ন্ত্রণাধীন। ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত অনেক ব্যাপারে কমিশনারের নিকট আপীল করা চলে। কমিশনার বিভাগের অধীনস্থ জেলা কালেক্টারদের কার্য্য তদারক করিয়া থাকেন। কোনও কোনও প্রদেশে, কমিশনার অধীনস্থ জেলাগুলির স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। কমিশনারের পদ একটি বাহুল্যপদ বলিয়া অনেকের অভিমত। এই পদ উঠাইয়া দিলে শাসন ব্যয়ভার অনেক কমিবে, অথচ শাসন ব্যবস্থা ক্ষুন্ন হইবে না, এই কথা অনেকে বলেন।

জেলার শাসনকর্ত্তা

(District Officer)

প্রদেশের বিভাগসমূহ কয়েকটি করিয়া জেলায় বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক জেলা একজন করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের (District Magistrate and Collector) শাসনাধীনে রাখা হইয়াছে। কোনও কোনও স্থানে ইহাকে ডেপুটি কমিশনার (Deputy Commissioner) বলা হয়।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শাসনযন্ত্রের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলা যায়। ইহার কাজের আর সীমা নাই; ইহার হাতে ক্ষমতাও প্রচুর দেওয়া হইয়াছে। প্রথমতঃ, কালেক্টর (Collector) হিসাবে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর জেলার ভূমি-রাজস্ব আদায় সম্পর্কে দায়িত্ব রহিয়াছে। রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা সংক্রান্ত খাতা ও হিসাবপত্র তিনি রাখিবার ববস্থা করেন। জেলার অভ্যন্তরস্থ খাস মহল জমি সম্পর্কিত ব্যবস্থা তাঁহারই নিয়ন্ত্রণাধীন। কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্-এর (Court of Wards) কাজকর্ম্ম পরিচালনায় তিনি কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আবার ম্যাজিষ্ট্রেট (বা বিচারক) হিসাবে অধীনস্থ ফৌজদারী আদালতগুলির উপর কর্তৃত্ব করেন। তিনি নিজেও একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের (First Class Magistrate) ক্ষমতাসম্পন্ন ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি নিজেও অনেক ফৌজদারী মামলার বিচার করিতে পারেন। আবার তিনি অধীনস্থ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেটদের বহু মামলার আপীল বিচার করিবারও অধিকারী। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর আবার জেলার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার দায়িত্ব ও রহিয়াছে। কাজেই তিনি জেলার পুলিশের কার্য্যেরও নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁহার আদেশে লোকে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত হইতে পারে।

জেলার প্রায় সকল প্রকার সরকারী বিভাগের উপরই কর্তৃত্ব করিবার অধিকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে দেওয়া হইয়াছে। জেলার এক্‌সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (Executive Engineer), সিভিল সার্জ্জন (Ciyil Surgeon), জেলার স্কুল ইন্‌সপেক্টর (District Inspector of Schools), প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন সরকারী বিভাগের কর্ত্তারাও কতক পরিমাণে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণাধীন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই সব বিভাগের শাসনকার্য্য নিজে পরিচালনা করেন না। তিনি শুধু এই সব বিভাগের কার্য্য পরিচালনার তদারক করিয়া থাকেন। এই ভাবে স্থানীয় জেল যদিও প্রত্যক্ষভাবে জেল স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অধীন, তথাপি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জেল পরিদর্শন ও জেলের পরিচালন তদারক করিতে পারেন।

এই সব ক্ষমতা ছাড়াও, কিছু কিছু ব্যাপারে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির (Local Self-Governing Bodies) উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন জেলার মধ্যে সরকারের প্রতিনিধি। সরকারী আদেশ ও নির্দ্দেশ তিনি দেশের লোককে বুঝাইয়া দিবেন। তিনি আবার

দেশের লোকের অবস্থা সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করাইবেন। তিনি জেলার মধ্যে বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইবেন, বিভিন্ন লোকজনের সংস্পর্শে আসিবেন। লোকের অভাব অভিযোগ জ্ঞাত হইবেন এবং সেগুলির প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন। জেলার যাবতীয় সমস্যার সঙ্গে তাঁহাকে পরিচিত হইতে হইবে। জেলার মধ্যে বৃষ্টিপাত উপযুক্তরূপ হইয়াছে বা হয় নাই, সেচ ব্যবস্থা বা জল নিকাশ ব্যবস্থা কোথায় কিরূপ দরকার, খাদ্য-বস্ত্র প্রভৃতির সমস্যা কিরূপ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সমস্যাই বা কিরূপ, সবই তাঁহাকে জানিতে হইবে। এইরূপ দেশের কল্যাণ জড়িত এমন কোনও বিষয় নাই, যাহার সহিত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্পর্ক না রাখিলে চলে। বস্তুতঃ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর এই সব কাজ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এতগুলি বিভিন্ন ধরণের শাসনের কাজ একই ব্যক্তিকে করিতে দিলে, সুশাসন ব্যাহত হইবার সম্ভাবনা। এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করিবার মত উপযুক্ত লোক দুর্লভ। ম্যাজিষ্ট্রেট যদি প্রতিভাশালী অশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি হন, তবেই এতগুলি কর্ত্তব্যের গুরুভার বহন করিতে পারেন। নতুবা, সাধারণতঃ ম্যাজিষ্ট্রেটরা গতানুগতিক পন্থায় শাসনকার্য্য চালাইতে বাধ্য হন, নূতন কোনও বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন না।

ইহা ছাড়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে বলিবার সব চেয়ে বড় কথা এই যে ইনি একাধারে বিচারক ও শাসক। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর জেলার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব আছে, তিনি জেলা পুলিশের কার্য্যের তদারক করেন; তিনি শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে লোকজনকে ফৌজদারী বিচারালয়ে অভিযুক্ত করিতে পারেন। আবার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট একজন প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে বিচার করিতেও পারেন। তিনি জেলার মধ্যে তাঁহার অধীনস্থ ফৌজদারী বিচারালয়গুলির কার্য্যের তদারক করেন এবং তিনি আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটদের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের বিচার করিতে পারেন। কাজেই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বেলায় আমরা শাসন বিভাগীয় ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই। ইহা সুবিচারের পরিপন্থী। বিচারক ও অভিযোক্তা একই ব্যক্তি হইলে ন্যায় বিচার না হইয়া অত্যাচার হইবারই সম্ভাবনা। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচার বিভাগীয় ক্ষমতাসমূহ কাড়িয়া লইয়া বিচার বিভাগীয় ব্যক্তির হাতে অর্পণ করাই যুক্তিসঙ্গত। আমাদের দেশের বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার সব চেয়ে বড় ত্রুটি হইতেছে যে ম্যাজিষ্ট্রেটগণ একাধারে বিচারক ও শাসকের কাজ করিয়া থাকেন। এই ব্যবস্থা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটা মূলনীতির, সরকারী কার্য্যসমূহের পৃথকীকরণের নীতির, (Theory of Separa-

tion of Powers) বিরোধী। এই অপব্যবস্থার ফলে অতীতে অনেক গলদ দেখা দিয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটরা নানাভাবে, অধীনস্থ ম্যাজিষ্ট্রেটদের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপ দিয়া, তাঁহার বিরাগভাজন ব্যক্তিদের দণ্ডদান করাইয়াছেন, এমন বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

মহকুমা
(Sub-Division)

প্রত্যেক জেলা আবার কয়েকটি করিয়া মহকুমায় বিভক্ত। প্রত্যেক মহকুমা একজন করিয়া মহকুমার শাসনকর্ত্তার (Sub-divisional Officer) অধীন থাকে। মহকুমা শাসনকর্ত্তা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার অনুরূপ ক্ষমতা মহকুমা শাসন ব্যাপারে প্রয়োগ করেন। মহকুমা অফিসারও প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে ফৌজদারী বিচার করিতে পারেন।

থানা
(Police Station)

প্রত্যেক মহকুমা কয়েকটি করিয়া থানায় বিভক্ত। প্রত্যেক থানা একজন করিয়া পুলিশ অফিসার, দারোগার, অধীন।

পুলিশ ও কারা বিভাগ
(Police and Prisons)

পুলিশ বিভাগের কার্য্য হইতেছে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা, অপরাধ নিবারণ করা, অপরাধীদের খুঁজিয়া বাহির করা এবং অপরাধীদের আইন অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা করা।

প্রাদেশিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং পুলিশ বিভাগ প্রাদেশিক বিষয় (Provincial Subject) রূপ গণ্য হয়। এই বিভাগ প্রাদেশিক স্বরাষ্ট্র সচিবের (Home Minister) অধীন। স্বরাষ্ট্র সচিবের অধীনে পুলিশ বিভাগের বড় কর্ত্তা হইতেছেন, ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ্ পুলিশ (Inspector General of Police--মহা আরক্ষা পরিদর্শক) কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই এই তিনটি সহরে পুলিশ বিভাগ একজন করিয়া পুলিশ কমিশনারের (Commissioner of Police—নগর পাল) অধীন। প্রত্যেক প্রদেশ

আবার কয়েকটি করিয়া 'রেঞ্জে' (range) বিভক্ত, প্রত্যেক 'রেঞ্জ' একজন করিয়া ডেপুটি ইন্সক্টের জেনারেলের (Deputy Inspector General) অধীন। প্রত্যেক রেঞ্জে কয়েকটি করিয়া জেলা আছে। প্রত্যেকটি জেলা একজন করিয়া পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের (Superintendent of Police—আরক্ষাধ্যক্ষ) অধীন। জেলা আভ্যন্তরস্থ মহকুমাগুলি আবার একজন করিয়া পুলিশ ইন্সপেক্টরের (Sub-divisional Inspector of Police—আরক্ষা পরিদর্শক) অধীন। প্রত্যেক মহকুমা দুই বা ততোধিক 'সার্কেলে' (Circle) বিভক্ত ; প্রত্যেক সার্কেল একজন করিয়া সার্কেল ইন্সপেক্টরের (Circle Inspector) অধীন। আবার প্রত্যেক সার্কেল কয়েকটি থানায় বিভক্ত এবং প্রত্যেক থানায় একজন করিয়া ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর (Sub-Inspector of police—অবর আরক্ষা পরিদর্শক) থাকেন। প্রত্যেক থানা কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত। গ্রাম্য চৌকিদার হইল সর্ব্বনিম্ন পুলিশ কর্ম্মচারী। কয়েকজন চৌকিদারের উপর আবার একজন করিয়া দফাদার থাকে। চৌকিদার ও দফাদারের বেতন ইউনিয়ন বোর্ড (Union Board) বহন করে।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে পুলিস বিভাগ প্রাদেশিক মন্ত্রীর অধীন হইলেও প্রাদেশিক গভর্ণর তাঁহার ব্যক্তিগত বিচার প্রয়োগ করিয়া (in his individual judgment) পুলিস বিভাগে নানাভাবে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন। বর্ত্তমানে প্রাদেশিক গভর্ণর আগেকার মত ব্যক্তিগত বিচার প্রয়োগ করিয়া কোনও ক্ষমতার ব্যবহার করিতে পারেন না। তাঁহাকে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্ত্তা হিসাবে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুযায়ী শাসনকার্য্য চালাইতে হয়।

কারা-বিভাগ
(Prisons)

অন্যান্য প্রাদেশিক বিভাগের ন্যায় কারা-বিভাগও একজন প্রাদেশিক মন্ত্রীর শাসনাধীন। কারা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কারা পরিচালনার মূলনীতি ঠিক করিয়া দেন। কারা বিভাগীয় মন্ত্রীর অধীনে একজন কারা বিভাগের ইন্স্পেক্টর জেনারেল (Inspector General of prisons—মহা কারা পরিদর্শক) থাকেন। তিনি মন্ত্রীর অধীন থাকিয়া মন্ত্রীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী কারা বিভাগের শাসন পরিচালনা করেন। প্রত্যেক প্রদেশে আবার কতকগুলি করিয়া সেণ্ট্রাল জেল (Central Jail) থাকে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ—এই তিনটি

সহরে আবার এক একটি প্রেসিডেন্সী জেল রহিয়াছে। এই সমস্ত জেল একজন করিয়া সুপারিন্টেণ্ডেন্টের (Superintendent of Jail—কারাধ্যক্ষ) অধীন। আবার প্রত্যেক জেলায় একটি ডিষ্ট্রিক্ট জেল (District Jail) রহিয়াছে; জেলার সিভিল সার্জেন (Civil Surgeon) ইহার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (Superintendent—অধ্যক্ষ) রূপে কাজ করেন। প্রত্যেক মহকুমায় আবার একটি করিয়া মহকুমা জেল (Sub-divisional Jail) আছে। প্রত্যেক জেলে একজন করিয়া জেলার, ডেপুটি জেলার, কনেষ্টবল প্রভৃতি থাকেন।

অল্পবয়স্ক অপরাধীদের থাকিবার জন্য আলাদা জেল আছে। এই সব স্থানে সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হয়; যাহাতে অপরাধী কারামুক্ত হইয়া স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সৎভাবে জীবন যাপন করিতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয়।

আমাদের দেশের কারাগারগুলি এখনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এগুলির পরিচালন ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুসরণ করা হয় না। আমাদের কারাগারগুলি দণ্ডিত অপরাধীদিগকে কোনও রকমে আটক রাখিবার স্থান মাত্র। কারাগারগুলিতে অসুস্থ কয়েদীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা যথেষ্ট নহে। হাসপাতালগুলির পরিচালনা ভাল নহে। সব চেয়ে বড় কথা এই যে, অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের কোনও ব্যবস্থাই কারাগারে নাই। লঘু অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি কিছুদিন কারাগারে আটক থাকিবার পর পাকা অপরাধী হইয়া ফিরিয়া আসে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কারাগারগুলিকে অপরাধ শিক্ষার উর্ব্বর ক্ষেত্ররূপে অনেকে বর্ণনা করিয়া থাকেন। কারাগারগুলিতে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া এবং উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া অপরাধীদের সংশোধন করিবার কোনও চেষ্টা মাত্র না করিয়া, নিছক শাস্তি দিবার প্রতিহিংসাজাত মনোবৃত্তির দ্বারা আমাদের কারাগারগুলি পরিচালিত হয়। কতকগুলি দণ্ডিত ব্যক্তিকে নোংরা আবহাওয়ার মধ্যে আটক রাখিয়া, যথাসম্ভব খাটাইয়া লইয়া কারা বিভাগে যতটা পারা যায়, ততটা আয় করিয়া লইবার উদ্যমই অনেক সময় কারা পরিচালনার মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। সৌভাগ্যের বিষয়, বর্ত্তমানে আমাদের অধিকাংশ প্রাদেশিক মন্ত্রীর কারা-জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকায় কারা-পরিচালনার ত্রুটি সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

শিক্ষা

(Education)

জাতীয় জীবনে শিক্ষার স্থান অনেক উচ্চে। উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে কেহ তাহার নাগরিক কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবে না। নাগরিক চেতনাবোধ ও কর্ত্তব্যজ্ঞান শিক্ষা ব্যতীত সম্ভব নহে। যে-কোনও শাসনতন্ত্র সফল করিতে হইলে প্রথম আবশ্যক নাগরিকগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র গণ-তন্ত্রের বিজয় অভিযান স্বরু হইয়াছে। এই গণতন্ত্রের সাফল্যের পথে অশিক্ষার অন্ধকার প্রধান বাধা সৃষ্টি করিতে পারে। অশিক্ষিত নিরক্ষর জনসাধারণ লইয়া গণতন্ত্র চলিতে পারে না। অশিক্ষার চাপে গণতন্ত্র বিকৃত হইয়া পড়িবে। তাই ভারতীয় ইউনিয়নের পরিকল্পিত শাসনতন্ত্রের খসড়ায়, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে যথাসম্ভব শীঘ্র বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাদানকে গ্রহণ করা হইয়াছে। কেহ কেহ শিক্ষালাভের অধিকারকে মৌলিক অধিকার (Fundamental Right) রূপে গণ্য করিবার পক্ষপাতী।

শিক্ষা বিস্তারের এতখানি গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে শিক্ষার বিষয়কে শোচনীয়ভাবে অবহেলা করা হইয়াছে। লিখন-পঠনক্ষম লোকের সংখ্যা ভারত-বর্ষে শতকরা ১৫ জনের বেশী নহে। কি প্রাথমিক শিক্ষা, কি উচ্চ শিক্ষা, সব দিক দিয়াই ভারতবর্ষ অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

শিক্ষা-বিষয়ক কর্ত্তৃপক্ষ

(Educational Authorities)

শিক্ষা প্রধানতঃ প্রাদেশিক বিষয় (Provincial Subject)। প্রদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার ভার আইন সভার প্রতি দায়িত্বশীল প্রাদেশিক মন্ত্রীর উপর রহিয়াছে। প্রাদেশিক সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় প্রাদেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপার প্রাদেশিক সরকার অনেক

পরিমাণে স্বায়ত্ত শাসনমূলক স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের (Local self govening bodies) উপর ছাড়িয়া দিয়া থাকেন।

প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের স্থায়ী কর্তা হইলেন ডিরেক্টর অফ পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শন (Director of Public Instruction—শিক্ষা-অধিকর্তা)। তিনি শিক্ষা-মন্ত্রীর নির্দ্দেশক্রমে শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিচালনা করেন।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থার উপর প্রত্যক্ষ কর্ত্তৃত্ব প্রয়োগ করিতে পারে না। ভারত সরকারের শিক্ষা-মন্ত্রী সমগ্র ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটাইবার এবং জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনের পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করেন। আলীগড় মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয় ও কাশী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চলগুলির শিক্ষা ব্যবস্থাও সোজাসুজি কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন। কেন্দ্রীয় রিসার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউট (Central Research Institute) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন।

প্রাথমিক শিক্ষা
(Primary Education)

প্রাথমিক শিক্ষাই জাতির উন্নতির মূল ভিত্তি। অথচ আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা অতি নিম্ন স্তরের। শিক্ষার সারতার দিক, অথবা শিক্ষার উৎকর্ষতার দিক, যে দিক দিয়াই বিচার করা হউক, প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা অতি শোচনীয় বলিতে হইবে। শুধুমাত্র লিখিতে পড়িতে জানে, এমন লোকের সংখ্যা ধরিলেও লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা শতকরা ১০ জন মাত্র দাঁড়ায়। আবার যাহাদিগকে লোক-গণনার সময় লেখাপড়া জানা বলিয়া ধরা হয়, তাহাদের অনেকে আবার পড়াশুনার সুযোগের অভাবে শীঘ্র সব ভুলিয়া গিয়া নিরক্ষর হইয়া দাঁড়ায়। নিরক্ষর জনগণকে অনতিবিলম্বে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে না পারিলে, নবলব্ধ স্বাধীনতা সত্ত্বেও ভারতের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া থাকিবে।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দ প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বহুদিন হইতে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের দাবী করিয়া আসিয়াছেন। মহামতি গোখলে ১৯১১ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে এই সম্পর্কে এক বিল উত্থাপন করেন। সরকারী বিরোধিতায় এই বিল পরিত্যক্ত হয়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী শিক্ষা প্রাদেশিক বিষয়রূপে গণ্য হয়।

ইহাতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পথ সুগম হইলেও বেশী কিছু কাজ করা হয় নাই। কোন কোন প্রাদেশিক সরকার স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহকে নিজ নিজ এলাকায় অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিবার অধিকার দিয়াছিলেন, তদনুযায়ী কোন কোন মিউনিসিপ্যালিটি, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টাও করিয়াছেন। কিন্তু অনেক স্থানে অর্থাভাবের দরুণ ইহা করা সম্ভব হয় নাই।

বাংলা দেশে ১৯৩০ সালে প্রাথমিক আইন (Primary Education Act) পাশ হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে প্রাথমিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকার (Provincial Autonomy) প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রাদেশিক সরকারগণ প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। অনেক স্থানে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুযায়ী বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্র অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

এই আইন অনুযায়ী দেয় খাজনার উপর প্রতি টাকায় পাঁচ পয়সা করিয়া সেস বা কর বসানো হইয়া থাকে। যে জেলায় এই আইন অনুযায়ী কার্য্য করা হয়, সেখানে একটি স্কুল বোর্ডের উপর প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। এই স্কুল বোর্ডের অধিকাংশ সদস্য নির্ব্বাচিত, কম সংখ্যক সদস্য মনোনীত হইয়া থাকেন। বঙ্গীয় আইনের অনুরূপ আইন অন্যান্য প্রদেশেও কার্য্যকরী করা হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের পথে বাধা কি ?

(Obstacles to the Spread of Primary Education)

আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে না আছে উপযুক্ত বই-পত্র, আসবাব-সাজ-সরঞ্জামাদি, না আছে আলো-হাওয়াযুক্ত একখানা ঘর, না আছে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত যোগ্য শিক্ষক। অর্দ্ধভুক্ত, অর্দ্ধ-নগ্ন শিশুগুলি নোংরা অস্বাস্থ্যকর পাঠশালায় বসিয়া শিক্ষা-বিহীন শিক্ষকের কাছে যে স্বল্প বিদ্যা শিক্ষা করে, তাহার উৎকর্ষতা সাধন করিয়া তাহার ব্যাপক প্রসারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কিন্তু ইহার পথে প্রধান বাধা হইতেছে অর্থাভাব। এ পর্য্যন্ত বিদেশী সরকারের প্রভুত্ব থাকায় স্বভাবতঃই শিক্ষা বিস্তারে সরকারের উদাসীনতা দেখা

গিয়াছে। বর্ত্তমানে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পরে, আমাদের দেশ দ্রুতবেগে শিক্ষার উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে আশা করা যায়। অবশ্য অবৈতনিক বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার ব্যয়ভারও দেশবাসীকে বহন করিতে হইবে। বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র জনপ্রিয় সরকার গঠিত হওয়ায়, লোকে অধিক কর দিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

উপযুক্ত শিক্ষক, বই-পত্র ও সাজ-সরঞ্জামও প্রয়োজন। এগুলির দিকেও নজর দেওয়া দরকার। শিক্ষকদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করা দরকার। তাহা ছাড়া শিক্ষকগণ যে নামমাত্র বেতন পাইয়া থাকেন, তাহা যে-কোনও দেশের পক্ষে লজ্জাকর। একজন প্রাথমিক শিক্ষক যে বেতন পান, তাহা যে-কোনও একজন অকুশলী শ্রমিক বা ভৃত্যের বেতন অপেক্ষাও কম। প্রাথমিক শিক্ষকদিগকে এত কম হারে বেতন দিয়া সমাজ শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা ও উদাসীনতা প্রকাশ করিতেছে। এই ব্যবস্থার প্রতিকার অবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন।

ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনা—বুনিয়াদী শিক্ষা
(Wardha Scheme—Basic Education)

বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার মূল সূত্রগুলি মহাত্মা গান্ধীর উদ্ভাবিত। পরি-কল্পনাটির খুঁটিনাটি বিষয় জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে একটি কমিটি স্থির করেন। ১৯৩৭ সালে গান্ধীজী তাঁহার শিক্ষা-সংস্কার সম্পর্কিত কল্পনা প্রকাশ করেন। তাঁহার মূল কথা এই যে, শিক্ষার্থীকে তাহার মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান করিতে হইবে, যে-কোনও একটি হস্ত-শিল্পকে (craft) কেন্দ্র করিয়া শিক্ষার্থীর শিক্ষাদান-কার্য্য চলিবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চলতি ব্যয়ভার প্রতিষ্ঠানের আয় হইতে তুলিতে হইবে। গান্ধীজী তাঁহার এই পরিকল্পনাকে এইভাবে বর্ণনা করিলেন, "গ্রাম্যহস্ত-শিল্পের মধ্য দিয়া গ্রাম্য জাতীয় শিক্ষা বিস্তার" ("rural national education through village handicrafts")। ওয়ার্দ্ধায় জাকির হোসেন কমিটিও সুপারিশ করিলেন যে, ব্যাপকভাবে সমগ্র জাতির শিশুদিগকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা দান করিতে হইবে। শিক্ষার মাধ্যম হইবে মাতৃভাষা; কোনও একটি কায়িক শ্রমজনক উৎপাদক কার্য্যকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদান চলিবে এবং এই শিক্ষাব্যবস্থা হইতে ক্রমশঃ শিক্ষকদের পারি-শ্রমিক পাওয়া যাইবে।

জাকির হোসেন কমিটি সাত বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত শিক্ষা দানের ব্যবস্থার কথা বলেন। এই শিক্ষাকে বুনিয়াদী বলা হইল, কারণ, এই শিক্ষাই

আমাদের জাতীয় শিক্ষার বনিয়াদ বা ভিত্তিস্বরূপ হইবে। তাহা ছাড়া, এই শিক্ষা শিশু-জীবনের অফুরন্ত কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবে। সৃষ্টিমূলক উৎপাদন কার্য্য করিবার অন্তর্নিহিত অদম্য ইচ্ছা সকল মানুষের মনে রহিয়াছে। হস্ত-শিল্পের মধ্য দিয়া শিক্ষাদান ব্যবস্থার ফলে মানুষের এই অন্তর্নিহিত ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আবার সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের দিক দিয়াও বুনিয়াদী শিক্ষার দান অসীম হইবে। সমাজ জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি তৈরী করিতে শিখিয়া শিক্ষার্থী সমাজের মঙ্গলকর সেবক হিসাবে গড়িয়া উঠিবে। তাহার মনে কায়িক শ্রমের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিতে পারিবে না। ইহার ফলে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবীদের মধ্যে যে দুর্লঙ্ঘ্য বিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অন্তর্হিত হইবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি স্বাবলম্বী হইবে। এই মতের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছে। বিরুদ্ধ সমালোচকগণ বলিয়াছেন যে, ইহার ফলে শিশু-শ্রমিককে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কারখানার শিক্ষকদের বেতন যোগাইবার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হইবে ; যখন শিক্ষকগণ দেখিবেন যে, তাঁহাদের বেতন শিশুদের উৎপন্ন মালের বিক্রয়লব্ধ টাকার উপর নির্ভর করিতেছে, তখন তাঁহারা নির্ম্মমভাবে শিশুদিগকে বেশীভাবে খাটাইয়া লইবেন, শিক্ষার্থীর মানসিক বা নৈতিক উন্নতির দিকে যথোচিত দৃষ্টি দিবেন না।

কিন্তু এইরূপ সমালোচনা ঠিক নহে। কারণ, কমিটির রিপোর্টেই বলা হইয়াছে যে, শিশুদের উৎপন্ন হস্ত-শিল্পজাত দ্রব্যগুলি বিক্রয় করা হইবে, রাষ্ট্র বিক্রয় করিবার গ্যারান্টি দিবে এবং ফলে শিক্ষার ব্যয়ভার অনেকটা ইহাতে বহন করা চলিবে।

অবশ্য বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার সাফল্য উপযুক্ত শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। ১৯৩৭ সালে গঠিত বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ওয়ার্দ্ধা-পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হইবার আগেই ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রচেষ্টা বন্ধ হইয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে পণ্ডিত নেহেরু কর্ত্তৃক গঠিত জাতীয় পরিকল্পনা কমিটিও (National Planning Committee) বুনিয়াদী শিক্ষার মূলনীতি গ্রহণ করেন।

পরীক্ষামূলকভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলনের পরিকল্পনা বিভিন্ন প্রদেশে করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও এবিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা
(Secondary Education)

মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বাঙ্গলায় তিন প্রকার বিদ্যালয় আছে। মধ্য-ইংরাজী,

মধ্য-বাঙ্গলা ও উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়। অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ বিদ্যা প্রতিষ্ঠান-সমূহ রহিয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষা প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের শিক্ষা বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সরকারী স্কুল-পরিদর্শক (Inspector of Schools) উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করেন। অর্থ সাহায্য (Grant-in-aid) দিয়া সরকার ইহাদের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বিশ্ব-বিদ্যালয় পাঠ্য বিষয় স্থির করিয়া দেন এবং ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পরিচালনা করেন। কোনও কোনও প্রদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মধ্য-ইংরাজী ও মধ্য-বাঙ্গলা বিদ্যালয়-গুলির সাহায্য ও তত্ত্বাবধানের ভার অনেক পরিমাণে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিসমূহের মধ্যে পাঠ্য বিষয়ক উপযুক্ত নির্ব্বাচনের অভাব। উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব এবং শিক্ষকদের অত্যন্ত অল্প বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে জাতীয় সরকার স্থাপিত হওয়ায় এই ত্রুটিগুলি দূর হইবে, আশা করা যায়।

সার্জ্জেন্ট-পরিকল্পনায় (Sargent Scheme) বলা হইয়াছে যে, উচ্চ বিদ্যা-লয়গুলিতে শুধু সাধারণের চেয়ে বেশী মেধাবী ছাত্ররাই পড়িবে।

কলেজী শিক্ষা
(College Education)

মাধ্যমিক শিক্ষালাভের পর কলেজে শিক্ষা পাইবার ব্যবস্থা আছে। ভারত ও পাকিস্তানে মোট তিন শতের বেশী কলেজ রহিয়াছে। কতকগুলি কলেজ শুধু ছাত্রীদের জন্য পৃথকভাবে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। কতকগুলি সরকারী কলেজও আছে, এগুলি সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত হয়। কতকগুলি কলেজ সরকার হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে। অধিকাংশ কলেজকে ছাত্রদের নিকট প্রাপ্ত বেতন হইতে খরচ চালাইতে হয়। কলেজগুলিতে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি, বই-পত্র ও সাজ-সরঞ্জামের অভাব, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, শিক্ষকদের অত্যন্ত অল্প বেতন, উপযুক্ত সরকারী সহানুভূতির অভাব, এগুলি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি। অধিকাংশ প্রদেশে কলেজগুলিতে প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়ায় শিক্ষার উৎকর্ষতা সাধনের সম্ভবনা হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়
(University)

ভারতীয় ইউনিয়নে ২২টি বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। এগুলির মধ্যে হায়দ্রাবাদে ১টি বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। ভারতীয় ইউনিয়নে নিম্নলিখিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি রহিয়াছে ; যথা—কলিকাতা, আসাম, উৎকল, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, নাগপুর, আন্না-মালাই, ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর, বোম্বাই, এলাহাবাদ, লখ্নৌ, দিল্লী, আলিগড় মুস্লিম, কাশী হিন্দু, আগ্রা, পাটনা, গুরুকুল, সাগর, রাজপুতানা, পূর্ব্ব পাঞ্জাব ও ভারতীয় মহিলা।

পাকিস্তানে ৩টি বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিভিন্ন পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন এবং বিভিন্ন পরীক্ষা পরিচালনা করিয়া থাকেন। কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন।

বৃত্তি-শিক্ষা
(Vocational Education)

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বেশীর ভাগ সাহিত্যমূলক সাধারণ শিক্ষা। বৃত্তি শিক্ষার উপর আমাদের দেশের কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত বিশেষ নজর পড়ে নাই। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক বেশী কেরাণী ও চাকুরিয়া সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ের কারিগর বা ইঞ্জিনিয়ার বা অনুরূপ বিবিধ বৃত্তিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক সৃষ্টি হয় নাই। ফলে আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষা আমাদের জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে কোনও সাহায্য করে নাই। আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকগণ যখন দলে দলে দুর্ব্বহ বেকার জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেছেন, কলেজী শিক্ষা যখন তাঁহাদিগের অন্ন বস্ত্রের সমস্যার কোনও সমাধান করিতে পারিল না, তখন, অনেকের দৃষ্টি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট হইল এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বৃত্তি-শিক্ষার অভাবকে অনেকে আমাদের আর্থিক দুর্দ্দশার একটা বড় কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

বৃত্তি-শিক্ষা (Vocational Education) বলিতে সেইরকম শিক্ষা বুঝায়, যাহাতে লোকে জীবিকা অর্জ্জনের উপায়রূপে কোনও বৃত্তি বা কোনও শিক্ষা অবলম্বন করিতে পারে। এই শিক্ষাদানের ফলে লোকে সহজে জীবিকা

অর্জ্জনের উপায় খুঁজিয়া পাইবে, দেশের শিল্প-বাণিজ্য বিস্তার লাভ করিবে, দেশ সম্পদে-ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। এই সব কারণে বৃত্তি-মূলক শিক্ষার দাবী আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে করা হইয়াছে।

এই দিকে যদিও কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, তথাপি এ বিষয়ে আমাদের দেশ এখনও বিশেষ অনগ্রসর বলিতে হইবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য আমাদের দেশে যাদবপুর, শিবপুর, রুরকী, কাশী, পুনা, মাদ্রাজ এবং পাটনায় কলেজ এবং বিভিন্ন স্থানে কতকগুলি স্কুল রহিয়াছে। এই সঙ্গে বাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউট অফ্ সায়েন্সের (Indian Institute of Science) নাম উল্লেখযোগ্য। ডাক্তারী শিক্ষার জন্য প্রায় ৪৫টি স্কুল ও কলেজ রহিয়াছে। সম্প্রতি ডাক্তারী স্কুলগুলি তুলিয়া দিয়া কলেজে পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কৃষি শিক্ষার জন্য পুনা, নাগপুর ও কোয়েম্বাটুরের কলেজ এবং বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি স্কুল রহিয়াছে। কৃষি সম্পর্কে উচ্চ গবেষণা করিবার জন্য দিল্লীতে একটি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকাল-চার্যাল রিসার্চ (Indian Council of Agricultural Research) আছে। খনি-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য ধানবাদে একটি মাইনিং স্কুল (Mining School) রহিয়াছে। জামসেদপুরে ধাতুবিদ্যা (Metallogy) শিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। এই সব ছাড়াও অনেক ছোটখাট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে হাতে কলমে বৃত্তিগত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। আইন শিক্ষা দিবার জন্য প্রায় ১৫টি কলেজ আছে। আইনজীবীর সংখ্যা আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী ; আইনের কলেজগুলি কমিলে ক্ষতি নাই।

আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাব থাকাতে আমরা শিল্প-বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি। বিগত যুদ্ধের সময় প্রয়োজনীয় শিল্পের অভাবে আমাদের বিশেষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। আমাদের দেশের প্রয়োজনীয় যে সকল জিনিষ উৎপন্ন হইতে পারে, সেগুলি যাহাতে দেশে দেশীয় কারিগর দ্বারা উৎপন্ন করা যায়, সেই উদ্দেশ্যে এবং বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে, জাতীয় সরকার অধিক সংখ্যায় বৃত্তিমূলক কারিগরী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

স্ত্রী-শিক্ষা
(Education of Women)

আজ স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধীদের সংখ্যা নগণ্য। সকলেই স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন। বাল্য-বিবাহ ও পর্দ্দাপ্রথা দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার লাভ ঘটিতেছে। আজ আমাদের পুরাতন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। স্ত্রীলোককে ঘরের চতুঃসীমার অজ্ঞান অন্ধকারের মধ্যে আটক না রাখিয়া, সমানভাবে স্কুল কলেজের শিক্ষাদান করিবার আগ্রহ বাড়িয়া যাইতেছে।

পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সমান অধিকার সর্ব্বত্র সভ্য শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের খসড়ায় সমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যবিধ অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। স্ত্রীলোকগণও পুরুষদের সহিত সমানভাবে নাগরিকরূপে গণ্য হইবার যোগ্য। তাঁহাদেরও রাষ্ট্রের প্রতি সমান দায়িত্ব রহিয়াছে। স্ত্রীলোকগণ যদি উপযুক্ত শিক্ষা না পান, তবে, তাঁহারা তাঁহাদের নাগরিক কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবেন না। উপযুক্ত শিক্ষা বিস্তার ব্যতীত স্ত্রীলোকদের মধ্যে নাগরিক-চেতনা সঞ্চার করা যাইবে না। সমাজের অর্দ্ধেক অংশ যদি নাগরিক-অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন থাকিয়া যায়, তাহা হইলে সমাজের উন্নতি হইতে পারে না। রাজনৈতিক যুক্তি ছাড়া বলিবার কথা এই যে, মেয়েদের শিক্ষা দিবার মানে মায়েদের শিক্ষা। মা সুশিক্ষিতা হইলে সন্তান উপযুক্তরূপে গড়িয়া উঠিতে পারে। এ বিষয়ে ইংরাজীতে একটি স্মরণীয় কথা আছে—যে হস্ত শিশুর দোলনায় দোল দেয়, সেই হস্তই পৃথিবীর শাসন চালায় (The hand that rocks the cradle rules the world)। মাতার উপরই সন্তানের ভাল-মন্দ সমস্ত নির্ভর করে।

স্ত্রী-শিক্ষার এত গুরুত্ব সত্বেও ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার লাভ খুব সামান্য হইয়াছে। ভারতবর্ষে শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য পৃথক কয়েকটি স্কুল-কলেজ রহিয়াছে। অনেক কলেজে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিতে ছোট ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়িতে পায়। মেয়েদের শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় মোটেই যথেষ্ট নহে।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনা
(Sargent Scheme)

ভারত সরকারের শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা মিঃ সার্জেণ্ট শিক্ষা ব্যবস্থায় পুনর্গঠনের এক পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। তিনি ৬ হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত ছেলে-মেয়েদের

অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে শিক্ষা ব্যবস্থা করিতে বাৎসরিক প্রায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয় পড়িবে। উচ্চ বিদ্যালয়গুলি দুই প্রকার হইবে—সাধারণ শিক্ষা বিষয়ক, (academic), এবং কারিগরী শিক্ষা বিষয়ক (technical)। যে সব ছাত্র সাধারণ অপেক্ষা বেশী মেধাবী তাহারাই প্রথমোক্ত উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়িবে। অন্য সকলে দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পড়িতে পাইবে। কলেজের ইন্টারমিডিয়েট ক্লাশগুলি উচ্চ বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হইবে। শিক্ষকদিগকে অধিক হারে বেতন দিতে হইবে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শরীর বিষয়ক শিক্ষা দিতে হইবে।

বিংশ অধ্যায়

জনস্বাস্থ্য

(Public Health)

ভারতে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা নিরতিশয় শোচনীয়। ১৯৪১ সালের লোক গণনার হিসাব (census) অনুযায়ী আমাদের দেশে প্রতি হাজার লোকের মধ্যে ২২ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার তুলনায় মৃত্যুর হার ইংলণ্ডে মাত্র ১২'৪ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১১'২ এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ৯'৪। এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার আরও ভীতিপ্রদ। ১৯৪০ সালে প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে ১৬০ জন মারা গিয়াছে, ঐ স্থলে, মৃত্যুর হার ইংলণ্ডে ৫৮, আমেরিকায় ৫৪ এবং অষ্ট্রেলিয়ায় ৩৮। আমাদের শিশু-মৃত্যুর হার আগে আরও বেশী ছিল। কিন্তু এখনও শিশু-মৃত্যুর হার যেরূপ বেশী, তাহাও যে কোন দেশের পক্ষে কলঙ্কের বিষয়। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি রোগে প্রতি বৎসর সংখ্যাতীত লোক অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অথচ এই সমস্ত রোগ নিবারণযোগ্য। আমাদের সীমাহীন দারিদ্র্য, বাল্য-বিবাহ প্রথা, যথাকালে যথাযোগ্য চিকিৎসার অভাব, অপ্রচুর খাদ্য, স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞতা,—এই সব হইল আমাদের এই অধিক মৃত্যুহার এবং স্বাস্থ্যহীনতার কারণ।

জনস্বাস্থ্য একটি প্রাদেশিক বিষয় (Provincial Subject) ; তবে, কেন্দ্রীয় সরকারেরও একটি জনস্বাস্থ্য বিভাগ রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালনার মধ্যে সমন্বয় ঘটাইবার চেষ্টা করেন এবং প্রাদেশিক সরকারদিগকে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে তথ্য ও উপদেশাদি প্রদান করেন। কেন্দ্রীয় সরকার জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত গবেষণার কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। All India Institute of Hygiene and Public Health, Malaria Institute, প্রভৃতি গবেষণাগার কেন্দ্রীয় সরকারে অধীন।

প্রত্যেক প্রদেশে জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রীর অধীনে ডিরেক্টর অফ্ পাব্লিক হেল্‌থ্ (Director of Public Health), মাদ্রাজ, বোম্বাই ও পশ্চিম বঙ্গে সার্জ্জেন জেনারেল (Surgeon General) এবং অন্যান্য প্রদেশে ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অফ্ সিভিল হস্‌পিট্যাল্‌স্ (Inspector General of Civil Hospitals) জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক ব্যবস্থা পরিচালনা করেন।

প্রত্যেক জেলাতে একজন করিয়া সিভিল সার্জ্জেন (Civil Surgeon) থাকেন এবং তাঁহার অধীনে বিভিন্ন মহকুমায় ও অন্যান্য প্রধান প্রধান স্থানের

হাসপাতালে এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন (Assistant Surgeon) ও সাব-এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন (Sub-Assistant Surgeon) থাকেন।

মোটামুটিভাবে সার্জ্জেন জেনারেল অধীনস্থ লোকজনের সহায়তায় রোগীদের আরোগ্য করিবার ব্যবস্থা ও তাহাদের দেখাশুনা করেন এবং ডিরেক্টর অফ্ পাব্লিক হেল্‌থ রোগ নিবারণের ব্যবস্থা ও দেখাশুনা করেন। প্রত্যেক জেলাতে সিভিল সার্জ্জেনের অধীনে অন্ততঃ একটি করিয়া হাসপাতাল রহিয়াছে। প্রতি মহকুমায় ও অন্যান্য স্থানেও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ডাক্তারী শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি হইতে প্রতি বৎসরে বহু লোক ডাক্তার হইয়া বাহির হইতেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের বিপুল জনসংখ্যা এবং জনস্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করিলে বলা যায় যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত চিকিৎসকের সংখ্যা এবং রোগ প্রতিকার ও নিবারণের জন্য সরকারী ও বেসরকারী সকল ব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। বিশেষ করিয়া, গ্রামসমূহে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ব্যবস্থা নাই বলিলেও চলে। গ্রামে আজও উপযুক্ত চিকিৎসক ও ঔষধ পাওয়া কঠিন। কলেরা ও বসন্ত রোগের প্রতিষেধক হিসাবে টীকা দিবার ব্যবস্থা, রোগ হইলে তাহা যাহাতে বিস্তৃত হইয়া না পড়ে তাহার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পানীয় জল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা, খাদ্যে ও পানীয় বস্তুতে ভেজাল নিবারণের ব্যবস্থা প্রভৃতি এখনও প্রয়োজনের তুলনায় একান্ত অপ্রচুর বলা যায়। জেলা বোর্ডও ইউনিয়ন বোর্ডের উপর এইসব ব্যবস্থা করিবার প্রধান ভার রহিয়াছে। সরকার স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় জনস্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কিত ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

ভারতে শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ও প্রত্যেকের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে। জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিবারণযোগ্য রোগগুলির প্রাদুর্ভাবও কমিয়া আসিবে। আমাদের খাদ্য ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। আমরা প্রোটীনের পরিমাণ খুব কম খাইয়া কার্ব্বো-হাই-ড্রেটের পরিমাণ বেশী খাই। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ত খাদ্য খাইবার শিক্ষা দিতে হইবে। গ্রামে, বিশেষ করিয়া সহরে, গৃহ সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। সঙ্কীর্ণ বদ্ধ ঘরে পাশাপাশি বহু লোক বাস করিবার ফলেও অনেকে অসুখে পড়ে। প্রাদেশিক সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগকে আরও কার্য্যকরী করিতে হইবে। চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়াইবার জন্য আরও অনেক চিকিৎসা-বিদ্যালয় খুলিতে হইবে। চিকিৎসকগণকে গ্রামে গ্রামে যাইয়া থাকিবার উৎসাহ দিতে হইবে।

পরিশিষ্ট—ক

(Appendix—A)

ভবিষ্যৎ ভারতের গঠনতন্ত্রের খসড়া

(Draft Constitution of India)

১৯৪৭ সালের ২৯শে আগষ্ট ভারতীয় গণ-পরিষদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন কমিটি (Drafting Committee) গঠিত হইয়াছিল। ডাঃ বি. আর. আম্বেদকর (চেয়ারম্যান), শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার, আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আয়ার, কে. এম. মুন্সী, এন. মাধব রাও, ডি. পি. খৈতান ও সৈয়দ মহম্মদ সাদুল্লা।

এই কমিটি ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করেন। যে খসড়া প্রণয়ন করা হইয়াছে, তাহা ভারতীয় গণ-পরিষদের পরবর্ত্তী অধিবেশনে আলোচিত হইবে। গঠনতন্ত্রের খসড়া প্রণয়ন কমিটি গণ-পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তের বেশীর ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে কোন কোন স্থলে এই কমিটি গণ-পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। খসড়াটির মোটামুটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

মুখবন্ধে (Preamble) বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ একটি সার্ব্বভৌম গণ-তান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র (Sovereign Democratic Republic) হইবে। গণ-পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষ হইবে সার্ব্বভৌম, স্বাধীন সাধারণতন্ত্র (Sovereign Independent Republic)। খসড়া কমিটি সার্ব্বভৌম (Sovereign) কথাটির পর আবার স্বাধীন (Independent) কথাটি বসাইবার কোনও সার্থকতা দেখিতে পান নাই; তাঁহারা তৎপরিবর্ত্তে গণতান্ত্রিক (Democratic) কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। ফলে, তাঁহাদের প্রস্তাব হইতেছে এই যে, ভারতবর্ষে সার্ব্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র (Sovereign Democratic Republic) প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মুখবন্ধে আরও বলা হইয়াছে যে, সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়-বিচার (Justice), স্বাধীনতা (Liberty), ও সাম্য (Equality) প্রতিষ্ঠা এবং

সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বোধ (Fraternity) প্রসার করাই এই গঠনতন্ত্রের উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার নাম হইবে Union of States বা রাষ্ট্রীয় ইউনিয়ন। এই ইউনিয়ন নিম্নলিখিত States বা রাষ্ট্রগুলি লইয়া গঠিত হইবে :—

(ক) গভর্ণর শাসিত প্রদেশ—১। মাদ্রাজ, ২। বোম্বাই, ৩। পশ্চিম বঙ্গ, ৪। যুক্তপ্রদেশ, ৫। বিহার, ৬। পূর্ব্ব পাঞ্জাব, ৭। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, ৮। আসাম ও ৯। উড়িষ্যা।

(খ) চীফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ—১। দিল্লী, ২। আজমীর-মারওয়ার, ও ৩। কুর্গ।

(গ) নিম্নলিখিত দেশীয় রাজ্যগুলি—১। মহীশূর, ২। কাশ্মীর, ৩। গোয়ালিয়র, ৪। বরোদা, ৫। ত্রিবাঙ্কুর, ৬। কোচিন, ৭। উদয়পুর, ৮। জয়পুর, ৯। যোধপুর, ১০। বিকানীর, ১১। আলওয়ার, ১২। কোটা, ১৩। ইন্দোর, ১৪। ভূপাল, ১৫। রেওয়া, ১৬। কোলাপুর, ১৭। পাতিয়ালা, ১৮। ময়ূরভঞ্জ ও ১৯। কাথিয়াওয়াড়।

দুই বা ততোধিক দেশীয় রাজ্য একত্র হইয়া এক একটি রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে, ভবিষ্যতে আরও এইরূপ হইবে। কোন কোনও দেশীয় রাজ্য আবার নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া, সংশ্লিষ্ট প্রদেশের সহিত যোগ দিয়া এক রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে আরও এইরূপ হইবে। সুতরাং দেশীয় রাজ্যগুলির সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব হইল না।

এইখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে যোগদানকারী প্রদেশ ও অন্যান্য অংশগুলিকে 'ষ্টেট', বা রাষ্ট্র (State) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ভারতীয় ইউনিয়নের শাসন বিভাগ
(The Executive of the Union of India)

প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট
(The President and Vice-President)

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান কর্ত্তা হইবেন প্রেসিডেণ্ট (রাষ্ট্রপতি)। ভারতীয় ইউনিয়নের শাসন বিভাগীয় সমস্ত ক্ষমতা প্রেসিডেণ্টের উপর ন্যস্ত হইবে। তাঁহার

নামেই ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য চলিবে। তিনি সমগ্র দেশরক্ষা বাহিনীর সর্ব্বপ্রধান অধিনায়ক হইবেন।

প্রেসিডেন্ট ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্যগণ এবং যোগদানকারী রাষ্ট্রসমূহের আইন সভার নির্ব্বাচিত সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। তাঁহার কার্য্যকাল পাঁচ বৎসর হইবে। কেহ দুই বারের বেশী প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

প্রেসিডেন্টের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট থাকিবেন। ভাইস-প্রেসিডেন্ট তাঁহার পদাধিকার বলে রাষ্ট্র-পরিষদের চেয়ারম্যান হইবেন। প্রেসিডেন্টের মৃত্যু বা অন্য কোনও কারণে প্রেসিডেন্টের পদ শূন্য হইলে, তিনি প্রেসিডেন্ট হিসাবে কার্য্য করিবেন। ভাইস-প্রেসিডেন্ট ভারতীয় পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের মিলিত সভায় সকল সদস্যের ভোটে নির্ব্বাচিত হইবেন।

ভারতীয় ইউনিয়নের আইন সভা, পার্লামেন্টের যে-কোনও পরিষদ, অপর পরিষদের নিকট প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ (impeachment) আনয়ন করিতে পারেন। অপর পরিষদ অভিযোগের তদন্ত করিয়া যদি প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহা হইলে প্রেসিডেন্টের পদচ্যুতি ঘটিবে।

ভাইস-প্রেসিডেন্টের অযোগ্যতার জন্য অথবা তাঁহার উপর অন্য কারণে অনাস্থা ঘটিবার জন্য, রাষ্ট্রসভা (Council of State) তাঁহাকে অপসারিত করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন এবং এই প্রস্তাব লোক-সভা (House of the People) কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে, ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদচ্যুতি ঘটিবে।

প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা
(Powers of the President)

প্রেসিডেন্ট হইবেন শাসন বিভাগীয় প্রধান কর্ত্তা। তিনি গঠনতন্ত্র ও আইন অনুযায়ী শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন। তিনি সমগ্র দেশরক্ষা বাহিনীর (Defence Forces of India) অধিনায়ক হইবেন। তাঁহার নামেই শাসনকার্য্য পরিচালিত হইবে। প্রেসিডেন্ট তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য একদল মন্ত্রী নিয়োগ করিবেন। প্রেসিডেন্ট ইউনিয়নের জন্য এটর্নি-জেনারেল প্রভৃতি বড় বড় পদে লোক নিযুক্ত করিতে পারিবেন। প্রেসিডেন্ট ইউনিয়নের প্রধান মন্ত্রীর নিকট হইতে ইউনিয়নের শাসন সংক্রান্ত খবর ও আইনের প্রস্তাবাদি

সম্পর্কে খবর জানিতে চাহিতে পারেন। প্রেসিডেন্ট যে-কোনও অপরাধীকে ক্ষমা করিতে পারিবেন, বা তাহার দণ্ডকাল হ্রাস করিতে পারিবেন।

প্রেসিডেন্ট বৎসরে অন্ততঃ দুইবার আইন সভার অধিবেশন আহ্বান করিবেন। প্রেসিডেন্ট আইন সভার অধিবেশন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী (prorogue) করিতে পারেন। তিনি লোক-সভাকে (House of the People) কার্য্য-কাল শেষ হইবার আগে ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। তিনি যখন আইন সভার অধিবেশন আহ্বান করিবেন, তখন প্রতিবার অধিবেশনের প্রারম্ভে আইন সভার যুক্ত অধিবেশনে, অধিবেশন আহ্বান করিবার কারণ বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করিবেন। তাঁহার সম্মতি ব্যতীত কোনও বিল আইনে পরিণত হইতে পারিবে না। আইন সভার বিরামকালে তিনি জরুরী আইন রচনা, প্রবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

প্রেসিডেন্ট প্রতি বৎসর কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট আইন সভায় উপস্থিত করাইবার ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহার সুপারিশ ব্যতীত কোনও ব্যয় বরাদ্দের দাবী (Demand for Grant) মঞ্জুরীর জন্য আইন সভায় উপস্থিত করা যাইবে না। তাঁহার সুপারিশ ছাড়া কোনও আর্থিক বিলও (Financial Bill) উপস্থিত করা যাইবে না।

ভারতীয় মন্ত্রী-সভা

(Council of Ministers)

প্রেসিডেন্টের কার্য্যে সাহায্য ও পরামর্শ দিবার জন্য একদল মন্ত্রী থাকিবেন। মন্ত্রীদের নেতা হিসাবে প্রধান মন্ত্রী (Prime Minister—অধি-মন্ত্রী) থাকিবেন। প্রধান মন্ত্রী প্রেসিডেন্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন ; অন্যান্য মন্ত্রী প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ-ক্রমে প্রেসিডেন্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন। মন্ত্রী-সভা সমবেতভাবে লোক-সভার নিকট দায়ী থাকিবেন। অর্থাৎ লোক-সভা কোনও ভাবে মন্ত্রীসভার উপর অনাস্থা প্রকাশ করিলে মন্ত্রী-সভা পদত্যাগ করিবেন। মন্ত্রিগণ প্রেসিডেন্টের ইচ্ছানুরূপ কাল মন্ত্রী-পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

প্রেসিডেন্ট ইচ্ছা করিলে মন্ত্রিগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন। মন্ত্রিগণকে পার্লামেন্টের সদস্য হইতে হইবে ; তবে, নিয়োগকালে কেহ যদি পার্লামেন্টের সদস্য না থাকেন, তবে তাঁহাকে নিয়োগকালের ছয় মাসের মধ্যে পার্লামেন্টের সদস্য হইতে হইবে। মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতা পার্লামেন্ট কর্ত্তৃক আইন দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে।

ভারতীয় আইন সভা
(Parliament)

ভারতীয় ইউনিয়নের পার্লামেণ্ট (Parliament) বা আইন-সভা প্রেসিডেন্ট এবং দুইটি পরিষদ, যথা—লোক-সভা (House of the People) ও রাষ্ট্রসভা (Council of States) লইয়া গঠিত হইবে। অতএব, ভারতীয় পার্লামেন্ট দ্বি-পরিষদবিশিষ্ট আইন সভা (Bicameral Legislative) হইবে।

রাষ্ট্র-সভা
(Council of States)

রাষ্ট্র-সভা ২৫০ জন সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। তন্মধ্যে ১৫ জন প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন, অবশিষ্ট সকলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরূপে রাষ্ট্রীয় আইন সভার নিম্ন পরিষদের সদস্যগণ কর্ত্তৃক, অথবা যেখানে একটি মাত্র পরিষদ রহিয়াছে, সেখানে পরিষদের নির্ব্বাচিত সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। রাষ্ট্র-সভা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিরাজ করিবে, ইহাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া চলিবে না। প্রতি দুই বৎসর অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করিবেন এবং প্রত্যেক সদস্যের কার্য্যকাল ছয় বৎসর হইবে। ভারতীয় ইউনিয়নের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট তাঁহার পদাধিকার-বলে (Ex-Officio) রাষ্ট্র-সভার চেয়ারম্যান হইবেন। রাষ্ট্র-সভার সদস্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবেন।

লোক-সভা
(House of the People)

লোক-সভার সদস্য-সংখ্যা পাঁচ শতের বেশী হইবে না। ইহারা রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিরূপে ভোটদাতাগণ কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্ব্বাচিত হইবেন। নির্ব্বাচক-মণ্ডলী এরূপভাবে স্থির করা হইবে যে, যাহাতে পাঁচ লক্ষ হইতে সাড়ে সাত লক্ষ অধিবাসী একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে। স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেই ভোটাধিকারের অধিকার লাভ করিবে। লোক-সভার কার্য্যকাল পাঁচ বৎসর হইবে ; তবে প্রেসিডেণ্ট জরুরী অবস্থার ঘোষণা করিলে, ইহার কার্য্যকাল বৃদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু একবারে এক বৎসরের অধিক কালের জন্য কার্য্যকাল

বৃদ্ধি করা চলিবে না। লোক-সভার সদস্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্ব্বাচিত করিবেন।

প্রেসিডেন্ট তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে এবং সময়ে পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্টের অধিবেশন অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী (prorogue) করিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে কার্য্যকাল শেষ হইবার পূর্ব্বেই লোক-সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন।

আইন করিবার পদ্ধতি

(Procedure for Legislation)

অর্থ-বিষয়ক বিল (Financial Bill) ছাড়া অন্য প্রকার বিল যে কোনও পরিষদে উত্থাপিত করা যাইবে। যে কোনও বিল উভয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের সম্মতি না পাইলে পার্লামেন্টে গৃহীত হইয়াছে বলা যাইবে না। কোনও বিল সম্পর্কে উভয় পরিষদে মতানৈক্য ঘটিলে প্রেসিডেন্ট উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন। এই যুক্ত অধিবেশনে অধিকাংশ সদস্যের মত অনুযায়ী বিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। অর্থ-বিষয়ক বিল লোক-সভায় প্রথম উত্থাপন করিতে হইবে, ইহা রাষ্ট্র-সভায় প্রথম উত্থাপন করা যাইবে না।

কোনও বিল আইন সভার-উভয় পরিষদ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার পর, প্রেসিডেন্টের নিকট উপস্থাপিত করা হইবে। প্রেসিডেন্টকে ঘোষণা করিতে হইবে, তিনি বিলে সম্মতি দিতেছেন অথবা দিতেছেন না। তিনি সম্মতি দিলে তবে বিল আইনে পরিণত হইবে। তিনি সম্মতি না দিলে বিল আইনে পরিণত হইবে না। প্রেসিডেন্ট তাঁহার সম্মতির জন্য উপস্থাপিত আর্থিক বিল ছাড়া অন্য যে কোনও বিল আইন-সভার পরিষদগুলিতে পুনর্ব্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন।

ভারতীয় ইউনিয়নের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ব্যবস্থা

(Procedure in Financial Matters)

প্রেসিডেন্ট ভারত সরকারের বাৎসরিক বাজেট (Budget) বা আয়-ব্যয়ের-সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাবের বিবরণ (Annual Financial Statement) আইন-সভার পরিষদসমূহের নিকট উপস্থিত করিবেন। ব্যয়গুলি দুই ভাগে ভাগ করিয়া দেখানো হইবে—ভারতের রাজস্বের উপর দায়বদ্ধ ব্যয় (Expenditure charged upon the revenues of India) এবং অন্যান্য ব্যয়।

প্রথম দফার ব্যয়গুলি সম্পর্কে পরিষদের ভোট দিবার বা মতামত জানাইবার কোনও অধিকার থাকিবে না। অপর ব্যয়গুলি সম্পর্কে লোক-সভার ভোট দিবার অধিকার থাকিবে। নিম্নলিখিত ব্যয়গুলি ভারতীয় রাজস্বের উপর দায়বদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

১। প্রেসিডেণ্টের বেতন ও ভাতা এবং তাঁহার অফিসের খরচ-পত্র।

২। রাষ্ট্র-সভার চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং লোক-সভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার—ইহাদের বেতন ও ভাতা।

৩। সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের বেতন, ভাতা ও পেন্সন।

৪। ভারত সরকারের ঋণ পরিশোধ বাবদ ব্যয়।

৫। ভারতীয় পার্লামেণ্ট কর্তৃক রাজস্বের উপর দায়বদ্ধ বলিয়া নির্ণীত যে কোনও ব্যয়।

অর্থ-বিষয়ক বিল
(Money Bill)

কোনও বিল দ্বারা যদি কর (Tax) বসানো হয় বা কর উঠাইয়া দেওয়া হয়, অথবা কর-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করা হয়, অর্থ ঋণ লইবার ব্যবস্থা বা অর্থের দায়িত্ব লইবার ব্যবস্থা প্রভৃতি হয়, তাহা হইলে তাহাকে অর্থ-বিষয়ক বিল (Money Bill) বলা হয়। এইরূপ বিল রাষ্ট্র-সভায় (Council of States) প্রথমে উপস্থিত করা যাইবে না, ইহাকে প্রথম লোক-সভায় (House of the People) উপস্থিত করিতে হইবে। লোক-সভায় গৃহীত হইবার পর এই বিল রাষ্ট্র-সভায় প্রেরিত হইবে। রাষ্ট্র-সভাকে তিরিশ দিনের মধ্যে বিলটি আলোচনা শেষ করিয়া সুপারিশসহ লোক-সভার নিকট ফেরত পাঠাইতে হইবে। লোক-সভা রাষ্ট্র-সভার মতামত গ্রহণ করিতেও পারেন, নাও পারেন। লোক-সভার মতই কার্য্যকরী হইবে। রাষ্ট্র-সভা যদি তিরিশ দিনের মধ্যে তাঁহাদের মতামত না জানান, তাহা হইলে তাঁহাদের মতামত না শুনিয়াই লোক-সভার প্রকাশিত মত অনুযায়ী অর্থ-বিষয়ক বিল (Money Bill) গৃহীত হইবে।

প্রেসিডেণ্টের আইন সংক্রান্ত বিশেষ ক্ষমতা
(Special Legislative Powers of the President)

ভারতীয় পার্লামেণ্টের পরিষদগুলির বিরামকালে, যখন পরিষদগুলির অধিবেশন চলিতেছে না, এমন সময় প্রেসিডেণ্ট প্রয়োজন মনে করিলে অর্ডিন্যান্স

(Ordinance—জরুরী আইন) প্রণয়ন ও জারী করিতে পারেন। এইরূপ অর্ডিন্যান্স পার্লামেণ্টের অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হইবার ছয় সপ্তাহের মধ্যে যদি পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত না হয়, তাহা হইলে বাতিল হইয়া যাইবে। পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদ ইহার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ছয় সপ্তাহের আগেও নাকচ করিয়া দিতে পারেন।

গভর্ণর-শাসিত প্রদেশ
(Governor's Provinces)

নিম্নলিখিত রাষ্ট্রগুলিতে একজন করিয়া গভর্ণর (Governor—দেশপাল) থাকিবেন।—১। পশ্চিমবঙ্গ, ২। আসাম, ৩। উড়িষ্যা, ৪। বিহার, ৫। যুক্তপ্রদেশ, ৬। পূর্ব্ব পাঞ্জাব, ৭। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, ৮। মাদ্রাজ ও ৯। বোম্বাই।

রাষ্ট্রগুলির আইন-সভার নিম্ন পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচনে যে সব ব্যক্তি ভোট দিবার অধিকারী, তাঁহাদের ভোটে গভর্ণর নির্ব্বাচিত হইবেন। শাসনতন্ত্র নির্দ্ধারণ কমিটির অনেক সদস্যের মতে, গভর্ণর জনসাধারণ কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্ব্বাচিত না হইয়া, আইন-সভার সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত চার জন প্রার্থীর মধ্য হইতে প্রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোনও ব্যক্তি দুই বারের বেশী গভর্ণর হইতে পারিবেন না। প্রত্যেক রাষ্ট্রের শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা গভর্ণরের উপর ন্যস্ত থাকিবে। গভর্ণরের নামেই শাসনকার্য্য চলিবে।

মন্ত্রিসভা
(Council of Ministers)

গভর্ণরের কাজে সাহায্য করিবার জন্য ও পরামর্শ দিবার জন্য একদল মন্ত্রী থাকিবেন। মন্ত্রিমণ্ডলীর নেতা হিসাবে প্রধান মন্ত্রী (Chief Minister—মহামন্ত্রী) থাকিবেন। গভর্ণর যে যে বিষয়ে তাঁহার নিজ ইচ্ছামত ক্ষমতা অনুযায়ী (in his discretion) কার্য্য করিতে পারিবেন, সেইগুলি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে মন্ত্রিমণ্ডলী তাঁহাকে পরামর্শ দিতে পারিবেন। মন্ত্রিগণ গভর্ণর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন। মন্ত্রিগণের কার্য্যকাল গভর্ণরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। মন্ত্রিগণকে আইন-সভার সদস্য হইতে হইবে। কেহ মন্ত্রী-রূপে নিযুক্ত হইবার কালে যদি আইন-সভার সদস্য না থাকেন, তাঁহাকে ছয় মাসের মধ্যে আইন-সভার সদস্য হইতে হইবে।

প্রাদেশিক আইন সভা
(Provincial Legislature)

প্রত্যেক রাষ্ট্রে আইন-সভা থাকিবে। এই আইন সভা গভর্ণর এবং একটি বা দুইটি পরিষদ লইয়া গঠিত হইবে। যেখানে দুইটি পরিষদ থাকিবে, সেখানে একটিকে বলা হইবে ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council) এবং অপরটিকে বলা হইবে ব্যবস্থা পরিষদ (Legislative Assembly); একটি মাত্র পরিষদ থাকিলে তাহাকে ব্যবস্থা পরিষদ (Legislative Assembly) বলা হইবে।

ব্যবস্থা পরিষদ প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষভাবে নির্ব্বাচিত সদস্যগণ লইয়া গঠিত হইবে। প্রতি লক্ষ অধিবাসী উর্দ্ধ সংখ্যায় এক জন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন। কোনও ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যসংখ্যা তিন শতের অধিক বা ষাট জনের কম হইবে না। ব্যবস্থা পরিষদের কার্য্যকাল পাঁচ বৎসর হইবে। গভর্ণর উভয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী (prorogue) করিতে পারিবেন এবং ব্যবস্থা পরিষদের কার্য্যকাল শেষ হইবার আগে ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন। ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন।

ব্যবস্থাপক সভা স্থায়ী প্রতিষ্ঠানরূপে থাকিবে। ইহাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া চলিবে না। প্রতি তিন বৎসর অন্তর ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করিবেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সংখ্যা ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য সংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগের বেশী হইবে না। ইঁহাদের মধ্যে এক-ষষ্ঠাংশ গভর্ণর কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন, অবশিষ্ট সকলে নির্ব্বাচিত হইবেন।

অর্থ বিষয়ক বিল (Financial Bill) ছাড়া অন্য যে কোনও বিল দুইটি পরিষদ থাকিলে যে কোনও পরিষদে প্রথম উত্থাপন করা চলিবে। অর্থ বিষয়ক বিল শুধু ব্যবস্থা পরিষদে প্রথম উত্থাপন করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার বিল উভয় পরিষদ কর্ত্তৃক যথারীতি গৃহীত হওয়া দরকার। কোনও বিল সম্পর্কে উভয় পরিষদের মতানৈক্য ঘটিলে, গভর্ণর উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন। কোনও বিল আইন-সভার পরিষদ বা পরিষদগুলিতে যথারীতি গৃহীত হইবার পর তাহা গভর্ণরের নিকট উপস্থাপিত করা হইবে। গভর্ণর ঘোষণা করিবেন, তিনি বিলে সম্মতি দিবেন বা দিবেন না। গভর্ণর

সম্মতি না দিলে বিল আইনে পরিণত হইবে না। যেখানে আইন-সভায় একটি মাত্র পরিষদ রহিয়াছে, সেখানে গভর্ণর তাঁহার সম্মতির জন্য উপস্থাপিত বিল পুনর্ব্বিবেচনার জন্য পরিষদের নিকট ফেরত পাঠাইতে পারেন এবং পরিষদ যদি এই বিল পুনর্ব্বিবেচনার পর তাঁহার নিকট উপস্থিত করে, তবে তিনি আর অসম্মতি জানাইতে পারিবেন না। গভর্ণর কোনও বিল প্রেসিডেণ্টের বিবেচনার জন্যও পাঠাইতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রেসিডেণ্ট যদি সম্মতি দেন, তবেই বিলটি আইনে পরিণত হইবে।

রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত ব্যবস্থা

(Financial Arrangements of the State)

গভর্ণর বাৎসরিক সম্ভাব্য আয় ও ব্যয়ের হিসাবের বিবরণ (Annual Financial Statement) রাষ্ট্রের আইন-সভার পরিষদ বা পরিষদগুলির নিকট উপস্থিত করাইবেন। এই বিবরণের মধ্যে ব্যয়গুলি দুইভাগে ভাগ করিয়া দেখানো হইবে—রাষ্ট্রের রাজস্বের উপর দায়বদ্ধ ব্যয় (expenditure charged upon the revenues of the State) এবং অনুরূপ ব্যয়।

নিম্নলিখিত ব্যয়গুলি রাজস্বের উপর দায়বদ্ধ হইবে বলিয়া গণ্য হইবে—১। গভর্ণরের বেতন ও ভাতা এবং তাঁহার অফিস সংক্রান্ত খরচ, ২। ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার, এবং ব্যবস্থাপক সভা থাকিলে, চেয়ারম্যান ও ডেপুটি চেয়ারম্যান—ইঁহাদের বেতন ও ভাতা, ৩। হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতন, ভাতা ও পেন্সন, ৪। রাষ্ট্রের ঋণ পরিশোধ বাবদ ব্যয়, ৫। রাষ্ট্রের আইন-সভা কর্তৃক রাজস্বের উপর দায়বদ্ধ বলিয়া ঘোষিত কোনও ব্যয়।

উল্লিখিত ব্যয়গুলি আইন-সভার ভোট-সাপেক্ষ বলিয়া গণ্য হইবে না। তবে, আইন-সভা এই সব ব্যয় সম্পর্কে আলোচনা চালাইতে পারিবেন। অন্যান্য ব্যয়গুলি মঞ্জুরীর জন্য ব্যবস্থা পরিষদের ভোট-সাপেক্ষ হইবে। ব্যবস্থা পরিষদ যে কোনও ব্যয়ের দাবী মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন অথবা কোনও কোনও ব্যয়ের দাবী কমাইয়াও দিতে পারিবেন। গভর্ণর এইসব বিষয়ে ব্যবস্থা পরিষদের মতের বিরুদ্ধে যাইতে পারিবেন না।

গভর্ণরের আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা

(Legislative Power of the Governor)

আইন-সভার বিরামকালে, অর্থাৎ যখন রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদের বা যেখানে দুই পরিষদ আছে, সেখানে ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভা, উভয় পরিষদের

অধিবেশন বন্ধ আছে, গভর্ণর প্রয়োজন বোধ করিলে অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন ও জারী করিতে পারেন। আইন-সভার অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হইলে, এই অর্ডিন্যান্স পরিষদ বা পরিষদদ্বয়ের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। যদি উপস্থিত না করা হয়, তাহা হইলে অধিবেশন আরম্ভ হইবার ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে অর্ডিন্যান্স বাতিল হইয়া যাইবে। আইন সভা এইরূপ অর্ডিন্যান্সকে আইনে পরিণত করিতে পারেন, অথবা বাতিল করিয়া দিতে পারেন।

গুরুতর জরুরী অবস্থায় গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা

(Special Power of the Governor in Cases of Grave Emergencies)

কোনও সময় গভর্ণর যদি বিবেচনা করেন যে, রাষ্ট্রে শান্তি ও শৃঙ্খলার বিঘ্নকর জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এবং শাসনতন্ত্র অনুযায়ী স্বাভাবিক ভাবে সরকার পরিচালন করা সম্ভব নহে, তাহা হইলে তিনি ঘোষণা করিয়া শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সাধারণ বিধিব্যবস্থা স্থগিত রাখিয়া নিজহস্তে নিজের ইচ্ছামত ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারেন। এই ঘোষণা অবিলম্বে প্রেসিডেণ্টকে জানাইতে হইবে। প্রেসিডেণ্ট ইচ্ছা করিলে গভর্ণরের ঘোষণা নাকচ বা প্রত্যাহার করিতে পারেন। অথবা তিনি তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে পারেন। এইরূপ ঘোষণা দুই সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিতে পারিবে ; এই সময় গভর্ণর তাঁহার ইচ্ছামত শাসনকার্য্য চালাইতে পারিবেন।

পরিশিষ্ট—খ

(Appendix—B)

ভারতীয় গণ-পরিষদ কর্ত্তৃক রচিত মৌলিক অধিকারের তালিকা

(Lists of Fundamental Rights Prepared by the Constituent Assembly)

প্রত্যেক নাগরিকের নিম্নলিখিত আদালতগ্রাহ্য মৌলিক অধিকারসমূহ থাকিবে। এগুলি সরকার বা অন্য কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবেন না। এই অধিকারগুলি ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোনও আইন হইলে তাহা আদালত কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইবে। এই সব অধিকার ভোগ করিতে কেহ বাধা দিলে সুপ্রীম কোর্টের অথবা ভারতীয় পার্লামেণ্ট নির্দ্ধারিত অন্য কোর্টে নালিশ করা চলিবে। এই সকল অধিকার যাহাতে নির্ব্বিবাদে ভোগ করা যায় তাহার জন্য কোর্ট 'হেবিয়াস কার্পাস' প্রভৃতি জারি করিতে পারিবেন।

১। ধর্ম্ম, জাতি বা স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলে রাষ্ট্রের নিকট সমান ব্যবহার পাইবেন। ধর্ম্ম, জাতি বা স্ত্রীপুরুষ ভেদে রাষ্ট্র বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত বৈষম্যমূলক আচরণ করিবেন না। এই সকল কারণে, কাহাকেও দোকান, হোটেল বা সাধারণের আমোদ-প্রমোদের স্থানে যাইতে, অথবা সরকারী ব্যয়ে প্রস্তুত সাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি ব্যবহার করিতে নিষেধ করা চলিবে না।

২। রাষ্ট্রের চাকুরীগুলিতে প্রবেশ করিবার জন্য সকল নাগরিকের সমান সুযোগ থাকিবে। তবে, সরকার অনুন্নত শ্রেণীদের জন্য চাকুরী সংরক্ষণ করিতে পারেন।

৩। অস্পৃশ্যতা সর্ব্বতোভাবে উচ্ছেদ বা বর্জ্জন করা হইবে। কেহ কোনও ভাবে অস্পৃশ্যতা-পরিপোষক আচরণ করিলে দণ্ডনীয় হইবে।

৪। রাষ্ট্র কাহাকেও কোনও উপাধি দিবেন না। কেহ বিদেশী কোনও রাষ্ট্রের নিকটও উপাধি লইতে পারিবে না।

৫। প্রত্যেক নাগরিকের নিজের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার আছে। তবে, রাষ্ট্রদ্রোহকর অথবা মানহানিকর বা নৈতিক অপরাধমূলক বিষয় প্রকাশ করা চলিবে না।

৬। শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সভাসমিতি করিবার অধিকার থাকিবে। তবে, শৃঙ্খলা রক্ষার্থে রাষ্ট্র এই অধিকারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিতে পারিবেন।

৭। ভারতীয় ইউনিয়নের সর্ব্বত্র সকলে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিতে পারিবেন, যে কোনও স্থানে বসবাস করিতে পারিবেন, এবং ইচ্ছামত সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় ও ভোগ-দখল করিতে পারিবেন। তবে, জনসাধারণ অথবা আদিম অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্য এইসব অধিকার সঙ্কুচিত করা চলিবে।

৮। নাগরিকগণ যে কোনও ব্যবসায় বা বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন। অবশ্য কোনও ব্যবসায় বা বৃত্তির জন্য বিশেষ বিশেষ যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ণয় করিয়া দেওয়া চলিবে।

৯। কাহারও জীবননাশ বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ আইনানুগ পন্থা ছাড়া করা চলিবে না।

১০। আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান বলিয়া গণ্য হইবে।

১১। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার থাকিবে।

১২। ১৪ বৎসরের নিম্নবয়স্ক কোনও বালক-বালিকাকে কারখানা, খনি প্রভৃতি বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ করা চলিবে না।

১৩। প্রত্যেক নাগরিকের নিজের নিজের ধর্ম্ম আচরণ করিবার স্বাধীনতা থাকিবে।

১৪। রাষ্ট্রের অর্থ-সাহায্যে পরিচালিত কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্ম-মত বিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হইবে না।

১৫। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা করিতে পারিবে।

১৬। বে-আইন-ভাবে কাহাকেও তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা চলিবে না। ক্ষতিপূরণ না দিয়া কাহারও কোনও সম্পত্তি গ্রহণ করা চলিবে না।

পরিশিষ্ট—গ

(Appendix—C)

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির নির্দ্দেশ

(Directive Principles of State Policy)

ভারতীয় গণপরিষদ রাষ্ট্র পরিচালনার কতকগুলি মূলনীতি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। সরকার এই সকল নীতি অনুযায়ী চলিবেন। তবে, সরকার যদি এই সকল নীতি অমান্য করেন, তাহা হইলে সরকারকে এগুলি জানিতে বাধ্য করিবার জন্য আদালতের সাহায্য পাওয়া যাইবে না। মৌলিক অধিকারগুলি আদালত সাহায্যে কার্য্যকরীরূপে ভোগ করা যাইতে পারিবে। সরকার বা অপর কেহ যদি মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে আদালত তাহার প্রতিবিধান করিবেন। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিগুলি ক্ষুণ্ণ হইলে আদালতের সাহায্যে কোনও প্রতিকার পাওয়া যাইবে না।

স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলে জীবিকা নির্ব্বাহের যথোপযুক্ত উপকরণ পাইবেন। সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ সাধিত হয়, এরূপ ভাবে দেশের সম্পদ বণ্টিত হইবে। অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা এরূপ হইবে যাহাতে কতিপয় ব্যক্তির হাতে ধনসম্পদ এবং উৎপাদনের উপায়গুলি কেন্দ্রীভূত না হয়; স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলে সমান সমান কার্য্যের জন্য সমান সমান পারিশ্রমিক পাইবেন।

নাগরিকগণের শিক্ষালাভের অধিকার, কাজ করিবার অধিকার এবং বেকার অবস্থায়, বার্দ্ধক্যে, অসুস্থতায় ও অক্ষমতায় এবং অন্যায়রূপে অভাবে পড়িলে সরকারী সাহায্য পাইবার অধিকার থাকিবে।

সর্ব্বশ্রেণীর শ্রমিক বাঁচিবার উপযোগী বেতন পাইবেন। সকলে ভদ্রভাবে জীবন যাপন করিতে পারিবেন।

প্রত্যেক নাগরিকের বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা পাইবার অধিকার থাকিবে। দশ বৎসরের মধ্যে, প্রত্যেক বালক-বালিকা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যাহাতে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা পায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইবে।

তপশীলী শ্রেণী ও অনুন্নত শ্রেণীদের শিক্ষা ও আর্থিক উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইবে।

আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জাতিতে জাতিতে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হইবে।

প্রশ্নাবলী

ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থা

(Indian Administration)

প্রথম অধ্যায়

ভারতে ইংরাজ শাসনের প্রতিষ্ঠা ও ক্রম-বিকাশ

(Origin and Growth of the British Rule in India)

1. Describe the important features of the Regulating Act, 1773, the Charter Act, 1853, and the Indian Councils Act, 1861, and Morley-Minto Reforms.

2. Describe the important features of the Government of India Act, 1919.

3. Describe the system of Dyarchy as introduced in the Provinces under the Government of India Act, 1919.

4. Describe the characteristic features of the Government of India Act, 1935, as originally enacted.

5. What are the characteristic features of the federation as contemplated in the Government of India Act, 1935 as originally enacted?

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৯৩৫ সালের পরবর্ত্তী গঠনতান্ত্রিক পরিণতি

(Constitutional Development after 1935)

1. Describe the important features of the Cripps' Proposals, Cabinet Mission Plan, and the Constituent Assembly of India.

চতুর্থ অধ্যায়

বড়লাট বা রাষ্ট্রপাল

(The Governor-General of India)

1. Compare the powers of the Governor-General of India before the transfer of power with those of the Governor-General of the Dominion of India after the transfer of power.

2. What are the legislative powers of the Governor-General of the Dominion of India?

3. Write a note on the Interim Government of Pandit Nehru.

পঞ্চম অধ্যায়

কেন্দ্রীয় আইন-সভা
(Central Legislative)

1. Describe the powers of the Central Legislature of India before the transfer of powers.

2. Describe the constitution and powers of the present Dominion Legislature of India.

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রাদেশিক সরকার
(Provincial Government)

1. Critically examine the Special Responsibilities of the Governor of a Province under the Government of India Act, 1935, as originally enacted.

2. Describe the powers of the Provincial Governor before the transfer of power.

সপ্তম অধ্যায়

বর্ত্তমান প্রাদেশিক সরকার
(Present Provincial Government)

1. Describe the powers of the Provincial Governor after the transfer of power.

2. Describe the present position of the Provincial Council of Ministers.

অষ্টম অধ্যায়

প্রাদেশিক আইন সভা
(Provincial Legislative)

1. Describe the powers of the Provincial Legislative before the transfer of power.

নবম অধ্যায়

প্রাদেশিক আইন-সভা
(Provincial Legislative)

1. Describe the powers of the present Legislative of a Province.

2. Describe the constitution and power and functions of the West Bengal Legislative.

দশম অধ্যায়

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকার

(Provincial Autonomy)

1. What is Provincial Autonomy? Mention its chief characteristics. (C. U. 33, 42, 46.)

2. What are the arguments for Provincial Autonomy?

একাদশ অধ্যায়

১৯৩৫ সালের আইনের প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র

(The Federation which was Proposed by the Government of India Act, 1935 as originally enacted)

1. Discuss the defects of the Federation Proposed in the Government of India Act, 1935, as originally enacted.

দ্বাদশ অধ্যায়

সরকারী বিষয়সমূহের বিভাগ

(Division of Subjects)

1. What do you understand by Central, Provincial, and conquerent subjects? Enumerate some of them.

2. What do you understand by Residuary Subjects? What are the presentary arrangements with regard to their distribution? Do you suggest any modification in the presentary arrangement?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আইন সভার নির্ব্বাচন

(Election to the Legislature)

1. Write notes on (*a*) Communal Award, (*b*) Poona Pact.

2. Write a short essay on the evils of communal and separate electorates in India.

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

দেশীয় রাজ্য

(Native States)

1. What was the status of the Native States before the transfer of power? Could they be described as States proper?

2. Briefly describe the position of the Native States after their recent merger and regrouping.

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভারতের বিচার-ব্যবস্থা

(The Judicial system of India)

1. Describe briefly the Judicial System of India. (C. U. 45, 47.)

2. Describe the constitution and functions of Federal Court of India.

3. Briefly describe the constitution and functions of the Proposed Supreme Court of India.

ষোড়শ অধ্যায়

স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন

(Local Self-Government)

1. What are the functions of the municipalities? What are their sources of income and items of expenditure? (C. U. 26, 31, 37, 38, 40, 44.)

2. Describe the organisation of Rural Self-Government in Bengal or Assam. (C. U. 27, 37, 38, 41.)

3. What are the functions of the Union Boards in West Bengal? What are their income and expenditure? Suggest measures for the improvement of the Union Boards in West Bengal.

4. Write a critical essay on the working of the self-governing institutions of India. Suggest measures for the improvement of their working.

সপ্তদশ অধ্যায়

ভারতীয় পাব্লিক সার্ভিস

(Public Services in India)

1. Write a short note on the Public Service Commission. (C. U. 33, 36.)

2. Write an essay on the Indianisation of the Services in India.

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রাদেশিক শাসন

(Provincial Administration)

1. What are the functions and powers of the District Officer? (C. U. 33, 37, 41.)

2. Write a critical note on the position and powers of the Collector-Magistrate. How far is the theory of separation of powers applied in his case?

উনবিংশ অধ্যায়

শিক্ষা

(Education)

1. What is the present state of Primary Education in India? Suggest measures for the spread of primary education in India. (C. U. 31.)

2. Write an essay on the Wardha Scheme of Basic Education.

3. Show the importance of vocational education in the national life of India. (C. U. 28.)

4. Write an eassay on vocational education in India.

বিংশ অধ্যায়

জন-স্বাস্থ্য

(Public Health)

1. Write a short essay on the present state of public health in India. Suggest measures how it can be improved.

দ্বিতীয় খণ্ডে ব্যবহৃত পরিভাষা

Advisory Committee—উপদেষ্টা সমিতি
Autocracy—স্বৈরতন্ত্র
Budget—বাজেট
Cabinet-Mission—মন্ত্রী-মিশন
Charter—সনদ
Communal Award—সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা
Constituent Assembly—গণ-পরিষদ
Cripps' Proposals—ক্রিপ্‌স্‌-প্রস্তাব
Central Legislature—কেন্দ্রীয় আইন সভা
Concurrent " List—সমানাধিক আইন বিষয়ক তালিকা
Council of Ministers—মন্ত্রি-সভা
Council of State—রাষ্ট্রীয় পরিষদ
Council of States—রাষ্ট্রসভা
Demands for Grants—ব্যয়-বরাদ্দের দাবী
Dominion Status—ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস : ডোমিনিয়ন তুল্য মর্য্যাদা
Double Government—দ্বৈত-শাসন
Dyarchy—দ্বৈত-শাসন
District Officer—জেলা শাসক
Dominion Legislature—ডোমিনিয়ন আইন-সভা
Draft Constitution—গঠনতন্ত্রের খসড়া
Executive—শাসন বিভাগ
Executive Council—শাসন-পরিষদ
Executive Powers—শাসন বিষয়ক ক্ষমতা
Expenditure charged upon the revenues of the Dominion—ডোমিনিয়নের আয়ের উপর দায়বদ্ধ ব্যয়
Expenditure charged upon the revenues of the Province—প্রদেশের আয়ের উপর দায়বদ্ধ ব্যয়
Federation—যুক্তরাষ্ট্র
Federal Lagislature—যুক্ত রাষ্ট্রীয় আইন সভা
" " List—যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সংক্রান্ত তালিকা

Financial Powers—অর্থ-বিষয়ক ক্ষমতা
Fundamental Rights—মৌলিক অধিকার
Government—সরকার
Government of India Act—ভারত-শাসন আইন
Governor—লাট, দেশপাল
Governor General—বড়লাট, রাষ্ট্রপাল
Governor-in-Council—সপরিষদ গভর্ণর
Governor-General-in-Council—সপরিষদ বড়লাট
House of the People—লোক-সভা
Indianisation—ভারতীয়করণ
Indian Independence Act—ভারতীয় স্বাধীনতা আইন
Interim Government—অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার
Judicial System—বিচার-ব্যবস্থা
Law Member—আইন সদস্য
Legislative Council—ব্যবস্থাপক সভা
" Assembly—ব্যবস্থা পরিষদ
" Powers—আইন বিষয়ক ক্ষমতা
Local Self-Government—স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন
Money Bill—অর্থ-বিষয়ক বিল
Morley-Minto Reforms—মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কার
Mountbatten Plan—মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা
Native State—দেশীয় রাজ্য
Paramountcy—সর্ব্বময় প্রভুত্ব
Proportional Representation—আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব
Provincial Autonomy—প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনাধিকার
" Government—প্রাদেশিক সরকার
" Legislative list—প্রাদেশিক আইন বিষয়ক তালিকা
Residuary Subjects—অবশিষ্ট বিষয়
Secretary of State for India—ভারত-সচিব
Sovereignty—সার্ব্বভৌমত্ব
Special Responsibilities—বিশেষ দায়িত্ব
Viceroy—রাজপ্রতিনিধি
Under Secretary—আণ্ডার সেক্রেটারী, অবর কর্ম্মসচিব
Unitary Government—এক রাষ্ট্রীয় সরকার, এক-কেন্দ্রিক সরকার

ভারতবর্ষের শাসন প্রণালীর নির্ঘণ্ট

অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার— ১৯—৩৫
অবশিষ্ট বিষয়— ৭৪
(Residuary Subjects)
আইন সভা—
—উভয় পরিষদের পরস্পরের সম্পর্ক ৪২
—কেন্দ্রীয় (পুরাতন) ৩৯
—কেন্দ্রীয় (বর্ত্তমান) ২
—কেন্দ্রীয় ক্ষমতা (পুরাতন) ৪০, ৪০, ৪২
—নির্ব্বাচন ৭৬—৭৮
ইংরাজ শাসনের ক্রম-পরিণতি ১
ইংরাজ শাসনের প্রতিষ্ঠা ১
ইণ্ডিয়া অফিস— ২৯
ইণ্ডিয়া কাউন্সিল এ্যাক্ট— ৫, ৬, ৭
কেন্দ্রীয় বিষয়— ৭২
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভা ৩৭
কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ (বর্ত্তমান) ৩৫
ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব— ১৭
গণপরিষদ— ২১
গভর্ণর জেনারেল— ৩, ৫
গঠনতন্ত্র—
—আইন সভা
—ভবিষ্যৎ খসড়া ১২৪—১২৮
—ভারতীয় ইউনিয়ন ১২৫
—মন্ত্রীসভা ১২৭
—রাষ্ট্র সভা ১২৮
—লোক সভা ১২৮
—শাসন বিভাগ—প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট ১২৫— ২৬
চার্টার আইন—
—(১৮১৩) ৪
—(১৮৩৩) ৪
—(১৮৫৩) ৪
জন-স্বাস্থ্য— ১২২—১২৩
জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট— ১০৬—১০৮
ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস ১১—১২
দ্বৈত শাসন— ২, ১০, ১১
দেশীয় রাজ্য
—ও ১৯৩৫ সালের আইনের প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র ৮২
—ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ৮১
—দেশীয় রাজ্যগুলির রূপান্তর ৮৩—৮৫
—নরেন্দ্র-মণ্ডল ৮১
—শাসনতান্ত্রিক মর্য্যাদা ৭৯
—সাধারণ বর্ণনা ৭৮
বড়লাট— ৩০
—অর্থ " ৩২
—আইন " ৩১
—ও প্রাদেশিক সরকার ৩৩
—শাসন পরিষদ ৩৩
—শাসন বিষয়ক ক্ষমতা ৩১
বিচার-ব্যবস্থা ৮৬—৯০
—দেওয়ানী ৮৬
—প্রিভি কাউন্সিল ৮৯
—ফেডারেল কোর্ট ৮৮
—ফৌজদারী ৮৭
—সমালোচনা ৮৯
—সুপ্রীম কোর্ট ৯০

বোর্ড অফ কন্‌ট্রোল— ৩
ব্যবস্থা পরিষদ (পুরাতন) ৩৯
ভারত শাসন আইন (১৯১৯) ৮
—(১৯৩৫) ৩৫
—পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্র ১৪, ৬৮, ৭১
—বিশেষত্বসূচক চিহ্ন ১৩
ভারত-সচিব ৪-২৬
—উপদেষ্টা সমিতি ২৭
ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (১৯৪৭) ২১
রাষ্ট্রীয় পরিষদ ৩৯
শিক্ষা—
—কলেজী ১১৭
—কর্তৃপক্ষ ১১২-১১৩
—প্রাথমিক ১১৩
—বিশ্ববিদ্যালয় ১১৮
—বিস্তারের পক্ষে বাধা ১১৪-১১৫
—বনিয়াদী ১১৫-১১৬
—বৃত্তি-শিক্ষা ১১৮
—মাধ্যমিক ১১৭
—স্ত্রী-শিক্ষা ১২০
সমানাধিকার বিষয়— ৭৪
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ৭৭
স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন — ৯১
—ইউনিয়ন বোর্ড ৯৭-৯৮
—উন্নতির উপায় ১০০-১০১
—কলিকাতা করপোরেশন ১৩
—গ্রাম্য ৯৫-৯৮
—জেলা বোর্ড ৯৫-৯৬
—প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রেণী বিভাগ ৯২
—মিউনিসিপ্যালিটি ৯৪-৯৫
—সমালোচনা ৯৯
পাবলিক সার্ভিস ১০২-১০৫
—কমিশন ১০২-১০৬
—ভারতীয়-করণ ১০৫
পিটের ভারত আইন— ৩
পুণা চুক্তি— ৭৭
পুলিশ বিভাগ ১০৯—১১৯
প্রাদেশিক আইন সভা—
—ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে ক্ষমতা ৫৬—৫৮
—ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ক্ষমতা ৬০-৬২
—দুই পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক ৫৯
—সদস্য সংখ্যার তালিকা ৬৩-৬৪
প্রাদেশিক গভর্ণর—
—অর্থ-বিষয়ক ক্ষমতা ৪৬-৪৮
—আইন বিষয়ক ক্ষমতা ৪৬
—ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে ৪৫-৫০
—ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ৫২-৫৫
—বিশেষ দায়িত্ব ১৮
—শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা ৪৬
প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা—
—ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে ৫১
—ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ৫৫
প্রাদেশিক সরকার
—ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব্বে ৪৫
—ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ৫২-৫৫
মন্ত্রিসভা—
—কেন্দ্রীয়
—প্রাদেশিক ৫১-৫৫
—ও আইন-সভা ৫১
মন্ত্রী-মিশন ১৮-১৯
মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কার ৬
মেকলে— ৪
মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা ২০

তৃতীয় খণ্ড

অর্থশাস্ত্র

(Economics)

তৃতীয় খণ্ড

অর্থশাস্ত্র

(Economics)

প্রথম অধ্যায়

মানুষের কত অভাব। শুধু বাঁচিয়া থাকিতে হইলেই কিছু পরিমাণ খাদ্য, বস্ত্র এবং একটা আশ্রয়ের দরকার। আর ভাল ভাবে বাঁচিতে হইলে, ভাল খাদ্য, ভাল বস্ত্র এবং ভাল আশ্রয় চাই। আধুনিক সভ্য জীবনে, মানুষের অভাব ত গণিয়া শেষ করা যায় না। মানুষের অভাব ত রোজই বাড়িতেছে। আর, এই সব অভাব মিটাইবার জন্য মানুষকে অহরহ খাটিতে হইতেছে। মানুষের অভাব, অভাব মিটাইার প্রচেষ্টা, এবং অভাব সমূহের পরিতৃপ্তি—এই সকল জিনিষ হইল অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বস্তু। অর্থশাস্ত্র মানুষের অভাব সমূহের আলোচনা করে, এবং মনুষ্য প্রচেষ্টা দ্বারা সেই অভাব সমূহ কি ভাবে পরিতৃপ্তি লাভ করে, তাহাও আলোচনা করে। মানুষ নিজের শ্রম প্রয়োগ করিয়া সম্পদ উৎপন্ন করে, এবং উৎপন্ন সম্পদ নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিনিময় করে। সম্পদ বিভিন্ন উৎপাদক শ্রেণীর মধ্যে আবার বণ্টিত হইয়া যায়। কি ভাবে এই সম্পদ উৎপাদন, বিনিময় এবং বণ্টন হয়, অর্থশাস্ত্র তাহাই আলোচনা করে।

অনেক কাল আগে মানুষ নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষ নিজেই উৎপন্ন করিয়া লইত, নিজের অভাব প্রত্যক্ষ ভাবে নিজের প্রচেষ্টা দ্বারা মিটাইয়া লইত। ক্রমে শ্রম বিভাগ দেখা দিয়াছে এবং মানুষ নিজের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ নিজে উৎপন্ন না করিয়া সেইগুলির বিনিময়ে অন্য জিনিষ আনিয়া নিজের অভাব মিটাইতে সুরু করিয়াছে। আজ মানুষ নিজ প্রচেষ্টা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নিজের সমুদয় অভাব মিটায় না, নিজের প্রচেষ্টালব্ধ সম্পদ অন্যের কাছে বিক্রয় করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহা দিয়া আবার নিজের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করে। এই ভাবে মানুষের প্রচেষ্টা দ্বারা মানুষের অভাব প্রত্যক্ষ ভাবে না মিটাইয়া, অর্থের মারফত পরোক্ষভাবে মিটাইয়া থাকে। মানুষের

অভাব মিটাইবার প্রচেষ্টা এবং অভাবের পরিতৃপ্তির মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে আজ অর্থের আবির্ভাব হইয়াছে। অতএব, আজ অর্থশাস্ত্রকে মানুষের আর্থিক আয়ের কথা আলোচনা করিতে হয়। অধ্যাপক মার্শ্যাল এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, মানুষ কিভাবে অর্থোপার্জ্জন করে এবং কি ভাবেই বা তাহা ব্যয় করে, অর্থশাস্ত্র তাহার আলোচনা করে।

তাই বলিয়া অর্থশাস্ত্র যে শুধু অর্থের পূজা করে, কি ভাবে রাশি রাশি সম্পদ সঞ্চয় করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনা করে, তাহা নহে। অর্থশাস্ত্রের (Economics) এই অর্থ ধরিয়া লইয়া এককালে ইহাকে অতি ভয়ঙ্কর নিকৃষ্ট বিদ্যা বলিয়া মনে করা হইত। কারলাইল ও রাস্কিনের ন্যায় মনীষী ইহাকে ধন-দেবতার পূজক বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, অর্থশাস্ত্র (Economics) বলিতে অর্থ বা সম্পদ আহরণের তত্ত্ব মাত্র বুঝায় না। অর্থশাস্ত্রকে কেবলমাত্র সম্পদ আহরণের বিদ্যা বলিলে ভুল করা হয়। অর্থশাস্ত্রে অবশ্যই সম্পদের কথা আলোচনা করা হয়, কিন্তু সম্পদই জীবনের লক্ষ্য, এই হিসাবে আলোচনা করা হয় না। সম্পদের কথা এইজন্য আলোচনা করা হয় যে, ইহার দ্বারা আমাদের অভাব পরিতৃপ্ত করা যায়। কাজেই, অভাব-পরিতৃপ্তিরূপ লক্ষ্য সাধনের উপায়রূপে সম্পদের কথা অর্থশাস্ত্রে আলোচনা করা হয়। অর্থশাস্ত্রে সম্পদকে কেন্দ্র করিয়া মানুষের নিত্য প্রচেষ্টা সমূহের কথা আমরা আলোচনা করি। অর্থশাস্ত্রে সম্পদের স্থান আছে, কিন্তু তাহা মানুষ এবং মানুষের প্রচেষ্টা সমূহের অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নহে। পেন্সন (Penson) এই সম্পর্কে বলিয়াছেন, "প্রকৃতপক্ষে আমরা অর্থশাস্ত্রে সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা না করিয়া মানুষের কথাই আলোচনা করি। মানুষের অভাব, অভাব মিটাইবার জন্য মানুষের প্রচেষ্টা, মানুষের আয় ও মানুষের ব্যয়,—এই সবই হইল অর্থশাস্ত্রের মুখ্য আলোচ্য বস্তু, আর যে সম্পদ মানুষের অভাব মিটাইতে পারে, তাহার আলোচনা গৌণ বস্তু।" অধ্যাপক মার্শাল (Marshall) এই একই কথা বলিয়াছেন, "একদিক দিয়া দেখিলে অর্থশাস্ত্র সম্পদ সম্পর্কিত আলোচনার স্থান। কিন্তু অন্য আর এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়া দেখিলে, অর্থশাস্ত্র মানুষের সম্পর্কিত আলোচনারই বিষয়।" অন্যান্য অর্থনীতিবিদরাও ঐ একই রূপ কথা বলিাছেন। মানুষই হইল অর্থশাস্ত্রের প্রথম ও শেষ কথা। মানুষের জীবন ও কল্যাণের সকল দিক অর্থশাস্ত্র আলোচনা করে না, শুধু মানুষের জীবন ও মানুষের কল্যাণের সহিত সম্পদের কি সম্পর্ক অর্থশাস্ত্র তাহাই আলোচনা করে।

অর্থশাস্ত্র এক প্রকার সমাজ-বিজ্ঞান

(Economics is a Social Science)

অর্থশাস্ত্র সমাজবদ্ধ মানুষের কথাই আলোচনা করে। সমাজবিচ্ছিন্ন পৃথক পৃথক মানুষের কার্য্যকলাপ অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য নহে। সন্ন্যাসী-জীবনের কথা অর্থশাস্ত্র আলোচনা করে না। সন্ন্যাসীরও বিবিধ বিচিত্র অভাব আছে, এবং সেই সমস্ত অভাব মিটাইবার জন্য তাহাকেও নানাভাবে খাটিতে হইতে পারে। কিন্তু, সন্ন্যাসীর জীবন সামাজিক জীবন নহে, সমাজের কর্ম্ম-চঞ্চলতার সহিত সন্ন্যাসীর যোগ নাই। তাই সন্ন্যাসীর অভাব মিটাইবার প্রচেষ্টা আমাদের আলোচনার বহির্ভূত। তেমনি রবিন্‌সন ক্রুসোর মত কেহ যদি জনহীন দ্বীপে একাকী নিজের অভাব মিটাইবার জন্য কাজ করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহার কর্ম্ম-প্রচেষ্টাও আমাদের অর্থশাস্ত্রের আলোচনার সীমার মধ্যে পড়ে না। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ তাহার বিবিধ অভাব মিটাইবার জন্য যে সব কর্ম্ম-প্রচেষ্টা করিয়া থাকে, তাহাই অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বস্তু।

অর্থশাস্ত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা

(Utility of the Study of Economics)

অর্থশাস্ত্র মানব-কল্যাণ ও সম্পদ সম্পর্কিত অনেকগুলি মূল সত্য শিক্ষা দেয়। ইহা বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্কবিবর্জ্জিত আলোচনা মাত্র নহে। মানব জীবনের অসংখ্য জটিল ও বাস্তব ঘটনা লইয়া ইহার আলোচনা। ইহাতে বহু জটিল ঘটনার বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের কারণ ও পরিণাম স্থির করিতে হয়। কাজেই, অর্থশাস্ত্র পাঠে মানসিক বৃত্তিসমূহের উপযুক্ত চর্চ্চা ও পরিণতি হইয়া থাকে। ব্যবহারিক দিক দিয়াও অর্থশাস্ত্রের উপকারিতা অনেক। ব্যাঙ্কিং, আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য, শুল্ক ও করনীতি প্রভৃতি অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন বিভাগ পাঠ করিলে শিল্পপতি, আমদানি-রপ্তানিকারক, সকল প্রকার ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক নেতারা সমভাবে উপকার লাভ করিবেন। যে কোনও ব্যবসায়ী যদি উৎপাদনের সংগঠন, মূল্যের নিরূপণ, চাহিদা ও যোগানের নিয়ম প্রভৃতি পাঠ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় নিজ ব্যবসায় ভালভাবে বুঝিতে ও চালাইতে পারিবেন। শ্রমিক সমস্যা, মূলধনের মালিক ও শ্রমিকের পরস্পর নির্ভরশীলতা, বিভিন্ন প্রকার সমবায়ের উপযোগিতা, প্রভৃতি অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন অংশ পাঠ করিলে শ্রমিক ও মালিক এবং সমাজ-সেবক সকলেরই উপকার হইবে।

রাজনৈতিক কর্ম্মী ও নেতা যদি অর্থশাস্ত্রের মূল নীতিগুলির সহিত পরিচিত না হন, তাহা হইতে রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁহাদের কাজ সম্পূর্ণ বিফল হইবে। রাজনীতির সহিত অর্থশাস্ত্রের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। রাজনীতিবিদ্‌কে রাষ্ট্রীয় ক্রিয়া কলাপের সহিত কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে রাষ্ট্রের সৌধও দুর্ব্বল হইবে। সমাজসেবক কর্ম্মীর পক্ষেও অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান একান্ত আবশ্যক। শ্রমিকের কর্ম্মকুশলতা কোন্ কোন্ জিনিষের উপর নির্ভর করে, সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ কিরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পথে আসিতে পারে, এই সমস্ত না জানিলে সমাজসেবক কর্ম্মীর কাজ করাই চলিবে না। বর্ত্তমানে যে বিবিধ সামাজিক সমস্যা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, সেগুলির সুষ্ঠু সমাধানে অর্থশাস্ত্রের জ্ঞান অনেক কাজে লাগিবে। সম্পদ উৎপাদনের জন্য সমষ্টিগত প্রচেষ্টা অথবা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অধিকতর উপযোগী, উৎপন্ন সম্পদ কিরূপে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাজে লাগানো যাইতে পারে, অধিকতর ন্যায়সঙ্গতভাবে সম্পদ বণ্টনের কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, বিভিন্ন শ্রেণীর উপর সরকারী কর-ভারের প্রতিক্রিয়া কিরূপ হয়, এই সমস্ত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের উপর পৃথিবীর মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা হইতেছে অসংখ্য জনসাধারণের অপরিসীম দারিদ্র্য এবং তজ্জনিত দুঃখ-কষ্ট ও অধোগতি। বিজ্ঞানের উন্নতি এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নতির জন্য রাশি রাশি সম্পদ সম্ভার উৎপন্ন হইতেছে, এবং ক্রমশঃ বিপুলতর সম্পদ সৃষ্টি হইতেছে। তবু, মানুষের দুঃখ ঘুচিল না। সংখ্যাতীত মানুষ নিত্য অভাবের পীড়ন ভোগ করিয়া অতি কষ্টে দিন কাটাইতেছে। এই অভাবের জগতের মাঝখানে আবার নিষ্ঠুর বিলাসিতার স্রোত বহিয়া যাইতেছে। অর্থনৈতিক অপব্যবস্থার ফলে কত সম্পদ যে অপচয় হইতেছে, তাহার সীমা পরিসীমা নাই। এই সমস্ত সমস্যার সমাধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপযুক্ত উন্নতি বিধানের উপর নির্ভর করিতেছে। এই সব কারণে অর্থশাস্ত্রের পাঠ একান্ত আবশ্যক বলা যাইতে পারে।

অর্থশাস্ত্রকে কি বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে?

(Is Economics a Science ?)

অর্থশাস্ত্রকে (Economics) বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। অর্থশাস্ত্রে আমরা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা পরস্পর-সম্বদ্ধ ঘটনাবলী আলোচনা করিয়া থাকি।

অর্থশাস্ত্রের বিদ্যাও অন্য বিজ্ঞানের মত পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থশাস্ত্রেও কতকগুলি সাধারণ নীতি বা সূত্র রহিয়াছে, যেগুলি, মানুষ বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কিরূপ আচরণ করিবে তাহারই কথা বলে। অর্থশাস্ত্রের গবেষণা ও সাধারণ নিয়ম সমূহ বাহির করিবার কার্য্য অন্য বিজ্ঞান সমূহের অনুরূপ। অর্থশাস্ত্রেও কতকগুলি সাধারণ নিয়ম রহিয়াছে, যাহাকে বলা হয়, অর্থশাস্ত্রীয় আইন (Economic Laws)। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পরিণতি হইবে, অর্থশাস্ত্রীয় আইন (Economic Laws) বলিতে ইহা বুঝায়। এই দিক দিয়া দেখিলে অর্থশাস্ত্র পদার্থবিদ্যা বা রসায়নবিদ্যার মত বিজ্ঞানের অনুরূপ। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের নির্দ্দিষ্ট উত্তাপ, বায়ুচাপ প্রভৃতি থাকিলে তবে সেগুলি একত্র হইয়া জল উৎপন্ন করিবে। ঠিক তেমনি, অর্থশাস্ত্রের আইনগুলিও (Economic Laws) নির্দ্দিষ্ট অবস্থার মধ্যেই সত্য, অবস্থার ব্যতিক্রম হইলে সত্য নহে। যেমন, ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার আইন বা নিয়ম (The Law of Diminishing Utility), অথবা ক্রমহ্রাসমান আগমের আইন বা নিয়ম (The Law of Diminishing Returns) নির্দ্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে নিশ্চয় খাটিবে।

তবে, অর্থশাস্ত্র পদার্থবিদ্যা বারসায়ন বিদ্যার মত ইহা নিভু্র্ল নহে, এবং অর্থশাস্ত্রের আইনগুলিও (Economic Laws) বা সাধারণ নিয়ম পদার্থবিদ্যা বা রসায়ন শাস্ত্রের অনুরূপ বিজ্ঞানের আইন বা সাধারণ নিয়মের মত নিভু্র্ল নহে। এই সমস্ত বিজ্ঞানের ব্যাপারে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সুনির্দ্দিষ্ট ও নিভু্র্ল সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে জটিল ব্যাপার সমূহের আলোচনা করিতে হয়। এইগুলিকে সর্ব্বসময়োপযোগী নিভু্র্ল সাধারণ সূত্রে গ্রথিত করা সম্ভব হয় না। ম্যার্শ্যাল এই সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, অর্থশাস্ত্রের আইন বা সাধারণ নিয়মগুলিকে (Economic Laws) নিভু্র্ল মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের সহিত তুলনা না করিয়া বরং জোয়ার-ভাটার সাধারণ নিয়মের সঙ্গে তুলনা করিতে হইবে। জোয়ার-ভাটার নিয়ম অনেক জটিল অবস্থার উপর নির্ভর করে, তাই তাহা খুব নিখুঁত নহে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম কতকগুলি সহজবোধ্য অবস্থার উপর নির্ভরশীল, তাই তাহা খুব নিভু্র্ল ও নিখুঁত। পার্থক্যের আর একটা কারণ এই যে, পদার্থ বিদ্যা বা রসায়ন বিদ্যার মত বিজ্ঞানের ব্যাপারে পরীক্ষাগারে বসিয়া বৈজ্ঞানিক বিবিধ রকম পরীক্ষার ফল পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন। কিন্তু মানুষকে লইয়া

পরীক্ষা করা যায় না। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব ইচ্ছা, অভিপ্রায় ও আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে, বিভিন্ন সময়ে মানুষ বিভিন্ন আচরণ করে। মানুষ ইচ্ছা করিয়া নিজের আচরণ পরিবর্ত্তন করিতে পারে। এইজন্য অর্থশাস্ত্রের নিয়ম পদার্থবিদ্যা প্রভৃতির নিয়মের মত নির্ভুল নহে। তাই বলিয়া অর্থশাস্ত্রের নিয়ম যে ভুল প্রমাদপূর্ণ, তাহা নহে। কোনও ব্যক্তি বিশেষ কোন্ অবস্থায় কি করিবে, অর্থশাস্ত্রবিদ্ তাহা বলিতে পারিবেন না। তবে, সাধারণ মানুষের সমষ্টি নির্দ্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে গড়পড়তা হিসাবে কিরূপ আচরণ করিবে, তাহা বলিতে পারিবেন। সুতরাং অর্থশাস্ত্রকে বিজ্ঞান হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে।

অর্থশাস্ত্রের আইন বা সাধারণ নিয়ম
(Economic Laws)

অর্থশাস্ত্রবিদ্‌গণ অর্থশাস্ত্রের কতকগুলি সাধারণ নিয়ম বাহির করিয়াছেন। এগুলিকে বলা হয় **Economic Laws** বা অর্থশাস্ত্রের আইন বা সাধারণ নিয়ম। Economic Laws বলিতে বুঝায় যে নির্দ্দিষ্ট কারণসমূহ বর্ত্তমান থাকিলে নির্দ্দিষ্ট ফল হইবার সম্ভাবনা। যেমন, চাহিদার নিয়ম (The Law of Demand) বলিতে বুঝায় যে, জিনিষের মূল্য বাড়িলে জিনিষের চাহিদা কমিবে ; মূল্য কমিলে, চাহিদা বাড়িবে। অর্থশাস্ত্রে এইরূপ বহু সাধারণ নিয়ম আছে, যাহাকে Economic Laws বলা হইয়া থাকে।

অন্যান্য বিজ্ঞানেও এইরূপ সাধারণ নিয়ম আছে, যাহাকে সেই সেই বিজ্ঞানের laws বা আইন বা সাধারণ নিয়ম বলা হয়। Economic Lawগুলির মত অন্যান্য বিজ্ঞানের lawগুলি বলিতে এই বুঝায় যে, নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি কারণ বর্ত্তমান থাকিলে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি ফল বা কার্য্য হইবে। তবে, পদার্থ-বিদ্যা বা রসায়ণবিদ্যার মত বিজ্ঞানের law বা সাধারণ নিয়মের ন্যায় অর্থ-শাস্ত্রের laws বা সাধারণ নিয়মগুলি খাঁটি ও নির্ভুল নহে। অর্থশাস্ত্রের laws বা সাধারণ নিয়মগুলি সর্ব্ব অবস্থায় সর্ব্বদা খাটিবে এমন কথা ঠিক নহে, খাটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, একথা বলা যায়। তাই বলিয়া, অর্থশাস্ত্রের laws বা সাধারণ নিয়মগুলির কোনও মূল্য নাই, একথাও ঠিক নহে। অর্থনীতিবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এই সাধারণ নিয়মগুলি সাধারণতঃ বাস্তব ক্ষেত্রে সত্য বলিয়া প্রমানিত হয়। যেমন বলা যায় যে, বিলাসের সামগ্রীর মূল্য কমিলে, চাহিদা বাড়িবে, এবং মূল্য বাড়িলে, চাহিদা কমিবে। আবার সাধারণভাবে, জিনিষের মূল্য বাড়িলেও যোগান বাড়িবে, এবং মূল্য কমিলে, যোগান কমিবে।

অর্থশাস্ত্রের সহিত অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক
(The Relation between Economics and Sociology)

অর্থশাস্ত্র ও সমাজবিদ্যা
(Economics and Sociology)

সমাজবিদ্যায় মনুষ্য সমাজের উদ্ভব, সমাজের প্রকৃতি এবং সমাজের ক্রমপরিণতি শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাতে সমাজ-জীবনের আর্থিক, রাজনৈতিক, আইনগত প্রভৃতি সকল দিক আলোচনা করা হয়। অর্থশাস্ত্র সমাজবিদ্যার একটি অংশ মাত্র; ইহাতে সমাজ-জীবনের একটি মাত্র দিক আলোচনা করা হয়। সমাজ-জীবনে মানুষের সম্পদ উৎপাদন ও সম্পদ ভোগের দিকটাই অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বস্তু। অর্থশাস্ত্র সমাজবিদ্যার অংশ হইলেও, ইহাকে একটি পৃথক সমাজবিজ্ঞান রূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

অর্থশাস্ত্র ও রাষ্ট্রনীতি
(Economics and Politics)

অর্থশাস্ত্র ও রাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সরকারী নীতি ও কার্য্যকলাপের উপর দেশের সম্পদের উৎপাদন ও বণ্টন বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। দেশের অর্থনৈতিক জীবন সরকার কর্তৃক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সরকার যদি সুদৃঢ় ও ন্যায়পরায়ণ হয়, তাহা হইলে সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টন ন্যায়-সঙ্গত হইবে। আর, সরকার যদি শ্রেণীবিশেষের স্বার্থে পরিচালিত হয়, অথবা সরকার যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে দেশের আর্থিক অবস্থাও শোচনীয় হইবে। আবার, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো রাষ্ট্রীয় আকার ও রূপের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। বড় বড় শ্রমশিল্প যেদেশের অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি, সে দেশের রাষ্ট্রীয় রূপ, যে দেশের অর্থনৈতিক জীবন প্রধানতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীল, সে দেশের রাষ্ট্রীয় রূপ হইতে পৃথক হইবে। তাহা ছাড়া এমন অনেক সমস্যা আছে, যেগুলি অর্থশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রনীতি উভয়েরই সাধারণ সমস্যা; যেমন একচেটিয়া ব্যবসায়গুলির সরকারী নিয়ন্ত্রণ, রেলওয়ে সমূহের সরকারী পরিচালন, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, প্রভৃতি, সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টন এবং রাষ্ট্র পরিচালন—অর্থশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রনীতি, উভয় দিক হইতেই এই সমস্যাগুলির বিচার আবশ্যক।

অর্থশাস্ত্র ও ইতিহাস

(Economics and History)

ইতিহাস হইল মানব-সমাজের ক্রমপরিণতির কাহিনী। কোনও দেশের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা তাহার অতীত ইতিহাসের পরিণাম বলা যাইতে পারে। অর্থনৈতিক মতবাদ ও মূলনীতি বুঝিতে হইলে ইতিহাসের, বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিক ইতিহাসের মূল কথার সহিত পরিচিত হওয়া দরকার। অর্থশাস্ত্রের বহু মতবাদ ইতিহাসের উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়। অর্থশাস্ত্রের বহু নীতি ইতিহাসের পাতায় সমর্থিত হয়। আবার, নূতন নূতন অর্থশাস্ত্রীয় মতবাদও ইতিহাসের কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহাসিকও যদি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অনুধাবন না করেন, তাহা হইলে তাহার ইতিহাসের জ্ঞান সম্পূর্ণ হইবে না। স্যার জন সীলীর (Sir John Seeley) বিখ্যাত উক্তি একটু পরিবর্ত্তন করিয়া বলা যাইতে পারে, ইতিহাস-বিবর্জ্জিত অর্থশাস্ত্রের মূল নাই, আর অর্থশাস্ত্র-বিবর্জ্জিত ইতিহাসেরও কোনও ফল নাই।

অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র

(Economics and Ethics)

মানুষের কিরূপ আচরণ করা উচিত নীতিশাস্ত্রে তাহাই আলোচনা করা হয়। যে সব আচরণ করিলে, সাধারণের কল্যাণ-সাধন হইবে, নীতিশাস্ত্রে তাহাই অনুমোদন করা হয়। অর্থশাস্ত্রেরও লক্ষ্য যাহাতে সমাজবদ্ধ মানুষের কল্যাণ হয়। কাজেই নীতিশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র পরস্পর নিকট সম্বন্ধযুক্ত বলা যাইতে পারে। অর্থনীতিবিদকে দেখিতে হইবে সম্পদ উৎপাদন ও বণ্টন কতটা নীতিশাস্ত্র-অনুমোদিত রূপে হইতেছে। শ্রমিক-সমস্যার ব্যাপার এবং সরকারী করভার বসাইবার ব্যাপারে নীতিশাস্ত্র বিশেষ প্রয়োজনীয়। তবে, নীতিশাস্ত্রে শুধু ন্যায় আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, আদর্শ আচরণ কিরূপ হওয়া উচিত তাহাই আলোচনা করা হয়। নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্র অর্থশাস্ত্র অপেক্ষা প্রশস্ত। সর্ব্বদা কিরূপ পবিত্র চিন্তা করা উচিত, অথবা পিতামাতাকে কিভাবে শ্রদ্ধা করা উচিত, এই সব আচরণের কথা নীতিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ; কিন্তু, অর্থনীতিতে এই সব কথার স্থান নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক জীবনের ক্রমবিকাশ

(Evolution of Economic Life.)

বহুদিন আগে মানুষ বনে-জঙ্গলে-পাহাড়-পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়াইত, বন্য ফলমূল সংগ্রহ করিয়া এবং সুবিধা হইলে বন্য জীব-জন্তু শিকার করিয়া প্রাণ ধারণ করিত, তখন মানুষের স্থায়ী বাসভূমি বলিয়া কিছু ছিল না; আহার ও আশ্রয়ের অন্বেষণে মানুষকে স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। তখন মানুষের জীবন ছিল পশুসুলভ শোচনীয় ও স্বল্পস্থায়ী। অর্থনৈতিক জীবন বলিয়া কিছু তখন গড়িয়া উঠে নাই।

ইহার পর মানুষ ক্রমে মেষ, ছাগল, গরু প্রভৃতি জীবকে পোষ মানাইতে শিখিল এবং ক্রমে শিকারীর জীবন ত্যাগ করিয়া পশুচারকের (pastoral) জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িল। শিকারীর জীবনে ছিল আহার সংগ্রহের অনিশ্চয়তা, তাহার স্থলে পালিত মেষ প্রভৃতি থাকার জন্য এখন কিছুটা খাদ্যসংগ্রহের নিশ্চয়তা দেখা দিল। পালিত পশুপালের খাদ্য সন্ধানে মানুষকে এই অবস্থায় স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। এ সময় ভূমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা উদ্ভব হয় নাই, তবে, পালিত পশুপালের সম্পর্কে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হইয়াছে।

ক্রমে মানুষ বিভিন্ন খাদ্যশস্য ব্যবহার করিতে শিখিল। ধান্য ও গমের গাছ আবিষ্কার করিয়া মানুষ জমি চাষ করিতে আরম্ভ করিল। কৃষি কার্য্য আরম্ভ করায় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন অনেক বাড়িয়া গেল। মানুষ ক্রমে যাযাবর জীবন ত্যাগ করিয়া কৃষি কার্য্যের জন্য এক এক স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করিতে সুরু করিল। ফলে, গ্রাম ও জনপদ গড়িয়া উঠিতে লাগিল। মানুষ ক্রমে জমির উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানিতে শিখিল; যে প্রথম জমি পরিষ্কার করিয়া চাষ-আবাদ করিল, সেই সে জমির মালিক বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। এইভাবে জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দেখা দিল। ক্রমশঃ প্রাথমিক শ্রম-বিভাগ দেখা দিল। কালক্রমে শক্তিশালী ও স্বার্থবুদ্ধি লোকরা অপরের কাছে জমি কাড়িয়া লইয়া, অপরকে নিজেদের জমি চাষ করিতে বাধ্য করিয়া অথবা

অপরের কাছ হইতে জোর করিয়া কিছু শস্য আদায়ের নিয়ম করিয়া সামন্ত প্রথার (Feudal System) সূত্রপাত করিল। এই সময় ছোট ছোট হস্ত-শিল্প দেখা দিয়াছে। গ্রাম বা কতিপয় গ্রামের সমষ্টি ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ, নিজেদের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা গ্রামের মধ্যেই সহজ শ্রমবিভাগের দ্বারা উৎপন্ন হইত।

ক্রমে বণিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইল। বণিকগণ এক স্থানের উদ্বৃত জিনিষ ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল। তাহারা ক্রমে প্রভূত বিত্তশালী হইয়া উঠিল, এবং তাহারা আরো অনেক বেশী উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যে কারখানা খুলিয়া বহু লোকজন নিযুক্ত করিতে লাগিল। ইহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীতে ষ্টীম ইঞ্জিন এবং অন্যান্য অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে শিল্প জগতে যুগান্তর আসিল। শ্রমবিপ্লবের পরিণামে হস্ত-শিল্পের যুগ শেষ হইয়া আসিল, তাহার স্থলে পুঁজিপতিদের অধীনে উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিতর জটিল শ্রম-বিভাগ, প্রভূত মূলধন নিয়োগ, ব্যাপকভাবে যন্ত্র সাহায্যে এক সঙ্গে অধিক উৎপাদন, এক সঙ্গে বহু মজুরীভোগী শ্রমিক নিয়োগ প্রভৃতি বিশেষত্ব দেখা দিল। বর্ত্তমানে অধিকাংশ দেশে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে, তাহার নাম ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Capitalist System)। ইহার বিশেষত্ব এই যে, উৎপাদন ব্যবস্থা পুঁজিপতিদের নিয়ন্ত্রণের অধীন, এবং পুঁজিপতিরা মুনাফা অর্জ্জনের লোভেই উৎপাদন কার্য্যে অবতীর্ণ হন। আজ শ্রম বিভাগ যতদূর সম্ভব বিস্তৃত হইয়াছে। এখন উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের বাজার আর স্থানীয় না থাকিয়া সমস্ত পৃথিবীব্যাপী হইয়াছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং অবাধ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এই দুইটি জিনিষের উপর বর্ত্তমান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

মানুষের অর্থনৈতিক জীবন আদিম সরলতার যুগ হইতে কি ভাবে বর্ত্তমান যুগের জটিল অবস্থায় পরিণত হইয়াছে, তাহা নীচে বলা হইতেছে।

প্রথম অবস্থায়, মানুষের অভাব ছিল স্বল্প এবং সেই অভাবও মানুষ নিজ নিজ প্রচেষ্টায় প্রত্যক্ষভাবে পরিতৃপ্ত করিত। যে যাহার নিজের আহার নিজে সংগ্রহ করিতে, নিজের আশ্রয় নিজে তৈরী করিত অথবা খুঁজিয়া লইত।

ইহার পরবর্ত্তী কালে, মানুষ নিজের সকল প্রয়োজন আর নিজেই না মিটাইয়া, কতকগুলি কাজ প্রত্যেকে নিজে নিজে করিত। বাকী জিনিষগুলি নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে অপরের নিকট হইতে সংগ্রহ করিত। কেহ বা শিকার করিয়া পশু-মাংস সংগ্রহ করিত, কেহ বা শুধু শিকারের অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণ করিত,

কেহ বা আশ্রয় নির্ম্মাণ করিত। শিকারী শিকার-লব্ধ পশু-মাংসের বিনিময়ে শিকারের অস্ত্র সংগ্রহ করিত, এবং আশ্রয় নির্ম্মাণকারীর কাছে আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়া লইত। এইভাবে পরস্পরের প্রত্যক্ষ দ্রব্য বিনিময় চলিত।

ইহার পর আসিল সমষ্টিগত প্রচেষ্টার (Collective Effort) যুগ। আগে যে আশ্রয় তৈরী করিত, সে আশ্রয়স্থলের তৈরীর জন্য যাহা যাহা দরকার সবই নিজে সংগ্রহ বা প্রস্তুত করিত। কিন্তু, ক্রমে প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে আবার শ্রম-বিভাগ হইল। একজন নিজেই সমস্ত বাড়ী তৈরী না করিয়া কেহ হয়ত কাঠ যোগাড় করিবার কাজ, কেহ বা মাটি অথবা পাথর সংগ্রহ করিবার কাজ, কেহ বা চাল ছাইবার কাজ করিতে লাগিল। অর্থাৎ বাড়ীটি অনেকগুলি বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত লোকের সমষ্টিগত প্রচেষ্টার ফল হিসাবে প্রস্তুত হইল। শ্রমবিভাগ ক্রমশঃ জটিল হইল এবং উৎপন্ন সম্পদ বণ্টনের প্রশ্নও কঠিন হইল।

ক্রমশঃ অর্থের প্রচলন এই দ্রব্য-বিনিময় ও বণ্টনের প্রশ্নকে সহজ করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে মানুষের আয় ও সম্পদ টাকার অঙ্কে প্রকাশ করা হয়। দ্রব্য বিনিময় উঠিয়া গিয়া অর্থের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রত্যেকেই আজ সহ-উৎপাদক (Joint Producer); প্রত্যেকে তাহার সহ-উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ে যে অর্থ অর্জন করে, তাহা দিয়া সে তাহার প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র কিনিয়া নিজের অভাব মিটাইয়া থাকে। আজ তাই অভাবের পরিতৃপ্তি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরোক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ক্রম-বর্দ্ধমান শ্রম বিভাগ এবং উৎপাদন কার্য্যে ক্রমশঃ অধিক যন্ত্রপাতি নিয়োগ বর্ত্তমান যুগের বিশেষত্ব।

তৃতীয় অধ্যায়

অর্থনীতি শাস্ত্রে দুইটি শব্দের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রয়োজন, একটি দ্রব্য (Goods), অপরটি সম্পদ (Wealth)।

অর্থনীতিতে দ্রব্য (Goods) বলিতে শুধু কারবারের বস্তুকেই বুঝায় না। যাহা কিছু আমাদের অভাব পরিতৃপ্ত করে, তাহাই হইতেছে দ্রব্য বা goods, যথা, বাতাস, আলো, জল, চাল, গম, পান, তামাক, প্রভৃতি।

দ্রব্যের নানাভাবে শ্রেণী বিভাগ করা হইয়া থাকে। (১) বাস্তব দ্রব্য (material goods), যথা, জল, বাতাস, কলকব্জা, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি; এবং অবাস্তব দ্রব্য (non-material goods), যথা, ব্যবসায়ের good-will, অথবা, মানুষের ব্যক্তিগত গুণ, যেমন, কাহারো কর্ম্মদক্ষতা, শিল্প-কুশলতা, প্রভৃতি।

(২) হস্তান্তর যোগ্য (transferable goods), যাহা হস্তান্তর করা যায়, যথা, বিবিধ পণ্যবস্তু, কোম্পানির শেয়ার, ব্যবসায়ের goodwill প্রভৃতি; এবং হস্তান্তরযোগ্য নহে এরূপ (non-transferable goods), যথা সূর্য্যালোক, মানুষের ব্যক্তিগত গুণ, প্রভৃতি।

(৩) অর্থনীতিতে দ্রব্যের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী বিভাগ হইতেছে, যথেচ্ছ দ্রব্য বা free goods এবং পরিমিত দ্রব্য বা economic goods.

যথেচ্ছ দ্রব্য বা Free goods হইতেছে সেই সমস্ত জিনিষ যাহা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত রহিয়াছে, সেই সমস্ত জিনিষ যাহা সকল লোকের সকল প্রয়োজন মিটাইয়াও বেশী থাকে। বাতাস, সূর্য্যালোক, নদীর জল, মরুভূমির বালুকারাশি প্রভৃতি জিনিষকে আমরা free goods বা যথেচ্ছ দ্রব্য বলিতে পারি। এইসব জিনিষ আমরা যথেচ্ছা ব্যবহার করি, এইগুলি ব্যবহারের সময় আমাদিগকে মিতব্যয়ী হইবার প্রয়োজন হয় না। এই সব যথেচ্ছ দ্রব্য ছাড়া অন্য অনেক দ্রব্য রহিয়াছে, যেগুলি আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় বেশী নাই, যেগুলি আমাদের প্রয়োজন মিটাইয়া অতিরিক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। এই-গুলিকে আমরা পরিমিত দ্রব্য বা economic goods বলিয়া থাকি। খাদ্য, বস্ত্র, প্রভৃতি জিনিষ পরিমিত দ্রব্য—এইগুলি প্রয়োজনের তুলনায় এত বেশী

নাই যে, যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারি। এই সব জিনিষকে প্রয়োজনের তুলনায় বিরল বলিতে পারি। পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিষই এইরূপ প্রয়োজনের তুলনায় বিরল। এইগুলি ব্যবহারের সময় আমাদিগকে বাধ্য হইয়া মিতব্যয়ী হইতে হয়।

এইখানে মনে রাখা দরকার যে, যাহা এক স্থানে বা এক বিশেষ সময়ে যথেচ্ছ দ্রব্য রূপে পরিগণিত হয়, তাহাই আবার অন্য এক স্থানে বা অন্য এক সময়ে পরিমিত দ্রব্য রূপে পরিগণিত হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মরুভূমির মধ্যে বালু অথবা নদীবক্ষে বারি যথেচ্ছ দ্রব্য কিন্তু গ্রামে বা সহরের মধ্যে বালু ও মরুভূমিতে জল যথেচ্ছ দ্রব্য রূপে গণ্য হইতে পারে না। সেখানে মানুষকে পরিশ্রম করিয়া এই সব দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়, সেখানে এই সব দ্রব্য প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত নহে। কাজেই, এগুলি সেখানে পরিমিত দ্রব্য হইয়া পড়ে।

সম্পদ

(Wealth)

অর্থনীতিতে সম্পদ (Wealth) এই কথাটির গুরুত্ব সমধিক। কোনও জিনিষ প্রয়োজনের তুলনায় অল্প হইলে তাহাকে সম্পদ বলা যাইতে পারে। অর্থনীতিতে সম্পদ বলিতে সেই সব জিনিষই বুঝায় যাহা মানুষের কোনও অভাব পরিতৃপ্ত করে, যে সব জিনিষ মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় কম, যে সব জিনিষ হস্তান্তরযোগ্য এবং যাহা মানুষের বাহিরের বস্তু, মানুষের অন্তরের গুণ বা বৃত্তি নহে।

কোন জিনিযের যদি উপযোগিতা (utility) না থাকে, তবে, তাহাকে সম্পদ বলা চলে না। ধরা যাক, বহু অর্থব্যয় করিয়া একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র প্রস্তুত করা হইল, শেষে দেখা গেল, যন্ত্রটি যে উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে, এবং যন্ত্রটি কাহারো কোনও কাজে আসিতেছে না। এস্থলে এই অকেজো জিনিষটিকে সম্পদ বলা চলে না।

তাই বলিয়া শুধু উপযোগিতা থাকিলেই কোনও জিনিষকে যে সম্পদ বলা যাইবে, তাহাও নহে। বাতাস ও জলের উপযোগিতার সীমা নাই। বাতাস না হইলে আমরা এক দণ্ড বাঁচিতে পারি না, জল না হইলেও বাঁচা অসম্ভব। কিন্তু বাতাস ও জল এত প্রচুর পরিমাণে আছে যে, আমরা এগুলি না ভাবিয়া যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারি। এগুলি আমাদের

প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট রহিয়াছে। এগুলি সংগ্রহ করিতে আমাদিগকে পরিশ্রম করিতে অথবা অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। এগুলি সম্পদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং কোনও জিনিষের উপযোগিতা থাকিলেই তাহা সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে না, সেই জিনিষ প্রয়োজনের তুলনায় বিরল হওয়াও চাই। সূর্য্যালোক গ্যাস্ বা ইলেক্‌ট্রিক আলোর অপেক্ষা নিশ্চয় বেশী উপকারী; তথাপি সূর্য্যালোক প্রাচুর্য্যের কারণে সম্পদ নহে, গ্যাস ও ইলেক্‌ট্রিক আলো অপ্রাচুর্য্যের হেতু সম্পদ রূপে গণ্য হয়। একই জিনিষ এক স্থানে প্রাচুর্য্যের কারণে সম্পদ বলিয়া গণ্য না হইতে পারে, আবার অন্যত্র ভিন্ন অবস্থার মধ্যে বিরল হইবার জন্য সেই একই জিনিষ সম্পদ রূপে গণ্য হইতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, প্রকৃতির দান বাতাসের অভাবের কথা আমাদিগকে ভাবিতে হয় না, তথাপি ভূগর্ভে খনির মধ্যে যেখানে যন্ত্রের সাহায্যে বাতাস আনিয়া কাজ করিতে হয়, সেখানে বাতাস আর যথেচ্ছ দ্রব্য থাকে না, বাতাস সেখানে সম্পদে পরিণত হয়। অনুরূপ ভাবে, নদীতটে বা সাধারণতঃ গ্রামে জল সম্পদ নহে, কিন্তু সহরে, যেখানে কষ্ট করিয়া ও অর্থব্যয় করিয়া জল সংগ্রহ করিতে হয়, সেখানে জল অবশ্যই সম্পদ রূপে গণ্য হইবে।

উপযোগিতা ও বিরলতা ছাড়া, সম্পদের আর একটি গুণ হইতেছে এই যে, ইহা হস্তান্তরযোগ্য। ইহার অর্থ এই নহে যে জিনিষটি স্থানান্তরিত করার উপযুক্ত জিনিষ হইতে হইবে। ইহার অর্থ মাত্র এই যে, সম্পদ এমন জিনিষ হওয়া চাই যাহা ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। এই অর্থে জমি-জায়গা, কোম্পানির শেয়ার, প্রভৃতি সম্পদ রূপে গণ্য হয়। কিন্তু সমুদ্র ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু নহে; ইহা অর্থনীতিতে সম্পদ নহে।

সম্পদ মানুষের বাহিরের বস্তু হওয়া চাই, অন্তরের গুণ বা চরিত্রের গুণ বা ব্যক্তিগত কুশলতা ও দক্ষতা প্রভৃতি সম্পদ রূপে গণ্য নহে। কাহারো কবিতা রচনার ক্ষমতা আছে, কাহারো বৈজ্ঞানিক প্রতিভা আছে, কাহারো বা সঙ্গীত-কুশলতা আছে; বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন গুণাবলী রহিয়াছে। এইগুলি মানুষের ভিতরের জিনিষ, হস্তান্তরযোগ্য জিনিষ নহে। সুতরাং, সেগুলি সম্পদ রূপে গণ্য হইতে পারে না।

সম্পদ বলিতে যে শুধুমাত্র উল্লিখিত বিশেষত্বসম্পন্ন বস্তুকে বুঝায় তাহা নহে। যাহা বস্তু নহে, যাহা অবাস্তব,—যেমন, চাকরী অথবা, কোনও ব্যবসায়ের goodwill—এই সব জিনিষকেও বুঝায়। এই সব জিনিষও যখন উল্লিখিত বিশেষত্বসম্পন্ন হয়, তখন সম্পদ হইয়া থাকে।

প্রত্যেক ব্যক্তি যে ঘরবাড়ী, জমি-জায়গা, আসবাবপত্র, প্রভৃতি বাস্তব দ্রব্যের মালিক এবং goodwill প্রভৃতি যে সব অবাস্তব দ্রব্যের মালিক, সেগুলি হইল তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পদ (Individual Wealth)। যে সব গুণ বা বৃত্তি মানুষের একান্ত নিজস্ব, যাহা বাহিরের জিনিষ নহে এবং ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু নহে, তাহা সম্পদ রূপে গণ্য হইতে পারে না।

প্রত্যেক ব্যক্তি আবার কিছু কিছু পরিমাণে সাধারণের সম্পদ বা সমষ্টিগত সম্পদের (Collective Wealth) অংশীদার। যে সব সম্পদ কাহারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে, যে সব সম্পদের উপর সরকার জনসমষ্টির পক্ষ হইতে কর্তৃত্ব করেন, সেগুলিকে সমষ্টিগত সম্পদ (Collective Wealth) বলা যায়। সরকারী পথঘাট, সরকারী রেলপথ, সরকারী আলোক-ব্যবস্থা, পার্ক প্রভৃতি সমষ্টিগত সম্পদের দৃষ্টান্ত।

কোন দেশের লোকসমূহের ব্যক্তিগত সম্পদ ও সমষ্টিগত সম্পদ যোগ দিয়া জাতীয় সম্পদ (National Wealth) পরিমাপ করা হয়। অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে, এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা ব্যক্তিগত সম্পদ রূপে গণ্য হইলেও, জাতীয় সম্পদ রূপে গণ্য হইতে পারে না; যথা, সরকারী ঋণপত্রের অধিকারী ব্যক্তির কাছে ইহা সম্পদরূপে গণ্য হইলেও, জাতির সমষ্টিগত দিক হইতে ইহা কখনও সম্পদরূপে গণ্য হইতে পারে না। সরকারী ঋণপত্র দেশের দেনার নিদর্শন মাত্র, ইহা সম্পদের চিহ্ন নহে। জাতীয় সম্পদ নির্দ্ধারণ কালে, সরকারী ঋণ অবশ্যই বাদ দিতে হইবে। আবার জাতীয় সম্পদের পরিমাপ করিতে গিয়া আমাদিগকে অবশ্যই যথেচ্ছ দ্রব্যগুলি ধরিতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, গঙ্গা প্রভৃতি নদ নদী নানা ভাবে ভারতবর্ষের সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছে, এইগুলিকে জাতীয় সম্পদ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে এইবার আমরা কতকগুলি জিনিষ অর্থনীতির দৃষ্টিতে সম্পদ কি না তাহা বিচার করিয়া দেখিতে পারি।

কোনও স্থানের সুন্দর আবহাওয়া সম্পদ নহে। কারণ, ইহার উপযোগিতা আছে, ইহা প্রয়োজনের তুলনায় বিরল এবং ইহা মানুষের বাহিরের জিনিষ, কিন্তু ইহা হস্তান্তরযোগ্য বস্তু নহে। কিন্তু ইহাকে দেশের জাতীয় সম্পদ বলা যাইতে পারে। কোনও কবির প্রতিভা সম্পদ নহে; কারণ, ইহা মানুষের অন্তরের প্রকৃতিগত গুন, বাহিরের জিনিষ নহে, এবং হস্তান্তরযোগ্য বস্তু নহে। অনুরূপ ভাবে, কোনও বিষয়ে কাহারো দক্ষতা বা কুশলতা সম্পদ নহে।

খনির অভ্যন্তরস্থ স্বর্ণ বা অন্য ধাতু যদি আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যেও খনন করা সম্ভব না হয়, বা মানুষের অধিগম্য না হয়, তবে তাহা সম্পদ রূপে গণ্য হইবে না। সাধারণতঃ খনি-অভ্যন্তরস্থ ধাতুদ্রব্য জাতীয় সম্পদ ও খনির মালিকদিগের ব্যক্তিগত সম্পদ। যে স্বর্ণ হয়ত মঙ্গল বা অন্য কোন গ্রহে রহিয়াছে, তাহা মনুষ্যের আয়ত্তের বাহিরে বলিয়া সম্পদ নহে। তবে তাহা যদি মানুষের আয়ত্তের মধ্যে আনা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহা সম্পদ রূপে গণ্য হইবে।

মুদ্রা। ধাতু বা কাগজী মুদ্রা—মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদরূপে গণ্য হইতে পারে। কারণ, ইহার দ্বারা মানুষ তাহার প্রয়োজন মিটাইবার জিনিষ কিনিতে পারে। কিন্তু সমগ্র সমাজের দিক হইতে দেখিলে, মুদ্রা সম্পদ নহে, ইহা বিনিময়ের মাধ্যম মাত্র। দেশে মুদ্রার আধিক্য বা স্বল্পতা দেখিয়াই দেশের সম্পদের আধিক্য বা স্বল্পতা বুঝা যায় না। দেশে অনেক মুদ্রার আবির্ভাব হইলেও দেশ ধনী হয় না, দেশে কত সম্পদ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার উপরই দেশের স্বচ্ছলতা নির্ভর করে।

চতুর্থ অধ্যায়

উৎপাদন

(Production)

মানুষ নিজ চেষ্টায় বিভিন্ন প্রকার সম্পদ উৎপাদন করিয়া বিভিন্ন প্রকার অভাব পরিতৃপ্ত করে। অর্থনীতিতে উৎপাদন শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ রহিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে মানুষ কোনও বস্তু নিজে সৃষ্টি করিতে পারে না, যে বস্তুর অস্তিত্ব জগতে রহিয়াছে, মানুষ শুধু তাহার উপর কাজ করিয়া, তাহাকে অদল বদল করিয়া, নব নব উপযোগিতা সৃষ্টি করিতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, সূত্রধর যখন একটি চেয়ার প্রস্তুত করে, তখন সে কোনও জড়বস্তু (matter) উৎপন্ন করে না, সে কেবল কাঠের উপর কাজ করিয়া কাঠের রূপান্তর ঘটায় এবং কাঠকে আরও বেশী উপযোগী করিয়া তুলে। সেইরূপ কারিগর যখন একটি ছুরি তৈরী করে, সে কোনও নূতন বস্তু (matter) সৃষ্টি করে না। সে কেবল একখণ্ড লৌহ বা ইস্পাতকে নূতন আকার দিয়া অধিকতর প্রয়োজনীয় করিয়া তুলে। অর্থনীতিতে উৎপাদন শব্দটিকে উপযোগ (utility) সৃষ্টির অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। মার্শ্যাল (Marshall) এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, মানুষ জড়বস্তু সৃষ্টি করিতে পারে না, শুধু মাত্র জড় বস্তুর পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া তাহাকে আরও বেশী উপকারী করিয়া তুলিতে পারে। যেমন মানুষ কাঠ হইতে টেবিল তৈরী করে, অথবা মাটীতে এমনভাবে বীজ বপন করিতে পারে যাহাতে প্রাকৃতিক শক্তি তাহাকে অঙ্কুরিত করিয়া তুলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে কয়েকজন ফরাসী অর্থনীতিবিদ্ মনে করিতেন যে, একমাত্র কৃষিকার্য্যই আসল উৎপাদনকারী কার্য্য, অন্য সকল কার্য্য বন্ধ্যা, উৎপাদনকারী নহে। পরবর্ত্তী কালে এ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) লিখিয়াছিলেন যে, অর্থনীতিতে উৎপাদন বলিতে জড়বস্তুর সৃজন বুঝায়। অতএব যাহারা চেয়ার, টেবিল, শস্য, বস্ত্র, প্রভৃতি স্পর্শযোগ্য জড়বস্তু উৎপাদন করে, তাহারাই আসল উৎপাদনকারী (Productive) কার্য্যে লিপ্ত, আর যাহারা অন্যবিধ কার্য্য করে, যেমন যাহারা সঙ্গীত শিক্ষা দেয় অথবা ওকালতি, শিক্ষকতা, কেরাণীগিরি প্রভৃতি করে, যাহারা কোনও স্পর্শগ্রাহ্য জড়বস্তুর সৃজন করে না, তাহারা উৎপাদনকারী কার্য্য (Productive

work) করে না ; তাহাদের কার্য্য বন্ধ্যা, উৎপাদক নহে (unproductive)। এ্যাডাম স্মিথের (Adam Smith) এই সংজ্ঞা বহুদিন হইল পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ বস্তু-জগতে একটি পরমাণুও সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে। মানুষ শুধু যে সব বস্তুসম্ভার রহিয়াছে, তাহার আকার-প্রকার বদলাইয়া নিজের পক্ষে অধিকতর প্রয়োজনীয় করিয়া তুলিতে পারে। মানুষ শুধু মাত্র উপযোগিতা সৃষ্টি করিতে পারে, প্রকৃতিদত্ত বস্তুকে নিজের অভাব মিটাইবার জন্য উপযোগী করিয়া তুলিতে পারে। উৎপাদন বলিতে উপযোগিতা সৃষ্টি, অথবা অধিকতর উপযোগিতা সৃষ্টি বুঝায়। যে জিনিষ এখন মানুষের কোনও কাজে আসিতেছে না, তাহার উপর কাজ করিয়া মানুষ তাহাকে নিজের প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগী করিতে পারে, অথবা যে জিনিষ বর্ত্তমান অবস্থাতেই মানুষের অভাব মিটাইতে পারে, তাহার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া মানুষ তাহাকে অভাব মিটাইবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী করিতে পারে।

বিভিন্ন প্রকারের উপযোগিতা

(Different Kinds of Utility)

কোনও বস্তুর আকার পরিবর্ত্তন করিয়া যে উপযোগিতার সৃষ্টি হয়, তাহাকে আকারগত উপযোগিতা (form utility) বলা চলে। কাঠের আকার পরিবর্ত্তন করিয়া যখন টেবিল প্রস্তুত করি, তখন আকারগত উপযোগিতার সৃষ্টি হয়। কাঠের নিজস্ব একটা উপযোগিতা ছিল, টেবিল তৈরী হইবার পর, সেই উপযোগিতার বৃদ্ধি হইল। এই বর্দ্ধিত উপযোগিতা হইল আকারগত উপযোগিতা।

কোনও জিনিষ হয় ত একস্থানে খুব প্রচুর ; এই প্রাচুর্য্যের স্থানে, জিনিষটির উপযোগিতা আছে, কিন্তু, যে স্থানে ইহা তত প্রচুর নহে সেই স্থানের মত ইহার উপযোগিতা তত অধিক নহে। প্রাচুর্য্যের স্থান হইতে স্বল্পতার স্থানে জিনিষটিকে লইয়া গেলে, জিনিষটির যে উপযোগিতা বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম স্থানগত উপযোগিতা (place utility) ; যেমন রাণীগঞ্জে কয়লার উপযোগিতা যে নাই তাহা নহে, তবে, সেখানে কয়লার উপযোগিতা কলিকাতার মত অধিক নহে। রাণীগঞ্জ হইতে কয়লা কলিকাতায় আনিলে কয়লার উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। স্বল্প উপযোগিতার স্থান হইতে অধিক উপযোগিতার স্থানে কয়লা আনিয়া যে উপযোগিতা সৃষ্টি হয়, তাহার নাম স্থানগত উপযোগিতা (place utility)।

আবার, এক এক সময় এক একটি জিনিষের প্রাচুর্য্য থাকিতে পারে, কিন্তু অন্য সময় সেই জিনিষের স্বল্পতা ঘটে। প্রাচুর্য্যের কালে জিনিষের উপযোগিতা কম, স্বল্পতার কালে জিনিষের উপযোগিতা বেশী। প্রাচুর্য্যের কালে জিনিষকে সঞ্চিত করিয়া স্বল্পতার কাল পর্য্যন্ত রাখিলে যে উপযোগিতায় সৃষ্টি হয়, তাহার নাম কালগত উপযোগিতা (time utility) ; যেমন, পৌষ-মাঘ মাসে ধানের মূল্য খুবই কম, সে সময় প্রাচুর্য্যের হেতু ইহার উপযোগিতা কম ; এই সময়ের ধান্য সঞ্চয় করিয়া আষাঢ় শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত রাখিলে যে অধিক উপযোগিতা সৃষ্টি হয়, তাহাই হইল কালগত উপযোগিতা (time utility)।

উৎপাদক কাহারা ?
(What is meant by a Producer ?)

যাহারা কৃষিকার্য্য করে, যাহারা পশুপালন করে, যাহারা খনিজ দ্রব্য আহরণ করে, যাহারা কল-কারখানায় কার্য্য করে, যাহারা যানবাহন পরিচালন করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে মানুষ ও মালপত্র বহন করে, যাহারা ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য সরবরাহ করে, যাহারা বিবিধরকম প্রত্যক্ষ সেবার কাজ করে,—যেমন সঙ্গীত শুনায় বা অভিনয় করে, ওকালতি, শিক্ষকতা, কেরানীগিরি, প্রভৃতি কার্য্য করে,—সকলেই উৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত বলা যায়। যে ধীবর নদীতে জাল ফেলিয়া মাছ ধরে, যে ব্যবসায়ী সেই মাছ লইয়া ভিন্ন স্থানে বিক্রয় করে, উভয়েই সমভাবে উৎপাদক শ্রেণীভুক্ত। যে কৃষক শস্য উৎপন্ন করে, যে সকল ব্যক্তি সেই শস্য রেল ষ্টীমার চালাইয়া বহন করে, এবং যে ব্যবসায়ী সেই শস্য লইয়া কারবার করে, সকলেই উৎপাদন করিতেছে।

উৎপাদনের উপাদান
(Factors of Production)

উৎপাদন কাহার উপর নির্ভর করে ? উৎপাদন করিতে কোন্ কোন্ জিনিষ আবশ্যক ?

কোনও কিছু উৎপাদন করিতে অন্ততঃ তিনটি জিনিষ দরকার। প্রথমতঃ প্রাকৃতিক দান, যথা, মাটি, খনিজ দ্রব্য, যেমন, কয়লা, লৌহ, তাম্র, প্রভৃতি এবং পাহাড় পর্ব্বত, অরণ্য, নদ-নদী সমুদ্র, বাতাস, আলো, উত্তাপ, প্রভৃতি। ইংরাজীতে Land এই একটি শব্দ দ্বারা অর্থনীতিবিদরা সকল প্রকৃতির দানকে বুঝাইয়া থাকেন। এই সব প্রাকৃতিকদান ব্যতীত কোনও উৎপাদন সম্ভব

নহে। দ্বিতীয়তঃ, মনুষ্য শ্রম (labour) ;—মানুষের কায়িক ও মানসিক শ্রম ব্যতীত উৎপাদন সম্ভব নহে। প্রাকৃতিক দানের প্রাচুর্য্যের উপর যেমন উৎপাদন নির্ভর করে, শ্রম কুশলতার উপরও তাহা সেইরূপ নির্ভর করে। তৃতীয়তঃ, মূলধন (capital),—ইহা উৎপাদনের জন্য একান্ত আবশ্যক। মূলধন বলিলে, যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা, উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল, প্রভৃতি উৎপাদন সম্বন্ধীয় কৃত্রিম সাহায্য বুঝায়।

একজন কৃষকের কার্য্যের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক। কৃষক চাষ করিয়া শস্য উৎপাদন করে। এই উৎপাদন কার্য্যে তাহার প্রথম আবশ্যক, ভূমিরূপ প্রাকৃতিক দান (land) ; সেই সঙ্গে চাই তাহার শ্রম (labour) এবং লাঙ্গল, বীজধান, সার প্রভৃতি মূলধন (capital)।

কালক্রমে শ্রম-বিভাগ জটিলতর হইয়াছে এবং সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। কতকগুলি লোক প্রাকৃতিক দান সমূহের মালিক, অন্য কতকগুলি লোক মূলধনের মালিক এবং বহুলোক শুধুমাত্র শ্রমজীবী। উৎপাদন করিবার উদ্দেশ্যে এই সব বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে এবং এই কাজের উপযুক্ত একদল লোকের উদ্ভব হইয়াছে, যাহাদিগকে বলা যায়, সংগঠনকারী (organiser), যাহাদের কাজ হইল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়া উৎপাদন সংগঠন (organisation) করা। ইহাদিগকে ক্ষতির সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া সাহসের সহিত উৎপাদন কার্য্যে অবতীর্ণ হইতে হয়। বর্ত্তমান কালের অর্থনীতিবিদরা সংগঠনকেও (organisation) উৎপাদনের জন্য অত্যাবশ্যক জিনিষ বলিয়া মনে করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ভূমি বা প্রাকৃতিক দান

(Land)

উৎপাদন করিবার জন্য ভূমি বা প্রাকৃতিক দান আবশ্যক। ইংরাজী ভাষায় land বলিলে অর্থনীতিবিদগণ প্রাকৃতিক দান বুঝেন। এই কথাটির দ্বারা শুধু ভূমি নয়, অন্য যাহা কিছু প্রকৃতি দত্ত জিনিষ মনুষ্য শক্তি দ্বারা সৃষ্টি হইতে পারে না, অথচ উৎপাদন করিবার জন্য প্রয়োজনীয়, এমন জিনিষকেও বুঝায়। অতএব এই শব্দ দ্বারা ভূমি, খনি ও খনিজদ্রব্য, অরণ্য, নদ-নদী, সমুদ্র, পাহাড়-পর্ব্বত, আলো, বাতাস, বৃষ্টি, প্রভৃতি সকল প্রাকৃতিক দান বুঝায়।

এই সমস্ত প্রকৃতির দান ব্যতীত কোনও প্রকার উৎপাদন কার্য্য হইতে পারে না। ইহাদিগকে উৎপাদন কার্য্যের মূল উপাদান বলা যাইতে পারে। প্রকৃতির দানগুলি সম্পর্কে দুইটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক দান সমূহ প্রকৃতি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট, মানুষ নিজ পরিশ্রমে বা চেষ্টায় ইহাদের পরিমাণ বাড়াইতে পারে না। দেশে মোট যে পরিমাণ ভূমি বা খনি রহিয়াছে, আমরা চেষ্টা করিয়া তাহার পরিমাণ বাড়াইতে পারি না। আমরা নূতন নূতন অনাবাদী জমি চাষ করিতে পারি, অথবা নূতন নূতন খনি আবিষ্কার করিতে পারি, কিন্তু ইহাদের পরিমাণ ত প্রকৃতি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ; মনুষ্য-প্রচেষ্টা ইহাদের মোট পরিমাণ বাড়াইতে পারে না। প্রকৃতির দান এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে ইহা একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু প্রাকৃতিক দানের পরিমাণ একই থাকে। কোনও দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের সংখ্যাও অথবা মোট শ্রমের পরিমাণ (labour) বৃদ্ধি হয়। মূলধনও চেষ্টা দ্বারা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক দানের পরিমাণ প্রকৃতি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট, ইহার হ্রাসবৃদ্ধি মনুষ্য প্রচেষ্টার অতীত।

প্রাকৃতিক দান (land) সম্পর্কে অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে ইহা একটি বিশেষ নিয়মের অধীন। যাহাকে বলা হয় ক্রমহ্রাসমান আগমের নিয়ম (The law of Diminishing Returns)। উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানও এই নিয়মের অধীন, তবে, প্রাকৃতিক দান (land) যাহা মনুষ্য প্রচেষ্টায় বৃদ্ধি করাইতে পারা যায় না, তাহা বিশেষভাবে এই নিয়মের অধীন।

ক্রমহ্রাসমান আগমের নিয়ম
(The Law of Diminishing Returns)

কোনও জমিতে যত অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হউক, সেই অনুপাতে তত অধিক পরিমাণে ফসল সেই জমি হইতে পাওয়া যায় না—Law of Diminishing Returns বলিতে এই নিয়ম বুঝায়। এই নিয়ম যে কোনও কৃষকের সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয়। কৃষকের যখন অধিক শস্য প্রয়োজন হয়, তখন সে তাহার জমিতে অধিক লোক লাগাইয়া ও সার দিয়া ভালভাবে চাষ করিবার বন্দোবস্ত করে। ইহাতে সে আগের চেয়ে বেশী ফসল লাভ করে সত্য, তবে,একথা কৃষক জানে যে সে যতই অধিক পরিমাণে লোক ও সার প্রভৃতি নিয়োগ করুক না কেন, একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার পর, সেই জমি হইতে প্রাপ্ত ফসলের পরিমাণ, বর্দ্ধিত শ্রম ও মূলধনের আনুপাতিক হারে বাড়িবে না। জমিতে ফসলের বৃদ্ধির হার শ্রম ও মূলধনের অনুপাতে হইবে না। কৃষক যদি তাহার জমিতে ক্রমশঃ অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার ফসল বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ তাহার বর্দ্ধিত ফসলের পরিমাণ বর্দ্ধিত শ্রম ও মূলধনের আনুপাতিক হইবে না। অর্থাৎ বেশী শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া যে পরিমাণ বেশী ফসল লাভ করা যাইবে, তাহা উৎপন্ন করিতে আগেকার চেয়ে বেশী খরচ হইবে। বেশী শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করার পরে, একই জমি বেশী ফসল দিতে পারে, কিন্তু, এই বেশী ফসল পাওয়া যাইবে ক্রমহ্রাসমান হারে। যতই অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা যায়, ততই ফসলের পরিমাণ বাড়িলেও এই বৃদ্ধির পরিমাণ আগেকার শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ দ্বারা প্রাপ্ত ফসলের পরিমাণ অপেক্ষা কম। প্রত্যেক কৃষকই একথা জানে, তাই এক নির্দ্দিষ্ট সীমার পর, কোনও কৃষকই তাহার জমিতে চাষে অধিক ব্যয় না করিয়া বরং অন্য নূতন জমি চাষের ব্যবস্থা করিতে চেষ্টা করে।

মনে করা যাক, এক কৃষক, একজন শ্রমিক, একটি মাত্র লাঙ্গল ও এক জোড়া বলদ এবং একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সার লইয়া এক বিঘা জমি চাষ করিয়া ১০ মণ ধান্য পাইল। পর বৎসর সে দুইজন শ্রমিক, দুইটী লাঙ্গল, দুই জোড়া বলদ এবং দ্বিগুণ সার লইয়া সেই এক বিঘা জমি চাষ করিল, এবং মোট ১৬ মণ ধান্য লাভ করিল। দ্বিগুণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া কৃষক জমি হইতে দ্বিগুণ ফসল পাইল না; বর্দ্ধিত ফসলের পরিমাণ বর্দ্ধিত শ্রম ও মূলধনের অনুপাতে কম হইয়াছে। অতিরিক্ত ফসলের পরিমাণ মাত্র ৬ মণ হইয়াছে।

অতিরিক্ত ফসল অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধনের আনুপাতিক হয় নাই। মনে করা যাক সে পর বৎসর তিনজন শ্রমিক, তিনটি লাঙ্গল, তিন জোড়া বলদ এবং তিনগুণ সার নিয়োগ করিয়া ঐ জমি চাষ করিল ; এ বৎসর তাহার ফসলের পরিমাণ বাড়িয়া ২০ মণ হইল। তিনগুণ শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করিয়া কৃষক তাহার জমি হইতে তিনগুণ ফসল পাইল না। বর্দ্ধিত ফসলের পরিমাণ বর্দ্ধিত শ্রম ও মূলধনের অনুপাতে কম হইয়াছে। অতিরিক্ত ফসলের পরিমাণ মাত্র ৪ মণ হইয়াছে, অতিরিক্ত ফসল অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধনের আনুপাতিক হয় নাই। অতিরিক্ত ফসলের পরিমাণ আগের বারে অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া প্রাপ্ত ফসল অপেক্ষা কম হইয়াছে। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাই যে ক্রমশঃ অতিরিক্ত পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিলেও, একই জমি কখনও অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধনের অনুপাতে অতিরিক্ত ফসল দান করে না ; জমির ফসলের পরিমাণ বাড়িলেও, ফসলের বৃদ্ধির হার শ্রম ও মূলধনের বৃদ্ধির অনুপাতে কম পরিমাণে হইয়া থাকে।

নিয়মের ব্যতিক্রম

(Exceptions)

ক্রমহ্রাসমান আগমের নিয়ম—(The Law of Diminishing Returns) পরিণামে সকল জমিতেই খাটে। তবে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাময়িক ভাবে এই নিয়মের ব্যতিক্রম বা ব্যত্যয় দেখা যাইতে পারে।

যদি কোনও জমি যথেষ্ট পরিমাণ শ্রম ও মূলধনের অভাবে উপযুক্তভাবে চাষ আবাদ না হইয়া থাকে, তবে সেক্ষেত্রে বেশী শ্রম ও মূলধন নিয়োগের ফলে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ আনুপাতিকভাবে, এমন কি ক্রম-বর্দ্ধমান হারেও প্রথম প্রথম বাড়িতে পারে। মনে করা যাক, একটি কৃষক, তাহার দশ বিঘা জমিতে মাত্র একটি লাঙ্গল ও এক জোড়া বলদ লইয়া সামান্যমাত্র সার প্রয়োগ করিয়া চাষ করে এবং বৎসরে মাত্র ৩০ মণ ধান্য পায়। তাহার জমি যদি উৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যথেষ্ট শ্রম ও মূলধনের অভাবেই সে উপযুক্ত পরিমাণ ফসল পাইতেছে না। এক্ষেত্রে যদি কৃষক তিনগুণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া ঐ জমি চাষ করে, তাহা হইলে সে হয়ত ১০০ মণের বেশী ফসল পাইবে, অর্থাৎ শ্রম ও মূলধনের অনুপাতের চেয়ে বেশী ফসল পাইবে। এইভাবে কৃষক যদি তাহার জমিতে ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিতে থাকে, তাহা হইলে প্রথম প্রথম তাহার বর্দ্ধিত ফসলের পরিমাণ শ্রম ও মূলধনের

তুলনার অনুপাতে অধিক হইলেও, এই বৃদ্ধির একটা সীমা আছে, যাহার পরে, অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন নিয়োগের ফলে আর ফসল আনুপাতিক বা ক্রম-বর্দ্ধমান হারে বৃদ্ধি না পাইয়া ক্রম হ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পাইবে। অর্থাৎ উপযুক্ত চাষ-আবাদ না হইলে যদিও প্রথম প্রথম ক্রমহ্রাসমান আগমের নিয়ম (The Law of Diminishing Returns) কার্য্যকরী না হয়, শেষ পর্য্যন্ত ইহা কার্য্যকরী হইবেই।

কৃষি ব্যবস্থা বা কৃষি বিজ্ঞানের উন্নতির ফলেও এই নিয়মের প্রয়োগ কিছুকাল স্থগিত থাকিতে পারে। উন্নত বৈজ্ঞানিক কৃষি-ব্যবস্থা হইলে অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগের ফলে আনুপাতিক বা অনুপাত অপেক্ষা অধিক ফসল লাভ হইতে পারে। কিন্তু হ্রাসমান আগমের নিয়ম (Law of Dimnishing Returns) পরিণামে কার্য্যকরী হইবেই।

ক্রমহ্রাসমান আগমের নিয়ম এবং ভূমি ব্যতীত অন্যান্য প্রাকৃতিক দান ও শ্রমশিল্প

(The Law of Diminishing Returns and its Application to Gifts of Nature other than Land and to Manufacturing Indusries.)

ক্রমহ্রাসমান আগমের নিয়ম শুধু যে জমির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তাহা নহে, খনি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দানের বেলাতেও প্রযোজ্য। মনে করা যাক, একটি কয়লার খনি হইতে অধিকতর কয়লা উত্তোলন করিবার জন্য অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হইল; তাহা হইলে সাধারণতঃ যদি খনি-বিজ্ঞানের নূতন কোনও উন্নতি না হইয়া থাকে অধিক শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগের ফলে যে অধিক কয়লা পাওয়া যাইবে তাহার পরিমাণ শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির আনুপাতিক হইবে না, অতিরিক্ত কয়লার ব্যয় আগেকার কয়লায় ব্যয় অপেক্ষা বেশী পড়িবে।

বড় বড় কারখানা শিল্পের বেলাতেও এই নিয়মের প্রয়োগ দেখা যাইতে পারে। এই নিয়মের মূলকথা এই যে যদি, একই নির্দ্দিষ্ট জমিতে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে বর্দ্ধিত শ্রম ও মূলধনের অনুপাতে ফসল পাওয়া যাইবে না। এক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে জমিকে না বাড়াইয়া নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া অন্য উপাদানগুলি বাড়ানো হইতেছে। কঠি এই ভাবে যে কোনও উৎপাদনের বেলায় যদি একটি উপাদানকে না

বাড়াইয়া নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া অন্য উপাদান গুলিকে বাড়ানো যায় তবে, বর্দ্ধিত উৎপাদনের হার উপাদানগুলির বর্দ্ধিত পরিমাণের আনুপাতিক হইবে না। একটি কারখানায় উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলিকে ঠিক রাখিয়া যদি শুধু শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ানো যায়, তাহা হইলে বর্দ্ধিত শ্রমিকের সংখ্যার তুলনায় উৎপন্ন দ্রব্যের বৃদ্ধি হইবে না। কারখানায় যদি উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াইতে হয়, তাহা হইলে উৎপাদনের সকল উপাদানগুলিকে সমান হারে বাড়াইতে হইবে; কোনও একটিকে ঠিক রাখিয়া অন্যগুলিকে বাড়াইলেও, উৎপন্ন দ্রব্যের বৃদ্ধির ক্রমহ্রাসমান হারে হইবে। অতএব, কলকারখানা প্রভৃতি শ্রম-শিল্পের বেলাতেও ক্রমহ্রাসমান আগমের নিয়ম (The Law of Diminishing Returns) খাটিবে। তবে, কারখানা শিল্পের বেলায় উৎপাদনের সকল উপাদান সাধারণতঃ সমান হারে বাড়ানো সম্ভব হয় এবং সেইজন্য কলকারখানার ক্ষেত্রে এই নিয়মের প্রয়োগ দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু ভূমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দান (land) প্রকৃতি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় মানুষ নিজ চেষ্টায় সেগুলিকে বাড়াইতে পারে না। সুতরাং সে ক্ষেত্রেই ক্রম-হ্রাসমান আগমের নিয়মের (The Law of Diminishing Returns) প্রয়োগ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শ্রম

(Labour)

অর্থনীতিতে শ্রম (labour) বলিতে মানুষের পরিশ্রমকেই বুঝায়, জীব-জন্তুর দ্বারা যে কাজ করানো হয় তাহাকে শ্রম বলে না। শ্রম বলিতে মানুষের শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার শ্রমই বুঝায়।

সম্পদ উৎপাদন করিতে হইলে শ্রম অত্যাবশ্যক। শ্রম ব্যতীত সম্পদ উৎপাদন সম্ভব নহে। তবে শ্রম দুই প্রকারের হইতে পারে, উৎপাদক শ্রম (productive labour) এবং অনুৎপাদক শ্রম (unproductive labour)। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে Physiocrat রা বলিতেন, যাহারা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহারাই সম্পদ উৎপন্ন করে, কৃষিশ্রমই হইল উৎপাদনকারী শ্রম (productive labour), কৃষকরাই হইল আসল উৎপাদক শ্রমিক। অন্যান্য সকলের শ্রম উৎপাদক নহে (unproductive labour) তাহারা হইল অনুৎপাদক (unproductive)। পরবর্ত্তী যুগে এ্যাডাম স্মিথ এই মত প্রচার করিলেন যে যাহারা কৃষিজাত দ্রব্য অথবা শিল্প জাত দ্রব্য অথবা অন্য যে কোনও জড় বস্তু সৃষ্টি করে, তাহারাই উৎপাদক শ্রম (productive ladour) করে, তাহারা উৎপাদক (productive)। অপর সকলের শ্রম উৎপাদনকারী নহে (unproductive labour), তাহারা অনুৎপাদক (unproductive)। এ্যাডাম স্মিথের মত অনুযায়ী, ডাক্তার, শিক্ষক, উকিল বা কেরাণীর শ্রম, উৎপাদক নহে (unproductive labour)। ইহাদের শ্রম দ্বারা কোনও কিছু উৎপন্ন হয় না। এ্যাডাম স্মিথ বলিয়াছেন যে, বহু গুরুত্বপূর্ণ বৃত্তিধারী ব্যক্তিদের শ্রমও কিছুই উৎপাদন করে না (unproductive labour); ইহারা সকলেই অনুৎপাদক (unproductive) শ্রেণীভুক্ত।

বর্ত্তমানে উৎপাদনের এই ধারণা বদলাইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে অর্থনীতিবিদ্‌গণ উৎপাদন বলিতে শুধুমাত্র জড়বস্তুর উৎপাদন বুঝেন না। বাস্তবিক পক্ষে. কোনও জড়বস্তু উৎপাদন করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই, প্রকৃতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট যে বস্তুসম্ভার রহিয়াছে তাহার এক পরমাণুও মানুষ বাড়াইতে পারে না।

মানুষ শুধু বর্ত্তমান জড় বস্তুকে নূতন আকার দিয়া অথবা স্থানান্তরে লইয়া গিয়া অথবা স্থানান্তরের জন্য সঞ্চয় করিয়া নব নব উপযোগিতা (utilities) সৃষ্টি করিতে পারে। (যে শ্রমের দ্বারা উপযোগিতা সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ কোনও বস্তু উপযোগী হয়, অথবা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী হয়, সেই শ্রমই হইল উৎপাদক।) যে কৃষক জমিতে ফসল ফলাইতেছে, যে সূত্রধর কাঠ হইতে টেবিল তৈরী করিতেছে, তাহারা ও যেমন উৎপাদক শ্রম (productive labour) করিতেছে, যাহারা রেলগাড়ী ষ্টীমার প্রভৃতি চালাইতেছে, যাহারা ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছে, যাহারা ডাক্তারি, ওকালতি, শিক্ষকতা করিতেছে, তাহারাও সেইরূপ উৎপাদক শ্রম (productive labour) করিতেছে। ইহারা সকলেই উৎপাদক (productive) একথা বলা যায়। শুধু দেখিতে হইবে মানুষ শ্রম দ্বারা যাহা করিতেছে, তাহার কোনও উপযোগিতা (utilities) আছে কি না। যদি কাহারও শ্রম দ্বারা কিছু মাত্র উপযোগিতা সৃষ্টি না হইয়া থাকে, তবে, সেই শ্রম উৎপাদক নহে (unproductive labour) এবং সেইব্যক্তি উৎপাদক (productive) নহে। মনে করা যাক, বহু অর্থব্যয় করিয়া একটি বাড়ী করা হইল, কিন্তু তৈরী করিবার দোষে বাড়ীটি হইতে না হইতে ধ্বসিয়া পড়িয়া গেল, কাহারো কোন কাজে আসিল না, অথবা, একজন বহু পরিশ্রমে একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিল যাহা কোন কাজেই লাগিল না, অথবা এমন একটি ক্যানেল খোঁড়া হইল, যাহা ইঞ্জিনিয়ারের দোষে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া গেল; যাহার কিছুমাত্র উপযোগিতা রহিল না,—এই সব ক্ষেত্রে মানুষের শ্রম উৎপাদনকারী নহে, (unproductive labour); যাহারা এই সব কাজ করিয়াছে তাহারা অনুৎপাদক শ্রম (unproductive labour) করিয়াছে বলা যায়।

শ্রম না হইলে সৃষ্টি সম্ভব নহে। মোট শ্রমের পরিমাণ নির্ভর করে দুইটি জিনিষের উপর ; একটি হইতেছে মোট জনসংখ্যা, অপরটি হইতেছে শ্রমিকের কাজ করিবার যোগ্যতা। দেশের মোট জন সংখ্যার সকলেই অবশ্য শ্রম করে না। শিশু, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, অক্ষম ও রুগ্ন ব্যক্তিগণ ছাড়াও বহু পরীশ্রমজীবী ব্যক্তি দেশে রহিয়াছে। যাহাই হউক, দেশের মোট জন-সংখ্যার উপর, মোটামুটি ভাবে দেশের উৎপাদন কার্য্যে মোট কত শ্রম নিযুক্ত করা যাইতে পারে তাহা নির্ভর করে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কিত ম্যালথাসের মতবাদ

(The Malthusian Theory of Population)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে টম্যাস ম্যালথাস (Thomas Malthus) নামক একজন ধর্ম্মযাজক ও অর্থনীতিবিদ এই মতবাদ প্রচার করেন যে দেশের জনসংখ্যা দেশের খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ অপেক্ষা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। তাঁহার মতে জনসংখ্যা যদি অবাধে বাড়িতে দেওয়া যায়, তাহা জ্যামিতিক হারে (in geometrical progression) বাড়িয়া চলে। ম্যালথাস বলেন যে জনসংখ্যা ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২…এইরকম হারে দ্রুতবেগে বাড়িয়া চলে। কিন্তু দেশের খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ অত্যন্ত ধীরগতিতে গাণিতিক হারে (in arithmetical progression) বৃদ্ধি পাইতে থাকে। খাদ্যদ্রব্য ১, ২, ৩, ৪, ৫…এইরকম হারে অত্যন্ত মন্থর গতিতে বাড়িয়া থাকে। ফলে দেশের লোকসংখ্যা, খাদ্যদ্রব্য যে পরিমাণ বাড়ানো যাইতে পারে তাহা অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। লোকবৃদ্ধির এই দ্রুতগতি রোধ করিতে হইলে মানুষকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। অধিক বয়স পর্যন্ত বিবাহ না করা, সংযম, প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া লোকসংখ্যা বেশী বাড়িতে দেওয়া চলিবে না। লোকবৃদ্ধি নিরোধমূলক এই সব ব্যবস্থাকে ম্যালথাস preventive cheks বলিয়াছেন। এই সব উপায় অবলম্বন করিলে লোক সংখ্যা স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইয়া কম থাকিবে, লোকসংখ্যার অনুপাতে খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ কম পড়িবে না, এবং মানুষ দুঃখ দারিদ্র্যের হাত এড়াইতে পারিবে। যদি লোকবৃদ্ধি প্রতিরোধের এই সব উপায় অলবম্বন করা না হয়, তবে লোকসংখ্যা স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ খাদ্য দ্রব্যের অভাব ঘটিবে। খাদ্যদ্রব্য যতটুকু বাড়ানো যাইতে পারিবে, লোকসংখ্যা তাহার তুলনায় অনেক বেশী বাড়িয়া যাইবে। ফলে অন্নাভাব দেখা দিবে সুতরাং, অনাহার ও অপুষ্টি, দুর্ভিক্ষ, রোগ, মড়ক প্রভৃতিতে বহু মানুষের মৃত্যু ঘটিবে। তাহা ছাড়া, লোকবৃদ্ধি হেতু যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়াও অনেক লোকক্ষয় ঘটিবে। লোক বৃদ্ধি নিবারণের এই সব শেষোক্ত পথকে ম্যালথাস বলিয়াছেন, positive checks বা প্রতিরোধ—এইগুলি দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত জনসংখ্যা হ্রাস হইয়া থাকে।

ম্যালথাস ১৭৯৮ সালে প্রকাশিত তাঁহার Eassay on the Principle of Population নামক পুস্তকে এই তথ্য প্রচার করেন। ম্যালথাস্ ইংলণ্ড ও আয়ারলণ্ডে তৎকালীন অতিরিক্ত জনসংখ্যার কুফল দেখিয়া বিচলিত

হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, ধরিত্রী যে পরিমাণ শস্য দান করিতে পারেন, মানুষ তাহার তুলনায় অত্যন্ত দ্রুতবেগে বংশবৃদ্ধি করিয়া লোকসংখ্যা বাড়াইতে পারে। ফলে সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইতে চলিয়াছে। ম্যালথাস ভাবিলেন তিনি মানুষের দুঃখ দারিদ্র্যের মূল কারণের সন্ধান পাইয়াছেন।

ম্যালথাসীয় মতবাদের সমালোচনা

(Criticism of the Malthusian Theory of Population)

ম্যালথাসের মতবাদ তাঁহার নিজদেশের সম্পর্কে তৎকালীন অবস্থা বিবেচনা করিয়া হয়ত সত্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা সর্ব্বদেশের পক্ষে সর্ব্বকালে প্রযোজ্য নহে। জন সংখ্যা যে সব সময় খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণের অপেক্ষা দ্রুতবেগে বাড়িয়া যায় তাহা নহে। দেশে সম্পদ বৃদ্ধির এবং জীবন যাত্রার উন্নতির লাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধির ক্ষমতাও হ্রাস পায়। ম্যালথাসের নিজের দেশ, ইংলণ্ডে, ইয়োরোপের অন্যান্য স্থানে এবং আমেরিকায় লোক বৃদ্ধি নানাকারণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। বহু দেশেই লোকবৃদ্ধি খাদ্য দ্রব্যের বৃদ্ধির তুলনায় বেশী হয় নাই, এবং অনেক দেশেই লোক বৃদ্ধির তুলনায় সম্পদ বৃদ্ধি বেশী হইয়াছে। ম্যালথাস লোকবৃদ্ধি ও খাদ্যবৃদ্ধি সম্পর্কে যে গাণিতিক সূত্র বাহির করিয়াছিলেন, তাহা ভ্রমাত্মক। লোকবৃদ্ধি ও খাদ্য বৃদ্ধি ঐরূপ কোনও সূত্র মানিয়া চলে না। তাহা ছাড়া খাদ্য বৃদ্ধির পরিমাণ কৃষি বিজ্ঞানের উন্নতি এবং শ্রম সংগঠনের উন্নতির দ্বারা অনেক বেশী করা যাইতে পারে। ম্যালথাস যে অন্ধকারময় ভবিষ্যতের কথা বলিয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে তাহা সত্য প্রমাণিত হয় নাই।

Optimum Theory of Population.

এই মতবাদ প্রচারে অধ্যাপক ক্যানান্ (Prof. Cannan) এবং অধ্যাপক কার-সণ্ডারস্ (Prof. Carr-Saunders) বিশেষ অগ্রণী। এই মতবাদ অনুযায়ী প্রত্যেক দেশে এমন একটা জন সংখ্যা কল্পনা করা যায়, যাহাতে মাথাপিছু সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আয় হইতে পারে। এই জনসংখ্যাই শ্রেষ্ঠ অথবা সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়—ইহাই optimum population ; দেশে যখন এই জনসংখ্যা থাকে, তখন দেশের সম্পদ আহরণ ও উৎপাদন করিবার বর্ত্তমান পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া, মোট আয় এবং মাথা পিছু আয়, সর্ব্বাধিক হইবে। যদি দেশের জনসংখ্যা এই optimum সংখ্যার বেশী হয়, এবং দেশের সম্পদ

আহরণ ও উৎপাদন করিবার পদ্ধতির যদি পরিবর্ত্তন না হইয়া থাকে, তাহা হইলে, মোট আয়ের অনুপাতিক বৃদ্ধি হইবে না এবং মাথাপিছু আয় কম হইবে। আবার এই optimum সংখ্যার অপেক্ষা কম জনসংখ্যা হইলে এবং সম্পদ আহরণ ও উৎপাদনের পদ্ধতির পরিবর্ত্তন না হইয়া থাকিলে মোট আয়ের হ্রাস আনুপাতিক হ্রাস অপেক্ষাও বেশী হইবে এবং মাথা পিছু আয় কমিবে।

অতিরিক্ত জনসংখ্যা
(Overpopulation)

কোনও দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত দেশের সম্পদও আনুপাতিক বৃদ্ধি অপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি পাইতে পারে। সে ক্ষেত্রে মোট আয় ও মাথাপিছু আয় উভয়ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু, যদি এমন হয় যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের সম্পদও আনুপাতিক বৃদ্ধির অপেক্ষা কম বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে মাথাপিছু আয়ও কম হইবে। এই অবস্থায় বলা হয় দেশের জনসংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, দেশ overpopulated বা দেশে overpopulation হইয়াছে।

এই অবস্থায় জনসংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইলে, মাথাপিছু আয় বাড়িবে। যদি এমন দেখা যায় যে দেশের জনসংখ্যা বাড়িলে দেশের মাথাপিছু আয় বাড়িবে, তাহা হইলে বলা যায় দেশে বাঞ্ছনীয় জনসংখ্যা (optimum population) অপেক্ষা কম জনসংখ্যা আছে। দেশ underpopulated or দেশে under-population হইয়াছে।

শ্রমিকের কর্ম্মকুশলতা
(Efficiency of Labour)

শ্রমিকের কাজ করিবার যোগ্যতার (efficiency) উপর দেশের সম্পদ উৎপাদন বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। শ্রমিকদল যদি কাজ করিবার যোগ্যতা সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে দেশের উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণও বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে। শ্রমিকের যোগ্যতাও আবার কতকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। মোটামুটি ভাবে বলা যায়, শ্রমিকের কাজ করিবার ক্ষমতা এবং শ্রমিকের কাজ করিবার ইচ্ছা, এই দুইটির উপর, শ্রমিকের যোগ্যতা নির্ভর করে।

(১) **দেশের জলবায়ু** (Climate)—দেশের জলবায়ু অনুকূল হইলে, শ্রমিকের কর্ম্মকুশলতাও বৃদ্ধি পায়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের শ্রমিক সহজেই অধিকক্ষণ কঠোর শ্রমসাধ্য কাজ করিতে পারে। পরন্তু, গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের শ্রমিকরা সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

(২) **শ্রমিকের জাতিগত বৈশিষ্ট্য** (Racial Characteristics)—কতকগুলি জাতির লোক বলিষ্ঠ ও অধিক কর্ম্মক্ষম।

(৩) **উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান** (Food, Clothes and Habitation)—উপযুক্ত খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের উপর শ্রমিকের কর্ম্মক্ষমতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে অথবা অস্বাস্থ্যকর বাসস্থানে থাকিবার ফলে শ্রমিকের দেহ যদি সুস্থ না থাকে, তবে, তাহার কর্ম্ম-ক্ষমতা কমিয়া যাইবে।

(৪) **সাধারণ শিক্ষা** (General Education)—বুদ্ধিমান শ্রমিক নির্ব্বোধ শ্রমিক অপেক্ষা নিশ্চয়ই বেশী কর্ম্মক্ষম। সাধারণ শিক্ষা শ্রমিকের বুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তির পুষ্টি সাধন করে এবং মানসিক ও নৈতিক উন্নতি বিধান করে। সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের ফলে শ্রমিক অধিকতর কর্ম্ম-কুশল হইতে পারে।

(৫) **কারিগরি শিক্ষা** (Technical Education)—বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের জন্য আলাদা কারিগরি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিলে শ্রমিকগণ অধিক কর্ম্মকুশলতা অর্জ্জন করে।

(৬) **নৈতিক গুণাবলী** (Moral Quality)—শ্রমিকরা যদি নিজেরা সৎপ্রকৃতি হয়, অন্যায় ভাবে কাজে ফাঁকি দিবার প্রবৃত্তি না থাকে, তাহারা যদি উদ্যম ও অধ্যবসায়পরায়ণ হয়, তাহা হইলে তাহাদের কর্ম্মক্ষমতা বেশী হইয়া থাকে। শ্রমিক যদি উচ্চাশা-সংযুক্ত হয়, শ্রমিক যদি নিজ শ্রম দ্বারা সাংসারিক উন্নতি করিয়া নিজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা করে, তাহা হইলে তাহার কর্ম্মক্ষমতা বাড়ে।

(৭) **শ্রমের পুরস্কার প্রাপ্তির আশু সম্ভাবনা** (Prospects of Reward)—শ্রমিক যদি দেখে যে বেশী পরিশ্রম করিলে শীঘ্রই তাহার পদোন্নতি হইবে, অথবা বেশী বেতন বা অন্য পুরস্কার পাইবে, তাহা হইলে শ্রমিক তাহার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া অধিক কর্ম্ম করিতে উৎসাহ বোধ করিবে। উন্নতির আশা না থাকিলে শ্রমিক কর্ম্মক্ষমতা বাড়াইবার উৎসাহ অনুভব করিবে না।

(৮) **কারখানা বা কর্ম্মস্থানের অবস্থা** (Factory Conditions)—কারখানা বা কর্ম্মস্থানের অবস্থা যদি অস্বাস্থ্যকর হয়, আলোহাওয়াযুক্ত না হয়, তাহা হইলে তাহার কর্ম্মক্ষমতা কম হইবে। কারখানার অভ্যন্তরের অবস্থা যদি স্বাস্থ্যকর ও প্রীতিপ্রদ হয়, তাহা হইলে শ্রমিকের কর্ম্মক্ষমতা বাড়িয়া থাকে।

(৯) **উপযুক্ত সংগঠন** (Organising Ability of Employers)—মালিকের সংগঠন শক্তির উপরও শ্রমিকের কর্মক্ষমতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। মালিকগণ যদি উপযুক্ত ভাবে শ্রমবিভাগ করিয়া, কলকারখানা ও অন্যবিধ মূলধন এবং শ্রমিকের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন করিতে পারে, উৎপাদন পরিচালন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করিতে পারে, তাহা হইলেও শ্রমিকের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন পরিচালনের অব্যবস্থায় ফলে শ্রমিকের কর্মক্ষমতা কমিতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

মূলধন

(Capital)

প্রচলিত অর্থে মূলধন (Capital) বলিতে টাকা বুঝায় ; কিন্তু অর্থনীতিতে মূলধন (Capital) বলিতে টাকা বুঝায় না। টাকা শুধু বিনিময়ের মাধ্যম, তাই টাকাই মূলধন নয়। টাকা দিয়া অন্য জিনিষ ক্রয় করা যায়, যন্ত্রপাতি কলকারখানা নির্ম্মাণ করা সম্ভব হয়, এই জন্যই ব্যবসায়ে টাকার দরকার। টাকার পরিমাণ বাড়িলেই যে মূলধনের পরিমাণ বাড়িবে তাহার কোনও মানে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়াছে, লোকের হাতে আগেকার চেয়ে অনেক বেশী টাকা জমিয়াছে, তাই বলিয়া দেশের মূলধন বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নহে। আসলে মূলধন হইতেছে, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল প্রভৃতি জিনিষ, যাহার দ্বারা আমরা উৎপন্ন করিতে পারি।

দেশের উৎপন্ন সম্পদকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, এক ভাগে খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি সেই সকল জিনিষ যাহা আমরা অবিলম্বে ব্যবহার করি বা উপভোগ করি। আর এক ভাগে কলকারখানা প্রভৃতি জিনিষ, যাহা আমরা অবিলম্বে উপভোগ না করিয়া, আরও অধিক সম্পদ উৎপাদনের কার্য্যে লাগাই। এই শেষোক্ত সম্পদকেই মূলধন (Capital) বলা চলে। মূলধন হইল সম্পদের সেই অংশ যাহা আমরা উপভোগের দ্বারা ক্ষয় না করিয়া অধিক সম্পদ উৎপাদনের কাজে লাগাই। অতএব কোন সম্পদকে আমরা কি ভাবে ব্যবহার করি, তাহার উপরই তাহা মূলধন অথবা শুধুমাত্র সম্পদ তাহা নির্ভর করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, একটি বাড়ী কারখানা হিসাবে অথবা কারখানার শ্রমিকের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করিলে তাহা হয় মূলধন (Capital), আবার সেই বাড়ী ব্যক্তিগত বাসস্থান হিসাবে ভোগ করিলে তাহা হইবে শুধু সম্পদ (Wealth)। অনুরূপ ভাবে কেহ যদি তাহার মোটর গাড়ী নিজের ব্যক্তিগত কাজে ভোগ করে, তাহা হইলে তাহা হইবে শুধু সম্পদ, আর যদি সেই মোটর গাড়ী অধিক আয় করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, তবে, তাহা হইবে তাহার মূলধন। যে কয়লা দিয়া আমরা রন্ধন করি, তাহা হইল শুধু মাত্র সম্পদ (wealth), আর, যে কয়লা দিয়া আমরা ইঞ্জিন অথবা

কারখানা চালাই, তাহা হইল মূলধন (Capital)। সুতরাং সম্পদ যখন আরো সম্পদ উৎপাদন কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তখনই তাহা মূলধনরূপে গণ্য হয়।

আমরা প্রথমেই দেখিয়াছি মূলধন মানে টাকা নহে, টাকা বিনিময়ের মাধ্যম মাত্র। ইহার সাহায্যে আমরা অপরের সহিত জিনিষ ও সেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করি। টাকার পরিমাণ বাড়িলেই দেশের মূলধন বাড়িবে, অথবা টাকার পরিমাণ কমিলেই দেশের মূলধন কমিবে, এমন কথা নাই।

মাটি অথবা অন্যান্য প্রাকৃতিক দানও মূলধন নহে। যদিও এইগুলির সাহায্যে আমরা অধিক সম্পদ উৎপাদন করি, তথাপি এইগুলি প্রকৃতি-সৃষ্ট এবং মনুষ্য সৃষ্ট নহে, এই কারণে মূলধন বলিয়া গণ্য হয় না। মূলধন হইতেছে মানুষ সৃষ্ট সম্পদের সেই অংশ, যাহা আরও অধিক সম্পদ উৎপাদনের কার্য্যে নিয়োগ করা হয়। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে বিচার করিলে, ভূমি মূলধনরূপে গণ্য হইতে পারে। সমগ্র সমাজের দিক হইতে বিচার করিলে ভূমি প্রকৃতির দান, ইহা মূলধন নহে। কিন্তু কোনও ব্যক্তির পক্ষে ভূমি বিনামূল্যে পাইবার জিনিষ নহে, যে-কোনও ব্যক্তির পক্ষে ভূমি মূলধনরূপে গণ্য হইবে।

বিভিন্ন শ্রেণীর মূলধন
(Different kinds of Capital)

বিভিন্নভাবে মূলধনের শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে—(১) Fixed Capital (স্থির বা বদ্ধ মূলধন) এবং Circulating Capital (চলতি মূলধন)। কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ী প্রভৃতিরূপ মূলধন (Capital) পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া সম্পদ উৎপাদন করা চলে। এগুলি একবার ব্যবহারেই নিঃশেষ হইয়া যায় না, অথবা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়া যায় না। এই সব জিনিষ হইল Fixed Capital ; পরন্তু, কাঁচা মাল প্রভৃতি জিনিষ একবার মাত্র ব্যবহারের পরেই সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়া ভিন্ন জিনিষে পরিণত হয়। তূলা লইয়া সূতা বুনিবার কলে দিলে, তাহা আর তূলা থাকে না, সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ—সূতায় পরিণত হয়। কাপড় বুনিবার কলে সূতা হইতে কাপড় প্রস্তুত হয়, এখানে তূলা ও সূতা একবার মাত্র ব্যবহারের পর ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া অন্য বস্তুতে পরিণত হয়। এগুলি হইল Circulating Capital.

(২) Producer's Capital or Auxiliary or Instrumental Capital (সহায়ক মূলধন) এবং Consumer's Capital or Consumption Capital (ভোগ্য বা ব্যবহার্য্য বস্তু)—প্রথমোক্ত শ্রেণীর মূলধন বলিতে কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, রেলওয়ে, জাহাজ, শিল্পোৎপাদনের জন্য কাঁচা মাল

প্রভৃতি জিনিষ বুঝায়, অর্থাৎ যে সমস্ত জিনিষ দ্বারা অধিক সম্পদ উৎপাদনের কার্য্য হইয়া থাকে।

Consumer's Capital বলিতে বুঝায় সেই সমস্ত জিনিষপত্র যাহার দ্বারা মানুষের অভাব প্রত্যক্ষভাবে মিটে, কিন্তু যেগুলি অধিক উৎপাদনের কার্য্যে শেষ পর্য্যন্ত আবশ্যক। শ্রমিকদিগের জন্য আবশ্যক খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি Consumer's Capital এর দৃষ্টান্ত।

(৩) Individual Trade Capital (ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের মূলধন) ও Social Capital (সামাজিক মূলধন)।

Individual Trade Capital (বা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের মূলধন) বলিতে ব্যক্তিগত সম্পদের সেই অংশ বুঝায় যাহা কোনও ব্যক্তি আয় অর্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিয়াছে। অতএব ইহার দ্বারা ব্যক্তির নিম্নোক্ত জিনিষগুলি বুঝায়—

(ক) ব্যক্তির নিজস্ব যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, ব্যবসায়ের জন্য আবশ্যক কাঁচা মাল, জমিজায়গা প্রভৃতি।

(খ) শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতি।

(গ) তাহার ব্যবসায়ের goodwill.

(ঘ) তাহার প্রদত্ত ঋণ প্রভৃতি।

(ঙ) ব্যবসায়ে খাটিবার জন্য আবশ্যক টাকা।

Social Capital (সামাজিক মূলধন) বলিতে বুঝায় সমগ্র সমাজে ধনোৎপাদনের জন্য যে মূলধন নিয়োগ করা হইয়াছে। সমগ্র সমাজের দিক হইতে বিচার করিলে ভূমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দান, মনুষ্যসৃষ্ট নহে বলিয়া সামাজিক মূলধন বলিয়া গণ্য হইবে না। শুধু যে পরিমাণ মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ অধিক সম্পদ উৎপাদনের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাই সমাজের মূলধনরূপে গণ্য হইবে। টাকাও সামাজিক মূলধনরূপে গণ্য হইবে না। টাকা শুধু বিনিময়ের যন্ত্রস্বরূপ, সমাজের দৃষ্টিতে টাকা মূলধন নহে।

মূলধনের উদ্ভব ও বৃদ্ধি কিসের উপর নির্ভর করে?

(Conditions for the Growth of Capital)

উৎপন্ন সম্পদের যে অংশ অধিক সম্পদের উৎপাদনে নিয়োগ করা হয়, তাহাই হইল মূলধন। অতএব মুখ্যতঃ, সম্পদের উৎপাদন ও সঞ্চয়ের উপরই মূলধন নির্ভর করে। যেখানে সম্পদ উৎপাদন নামমাত্র, সেখানে সঞ্চয়ের

সম্ভাবনা নাই, মূলধনও জমিতে পারে না। আবার যেখানে সম্পদ যথেষ্ট উৎপন্ন হইলেও, সঞ্চয় নামমাত্র, সেখানেও মূলধন জমিতে পারে না। সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা প্রধানতঃ নির্ভর করে মানুষের আয়ের পরিমাণের উপর। মানুষের আয় যদি তাহার জীবনধারণের উপযোগী আবশ্যক জিনিষপত্র কিনিবার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে কোনও সঞ্চয় সম্ভব নহে।

মানুষের আয় যথেষ্ট হওয়া ছাড়া, মানুষের সঞ্চয় করিবার ইচ্ছাও থাকা চাই। সঞ্চয় করিবার ইচ্ছা কতকগুলি জিনিষের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, মানুষ যদি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হয়, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা যদি মানুষ ভাবিতে পারে, তবে, মানুষ অবশ্যই কিছু সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিবে। যাহারা অমিতব্যয়ী, যাহারা বর্ত্তমানের ভোগ লইয়া ব্যস্ত, ভবিষ্যতের কথা যাহারা ভাবে না, তাহারা সঞ্চয় না করিয়া সমস্ত আয় উড়াইয়া দিতে পারে। ইহা ছাড়া, যাহারা স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের প্রতি স্নেহ ও মমতাপরায়ণ, তাহারা ভবিষ্যতে প্রিয়জনগণ যাহাতে দুঃখ ও দারিদ্র্যের হাত এড়াইতে পারে এবং উপযুক্ত আরাম-বিরামের মধ্যে কাল কাটাইতে পারে, তাহার জন্য যথাসাধ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে।

অনেক মানুষই ক্ষমতালিপ্সু এবং ধন-সম্পত্তি মানুষকে অগাধ ক্ষমতার অধিকারী করে। অনেক উচ্চাশাপরায়ণ ব্যক্তি ক্ষমতার অধিকারী হইবার জন্যই সঞ্চয় করিয়া প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক হইতে চায়। আবার, জীবন ও ধন-সম্পত্তি যদি নিরাপদ না হয়, পদে পদে যদি জীবন ও ধন-সম্পত্তি হানির ভয় থাকে, তাহা হইলে দেশে মূলধন জমিতে পারে না। মানুষ যদি বুঝে যে, তাহার সঞ্চিত ধন-সম্পত্তি তাহারই থাকিবে, হঠাৎ একদিন কোনও লুণ্ঠনকারী আসিয়া তাহার কষ্টার্জ্জিত অর্থ কাড়িয়া লইবে না, তাহা হইলেই সে ধনসঞ্চয়ে উৎসাহ বোধ করিবে। আর মানুষ যদি দেখে যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ বা আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্য তাহার ধন-সম্পত্তি নিরাপদ নহে, যদি দেখে যে, একদিনে তাহার সঞ্চিত বিত্ত অপরে গ্রাস করিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে সে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় না করিয়া বর্ত্তমানেই সমস্ত সম্পদ ব্যয় করিয়া ফেলিতে চাহিবে ; ফলে মূলধন একেবারেই জমিতে পারিবে না। সরকারী করনীতিও এমন উৎপীড়নমূলক হইতে পারে যে, লোকে সঞ্চয় করিয়া ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা অপেক্ষা সব কিছু সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় করিয়া ফেলাই শ্রেয়ঃ মনে করিতে পারে। আর, মানুষের জীবন যদি বিপন্ন হয়, তাহা হইলে ত কেহই সঞ্চয় করিতে চাহিবে না।

দেশের সঞ্চিত বিত্ত যদি লাভজনকভাবে বিনিয়োগ করিবার বিবিধ পথ খোলা থাকে, তাহা হইলেও লোকে সঞ্চয় করিয়া মূলধন জমাইতে উৎসাহিত হয়। বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বত্র মূলধন বিনিয়োগের বিবিধ উপায় রহিয়াছে ; ফলে, এখন আগেকার চেয়ে মূলধন জমিবার ও সম্পদ উৎপন্ন হইবার সুযোগ রহিয়াছে। আগেকার দিনে সঞ্চিত সম্পদ নিরাপদভাবে খাটাইবার বেশী সুযোগ ছিল না। তাই তখনকার দিনে মানুষ মাটি খুড়িয়া টাকা পুতিয়া রাখিত অথবা সিন্দুকের মধ্যে টাকা জমাইত। এইরূপ সঞ্চয়ের বিপদও ছিল অনেক। বর্ত্তমান যুগে Commercial ও Industrial Bank-সমূহ, Insurance Company, এবং অসংখ্য Joint Stock Company স্বল্পবিত্ত লোকদের সঞ্চয় লাভজনকভাবে খাটাইবার সুযোগ করিয়া দিয়াছে।

মূলধনের কার্য্যকারিতা
(Function of Capital)

মূলধন সম্পদ উৎপাদনের একটি বিশিষ্ট উপাদান। মূলধন ব্যতীত সম্পদ-সৃষ্টি ভালভাবে সম্ভব নহে। মূলধন নিয়োগ করার ফলেই সম্পদ-সৃষ্টির কাজ দ্রুত চলিতে পারে। মূলধন নিয়োগ করিয়াই আমরা বেশী সম্পদ সৃষ্টি করিতে পারি। কৃষক যদি লাঙ্গল না লইয়া শুধু হাতে চাষ করিতে যায়, তাহা হইলে তাহার উৎপন্ন ফসল হইবে নামমাত্র। ধীবর যদি মাছ ধরিবার জাল বা অন্য সরঞ্জাম না লইয়া মাছ ধরিতে চায়, তাহা হইলে অল্প মাছই সে ধরিতে পারিবে। কৃষকের মূলধন যেমন তাহার লাঙ্গল, বলদ, বীজ ও সার প্রভৃতি জিনিষ, তেমনি ধীবরের মূলধন তাহার মাছ ধরিবার জাল ও অন্যান্য সরঞ্জাম। মূলধন নিয়োগ করিলেই তবে সম্পদ-সৃষ্টি বেশী পরিমাণে ও সহজে উৎপন্ন হইতে পারে। যেহেতু মূলধন নিয়োগের ফলে মোট উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, সেই জন্য শ্রমিক-সাধারণের বেতন বাড়ে এবং সর্ব্বশ্রেণীর লোকের আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। পাশ্চাত্যদেশে উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিক ও উন্নত ধরণের মূলধন নিয়োগ করিবার ফলে সেখানে সর্ব্বসাধারণের অবস্থা আমাদের দেশের তুলনায় উন্নত হইয়াছে। আমাদের দেশে অল্প মূলধন নিয়োগের ফলে, কি কৃষিক্ষেত্রে কি শিল্পক্ষেত্রে, মোট সম্পদের পরিমাণ ও সম্পদ উৎপাদনের হার অনেক কম। অধিক পরিমাণে আধুনিক মূলধন নিয়োগ করিলে আমাদের কৃষিজাত ও শিল্পজাত পণ্যসম্ভার বৃদ্ধি পাইবে, আমাদের অবস্থারও উন্নতি হইবে। বর্ত্তমান সভ্যতায় স্তূপীকৃত বস্তুসম্ভার সৃষ্টি, উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিক মূলধন নিয়োগের ফলেই সম্ভব হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

উৎপাদন সংগঠন

(Organisation)

বর্ত্তমান কালে উৎপাদনের কার্য্য আর সহজ সরল অনাড়ম্বর নহে, পরন্তু ইহা বিশেষ জটিল হইয়া পড়িয়াছে এবং বিশেষ অভিজ্ঞ সংগঠকের নিয়ন্ত্রণাধীন হইয়া পড়িয়াছে। অনেক পূর্ব্বকালে, জমির মালিক তাহারই নিজের শ্রম ও নিজের মূলধন লইয়া কাজ করিত ; যাহা উৎপন্ন হইত, তাহা ছিল তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব। উৎপাদন ছিল এইরূপ সরল জিনিষ। উৎপাদক নিজের শ্রম, মূলধন এবং ভূমি বা অন্য প্রাকৃতিক দান লইয়া কাজ করিয়া সম্পদ করিত। বর্ত্তমান কালে এক শ্রেণীর লোক ভূমি বা অন্য প্রাকৃতিক দানের (land) মালিক, এক শ্রেণীর লোক শ্রমজীবী, শ্রমের (labour) মালিক এবং অপর এক শ্রেণী ধনিক, মূলধনের (capital) মালিক। এই যুগে আর এক দল লোকের উদ্ভব হইয়াছে, যাহাদের কাজ হইতেছে প্রথম তিন শ্রেণীর লোকের সমন্বয় ঘটাইয়া উৎপাদন সংগঠন (organisation) ও পরিচালন করা।

শ্রম-বিভাগ

(Division of Labour)

সমাজের শৈশবে, বর্ব্বর যুগে, শ্রম বিভাগ বলিয়া বিশেষ কিছু ছিল না। প্রত্যেক লোককে তাহার যাবতীয় অভাব নিজেকেই মিটাইতে হইত। প্রত্যেককেই নিজের অভাব মিটাইবার জন্য সর্ব্বরকম কাজ করিতে হইত ; শিকার করিতে হইত, ফল-মূল সংগ্রহ করিতে হইত, নিজের কুঁড়ে ঘর তৈরী করিতে হইত, নিজের অস্ত্র-শস্ত্র নিজেকে বানাইতে হইত। একই ব্যক্তি একাধারে ছিল শিকারী, কৃষক, তন্তুবায় ও কুটীরনির্ম্মাতা। কালক্রমে, সকলে এক একটি বিশেষ বৃত্তি অবলম্বন করিতে লাগিল। কেহ হইল শিকারী, কেহ হইল কৃষক, কেহ হইল তন্তুবায়, কেহ বা হইল গৃহ-নির্ম্মাতা। আগে যেমন প্রত্যেককে নিজ নিজ অভাব নিজেই মিটাইতে হইত, এখন হইতে তাহা না করিয়া প্রত্যেকে এক একটি বিশেষ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া একটি মাত্র জিনিষ উৎপাদনে মনোনিবেশ করিল এবং নিজের উৎপন্ন জিনিষের বিনিময়ে

অন্যান্য লোকের নিকট হইতে নিজের আবশ্যক দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করিতে লাগিল। ইহাই হইল শ্রম-বিভাগের আদিরূপ। প্রত্যেকে একটি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া একটি বিশেষ জিনিষ উৎপন্ন করে এবং জিনিষটির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত উৎপাদনকার্য্যে নিযুক্ত থাকে। যে ব্যক্তি পাদুকা প্রস্তুত করে, সে পশুচর্ম্ম সংগ্রহ করে, চর্ম্ম 'ট্যান' করিয়া পাদুকা প্রস্তুত করিবার উপযোগী করে এবং পাদুকা প্রস্তুত করে। এইভাবে প্রত্যেকে নিজ নিজ বৃত্তির প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্য সমাধা করে। পেন্‌সন (Penson) এই শ্রমবিভাগকে বলিয়াছেন, "division into industries, trades and professions" ; কারণ, এই ব্যবস্থায় প্রত্যেকে এক একটি সম্পূর্ণ শিল্প, ব্যবসা এবং বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহাই সমাধা করে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর হইয়া পড়িলেও, প্রথমে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অনুযায়ী যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রকে চারি প্রকার কার্য্য দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও এই শ্রমবিভাগের নিদর্শনরূপে লওয়া যাইতে পারে। আদি মানব-সমাজের এই সরল শ্রম-বিভাগ ক্রমশঃ সভ্যতার উদ্ভবের সহিত আরও জটিল হইতে থাকে। মুচি নিজে পশুপালন ও পশুচর্ম্ম সংগ্রহ না করিয়া, একদল লোক পশুপালন করে ও পশুচর্ম্ম সংগ্রহ করে, একদল লোক পশু-চর্ম্মকে ট্যান (tan) করিয়া জুতা প্রস্তুত করিবার উপযোগী করিয়া তোলে এবং মুচি তাহাদের নিকট চর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া জুতা তৈরী করে। এইরূপ শ্রমবিভাগের মধ্যে প্রত্যেকে একটি নির্দ্দিষ্ট সম্পূর্ণ কর্ম্ম করে। পেন্‌সন (Penson) ইহাকে বলিয়াছেন "division into processes which are complete."—একটি কাজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকের ভাগ স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্ত্তমান সমাজে যন্ত্রের বহুল প্রয়োগের ফলে শ্রম-বিভাগ আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, পশুচর্ম্ম ট্যান (tan) করাও আর একটি সম্পূর্ণ কাজ নহে ; এই ট্যান্ (tan) করার কাজটিকেও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়া বিভিন্ন কারিকরের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আধুনিক জুতার কারখানায় একটি মুচি আর নিজে সম্পূর্ণ জুতা-জোড়া প্রস্তুত করে না। জুতা প্রস্তুতের সম্পূর্ণ কাজটাকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হইয়াছে, প্রত্যেক কারিকর সম্পূর্ণ কাজটার সামান্য একটি অংশ মাত্র সম্পন্ন করে, কেহ বা বিভিন্ন 'সাইজে' চামড়া কাটে, কেহ বা শুকতালা প্রস্তুত করে, কেহ বা শুকতালা জোড়া দেয়,—এই ভাবে কাজ চলে। জুতা প্রস্তুতের আধুনিক কারখানায়

জুতা তৈরীর কাজটাকে ১২০ অংশে ভাগ করিয়া বিভিন্ন কারিকরের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক কারিকর তাহার নিজ অংশটুকু মাত্র করে। অন্য অংশটুকুর সহিত তাহার সম্পর্ক থাকিলেও, তাহার পক্ষে খোঁজ করিবার কিছু দরকার হয় না। পেন্‌সন্ (Penson) ইহাকেই বলিয়াছেন "division into processes which are incomplete."—প্রত্যেকে সম্পূর্ণ কাজের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র করে। এই অংশটুকু সম্পূর্ণ একটি কাজ নহে, একটি সম্পূর্ণ কাজের সামান্য অংশ মাত্র।

আর এক প্রকারের শ্রমবিভাগ আছে যাহাকে বলা যায় ভৌগলিক শ্রমবিভাগ (territorial division of labour)। যে দেশে বা যে অঞ্চলে যে জিনিষ উৎপন্ন করিবার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সুযোগ-সুবিধা বর্ত্তমান, সে দেশ বা সে অঞ্চল সেই জিনিষ উৎপাদনে বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, দাক্ষিণাত্যে তুলা, জলপাইগুড়ি, দার্জ্জিলিং ও আসামে চা, পূর্ব্ববঙ্গে পাট, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শিল্পাঞ্চলে পাটশিল্প এবং আমেদাবাদ ও বোম্বাই-এ বস্ত্রশিল্প ভৌগলিক শ্রম-বিভাগের নিদর্শন।

শ্রমবিভাগের সুবিধা
(Advantages of Division of Labour)

শ্রম বিভাগের ফলে প্রত্যেককে তাহার উপযুক্ত কর্ম্ম দেওয়া যায়। সকলে সকল কর্ম্মের সামর্থ্য বা যোগ্যতা-সম্পন্ন নহে। শারীরিক শক্তি, শিক্ষা, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কাজের উপযুক্ত। শ্রম বিভাগের ফলে, প্রত্যেক কাজটিকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করিয়া সকলের মধ্যে যোগ্যতা অনুযায়ী বণ্টন করিয়া দেওয়া যায়। বলবান ব্যক্তি শ্রমসাধ্য কাজ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুদ্ধির কাজ—এই ভাবে যে যাহার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাইতে পারে। যাহার জুতা তৈরী করিবার শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা আছে সে শুধু মুচির কাজ করিবে, যাহার তাঁত বুনিবার শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা আছে সে শুধু তন্তুবায়ের কাজ করিবে—শ্রম বিভাগের ফলে ইহা সম্ভব হয়। এই ভাবে যে যাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ পাইবে। নিজের নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য মোট উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণ শ্রম বিভাগের ফলে অনেক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শ্রম বিভাগ না থাকিলে, একই ব্যক্তিকে একাধারে কৃষক, মুচি, তন্তুবায় প্রভৃতির কাজ করিতে হইত ; ফলে, অসুবিধার সীমা থাকিত না, উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কম হইত। এ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith)

বহুদিন পূর্ব্বে, শ্রম বিভাগজনিত প্রচুর উৎপাদন-বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে কোনও কাজে শ্রম বিভাগ প্রবর্ত্তনের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। তিনি তাঁহার পুস্তক Wealth of Nation-এ আলপিন প্রস্তুতের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, কোনও একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় সারাদিনে অনেক কষ্টে কুড়িটির বেশী আলপিন প্রস্তুত করিতে পারিবে না, কিন্তু তখনকার দিনের দশ জন শ্রমিক কাজ ক'রে এমন একটি কারখানায় শ্রম বিভাগের ফলে প্রতি দিন আটচল্লিশ হাজার আলপিন প্রস্তুত করা সম্ভব হইত। শ্রম বিভাগের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সুবিধা।

শ্রম বিভাগের ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি একই কাজ করে; কেহ সূত্রধরের কাজ করে, কেহ বা তন্তুবায়ের কাজ করে—এইভাবে এক এক জন একটিমাত্র কাজ করে, অথবা কারখানায় এক একজন সম্পূর্ণ একটি কাজের সামান্য একটি অংশমাত্র সম্পন্ন করে। মোটের উপর প্রত্যেকে এক একটি নির্দ্দিষ্ট কাজ পুনঃপুনঃ করার ফলে বিশেষ দক্ষতা অর্জ্জন করে। যে কেবল সূত্রধরের কাজ করে, সে কুশলী সূত্রধর হয়, যে কেবল তন্তুবায়ের কাজ করে, সে কুশলী তন্তুবায় হয় এবং যে কারখানায় শুধু একটি মাত্র কাজ করে, সেও সেই কাজে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে। অধিকাংশ লোকই সাধারণ-শ্রেণীভুক্ত। প্রথম হইতে অধিকাংশেরই কোনও বিষয়ে বিশেষ ঝোঁক বা বিশেষ কুশলতা লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু সাধারণ লোকও যদি একটি মাত্র কাজ দিনের পর দিন পুনঃপুনঃ করিতে থাকে, তাহা হইলে সেই কাজে তাহাকে দক্ষতা লাভ করিতে দেখা যায়।

শ্রম বিভাগের ফলে প্রত্যেক কাজকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগে করা হয়, কাহারও সমগ্র কাজটি না শিখিলেও চলে। একটি কাজের ক্ষুদ্র অংশ শিখিতে বেশী সময় যায় না, অল্প পরিশ্রমে অল্প সময়ের মধ্যেই প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কাজ আয়ত্ত করিয়া লইতে পারে। তাহা ছাড়াও, শ্রম বিভাগের ফলে এক ব্যক্তি একই স্থানে থাকিয়া একটি মাত্র কাজে রত থাকিতে পারে; শ্রম বিভাগ না থাকিলে একটি কাজ ছাড়িয়া আর একটি গ্রহণ করিতে যে সময় নষ্ট হইত, তাহা বাঁচিয়া যায়। এই ভাবে শ্রমবিভাগের ফলে, অনেক সময় বাঁচিয়া যায় এবং উৎপাদনও বাড়ে।

শ্রমবিভাগের ফলে মানুষের কাজ খুব সহজ সরল হইয়া পড়ে। তাহা ছাড়া প্রত্যেকটি কাজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইবার ফলে, কাজগুলি যন্ত্রের

সাহায্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। আবার, যন্ত্রদ্বারা উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে, মোট উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং ব্যয় কমে। কঠোর শ্রমসাধ্য কাজ যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন হয় বলিয়া মানুষের কষ্ট লাঘব হয় এবং যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করা সহজসাধ্য বলিয়া শ্রমিক বেকার হইলে অল্প পরিশ্রমেই অন্য কাজ শিখিয়া লইতে পারে।

শ্রমবিভাগের ফলে কাজগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হওয়ায়, নূতন নূতন আবিষ্কারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। বৈজ্ঞানিক ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি শ্রমিক পুনঃপুনঃ একটি ক্ষুদ্র কাজ করিতে দেখিয়া বা করিয়া নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে শ্রমবিভাগের ফলে বহু যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শ্রমবিভাগের ফলেই মনুষ্য-শ্রম লাঘব হইয়াছে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জিনিষপত্র সুলভ হইয়াছে। সুলভ মূল্যে বস্তু-সম্ভার সৃষ্টি হওয়ায় সর্ব্ব-সাধারণের ক্রয়-যোগ্য হইয়াছে এবং ফলে সর্ব্বসাধারণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত হইয়াছে। শ্রমবিভাগই বর্ত্তমান সভ্যতার অগ্রগতির মূলে রহিয়াছে।

শ্রমবিভাগের অসুবিধা

(Disadvantages of Division of Labour)

শ্রমবিভাগের বিপক্ষেও বলিবার কথা রহিয়াছে। শ্রমবিভাগের ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি একই কাজ বা একই কাজের সামান্য অংশমাত্র পুনঃপুনঃ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগের ব্যাপক ও জটিল শ্রমবিভাগের ফলে, প্রত্যেক শ্রমিক সম্পূর্ণ কাজের সামান্য একটু মাত্র অংশ করিয়া থাকে। ফলে প্রত্যেক কাজ অত্যন্ত একঘেঁয়ে এবং বিরক্তিকর হইয়া পড়ে, শ্রমিক তাহার কাজে আগ্রহ বা উৎসাহ হারাইয়া ফেলে। কাজেই তাহার আনন্দ বলিয়া কিছু থাকে না। নীরস একঘেঁয়ে কাজ করিতে বাধ্য হইবার ফলে শ্রমিকের জীবন নিরানন্দময় হইয়া উঠে, বুদ্ধি ভোঁতা হইয়া যায়, মনের প্রসারতা থাকে না। একই কাজ দিনের পর দিন করার ফলে, শ্রমিকের মন সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। শ্রমিক নিজে তাহার ব্যক্তিত্ব হারাইয়া যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়ে; কলের মত দিনের পর দিন একই ভাবে, না ভাবিয়া চিন্তিয়া, একই কাজ করিয়া যাইতে থাকে। ইহার ফলে, যদিও শ্রমিক হয়ত তাহার নিজ কর্ম্মটুকুতে দক্ষতা লাভ করে, সাধারণভাবে তাহার কর্ম্মকুশলতা বা কর্ম্মক্ষমতা হ্রাস পায়। সে তাহার নিজের কাজটুকু ছাড়া অন্য কাজ করিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে; সাধারণ ভাবে তাহার কর্ম্মযোগ্যতা কমিয়া যায়।

শ্রমবিভাগ প্রসার লাভ করিবার ফলেই কারখানা গড়িয়া উঠা সম্ভব হইয়াছে। শ্রমবিভাগের সহিত কারখানা-জীবনের বহুবিধ কুফল জড়িত, কারখানার মালিকের সহিত শ্রমিকের কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না। অস্বাস্থ্যকর বস্তীর মধ্যে অবিরত বেকার-সমস্যার ভারে পীড়িত থাকিয়া, হৃদয়হীন কর্ম্মচারীর অধীন কাজ করিতে করিতে শ্রমিকের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে।

সিদ্ধান্ত

(Conclusion)

প্রকৃতপক্ষে শ্রমবিভাগের বিরুদ্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার বিশেষ ভিত্তি নাই। শ্রমবিভাগ সমাজের প্রভূত উপকার করিয়াছে। ইহা সম্পদ উৎপদানের পরিমাণ বাড়াইয়াছে, উৎপন্ন সম্পদ সুলভ করিয়া সকলের আয়ত্তাধীন করিয়াছে এবং সকলের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করিয়াছে। শ্রমবিভাগের ফলে একঘেঁয়ে ও বিরক্তিকর কাজগুলি যন্ত্রের সাহায্যে করা হয়; ফলে মানুষের পক্ষে একঘেঁয়ে ও বিরক্তিকর কাজের হাত এড়ানো সম্ভব হইয়াছে। কাজেই, শ্রমবিভাগের ফলে, মানুষের কাজ একঘেঁয়ে হইয়া গিয়াছে বলা ঠিক নহে। শ্রমবিভাগের ফলে, মানুষ অল্প সময় কাজ করিয়া অধিক বিশ্রাম ভোগ করিবার অধিকারী হইয়াছে এবং বিশ্রামের সময় বিবিধ কাজে চিত্তবৃত্তির উন্নতি সাধন করিবার সুযোগ পাইয়াছে। ধনিক সম্প্রদায় অবশ্য শ্রম-বিভাগকে নিজেদের স্বার্থে লাগাইয়া অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদিগের দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছে, কিন্তু শ্রমবিভাগকে অবশ্যই এরূপভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, যাহাতে কারখানা জীবনের কুফলসমূহ এড়াইতে পারা যায়। শ্রমবিভাগ চিত্তের যে সঙ্কীর্ণতা আনে বলা হয়, তাহা উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা দূর করা যাইতে পারে এবং শ্রমিকদের উন্নতির জন্য ও বেকার-সমস্যা নিবারণের জন্য শ্রমবিভাগের উপযুক্ত প্রয়োগই প্রকৃত সমাধান।

কলকব্জা ও যন্ত্র উৎপাদনে যন্ত্রের প্রয়োগ

(Machinery)

বর্ত্তমান জগতে উৎপাদন ব্যাপারের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে বহুল পরিমাণ যন্ত্রের (machinery) প্রয়োগ। শ্রমবিভাগের ফলে যেমন নূতন নূতন যন্ত্রের প্রয়োগ সম্ভব হইয়াছে, তেমনি নূতন নূতন যন্ত্রের প্রয়োগের ফলে আবার শ্রমবিভাগের পরিসর বাড়িয়াছে।

যন্ত্রের আবিষ্কার ও প্রয়োগের ফলে উৎপাদনের পরিমাণ প্রভূত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উৎপন্ন দ্রব্য সুলভ হইয়াছে। যন্ত্রের বহুল প্রয়োগের ফলে

বর্ত্তমান শ্রমশিল্প এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। শিল্পগুলি আয়তনের দিক দিয়া হইয়া উঠিয়াছে অতিকায়, ব্যবসা-বাণিজ্যও বিশাল আকার ধারণ করিয়াছে।

সম্পদ উৎপাদনের উপর যন্ত্রের প্রভাব

(Effects of Machinery on Production)

যন্ত্র-সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি, বাষ্পীয় শক্তি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি আয়ত্ত করিয়া মানুষ অনায়াসে অত্যন্ত কঠিন কাজ সম্পন্ন করিয়া থাকে। যন্ত্রের সাহায্যে এমন অনেক কাজ করা হয়, যাহা মনুষ্য-শক্তিতে করা অসম্ভব। আবার, মানুষ বহু পরিশ্রমে যে কাজ কষ্টে করিতে পারিত, যন্ত্রের সাহায্যে তাহা অনায়াসে সম্পন্ন করা যায়।

যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন অত্যন্ত দ্রুতগতিতে হইয়া থাকে। যে পরিমাণ বস্ত্র আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে কয়েকজন মাত্র লোক একদিনে একটিমাত্র কারখানায় উৎপন্ন করিতে পারে, তাহা বিনা যন্ত্রে উৎপন্ন করিতে বহু শত তন্তুবায়ের দীর্ঘকাল লাগিবে।

যে সব কাজ খুব সূক্ষ্ম, তাহা বেশী পরিমাণে যন্ত্রের সাহায্যেই নির্ভুল ভাবে করা যায়। কিন্তু যে সব কাজে শিল্পকুশলতার পরিচয় থাকে, বা যে সব কাজ দ্বারা ব্যক্তিগত রুচি পরিতৃপ্ত হইবে, তাহা যন্ত্র সাহায্যে করা সম্ভব নহে। পুনঃপুনঃ একই কাজ করিতে হইলে, তাহা মানুষ অপেক্ষা যন্ত্র সহজে সম্পন্ন করে। যন্ত্র চালনা করিতে হইলে কতকটা বুদ্ধি ও দৃঢ়তা দরকার হয়। শ্রমিকদিগকে যন্ত্র চালনার ভার দিলে তাহাদের বুদ্ধি, দৃঢ়তা এবং চরিত্রের অন্যান্য গুণ বিকশিত হয়। যন্ত্র শ্রমিকের কাজকে সহজ করিয়া তুলে, কাজের একঘেঁয়েমি দূর করে। যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে, বেকার শ্রমিক সহজেই নিজের কাজ ছাড়া অন্য কাজ শিখিয়া লইতে পারে। যন্ত্র শ্রমিকের আয় বৃদ্ধি করে, তাহার জীবনকে আনন্দময় করে।

যন্ত্রের সপক্ষে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন-ব্যবস্থার ফলে প্রচুর বস্তুসম্ভার সুলভে উৎপন্ন হইতে পারে। কাজেই, ইহাতে সর্ব্ব-সাধারণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত হইয়া থাকে।

কোনও শিল্পে যদি সহসা যন্ত্রের দ্বারা বা অধিকতর উপযোগী যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদনের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা যায়, তাহা হইলে ইহার প্রথম ফল হইবে বহু শ্রমিকের কর্ম্মচ্যুতি। এই জন্য অনেকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে যন্ত্রের

আবির্ভাবকে ভাল চক্ষে দেখিতে পারে না। শ্রমিকগণ ক্ষিপ্ত হইয়া উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি নষ্ট করিয়া দিয়াছে, এরূপ বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কিন্তু অর্থনীতি-বিদ্‌গণের অভিমত এই যে, যন্ত্র প্রবর্ত্তনের জন্য কোনও শিল্পের ক্ষেত্রে যদিও প্রথমে বেকার-সমস্যা দেখা দিতে পারে, তথাপি, পরিণামে যন্ত্র প্রবর্ত্তনের ফলস্বরূপ সকলেরই অবস্থার উন্নতি হইবে এবং বেকার-সমস্যাও থাকিবে না। মনে করা যাক, কোনও শিল্পের ক্ষেত্রে যন্ত্রের প্রয়োগের ফলে কতকগুলি শ্রমিক বেকার হইল। কিন্তু, যন্ত্রের প্রয়োগের ফলে উৎপাদন-ব্যয় কম পড়ে এবং উৎপন্ন দ্রব্য আগেকার চেয়ে কম মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভব হইবে। ফলে এই জিনিষই আগেকার চেয়ে বেশী পরিমাণ বিক্রয় হইবে ; কাজেই, ঐ শিল্পেই আরও কতকগুলি বেশী শ্রমিকের দরকার হইবে। যাহারা ঐ জিনিষ ক্রয় করিত, জিনিষটি সস্তা হওয়ার জন্য তাহারা অধিক পরিমাণে ঐ জিনিয় ক্রয় করিবে এবং সস্তায় জিনিয়টি পাওয়ার জন্য, সকলের হাতে কিছু কিছু পয়সাও বাঁচিবে। সুতরাং, সকলে অন্যান্য জিনিষ কিছু কিছু বেশী কিনিতে চাহিবে। কাজেই, অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়িবে। সে সব শিল্পেও বেশী লোক নিযুক্ত হইবে। উন্নত শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদিগের আয় বাড়িবার জন্য তাহারাও কিছু বেশী খরচ করিবে এবং অন্যান্য জিনিষের চাহিদা হইবে। তাহা ছাড়া ঐ শিল্পের যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণের জন্যও কিছু লোক লাগিবে। এই ভাবে শেষ পর্য্যন্ত বেকার-সমস্যা থাকিবে না। কিন্তু, আগে হইতে বেকার শ্রমিকদিগের বেকার সমস্যা সমাধানের কোনও পরিকল্পনা না থাকিলে, শুধু স্বাভাবিকভাবে অর্থনীতির খেলার উপর প্রতীকারের ভার ছাড়িয়া দিলে, কর্ম্মচ্যুত শ্রমিকদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না।

বর্ত্তমানে কারখানার সহিত জড়িত বস্তীজীবন এবং শারীরিক ও নৈতিক অধোগতির কথা উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ যান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার নিন্দা করেন। কেহ কেহ বলেন, এই ব্যবস্থার ফলে মানুষ যন্ত্রের দাস হইয়া পড়িয়াছে, শ্রমিক সর্ব্বস্ব হারাইয়া বেতনভুক দাসজীবন যাপন করিতেছে।

যন্ত্র-প্রবর্ত্তনের যে সব ক্ষতির কথা বলা হইল, তাহার কোনটাই অবশ্যম্ভাবী নহে, প্রত্যেকটাই মানুষ চেষ্টা দ্বারা নিবারণ করিতে পারে। আমাদিগকে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, যন্ত্রের জন্য মানুষ হয় নাই, মানুষের জন্যই যন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে। যন্ত্রকে কতিপয় ধনিকের স্বার্থসিদ্ধির উপায় স্বরূপ ব্যবহার করিতে না দিয়া, তাহাকে সকলের কল্যাণকর কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। দেখিতে হইবে, যন্ত্র যেন সকলের মঙ্গল বিধানের উপায় স্বরূপ হয়, ইহা যেন শোষণের

উপায়রূপে ব্যবহৃত না হয়। একথা মনে রাখা দরকার যে, যন্ত্র সাহায্যেই আধুনিক সভ্যতার পণ্যসম্ভার তৈরী করা সম্ভব হইয়াছে, যন্ত্র ত্যাগ করিলে জীবন-যাত্রার মান কমিয়া অনেক নীচু হইয়া পড়িবে।

শ্রমশিল্পের স্থানীয়করণ

(Localisation of Industries.)

অনেক সময়, এক একটি স্থানে এক একটি বিশেষ শিল্পের প্রতিষ্ঠান-সমূহ কেন্দ্রীভূত হইয়াছে দেখা যায়। কলিকাতার নিকটে হুগলী নদীর উভয় তীরে পাটের কারখানা, বিহারে চিনির কারখানা, বোম্বাই ও আমেদাবাদে কাপড়ের কারখানা, কাশ্মীরে শাল প্রস্তুতের শিল্প, ম্যাঞ্চেষ্টারে বস্ত্র-শিল্প, শেফীল্ডে ছুরি-কাঁচি প্রস্তুত শিল্প প্রভৃতি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায়। দেখা যায়, যেখানে কোনও শিল্পের বিশেষ কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা আছে, সেইখানে সেই শিল্পের যাবতীয় বা অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। ইহারই নাম শ্রমশিল্পের স্থানীয়করণ (Localisation of Industries)।

এক স্থানে একই শ্রেণীর বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবার একটি বড় কারণ কাঁচা মালের সরবরাহ ক্ষেত্রের সান্নিধ্য। বোম্বাই ও আমেদাবাদে যে বস্ত্র-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার একটি কারণ এই যে, নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে প্রচুর তূলা উৎপন্ন হয়। বিহার বা যুক্তপ্রদেশে চিনি-শিল্প গড়িয়া উঠিবার একটা কারণ, ঐ প্রদেশগুলিতে প্রচুর ইক্ষু উৎপন্ন হয় এবং কলিকাতার নিকট হুগলীর উভয় তীরে যে পাট-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারও একটা কারণ এই যে, নিকটেই প্রচুর পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে। জামসেদপুরে লৌহশিল্পের উদ্ভবের একটা কারণ এই যে, নিকটেই প্রচুর লৌহ আকর রহিয়াছে। যে শিল্পের কাঁচা মাল বহন করিবার খরচ বেশী, সে শিল্প সাধারণতঃ কাঁচা মাল যেখানে উৎপন্ন হয় সেইস্থানে গড়িয়া উঠে।

কয়লা, পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি শিল্পোৎপাদনের শক্তি (Power) যেখানে সুলভ, তাহার নিকটেও অনেক সময় শিল্প গড়িয়া উঠে। যদি কয়লা অনেক দূর হইতে আনিয়া কারখানা চালাইতে হয়, তাহা হইলে অনেক ব্যয় হইয়া যায়। তাই যেখানে কয়লা পাওয়া যায়, কয়লা-শক্তি দ্বারা চালিত শিল্প অনেক সময় তাহার সান্নিধ্যে গড়িয়া উঠে।

কলকারখানা উৎপন্ন মাল বাজারে বিক্রয় করিতে হইবে। অতএব, যেখানে বাজার নিকটবর্ত্তী, সেইখানে শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে। বাজারের সহিত

জলপথ বা স্থলপথের সহজ ও সুবিধাজনক যোগাযোগের ব্যবস্থা না থাকিলে, শিল্পের উৎপন্ন মালের মূল্য বেশী পড়িয়া যাইবে এবং বিক্রয় করা দুঃসাধ্য হইবে।

যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত শ্রমিক পাওয়া যায়, সেখানে শিল্প গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা। উপযুক্ত শ্রমিক না পাওয়া যাইলে কোনও শিল্পই চলিবে না। তাই যেখানে যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিক পাওয়া যাইতে পারে, সেখানে শিল্প গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা। উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন নিয়োগ হইতে পারে এমন স্থানেও শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে।

কখনও কখনও রাজনৈতিক কারণে কোনও স্থানে শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে দেখা যায়। ভারতবর্ষে পূর্ব্বে মুসলমান ও হিন্দু রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁহাদের রাজধানীতে অনেক সময় বিশেষ বিশেষ কারুশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। মসলিন বা কাশীর বেনারসী বস্ত্র প্রস্তুতের শিল্প এই ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। কোনও দেশের সরকারও রাজনৈতিক কারণে বিশেষ বিশেষ স্থানে কল-কারখানা গড়িয়া তুলিতে পারে অথবা গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করিতে পারে।

আবার যদি কোনও একবার একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান এক স্থানে গড়িয়া উঠে, তখন অনেক সময় তাহার দেখাদেখি সেই শিল্পের অন্য প্রতিষ্ঠানগুলি একে একে সেইখানে গিয়া জুটিতে থাকে। একই স্থানে একটি শিল্পের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান একত্র হইলে যে বিশেষ বিশেষ সুবিধা লাভ করা যাইতে পারে, তাহারই আশায় ক্রমশঃ সেই শিল্পের অন্য প্রতিষ্ঠানগুলি সেই স্থানে গিয়া ভিড় জমাইতে থাকে। এই ভাবেও এক স্থানে একটি শিল্পের বহু প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পারে। ইহাকে ইংরাজীতে বলা হয় "Industrial inertia" (বাণিজ্যিক জড়ত্ব)।

শ্রমশিল্পের স্থানীয়করণের ভাল-মন্দ
(Advantages and Disadvantages of Localisation of Industries)

কোনও স্থানে একই শিল্পের প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া উঠিবার (Localisation of Industries) সুবিধা ও অসুবিধা দুই আছে।

এক স্থানে যদি একই শিল্পের অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে সেই স্থানটির সেই শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের সম্পর্কে একটা খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। যেমন, শেফীল্ডের ছুরি-কাঁচি বা সুইজারল্যাণ্ডের ঘড়ি বা বেনারসের শাড়ী। যদি নূতন কোনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ঐ সব স্থানে গিয়া ওই সব

স্থানের বিখ্যাত বস্তু উৎপাদন করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে তাহাও ঐ স্থানের খ্যাতির অংশ পাইবে।

যেখানে একই শিল্পের অনেক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে, সেখানে যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত শ্রমিক পাওয়া সম্ভব হয়। শ্রমিকগণ জানে যে, এইস্থানে গেলে, অনেক প্রতিষ্ঠান থাকার জন্য তাহারা তাহাদের দক্ষতা অনুযায়ী কর্ম্ম জুটাইতে পারিবে। মালিকরাও জানে যে, এই সব স্থানে তাহাদের প্রয়োজন মত সুদক্ষ শ্রমিকের অভাব হইবে না। শ্রমিকদের সন্তানগণ এই সব শিল্পকেন্দ্রে একই রকম বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকার ফলে সহজেই, একরকম তাহাদের অজ্ঞাতসারে, শিল্প-সংক্রান্ত কর্ম্মের বিষয় জানিয়া লয়। কাজেই শ্রমিক-সন্তানগণ সহজেই তাহাদের পিতার কার্য্য আয়ত্ত করিয়া লইতে পারে। শ্রমশিল্প স্থানীয়করণের ফলে, সেই স্থানে উপযুক্ত ব্যাঙ্ক্ প্রভৃতি গড়িয়া উঠে এবং মূলধন পাওয়া সহজ-সাধ্য হইয়া পড়ে। যানবাহনের বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থাও এই সব স্থানে হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, রেল কোম্পানী শিল্পজাত দ্রব্যগুলি বহন করিয়া লইবার জন্য এবং শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, কয়লা প্রভৃতি আনিবার জন্য বিশেষ ধরণের উপযোগী ওয়াগণ, সাইডিং প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে পারে। প্রয়োজনমত নূতন রেলপথ বা মোটর চলিবার পথও প্রস্তুত হইতে পারে।

প্রধান শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা প্রভৃতি যোগান দিবার জন্য সহায়ক শিল্প (subsidiary industry) ঐ স্থানে গড়িয়া উঠে; যেমন, যে জায়গায় বহু কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেখানে কাপড়ের তাঁতের সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিবার জন্য সহায়ক শিল্পও (subsidiary industry) গড়িয়া উঠে। ইহা ছাড়া প্রধান শিল্পের পরিপূরক শিল্প (supplementary industry) গড়িয়া উঠিতে পারে। যেখানে লৌহ শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেইখানে বস্ত্র শিল্প বা অনুরূপ কোন শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে, যাহাতে লৌহ কারখানার শ্রমিকদিগের সন্তান ও স্ত্রীলোকগণ অল্প হারে কাজ করিতে পারে। ইহাতে শ্রমিকদিগেরও মোট আয় বাড়ে, এবং কারখানার মালিকগণও কম মজুরীতে কাজ করাইয়া লইতে পারে।

এক স্থানে একই ধরণের বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবার ফলে যন্ত্রপাতি সম্পর্কে নূতন নূতন আবিষ্কার সহজ হয় এবং নূতন নূতন উন্নত ব্যবস্থা সংগঠন প্রবর্ত্তিত হইতে পারে।

শ্রমশিল্পের স্থানীয়করণের ফলে (localisation of Industries) কিছু অসুবিধাও রহিয়াছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য যদি ভিন্ন ভিন্ন ধরণের শ্রমিকদের

প্রয়োজন না হয়, যদি একই ধরণের শ্রমিক প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে শ্রমের মজুরী বেশী পড়িয়া যাইবে, স্থতরাং উৎপাদনের খরচের পড়তা বেশী পড়িবে। লৌহ কারখানার জন্য শুধু সবল শ্রমিক প্রয়োজন ; এখন লৌহ শিল্পের নিকট যদি অন্যান্য শিল্প গড়িয়া উঠে, যেখানে শ্রমিক পরিবারের স্ত্রীলোকরা বা যাহারা লৌহ কারখানায় কাজ করিবার অনুপযুক্ত, তাহারা কাজ পাইতে পারে, তাহা হইলে, লৌহকারখানার শ্রমিকদিগকে বেশী হারে মজুরি দিতে হইবে। নতুবা, শ্রমিকদিগের মধ্যে অসন্তোষ স্থষ্টি হইবে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য অস্থবিধা এই যে, যদি একই ধরণের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি এক একস্থানে গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে কোনও শিল্পজাত দ্রব্যের বাজারে মন্দা উপস্থিত হইলে অথবা শিল্পটির প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল বা কয়লা সরবরাহে বিঘ্ন ঘটিলে, ঐ স্থানের শ্রমিকদিগকে এবং সাধারণভাবে সকলকে, খুবই দুর্দ্দশার মধ্যে পড়িতে হইবে। যদি এক স্থানে একই ধরণের শিল্প না গড়িয়া উঠিয়া, কয়েকটি বিভিন্ন শিল্প গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে একটি শিল্পের বাজারে মন্দা ঘটিলেও, অন্য শিল্পগুলি সমান চালু থাকিতে পারে, এবং ফলে, একটি শিল্পের মন্দা জনিত কষ্টে শ্রমিকগন ও স্থানীয় জনসাধারণ অভিভূত হইয়া পড়িবে না।

বৃহৎমাত্রায় উৎপাদন
(Large Scale Production)

বর্ত্তমান যুগে অধিকাংশ জিনিষের উৎপাদন ব্যবস্থা এরূপ যে উৎপাদন আর অল্প অল্প করিয়া ধীরে ধীরে হয় না, এক সঙ্গে দ্রুতগতিতে বিপুল পরিমাণে দ্রব্য উৎপন্ন হয়। গ্রামে এখনও তাঁত প্রভৃতি কুটীর শিল্প রহিয়াছে। তন্তবায় তাহার বাড়ীর লোকজনের সহায়তায় প্রতিদিন বা একদিন ছাড়া একটি করিয়া কাপড় বুনিতে পারে। গ্রামের তাঁতশিল্প এককালে অল্প পরিমাণে জিনিষ উৎপাদনের (small scale production) দৃষ্টান্ত। আর কাপড়ের কল এক কালে বহু পরিমাণ মাল উৎপাদনের (large scale production) দৃষ্টান্ত। আধুনিক কাপড়ের কলে হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করে, রোজ হাজার হাজার গজ কাপড় ও হাজার হাজার পাউণ্ড স্থতা উৎপন্ন হয়। এইরূপ পাটকল, লৌহের কারখানা প্রভৃতি বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিপুল পরিমাণ যন্ত্রপাতি সহযোগে বহু শ্রমিক এক সঙ্গে কাজ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে দ্রব্য সম্ভার উৎপন্ন করে। ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের সময় হইতে এককালে

বিপুল উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার লাভ হইয়াছে, এবং ক্রমশঃ অধিকতর বৃহৎকায় কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়া উৎপাদন ব্যবস্থা অধিকতর পণ্যোৎপাদনের উপযোগী হইয়াছে। ক্রমশঃ অধিক জটিল ও ব্যাপক শ্রমবিভাগ প্রবর্ত্তন এবং ক্রমশঃ অধিক যন্ত্রপাতি প্রয়োগের ফলেই এককালীন লাভজনক বিপুল উৎপাদন ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে।

এককালীন বহুল উৎপাদনের সুযোগ সুবিধা

(Advantages of Large Scale Production)

উৎপাদন ব্যবস্থা বিরাট হইলে যে সকল সুযোগ-সুবিধা লাভ করা যায়, অধ্যাপক মার্শ্যাল (Prof. Marshall) তাহাদিগকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন, (১) internal economies, এবং (২) external economies ; Internal economies বলিতে সেই সব সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বুঝায়, যেগুলি মালিক তাহার ব্যবসা বাড়াইলে বর্দ্ধিত আকারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হইতেই লাভ করিতে পারে ; external economies বলিতে সেই সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বুঝায়, যেগুলি মালিক, সাধারণ ভাবে শিল্পের বিস্তার ও উন্নতি হইতে লাভ করে।

শিল্প-প্রতিষ্ঠান খুব বৃহৎ হইলে, খুব ব্যাপক শ্রমবিভাগ এবং অধিক যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। প্রত্যেকটি লোককে তাহার উপযুক্ত কাজ বণ্টন করিয়া দেওয়া যায়। বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বহু সুদক্ষ লোক নিযুক্ত করিয়া বিভিন্ন বিভাগে তাহাদের অভিপ্রায় ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দেওয়া যাইতে পারে। বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি অধিক বেতন দিয়া কর্ম্ম-কুশল ও বৈজ্ঞানিক কারিকর এবং উপযুক্ত বিভাগীয় ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়া ব্যবসায় সংগঠন উন্নত করিতে পারে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন হার অনেক বাড়াইতে পারে। তাহা ছাড়া বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানই সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক ও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি কিনিয়া উৎপাদন ব্যবস্থা সর্ব্বাধিক উন্নত ও লাভজনক করিতে পারে। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে, কয়লা প্রভৃতি শিল্প-চালক শক্তি কম ব্যয় হয়, এবং মোটের উপর অল্প ব্যয়ে অধিক উৎপাদন হয়। এইরূপ প্রতিষ্ঠানেই যন্ত্রপাতি বা উৎপাদন ব্যবস্থা বা সংগঠন সম্পর্কে ব্যয়সাধ্য গবেষণা চালানো সম্ভব। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বৃহৎ বৃহৎ লৌহ-শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ গবেষণা কার্য্যে অনেক ব্যয় করিয়া থাকে এবং নূতন নূতন গবেষণা দ্বারা ব্যবসায় জগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠাকে সুদৃঢ় করিয়া লয়। তাহা

ছাড়া বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি আনুসঙ্গিক মাল বা bye-product সমূহকে লাভজনক কাজে লাগাইতে পারে। শিকাগো সহরের মাংস প্যাক করিবার কারখানায় পশুর খুর, লোম প্রভৃতি bye-product বিবিধ কাজে লাগাইয়া প্রভূত আয় হইয়া থাকে। বড় বড় চিনির কলে, bye-product ঝোলা গুড় হইতে এ্যালকোহল (alcohol) প্রস্তুত করিবার জন্য আলাদা কল বসানো হইয়া থাকে। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে কাঁচামাল, কয়লা, প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষ এক সঙ্গে অনেক পরিমাণে কিনিতে হয়। কাজেই এই সব জিনিষ সুবিধা দরে ও সুবিধাজনক সর্ত্তে পাওয়া সম্ভব হয়। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিবার বেলায়ও বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান অনেক সুবিধা পায়। এইরূপ প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকারের বিপুল পণ্য সম্ভার থাকে বলিয়া, খরিদ্দার সহজেই আকৃষ্ট হয় ও ভাল মূল্যে মাল বিক্রয় সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব একটা খ্যাতি গড়িয়া উঠে, যে জন্য বহু খরিদ্দার পাওয়া যায় ও প্রভূত পরিমাণে মাল বিক্রয় করা সম্ভব হয়। বেশী পরিমাণে মাল কেনা-বেচা হয় বলিয়া, রেলগাড়ী প্রভৃতিতে মাল চালান দিবার সময় অথবা আনিবার সময় সুবিধাজনক সর্ত্ত পাওয়া যায়। ঐসব সুবিধা ব্যতীত, বড় প্রতিষ্ঠানের আর একটি সুবিধা হইতেছে এই যে, ইহার বিজ্ঞাপনের ব্যয় তুলনায় কম পড়ে। বর্ত্তমান ব্যবসা জগতে বিজ্ঞাপনের কৌশল ছাড়া কোনও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্থান পাওয়া সম্ভব নহে। বড় প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপনে অনেক বেশীও ব্যয় করিতে পারে, কিন্তু তবু, ছোট প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বড় প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের ব্যয় কম পড়ে। বড় প্রতিষ্ঠান বেশী বিজ্ঞাপন দেয় বলিয়া সস্তা হারে বিজ্ঞাপন দিতে পারে, এবং মোট বেশী বিজ্ঞাপন দিতে পারে বলিয়া সহজেই বেশী মাল কাটতি করিতে পারে। এসব কথা ছাড়াও, বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যাঙ্ক প্রভৃতির নিকট হইতে সহজেই টাকা ধার পাইতে পারে এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাইতে পারে।

উল্লিখিত সুযোগ সুবিধা ছাড়াও, বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান আরও কতকগুলি সুবিধা লাভ করে। কোনও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আকার যখন বাড়িয়া যায়, অথবা, কতকগুলি একই ধরণের শিল্প-প্রতিষ্ঠান যখন এক স্থানে গড়িয়া উঠে, তখন, শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ এক স্থানে শিল্প গড়িয়া উঠিবার যে সব সুযোগ-সুবিধা,—যথা, দক্ষ শ্রমিক সরবরাহ, স্থানীয় উৎপাদনের খ্যাতি, প্রভৃতি—ভোগ করিয়া থাকে।

বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অসুবিধা

(Disadvantages of Large Scale Production)

যদিও শিল্প প্রতিষ্ঠান বৃহদাকার হইলে অনেকগুলি সুযোগ-সুবিধা লাভ করা সম্ভব হয়, তথাপি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যে ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়াই চলিবে, এবং ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান একেবারেই লোপ পাইবে এমন কোনও কথা নাই। প্রথম কথা হইতেছে এই যে, বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলি যে সুযোগ-সুবিধা পায়, তাহা যে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর শিল্প-প্রতিষ্ঠানে সমানভাবে বাড়িয়া চলিবে তাহার কোনও স্থিরতা নাই। শিল্প-প্রতিষ্ঠান খুব বড় হইয়া পড়িলে তাহা পরিচালন করা ক্রমশঃ দুরূহ হইয়া পড়ে। খুব বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের বহু কর্ম্মী ও বহু বিভাগ সুষ্ঠুভাবে চালনা করিবার মত নায়কের (Captain of industry) একান্ত অভাব। এই পরিচালনার অসুবিধার জন্যই, একটা সীমার পর আর শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির আকার বাড়িতে পারে না।

ইহা ছাড়া বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের আর একটি অসুবিধা আছে। শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার উপরও শিল্পের বৃহদাকার নির্ভর করে। শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা যদি কম থাকে, অথবা শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়িবার সম্ভাবনা যদি না থাকে, তাহা হইলেও শিল্প-প্রতিষ্ঠান বেশী বৃহদাকার হইতে পারে না।

ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সুবিধা

(Advantages of Small Scale Production)

বৃহৎ শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বহু সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমাগত টিকিয়া রহিয়াছে। ক্ষুদ্র উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

প্রথমতঃ, ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মালিক ব্যক্তিগত ভাবে তাহাদের ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করিতে, সমস্ত ব্যাপারে খোঁজখবর লইতে ও দেখা-শুনা করিতে পারে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তাহাদের ব্যবসায়ের খুঁটিনাটি বিষয়ও তত্ত্বাবধান করিতে পারে। প্রত্যেকটি কর্ম্মচারী তাহাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কাজ করে। কোনও কর্ম্মচারী অলসতা বা অবহেলা করিয়া তাহাদের কাজে ফাঁকি দিতে পারে না। সুতরাং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কম খরচে উৎপাদন করিতে পারে। তাহা ছাড়া, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নিজে তাহার খরিদ্দারদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া প্রত্যেকের পছন্দ ও প্রয়োজনমত মাল সরবরাহ করিতে পারে। বর্ত্তমান কালে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী উৎসাহ-উদ্যমসহকারে কাজ আরম্ভ করিলে

প্রভূত সাফল্য লাভ করিতে পারিবে। তাহা ছাড়া, যেখানে ব্যক্তিগত পছন্দমত বা রুচিমত মাল সরবরাহ করিতে হইবে,—যেমন, দর্জ্জির ব্যবসায়ে,—অথবা, যেখানে খুব সৌখীন সুরুচিসঙ্গত বিভিন্ন প্রকার জিনিষ সরবরাহ করিতে হইবে, —যেমন, শান্তিপুরী বা বেনারসী শাড়ী, সেই সব স্থানে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অবশ্য— জয়লাভ করিবে। এককালীন প্রভূত মাল উৎপাদনকারী বৃহদাকার শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি সেখানে সফলতা লাভ করিতে পারিবে না।

বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসার প্রতিষ্ঠান

(Different Forms of Business Organisation)

অনেক সময় একব্যক্তিই ব্যবসায়ের মালিক ও পরিচালক হইতে পারে। ইহাই হইল ব্যবসায়ের আদি ও সর্ব্বাপেক্ষা সহজবোধ্য রূপ। এইরূপ ক্ষেত্রে মালিক তাহার নিজের টাকা অথবা এবং অপরের নিকট হইতে ঋণ করিয়া সংগৃহীত মূলধন ব্যবসায়ে নিয়োগ করে এবং নিজের ব্যবসায় নিজেই পরিচালন করে। ইহাকে ইংরাজীতে the single entrepreneur system বলে। এই ব্যবস্থায় মালিক নিজেই কর্ম্মচারী ও শ্রমিক নিযুক্ত করে, নিজেই উৎপাদনের বস্তু ও পরিমাণ নির্ণয় করে এবং উৎপন্ন বস্তু বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। একজন মাত্র মালিক থাকার জন্য ব্যবসায়ের নীতি স্থির নির্দ্দিষ্ট থাকে, অথচ তাহা প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্ত্তন করা কঠিন হয় না। এইরূপ ব্যবসায় খুবই ভালভাবে মিতব্যয়িতার সহিত পরিচালিত হয়। কারণ, মালিক-পরিচালক নিজেই সব বিষয় দেখা-শুনা করে এবং লাভ হইলে তাহা সম্পূর্ণ মালিকের প্রাপ্য হইবে বলিয়া সর্ব্বদা সজাগ হইয়া শ্রম-সহকারে ব্যবসায়ের পরিচালন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগে কম মূলধনে ব্যবসায় পরিচালন করা যায় না, অধিকাংশ শিল্প-ব্যবসায় পরিচালন করিতে বিপুল মূলধন আবশ্যক। এই বিপুল মূলধন কোনও এক ব্যক্তির পক্ষে দেওয়া সম্ভব নহে। আর তাহা ছাড়া,— যদি কাহারও বিপুল মূলধন থাকে ও ব্যবসায়জগতে সাফল্যের অনিশ্চয়তা থাকে, তাহার পক্ষে সমস্ত মূলধন ব্যবসায়ে নিয়োগ করা খুব দুঃসাহসের ব্যাপার। যদি ব্যবসায়ের মালিক ও পরিচালক এক ব্যক্তি হয়, ব্যবসায় ব্যর্থ হইলে তাহার সমস্ত মূলধন ডুবিয়া যাইতে পারে এবং তাহার সর্ব্বনাশ হইতে পারে। ব্যবসায়ে বিফলতা এবং তজ্জনিত দায়িত্ব ও বিপদের সম্ভাবনা এইরূপ ব্যবসায়ের মস্ত বড় বাধা। তা'ছাড়া, যেখানে একই ব্যক্তি মালিক ও পরিচালক, সেখানে ব্যবসায়

বৃহৎ হইবার সম্ভাবনা কম, কারণ, একজনের পক্ষে ব্যবসায়ের সমস্ত দিক ভাল করিয়া তত্ত্বাবধান ও বন্দোবস্ত করা দুঃসাধ্য।

অংশীদারি
(Partnership)

ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত কয়েক জন মিলিয়া একত্র জুটিয়া অংশীদারি ব্যবসায় গড়িতে পারে। প্রধানতঃ অংশীদারগণের নিকট হইতে ব্যবসায়ের মূলধন সংগৃহীত হয়, অংশীদারগণ সমবেতভাবে ব্যবসায়ের মালিক হইয়া ব্যবসায় পরিচালনের ঝুঁকি গ্রহণ করে। অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, একক ব্যবসায় পরিচালন অপেক্ষা বেশী মূলধন সংগৃহীত হয়। ব্যবসায়ের ঝুঁকি ও বিপদ অংশীদারি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সকল অংশীদার বহন করে। এই ব্যবস্থার ফলে, যাহার হয়ত নিজের মূলধন আছে, কিন্তু ব্যবসায় বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা নাই, সে ব্যবসায়ী কোনও ব্যক্তিকে অংশীদাররূপে লইয়া অংশীদারি ব্যবস্থা করিয়া ব্যবসায়ে নামিতে পারে। কোনও একক ব্যবসায়ী তাহার বৃদ্ধ বয়সে সুযোগ্য কোনও কর্ম্মচারীকে অংশীদার করিয়া ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব ও উন্নতিবিধান করিতে পারে।

অংশীদারি কারবারের একটা অসুবিধা এই যে অংশীদাররা নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ হেতু একযোগে কাজ করিতে অক্ষম হইলে ব্যবসায় ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। আর সবচেয়ে বড় অসুবিধা হইতেছে এই যে অংশীদারি ব্যবসায়ে অংশীদারদের সীমাহীন দায়িত্ব (unlimited liability) থাকে, অর্থাৎ যদি কোনও কারণে অংশীদারি ব্যবসায়ের দেনা হয়, তাহা হইলে মহাজন যে কোনও অংশীদারের নিকট হইতে তাহার সমস্ত প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া লইতে পারে। অংশীদারদের এই অসীম দায়িত্বের আইন থাকায় অংশীদারি ব্যবসায়ের বেশী প্রসারলাভ করা কঠিন। তাহা ছাড়া, বর্ত্তমানের বৃহদাকার ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্য যে বিপুল পরিমাণ মূলধন আবশ্যক, তাহা অংশীদারি ব্যবসায়ের কয়েকজন অংশীদারের নিকট হইতে সংগ্রহ করা কঠিন। ইহার জন্য আবশ্যক জয়েণ্ট্ ষ্টক কোম্পানি।

জয়েণ্ট্ ষ্টক কোম্পানি
(Joint Stock Company)

ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের আধুনিক রূপ হইল জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানি। যান্ত্রিক উন্নতি ও উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত ইংলণ্ড ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশে জয়েণ্ট

ষ্টক কোম্পানির উদ্ভব হয়। অনেক লোক মিলিয়া অংশ (share) কিনিয়া জয়েণ্ট কোম্পানি গঠন করিয়া থাকে। শেয়ার-হোল্ডারগণই কোম্পানির আসল মালিক। শেয়ার-হোল্ডারগণ কয়েকজন ডিরেক্টর (director) নির্ব্বাচিত করিয়া দেয়। এই নির্ব্বাচিত ডিরেক্টর-সভার (Board of Directors) উপর কোম্পানির ব্যবসায় পরিচালনের ভার থাকে। ডিরেক্টর-সভা তাহাদের কার্য্যের জন্য শেয়ার-হোল্ডারদের নিকট দায়ী থাকে। জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানির প্রধান বিশেষত্ব এই যে প্রত্যেক শেয়ার-হোল্ডারের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ (limited liability)—যে যত শেয়ার লইয়াছে, কোনও অবস্থাতেই, তাহার ততগুলি শেয়ারের টাকার বেশী আর কিছুই দিতে হইবে না। সুতরাং কোম্পানি কোনও কারণে ফেল পড়িলে, কোম্পানির দেনার দায়ে মহাজন কোনও শেয়ার-হোল্ডারের শেয়ারের টাকার অতিরিক্ত তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে হাত দিতে পারে না।

জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানির সুবিধা-অসুবিধা

(Advantages and Disadvantages of Joint Stock Companies)

জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানির শেয়ার সহজে হস্তান্তর যোগ্য এবং শেয়ার-হোল্ডারদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ (limited liability)—ফলে, লোকে আগ্রহ করিয়া কোম্পানির শেয়ার কিনিয়া টাকা খাটায়। বর্ত্তমান যুগে প্রচুর মূলধন সহযোগে অতিকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান না গড়িলে প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করা কঠিন। জয়েণ্ট ষ্টক কোম্পানি গঠন করিলেই তবে প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব। বহু ধনী লোক আছে, যাহাদের নিজেদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চালানোর ক্ষমতা নাই, তাহারা কোম্পানির শেয়ার কিনিয়া টাকা খাটায় ও লাভ ভোগ করে। অতি-অল্পবিত্ত লোকেরাও কোম্পানির শেয়ারে টাকা নিয়োগ করিতে পারে। যাহাদের ব্যবসায় বুদ্ধি আছে, অথচ টাকা নাই, তাহারা কোম্পানিতে চাকরি গ্রহণ করিতে পারে।

জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানির দোষও রহিয়াছে। শেয়ার-হোল্ডারগণ বিভিন্ন স্থলে ছড়াইয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে একত্র হইয়া কোম্পানির কাজ-কর্ম্ম দেখা বা খোঁজখবর লওয়া সম্ভব নহে। অধিকাংশ শেয়ার-হোল্ডারই কোম্পানির কাজ-কর্ম্মের কোনও খোঁজখবর রাখে না, তত্ত্বাবধান করা ত দূরের কথা। ডিরেক্টারবর্গ যদি অসাধু হয়, তাহা হইলে তাহারা সহজেই শেয়ার-হোল্ডারদিগকে প্রতারিত করিয়া কোম্পানির সর্ব্বনাশ ও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিতে পারে।

তাহা ছাড়া, জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিতে ব্যবসায় পরিচালনের ভার বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে, কিন্তু বেতনভোগী কর্ম্মচারীরা কোম্পানির সাফল্যে প্রকৃত আগ্রহ ও উৎসাহ বোধ করিতে না পারে।

শিল্প-সমবায়
(Industrial Combination)

কতকগুলি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান একত্র হইয়া এক নূতন রূপ সংযুক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়িতে পারে। যখন বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তাহাদের পণ্য বিক্রয়ের জন্য একত্র হইয়া একটি সাধারণ সঙ্ঘ গড়িয়া তুলে, তখন আমরা কার্টেলের (Kartell) উদাহরণ পাই। সাধারণ-সঙ্ঘ স্থির করিয়া দেয় মোট কত পণ্য উৎপন্ন হইবে, কোন প্রতিষ্ঠান কত পণ্য উৎপন্ন করিবে এবং কোন্ মূল্যে উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় হইবে। প্রত্যেক ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান অন্যান্য ব্যাপারে নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখে। জার্ম্মানিতে এই কার্টেলের উদ্ভব ও বিস্তার হইয়াছিল। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি একত্র যখন আপনাদের পৃথক সত্তা বিসর্জ্জন দিয়া এবং নিজেদের পৃথক পরিচালনের অধিকার ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন সঙ্ঘ গড়িয়া তুলে, তখন ট্রাষ্টের (Trust) উদাহরণ পাওয়া যায়। ট্রাষ্ট (Trust) স্থির করিয়া দেয়, কোন্ প্রতিষ্ঠান কিভাবে কত পণ্য প্রস্তুত করিবে, কোন্ প্রতিষ্ঠান খোলা থাকিবে অথবা বন্ধ হইবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাষ্টের বহু উদাহরণ পাওয়া যায়, যথা, ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানি, টোব্যাকো ট্রাষ্ট প্রভৃতি।

একই ব্যবসায়ে রত কতকগুলি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান একত্র মিশিয়া এক কর্তৃত্বাধীনে নূতন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গঠন করিলে, আমরা Horizontal Cambination এর দৃষ্টান্ত পাই। নিউ ইয়র্ক-এর ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানি ইহার উদাহরণ। কতকগুলি পাট কল, কাপড়ের কল প্রভৃতি একই প্রকার পণ্য উৎপাদনকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এক সঙ্গে মিশিয়া সাধারণ কর্তৃত্বাধীনে নূতন প্রতিষ্ঠান করিলে তাহাকে-ও Horizontal Combination বলা যায়। যখন কাঁচা মাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, কয়লা প্রভৃতি শক্তি-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্পজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি একটি পণ্য উৎপাদন করিতে ও বিক্রয় করিতে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যে সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দরকার হয়, তাহারা যখন সকলে একত্র হইয়া মিশিয়া একই কর্তৃত্বাধীনে নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করে, তখন Vertical Combination এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

জামসেদ পুরের, টাটা আয়রণ ও ষ্টীল কোম্পানি ইহার উদাহরণ। এই কোম্পানির নিজস্ব কয়লা খনি, লৌহখনি, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি লৌহ প্রস্তুতের জন্য আবশ্যক ধাতুর খনি, লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুতের কারখানা প্রভৃতি, লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুতের জন্য যে সমস্ত জিনিষ দরকার সমস্ত প্রস্তুতের প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে।

সরকারী কর্ত্তৃত্বে ও তত্ত্বাবধানেও অনেকগুলি শিল্প ও ব্যবসায় পরিচালিত হইয়া থাকে, যথা, রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ প্রভৃতি। এই বিষয়গুলি সাধারণ কোম্পানি বা ব্যবসায়ীর হাতে ছাড়িয়া দিলে সাধারণের ক্ষতি হইবে।

শ্রমিকগণ নিজেরাই মূলধন দিয়া সমবায় পদ্ধতিতে ব্যবসা পরিচালিত করিতে পারে। এই পদ্ধতিতে শ্রমিকগণ নিজেরাই ব্যবসায়ের লাভ উপভোগ করে এবং ক্ষতি বহন করে। ইহাতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার গলদগুলি দূর হইতে পারে।

নবম অধ্যায়

উপযোগিতা ও অভাব

(Utility and Wants)

এ পর্য্যন্ত উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। মানুষ কোনও জড়বস্তু উৎপাদন করিতে পারে না। অর্থনীতির মতে মানুষ শুধু উপযোগিতা (Utility) সৃষ্টি করিতে পারে। যে জিনিষ আগে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী ছিল না, পরিশ্রম করিয়া মানুষ তাহাকে উপযোগী করিতে পারে, অথবা যে জিনিষ কম উপযোগী ছিল, মানুষ পরিশ্রম করিয়া তাহাকে অধিক উপযোগী করিতে পারে। যখন কোনও উৎপন্ন বস্তু ব্যবহার বা উপভোগ (Consumption) করা হয়, তখন সেই বস্তুর যে উপযোগ তাহাই ভোগ করা হয়। মানুষ যখন একটা চেয়ার বা টেবিল ব্যবহার করে, তখন সে ঐ সব বস্তুতে উৎপাদিত উপযোগিতা (Utility) উপভোগ করে, যখন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, তখন গৃহ প্রস্তুতের দ্বারা যে উপযোগিতা সৃষ্টি হইয়াছে তাহাই উপভোগ (consume) করে।

মানুষ বিবিধ অভাব মিটাইবার জন্য শ্রম-সহকারে সম্পদ উৎপাদন করে, উপভোগ করিয়া তাহার অভাব পরিতৃপ্ত করে। বন্য, সরলপ্রকৃতি ও অনাড়ম্বর লোকের সমাজে অভাববোধ কম, সেখানে প্রাণধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু ছাড়া অন্য জিনিষের অভাববোধ বেশী নাই, কাজেই তাহাদের সমাজে উৎপাদনের সীমাও কম। আধুনিক সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে মানুষের অভাববোধ ও উৎপন্ন সম্পদসম্ভার পাল্লা দিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। কাজেই এখানে উৎপাদন-ক্ষেত্রের সীমা ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে মানুষের অভাবও বিভিন্ন হইয়া থাকে। মানুষের কতকগুলি অভাব মূলতঃ এক রকম হইলেও, দেশভেদে মানুষের অভাবের বৈচিত্র্যের সীমা নাই। মানুষের শারীরিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার উপর মানুষের অভাবের বিভিন্নতা নির্ভর করে।

মানুষের অভাবের বিভিন্নতা সত্ত্বেও, সাধারণভাবে সর্ব্বত্র অভাবের মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, মানুষের অভাবের কোনও সীমা নাই। একটি অভাব পূরণ হইতে না হইতে আর একটি অভাবের

কথা মনে হয়। প্রতিদিনই মানুষের অভাব বাড়িয়া চলে। মানুষের মোটামুটি খাদ্যের অভাব মিটিলে, সুস্বাদু খাদ্যের অভাব মনে জাগে, মোটা বস্ত্রের অভাব মিটিলে, সৌখীন বস্ত্রের অভাব মনে হয়, নিত্য নূতন নূতন জিনিষের কামনা ও অভাব মানুষকে পীড়িত করে।

সাধারণ ভাবে মানুষের অভাব সমূহের অন্ত নাই বটে, তবে, বিশেষ যে কোনও অভাব পরিতৃপ্ত করা সম্ভব। যেমন, কাহারো এক বিশেষ কোনও খাদ্যের অভাব মিটানো সম্ভব, সেই এক খাদ্য তাহাকে দিলে ক্রমশঃ তাহার অভাব কমিয়া আসিবে, শেষে সেই এক খাদ্যের অভাব আর তাহার থাকিবে না। সেইরূপ, যদি কাহারো তৃষ্ণা পায়, তাহাকে পানীয় দিলে ক্রমশঃ তাহার পানীয়ের অভাব কম হইয়া আসিবে, শেষে পানীয় আর থাকিবে না। কাহারো যদি এক প্রকার বস্ত্র প্রয়োজন হয়, তাহাকে সেই একই প্রকার বস্ত্র দিলে, ক্রমশঃ সেই বস্ত্রের অভাব তাহার কমিয়া আসিবে। অবশেষে, সেই প্রকার বস্ত্রের অভাব তাহার আর থাকিবে না। এইভাবে বলা যায় যে, মানুষের অভাবসমূহ সীমাহীন হইলেও, যে কোনও অভাব সীমাযুক্ত। তাহা পরিতৃপ্ত করা সম্ভব।

মানুষের অভাবসমূহ অসংখ্য, অথচ মানুষের বিত্ত এত বেশী নাই যে সমস্ত অভাব মিটাইতে পারে। সুতরাং যে অভাবগুলি খুব তীব্র, যেগুলি আগে পূরণ করা দরকার, সেগুলি মানুষ সর্ব্বাগ্রে পরিতৃপ্ত করে, আর যে অভাবগুলি তত তীব্র নহে, যাহা দুদিন পরে পূরণ করিলে চলিবে, সেগুলি তখন পরিতৃপ্ত করে না। কাজেই অভাবগুলি পরিতৃপ্তি লাভের জন্য যেন পরস্পর প্রতিযোগিতা (Competitive) হইয়া উঠে, যে অভাব যত তীব্র, তাহা তত আরো পরিতৃপ্ত করা হয়।

কোনও কোনও অভাব আবার পরস্পর-পরিপূরক। একটি অভাব মিটাইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য অভাব মিটাইবার দরকার হয়। পেট্রল না হইলে মোটর গাড়ী চলিবে না। অতএব পেট্রল ও মোটর গাড়ীর অভাব পরস্পর পরিপূরক। এইরূপ এক সঙ্গে দুই তিন বা ততোধিক অভাব পূরণ করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

বিভিন্ন রকমের অভাব

(Classification of Wants)

কতকগুলি জিনিষ আমাদের প্রাণধারণের জন্য, অথবা স্বাস্থ্য ও কর্ম্মক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য অপরিহার্য্য। এই সব অপরিহার্য্য দ্রব্যসমূহকে

(Necessaries) আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়: কতকগুলি জিনিষ আমাদের নিছক প্রাণরক্ষার জন্য আবশ্যক (Necessaries for Existence), কতকগুলি জিনিষ আমাদের কর্ম্ম-ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য আবশ্যক, (Necessaries for Efficiency), এবং কতকগুলি জিনিষ আমাদের বহুদিনের আচরিত প্রথা বা আচারের জন্য আবশ্যক (Conventional Necessaries)।

কতকগুলি জিনিষ না হইলে প্রাণধারণ করাই সম্ভব নহে। কতক পরিমাণ খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান ব্যতীত মানুষের বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নহে। এইগুলি হইল প্রাণধারণের জন্য অপরিহার্য্য জিনিষ (Necessaries for Existence.) শুধু প্রাণে টিকিয়া থাকিলেই ত চলিবে না; মানুষকে কাজ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে ও তাহা বজায় রাখিতে হইবে। এই জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ভাল খাদ্য, ভাল বস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজন। এইগুলি হইল কর্ম্মপটুতার্থে অপরিহার্য্য দ্রব্য (Necessaries for Efficiency); আবার কতকগুলি জিনিষ আছে, যাহা মানুষের না হইলেও চলিতে পারিত, কিন্তু যাহা বহুদিনের অভ্যাস বা প্রচলিত প্রথার ফলে, আবশ্যক বস্তুতে পরিণত হইয়াছে। ইহাদিগকে বলা হয় Conventional Neccssaries; চা, পান, তামাক প্রভৃতি এইরূপ জিনিষ। এইগুলি অভ্যাসে পরিণত হইয়া এত অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে যে, কোনও কারণে আয় কমিয়া গেলে, মানুষ বরং প্রাণধারণের জন্য আবশ্যক জিনিষ কিছু কমাইয়াও এই সব জিনিষ ক্রয় করিবে।

অপরিহার্য্য দ্রব্য (Necessaries) ছাড়া কতকগুলি জিনিষ আছে যাহাকে বলা হয় আরামের জিনিষ (Comforts) বা সুখকর সামগ্রী। এই সব জিনিষ মানুষের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও আনন্দদায়ক করিয়া তুলে। সুন্দর সুসজ্জিত বাড়ী, আসবাব পত্র, সাবান, গন্ধদ্রব্য, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি এই শ্রেণীর জিনিষ। আর একপ্রকার জিনিষ আছে যাহা হইল বিলাস-দ্রব্য (Luxuries)। যাহা না হইলে আমাদের প্রাণধারণের বা কর্ম্মকুশলতার কোনও ক্ষতি হয় না, অথচ যাহা পাইতে আমাদের বহু ব্যয় হইয়া যায়, ইহাকে আমরা বিলাস-সামগ্রী (Luxuries) বলিয়া থাকি।

অপরিহার্য্য দ্রব্য (Necessaries), আরামের জিনিষ (Comforts) এবং বিলাসের জিনিষ (Luxuries)—এগুলি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যে জিনিষ পূর্ব্বে হয়ত বিলাসের জিনিষ (Luxury) বলিয়া পরিগণিত হইত, আজ হয়ত তাহা অপরিহার্য্য জিনিষ (Necessary)

রূপে গণ্য হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, একশত বৎসর পূর্ব্বে এক কাপ চা পৃথিবীর অনেক দেশেই বিলাসিতা বলিয়া গণ্য হইত; আজ বহু দেশেই চা অপরিহার্য্য দ্রব্যরূপে গণ্য হইতেছে। ঠিক এই ভাবে আজ যে জিনিষ বিলাসের দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইতেছে, কালক্রমে তাহা হয়ত অপরিহার্য্য দ্রব্যে পরিণত হইবে। আবার, অপরিহার্য্য জিনিষের ধারণাও সামাজিক অবস্থা, রীতি-নীতি-প্রথা, আবহাওয়া এবং অন্যান্য অবস্থার উপর নির্ভর করে। বাঙ্গালীর পক্ষে ভাত-মাছ অপরিহার্য্য জিনিষ; কিন্তু পাঞ্জাবীর পক্ষে তাহা নহে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে ধুতি চাদর অপরিহার্য্য জিনিষ (Necessaries)। অপরিহার্য্য জিনিষ, আরামের জিনিষ এবং বিলাসের জিনিষের ধারণা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন রকম হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত লোকের কাছে বেড়াইবার জন্য মোটর গাড়ীর কথা ভাবাও বিলাসিতা, অথচ ধনী শ্রেণীর নিকট মোটর গাড়ী প্রয়োজনীয় জিনিষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। মধ্যবিত্ত বাড়ীর মহিলাদের নিকট কিছু স্বর্ণালঙ্কার প্রয়োজনীয় জিনিষ এবং হীরা-জহরৎ বিলাসের দ্রব্য বলিয়া গণ্য হয়। আর, ধনী মহিলাদের কাছে হীরা-জহরৎ প্রয়োজনীয় জিনিষ বলিয়া গণ্য এবং দরিদ্র সাধারণের কাছে স্বর্ণালঙ্কার বিলাসের জিনিষ বলিয়া গণ্য। ধনী লোকের কাছে যে খাদ্য পানীয় ও পরিধেয় প্রভৃতি অপরিহার্য্য জিনিষ বলিয়া গণ্য হয়, মধ্যবিত্ত লোকের কাছে তাহাই বিলাসের জিনিষ মনে হয়। আর একদিক দিয়া বিচার করিলে, সহরের একজন ডাক্তারের কাছে মোটর গাড়ী তাহার বৃত্তির জন্যই অপরিহার্য্য জিনিষ বলিয়া গণ্য, মধ্যবিত্ত লোকের কাছে সাধারণত মোটর গাড়ী বিলাসের জিনিষ। সাধারণভাবে, ঘড়ি, ফাউণ্টেন পেন, প্রভৃতি জিনিষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে অপরিহার্য্য (Necessaries), কিন্তু, দরিদ্র কৃষিজীবীর কাছে এগুলি বিলাসিতা (Luxuries) বলিয়াই গণ্য হইবে।

উপযোগিতা বলিতে কি বুঝায়?

(What is meant by Utility ?)

কোনও জিনিষের দ্বারা যখন মানুষের কোনও আকাঙ্খা মিটে, তখন সেই জিনিষের utility বা উপযোগিতা আছে বলা হয়। বাতাস, আলো, জল, ঘরবাড়ী, টেবিল, চেয়ার, বই-পত্র প্রভৃতি বহু জিনিষ আমাদের অভাব মিটায়,—এ সমস্তেরই utility বা উপযোগিতা আছে বলা যায়। মানুষের অভাব বা আকাঙ্খা মিটাইবার ক্ষমতাই হইল জিনিষের utility বা

উপযোগিতা। মানুষের অনেক অভাব বা আকাঙ্খা নৈতিক বিচারে সমর্থনীয় নহে, অনেক আকাঙ্খা পরিতৃপ্তির সহিত শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি জড়িত আছে, অনেক আকাঙ্খাই মানুষকে কল্যাণের পথে লইয়া যায় না। কিন্তু অর্থনীতিতে এই সব বিচার অবান্তর। যদি একটি জিনিষ মানুষের কোনও অভাব বা আকাঙ্খা পূরণ করে, তবে, তাহারই utility বা উপযোগিতা আছে ধরিতে হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মাদক দ্রব্য মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিষ নহে, ইহার ব্যবহারে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হইতে পারে, তথাপি যেহেতু বহু লোক মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতে আকাঙ্খা করে, সেই জন্য মাদক দ্রব্যেরও utility বা উপযোগিতা রহিয়াছে।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগের নিয়ম

(Law of Diminishing Utility)

মানুষের সকল অভাব কোনও দিন মিটে না, তবে, যে কোনও বিশেষ অভাব মিটিতে পারে। মানুষের অভাব সমূহের সীমা নাই ; কিন্তু প্রত্যেকটি অভাবের সীমা আছে। প্রত্যেকটি বিশেষ বিশেষ জিনিষের অভাব সীমাবদ্ধ এবং মানুষ যতই কোনও একটি জিনিষের অভাব পূরণ করিবার চেষ্টা করিবে, ততই সেই জিনিষের অভাব কম হইয়া সেই জিনিষের অভাব পরিতৃপ্ত হইয়া আসিবে। মানুষ কোনও একটি জিনিষ যত বেশী পরিমাণে পাইতে থাকিবে, ততই সেই জিনিষের আকাঙ্খা তাহার কমিয়া আসিবে। Law of Diminishing Utility (ক্রমহ্রাসমান উপযোগের নিয়ম) বলিতে ইহাই বুঝায়। মনে করা যাক, কাহারো বস্ত্রের অভাব। সে যদি পর পর একই ধরণের বস্ত্র পাইতে থাকে, তাহা হইলে ক্রমশঃ তাহার সেই ধরণের বস্ত্রের আকাঙ্খা কমিয়া আসিবে, এবং এমন এক অবস্থা আসিতে পারে, যখন সে সেই ধরণের বস্ত্র হইতে কোনও utility বা উপযোগ লাভ করিতে পারিবে না। মনে করা যাক, কোনও বালককে রসগোল্লা দেওয়া হইতেছে। প্রথম প্রথম তাহার রসগোল্লা খাইবার আকাঙ্খা খুবই বেশী, প্রথম কয়েকটি রসগোল্লা হইতে সে বেশী utility বা উপযোগ লাভ করিবে, কিন্তু তাহাকে যতই বেশী রসগোল্লা খাওয়ানো হইবে, রসগোল্লা খাইবার আকাঙ্খা তাহার ততো কমিয়া আসিবে, রসগোল্লা হইতে সে ক্রমশঃ কম উপযোগ লাভ করিবে, অবশেষে, রসগোল্লা খাইবার আকাঙ্খা তাহার চলিয়া যাইবে, রসগোল্লা হইতে কোনও utility বা উপযোগ আর সে পাইবে না। তাহার কাছে রসগোল্লার উপযোগিতা আর

কিছু থাকিবে না। এই ভাবে মানুষ একই জিনিষ যতই উপভোগ করিবে, ততই সেই জিনিষের উপযোগিতা তাহার কাছে কমিয়া আসে। প্রথম দফা জিনিষের যে utility বা উপযোগ ভোগ করে, দ্বিতীয় দফা জিনিষের utility বা উপযোগ তাহার চেয়ে কম হয়, তৃতীয় দফায় utility বা উপযোগ দ্বিতীয় দফার চেয়ে কম হয়, এই ভাবে জিনিষটি বেশী পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিনিষটির utility বা উপযোগ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে।

এই ভাবে একই জিনিষের অধিক পরিমাণ পাওয়ার সহিত তাহার utility বা উপযোগ কমে বলিয়া, সেই জিনিষের প্রথম দফার জন্য যে মূল্য দিতে আমরা প্রস্তুত হই, পরবর্ত্তী দফাগুলির জন্য আমরা ক্রমশঃ তাহার অপেক্ষা অল্প মূল্য দিতে চাই। প্রথম দফার utility বা উপযোগ বেশী, কাজেই, প্রথম দফার জন্য আমরা বেশী মূল্য দিতে পারি, কিন্তু পরবর্ত্তী দফার utility বা উপযোগ প্রথম দফার utility বা উপযোগ অপেক্ষা কম বলিয়া, পরবর্ত্তী দফার জন্য কম মূল্য দিতে চাই। কোনও জিনিষের জন্য আমরা যে মূল্য দিতে ইচ্ছুক, তাহা দিয়া আমাদের কাছে সেই জিনিষের উপযোগিতার পরিমাপ করিতে পারি। যে জিনিষের উপযোগিতা আমাদের কাছে যত বেশী, আমরা সেই জিনিষের জন্য তত বেশী মূল্য দিতে ইচ্ছুক হইব। যে জিনিষের উপযোগিতা আমাদের কাছে যত কম, আমরা সেই জিনিষের তত কম মূল্য দিতে চাহিব।

বালকের রসগোল্লা খাওয়ার দৃষ্টান্ত ধরা যাউক। রসগোল্লাগুলিকে এক সঙ্গে সমান দামে না দিয়া একটি একটি করিয়া দেওয়া হইতেছে। মনে করা যাক, বালকের রসগোল্লা খাওয়ার ইচ্ছা এত তীব্র যে, প্রথম রসগোল্লাটির জন্য বালক চার আনা দাম দিতে ইচ্ছুক হইবে। প্রথম রসগোল্লা খাওয়ার পর বালকের রসগোল্লা খাওয়ার ইচ্ছা কতকটা কমিল। দ্বিতীয় রসগোল্লা খাইবার ইচ্ছা প্রথম রসগোল্লা খাইবার ইচ্ছা অপেক্ষা কম হইবে। প্রথম রসগোল্লা হইতে যে পরিমাণ utility বা উপযোগ লাভ করিয়াছে, দ্বিতীয় রসগোল্লা হইতে সে তাহার চেয়ে কম utility বা উপযোগ লাভ করিবে। কাজেই, ধরা যাক, এবার দ্বিতীয় রসগোল্লার জন্য সে তিন আনার বেশী দিবে না। আরও রসগোল্লা যে খাইবার ইচ্ছা তাহার নাই তাহা নহে, কিন্তু, ইতিমধ্যে তাহার রসগোল্লা খাওয়ার ইচ্ছা অনেকটা মিটিয়াছে, কাজেই তৃতীয় রসগোল্লাটির জন্য সে দ্বিতীয় রসগোল্লাটির চেয়ে কম দাম দিতে রাজী হইবে। ধরা যাক, এবার সে মাত্র দশ পয়সা দিতে ইচ্ছুক। অনুরূপ ভাবে চতুর্থ রসগোল্লা পাইবার জন্য বালক

তৃতীয় রসগোল্লার অপেক্ষা কম দাম দিবে। ধরা যাক, চতুর্থ রসগোল্লার জন্য বালক মাত্র দুই আনা দিতে ইচ্ছুক হইবে। এইভাবে দেখা যায় যে, মানুষ একই জিনিষের যত বেশী পরিমাণ পাইবে, ততই সেই জিনিষের প্রতি আকাঙ্খা তাহার কমিবে এবং সেই জিনিষের প্রথম দফায় যে পরিমাণ utility বা উপযোগ লাভ করিয়াছে, পরবর্ত্তী দফায় তাহার অপেক্ষা কম utility বা উপযোগ লাভ করিবে। এই ভাবে, পর পর দফায় সেই জিনিষের utility বা উপযোগ পূর্ব্ববর্ত্তী দফার utility বা উপযোগ অপেক্ষা কম হইবে।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগের নিয়মের ব্যতিক্রম

(Limitations of the Law of Diminishing Utility)

কেহ কোনও জিনিষের যত বেশী পরিমাণ পাইতে থাকিবে, তাহার সেই জিনিষের প্রতি আকাঙ্খা ততই কমিতে থাকিবে, এবং তাহার সেই জিনিষের পরবর্ত্তী অংশগুলির utility বা উপযোগ পূর্ব্ববর্ত্তী অংশের utility বা উপযোগ অপেক্ষা কম হইবে, ইহার ব্যতিক্রম বিশেষ কিছু নাই। তবে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কোনও মানুষকে জিনিষটির দফায় দফায় যে পরিমাণ দেওয়া হইতেছে, তাহা যেন যুক্তিসঙ্গত পরিমাণ হয়। অধ্যাপক চ্যাপম্যান (Chapman) এ সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, যদি কোনও জিনিষের পরিমাণ খুব অল্প অল্প করিয়া বাড়াইয়া যাই, তাহা হইলে প্রথম প্রথম utility বা উপযোগ বাড়িয়া চলিবে। কয়লার কথা ধরা যাক। কয়লা যদি মণ হিসাবে না দিয়া আউন্স্ হিসাবে দেওয়া যায়, তাহা হইলে প্রথম প্রথম দিকে কয়লার কোনও utility বা উপযোগ নাই বলা চলে। কারণ, কয়লা একসঙ্গে কিছু বেশী পরিমাণ না পাইলে কোনও কাজে আসিবে না। কাজেই আউন্স্ হিসাবে কয়লার পরিমাণ বাড়াইয়া চলিবে। যতই বেশী আউন্স্ কয়লা জমিবে, ততই utility বা উপযোগ বাড়িয়া চলিবে। যখন উপযুক্ত পরিমাণ কয়লা জমিয়া যাইবে, কেবল তখনই পরবর্ত্তী পরিমাণ কয়লার utility বা উপযোগ কমিতে থাকিবে। অনুরূপ ভাবে, কাহারও তৃষ্ণার সময় যদি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্লাসে সরবত দেওয়া হয়, তাহা হইলে প্রথম প্রথম নূতন নূতন গ্লাস সরবতের utility বা উপযোগ পূর্ব্ববর্ত্তী গ্লাসের সরবতের utility বা উপযোগের চেয়ে না কমিয়া বাড়িয়া যাইতে পারে। তৃষ্ণা পরিতৃপ্তির দিকে আসিলেই পরবর্ত্তী পরিমাণ সরবতের utility বা উপযোগ কমিতে থাকিবে।

আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। জিনিষের বেশী পরিমাণ দিবার সময়ের মধ্যে ব্যক্তির রুচি ও অভ্যাস যেন অপরিবর্ত্তিত থাকে। রুচি ও অভ্যাস বদলাইলে বেশী পরিমাণ জিনিষের utility বা উপযোগ না কমিয়া বাড়িতে পারে।

আর একটি ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করা হয়। কৃপণের ধন-সঞ্চয়ের ইচ্ছা কোনও দিন কমে না, বরং বাড়িয়াই চলে। কিন্তু যে কৃপণ শুধু টাকা জমাইয়া চলে, খরচ করিবার কথা ভাবে না, তাহার কথা স্বতন্ত্র ; সে হইল অস্বাভাবিক জীব, আর অর্থনীতিতে আমরা স্বাভাবিক জীবের কথাই আলোচনা করি। লোকে ব্যয় করিবার জন্যই অর্থ সঞ্চয় করে। অর্থদ্বারা অন্যান্য জিনিষ কিনিয়া ভোগ করা যায়, ইহা অর্থের সার্থকতা।

প্রান্তিক উপযোগ ও সামগ্রিক উপযোগ
(Marginal Utility and Total Utility)

কোনও জিনিষের Total Utility বা সামগ্রিক উপযোগ বলিতে বুঝায় সেই জিনিষের সমস্ত দফায় utility বা উপযোগের যোগফল। মনে করা যাক, একটি বালক প্রথম একটি রসগোল্লার জন্য চার আনা দিতে ইচ্ছুক, এই রসগোল্লার utility বা উপযোগ তাহার নিকট চার আনার সমান। মনে করা যাক, দ্বিতীয় রসগোল্লাটির জন্য সে তিন আনা দিতে পারে, দ্বিতীয় রসগোল্লা হইতে সে তিন আনার সমান utility বা উপযোগ পাইতে পারে। তাহা হইলে দুইটি রসগোল্লা হইতে সে যে পরিমাণ utility বা উপযোগ ভোগ করিতে পারে তাহা চার আনা + তিন আনা = সাত আনার সমতুল্য। অতএব দুইটি রসগোল্লার total utility বা সামগ্রিক উপযোগের পরিমাপ সাত আনা। মনে করা যাক, বালকটি দশ পয়সা দিয়া তৃতীয় রসগোল্লা কিনিতে ইচ্ছুক। তাহা হইলে তৃতীয় রসগোল্লা হইতে বালক দশ পয়সার মত utility বা উপযোগ পাইতে পারে। তিনটি রসগোল্লা হইতে সে যে পরিমাণ utility বা উপযোগ পাইতে পারে তাহা চার আনা + তিন আনা + দশ পয়সা অর্থাৎ নয় আনা দুই পয়সার সমান। অর্থাৎ তিনটি রসগোল্লার total utility বা সামগ্রিক উপযোগিতার পরিমাণ সাড়ে নয় আনার।

Marginal utility বা প্রান্তিক উপযোগ বলিতে বুঝায় কোনও ব্যক্তি কোনও জিনিষের শেষ দফা হইতে কত উপযোগ পাইল। কোনও মানুষের কোনও জিনিষের একটি দফা লইয়া গেলে, তাহার যে পরিমাণ উপযোগ নষ্ট

হয়, তাহাই হইল সেই জিনিষের marginal utility বা প্রান্তিক উপযোগ; কিম্বা কোনও জিনিষের এক দফা বেশী হইলে যে পরিমাণ utility বা উপযোগ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইল সেই জিনিষের marginal utility বা প্রান্তিক উপযোগ। পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তে, বালকটি যখন তিনটি রসগোল্লা পাইয়াছে, তখন তাহার কাছে রসগোল্লার marginal utility বা প্রান্তিক উপযোগ হইতেছে, তৃতীয় রসগোল্লা হইতে সে যত utility বা উপযোগ পাইয়াছে তাহা অর্থাৎ দশ পয়সার সমতুল্য। রসগোল্লার marginal utility, তিনটি রসগোল্লার total utility বা সামগ্রিক উপযোগ হইতে দুইটি রসগোল্লার উপযোগ বিয়োগ করিলে পাওয়া যাইবে। ঠিক এই ভাবে বালকটি যদি চারটি রসগোল্লা পায়, তবে রসগোল্লার marginal utility বা প্রান্তিক উপযোগ চতুর্থ রসগোল্লার utility বা উপযোগের সমান, অথবা, চারটি রসগোল্লার total utility বা মোট উপযোগ হইতে তিনটি রসগোল্লার total utility বা মোট উপযোগ বিয়োগ করিলে পাওয়া যাইবে। এই আলোচনা হইতে আমরা দেখিতেছি যে, কোন জিনিষের পরিমাণ যতই হারানো যায়, সেই জিনিষের marginal utility বা প্রান্তিক উপযোগিতাও তত কমিতে থাকে, যদিও total utility বা সামগ্রিক উপযোগিতা বাড়িতে পারে।

দশম অধ্যায়

চাহিদা

(Demand)

চাহিদা বা Demand, এই কথাটির অর্থনীতিতে এক বিশেষ অর্থ আছে। যখন কোনও একটী জিনিষ আমরা পাইতে ইচ্ছা করি, তখন তাহার দ্বারাই সেই জিনিষের চাহিদা বা demand আছে, ইহা বুঝায় না। দরিদ্র ব্যক্তিরও মোটরগাড়ী চড়িবার ইচ্ছা জাগিতে পারে, অনেক সৌখীন জিনিষ পাইবার ইচ্ছা হইতে পারে। তাই বলিয়া যে সেই সব জিনিষের চাহিদা বা demand হইল, একথা ঠিক নহে। জিনিষটি পাইবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই চলিবে না, এই আকাঙ্ক্ষা কার্য্যকরী (effective) হওয়া দরকার, এই আকাঙ্ক্ষা ক্রয় করিবার শক্তি ও অর্থব্যয় করিবার ইচ্ছা দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই। অর্থাৎ কোনও জিনিষ পাইবার সঙ্গে যদি উপযুক্ত অর্থসঙ্গতি থাকে এবং অর্থব্যয় করিবার মতি থাকে তবেই বলা যায় যে সেই জিনিষের চাহিদা আছে।

চাহিদার নিয়ম

(The Law of Demand)

যে কোনও মানুষের কাছে কোনও জিনিষের marginal utility বা প্রান্তিক উপযোগিতা সেই জিনিষের পরিমাণ-বৃদ্ধির সহিত কমিতে থাকে। কোনও জিনিষের পরিমাণ বাড়াইলে, তাহার marginal utility বা প্রান্তিক উপযোগিতাও কম হইবে। কোনও জিনিষের মূল্য তাহার marginal utility বা প্রান্তিক উপযোগিতার সমান। অতএব, কোনও জিনিষের মূল্য কমাইলে সেই জিনিষ বেশী পরিমাণ বিক্রয় করা যাইতে পারে। প্রত্যেক জিনিষের মূল্যের সহিত তাহার চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক রহিয়াছে। জিনিষের মূল্য বাড়িলে তাহার চাহিদা কমিবে, জিনিষের মূল্য কমিলে তাহার চাহিদা বাড়িবে—ইহাই হইল Law of Demand বা চাহিদার নিয়ম। একথা মনে রাখা দরকার যে, মূল্যবৃদ্ধি ও চাহিদার স্বল্পতা এবং মূল্যের অল্পতা ও চাহিদার বৃদ্ধি, ইহাদের মধ্যে কোনও আনুপাতিক সম্পর্ক নাই, অর্থাৎ জিনিষের দাম শতকরা ২০ ভাগ কমিলে, চাহিদা যে শতকরা ২০ ভাগ বাড়িবে, এমন কথা নাই ; চাহিদা শতকরা ২৫ ভাগও বাড়িতে পারে অথবা শতকরা ৮০ ভাগ বা

যে-কোনও পরিমাণ বাড়িতে পারে। Law of Demand বা চাহিদার নিয়মের মূলে রহিয়াছে Law of Diminishing Utility বা ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতার নিয়ম। জিনিষের মূল্য কমিবার সঙ্গে বেশী চাহিদার আর একটি কারণ এই যে, মূল্য কমিলে দরিদ্র ব্যক্তিগণ, যাহারা বেশী মূল্যের জন্য জিনিষটি কিনিতে পারিত না, তাহারা জিনিষটি ক্রয় করিতে পারিবে।

চাহিদার পরিবর্ত্তনশীলতা

(Elasticity of Demand)

মূল্যের পরিবর্ত্তনের সহিত চাহিদারও (demand) পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। মূল্যবৃদ্ধি হইলে demand বা চাহিদা কমে ; মূল্য কমিলে চাহিদা (demand) বৃদ্ধি হয়। চাহিদার পরিবর্ত্তনশীলতা বা (Elasticity of demand) বলিতে মূল্যের সহিত চাহিদার এই সম্পর্কের কথা বুঝায়।

মূল্য ও চাহিদার সম্পর্ক সকল জিনিষ সম্পর্কে একই রকম হয় না। অনেকগুলি জিনিষ এমন যে, মূল্য একটু বৃদ্ধি পাইলে, চাহিদা অনেক বেশী কমিয়া যায়, আবার মূল্য একটু কম হইলে, চাহিদা অনেক বেশী বাড়িয়া যায়। এই সব জিনিষের চাহিদাকে (demand) elastic demand বা পরিবর্ত্তনশীল চাহিদা বলে। এই সব জিনিষের দাম সামান্যমাত্র কমিলে, অনেক লোকে ইহা কিনিতে ব্যগ্র হয়, আবার, দাম সামান্যমাত্র বাড়িলে, অনেক লোকে ইহা ক্রয় করা ত্যাগ করে। বিলাসের দ্রব্য বা আরামের দ্রব্যগুলির demand বা চাহিদা elastic অথবা পরিবর্ত্তনশীল। আবার এমন অনেকগুলি জিনিষ আছে, যাহার মূল্যের পরিবর্ত্তন হইলেও চাহিদার পরিবর্ত্তন হয় না ; যাহাদের মূল্য বাড়ুক বা কমুক, চাহিদা প্রায় একই থাকে, বা খুব সামান্য কম-বেশী হয়। এই সব জিনিষের চাহিদা inelastic বা অপরিবর্ত্তনশীল। জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি এইরূপ ; ইহাদের মূল্য যদি কমে, তাহা হইলে লোকে সামান্য পরিমাণ বেশী কিনিতে পারে, ইহাদের চাহিদা প্রায় ঠিকই থাকে ; আবার, ইহাদের মূল্য যদি বাড়ে তাহা হইলেও, লোকে সামান্য পরিমাণ মাত্র কম কিনিতে পারে, ইহাদের চাহিদা প্রায় ঠিকই থাকে। যেগুলি আমাদের অপরিহার্য্য জিনিষ (Necessaries), সেগুলির demand বা চাহিদা inelastic বা অপরিবর্ত্তনশীল।

মোটামুটি প্রত্যেক জিনিষের চাহিদাই দাম বাড়িলে কমে, আবার দাম কমিলে বাড়ে। কিন্তু কতকগুলি জিনিষের চাহিদা, দাম একটু বাড়িলেই

বেশী মাত্রায় কমে, এবং দাম একটু কমিলেই চাহিদা বেশী মাত্রায় বাড়ে। মূল্য পরিবর্ত্তনের সহিত চাহিদার পরিবর্ত্তন বেশী বা কম হইতেছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য নিম্নলিখিত পন্থা অনুসরণ করা যাইতে পারে। মূল্য শতকরা যত বাড়িবে বা কমিবে, চাহিদা যদি শতকরা তাহার বেশী কমে বা বাড়ে, তাহা হইলে সেই জিনিষের চাহিদাকে elastic demand বা পরিবর্ত্তনশীল চাহিদা বলা যায়। আর, মূল্য শতকরা যত বাড়িবে বা কমিবে, চাহিদা যদি শতকরা তাহার কম পরিমাণ কমে বা বাড়ে, তাহা হইলে সেই জিনিষের চাহিদাকে inelastic demand বা অপরিবর্ত্তনশীল চাহিদা বলা যায়।

চাহিদার পরিবর্ত্তনশীলতা কিসের উপর নির্ভর করে?

(Factors Determining Elasticity of Demand ?)

কোনও জিনিষ জীবনধারণ বা স্বাস্থ্য ও কর্ম্ম-যোগ্যতা বজায় রাখিবার জন্য আবশ্যক (Necessaries) হইলে, তাহার চাহিদা inelastic বা অপরিবর্ত্তনশীল হইবে, তাহার চাহিদা পরিবর্ত্তনশীল হইবে না। আমাদের পক্ষে চাউলের চাহিদা পরিবর্ত্তনশীল নহে। দরিদ্র ব্যক্তিরও যতদিন সঙ্গতি থাকে, সর্ব্বস্ব দিয়াও সে উপযুক্ত পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবে। চাউলের মূল্যের যদি কিছু হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে মোট চাহিদার বৃদ্ধি বা হ্রাস বিশেষ কিছু হয় না, সকলেই প্রায় সম পরিমাণ চাউল কিনিতে থাকিবে। কিন্তু আরামের বা বিলাসের সামগ্রী সম্পর্কে ঐ কথা বলা যায় না। এইগুলি জীবনধারণ বা কর্ম্ম-যোগ্যতা বজায় রাখিবার জন্য একান্ত আবশ্যক নহে। এই সব জিনিষের দাম বাড়িলে এগুলির চাহিদা বিশেষভাবে কমিয়া থাকে এবং দাম কমিলে, এগুলির চাহিদা বিশেষভাবে বাড়িয়া থাকে। এইখানে মনে রাখা দরকার, কোনও জিনিষ অপরিহার্য্য (Necessaries), অথবা আরামের জিনিষ (Comforts), অথবা বিলাসের জিনিষ (Luxuries), তাহা বিভিন্ন আর্থিক অবস্থার লোকের কাছে বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। ধনী ব্যক্তির কাছে জিনিষপত্রের মূল্যের অল্প পরিবর্ত্তন মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নহে। তাহা ছাড়া, ধনী ব্যক্তির কাছে যাহা অপরিহার্য্য (Necessaries), অল্পবিত্ত লোকের কাছে তাহা বিলাসের সামগ্রী (Luxuries) মনে হইতে পারে। ধনী ব্যক্তির কাছে দামী মোটর গাড়ী প্রয়োজনীয় জিনিষসমূহের (Necessaries) অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকের কাছে মোটরগাড়ী আয়ত্তাতীত বিলাসিতার সামগ্রী। ধনী সম্প্রদায় ছাড়া, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের কাছে দামী

মোটর গাড়ীর চাহিদা অপরিবর্ত্তনশীল (inelastic), ইহাদের দাম কমুক বা বাড়ুক, তাহাদের কাছে ইহাদের চাহিদা বিশেষ নাই। আবার ধনী সম্প্রদায়ের কাছে যাহা বিলাসের সামগ্রী, সেগুলির দামের উঠতি-পড়তির উপর তাহাদের চাহিদাও নির্ভর করে। খুব মূল্যবান মন্ত অথবা খুব মূল্যবান হীরা জহরৎ ধনী সম্প্রদায়ের কাছে বিলাসের সামগ্রী, ইহাদের দান কমার সহিত, ইহাদের চাহিদাও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এগুলির দাম কমুক বা বাড়ুক, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহাদের চাহিদার কোনও প্রভেদ হয় না। কিন্তু যে সব বিলাসিতার সামগ্রী বেশী মূল্যবান নহে, যেগুলি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আর্থিক সঙ্গতির অতীত নহে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে সেগুলির চাহিদা পরিবর্ত্তনশীল (elastic)। এগুলির দাম উঠা-নামার সহিত চাহিদাও নামা-উঠা করে। আরামদায়ক সুদৃশ্য পোষাক, ভাল খাদ্য, অথবা সিনেমার টিকিট এইরকম জিনিষ বলা যায়। এগুলির দাম কমিলে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এগুলির চাহিদা বৃদ্ধি পায়, দাম বাড়িলে, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এগুলির চাহিদা হ্রাস হয়। সুতরাং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে এগুলির চাহিদা পরিবর্ত্তনশীল (elastic)। কিন্তু ধনী সম্প্রদায়ের কাছে এগুলির চাহিদা পরিবর্ত্তনশীল নহে, এগুলির দাম কমিলেও ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে এগুলির চাহিদা বাড়িবে না। কারণ দাম বেশী থাকিলেও তাহারা এগুলি তাহাদের প্রয়োজনমত যথেষ্ট পরিমাণে কিনিয়া থাকে, দাম কমিয়াছে বলিয়া বেশী কিনিবার দরকার হয় না। আবার দরিদ্র ব্যক্তিদের কাছেও এই জিনিষগুলির চাহিদা পরিবর্ত্তনশীল নহে ; কারণ দাম কমিলেও, এগুলি তাহাদের আয়ত্তের অতীত থাকে, সুতরাং এগুলির দাম কমা-উঠার সহিত চাহিদা বাড়ে, কমে না। সাধারণ ভাবে এই কথা বলা যায়, একটি জিনিষ যদি কোনও লোক বা সম্প্রদায়ের কাছে অপরিহার্য্য জিনিষ (Necessary) বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে সেই লোক বা সম্প্রদায়ের কাছে সেই জিনিষের চাহিদা পরিবর্ত্তনশীল হইবে না (তাহা inelastic demand-এর জিনিষ হইবে) ; কোনও জিনিষ যদি কোনও লোক বা সম্প্রদায়ের কাছে আরামের জিনিষ (Comfort) বা বিলাসের জিনিষ (Luxury) হয়, তবে, সেই লোক বা সম্প্রদায়ের কাছে সেই জিনিষের চাহিদা পরিবর্ত্তনশীল হইবে, (তাহা elastic demand-এর জিনিষ হইবে)। শুধু মাত্র কোনও জিনিষের নাম শুনিয়া সেই জিনিষ পরিবর্ত্তনশীল চাহিদার জিনিষ কি না, তাহা বলা সম্ভব নহে। অন্যান্য জিনিষের মধ্যে দেখিতে হইবে সেই জিনিষের ব্যবহারকারী লোক বা সম্প্রদায়ের আর্থিক অবস্থা কিরূপ।

কোনও কোনও জিনিষ আবার মানুষের ব্যবসা ও বৃত্তি বা অন্য কোনও কারণে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিতে পারে। যেমন, সহরের পসারওয়ালা ডাক্তারের কাছে মোটরগাড়ী আবশ্যক বস্তু, সুতরাং তাহাদের কাছে, মোটরগাড়ীর চাহিদা পরিবর্ত্তনশীল নহে ; তেমনি, পল্লীগ্রামের ডাক্তারদের কাছে সাইকেল গাড়ীর চাহিদা পরিবর্ত্তনশীল নহে। ছাত্র ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের নিকট বই, খাতা-পত্র, ফাউণ্টেনপেন ও পেন্সিল প্রভৃতি জিনিষের চাহিদা পরিবর্ত্তনশীল নহে বলা যায়। এগুলির দাম অল্প উঠা-নামার সহিত ইহাদের চাহিদা বিশেষ নামা-উঠা করে না। অধিকাংশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের মধ্যে ঘড়ির মূল্যের অল্প পরিবর্ত্তনে চাহিদা বেশী পরিবর্ত্তিত হয় না।

মানুষ আবার যখন কোনও জিনিষ ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তখন জিনিষের দামের সহিত সেই জিনিষের চাহিদা তাহার নিকট পরিবর্ত্তনশীল থাকে না। সেই জিনিষের দামের অল্প কম-বেশীতে সেই জিনিষের ব্যবহারের পরিমাণ কমে না। আজকাল অধিকাংশ লোক চা-পানে আসক্ত ; ইহার চাহিদা সাধারণভাবে অপরিবর্ত্তনশীল বলা যায়। চায়ের দাম অল্প-অল্প বাড়িতে থাকিলেও, ইহার চাহিদা কিছুমাত্র কমে নাই। অভ্যাসের ফলে এই জিনিষ প্রায় সর্ব্ব সম্প্রদায়ের কাছে অপরিহার্য্য জিনিষ (Necessary) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে, এখনও পল্লীগ্রামে বহুলোক আছে, যাহাদের কাছে এক কাপ চা বিলাসের সামগ্রী, ইহার মূল্য কিছু কমিলে সেখানে ইহার চাহিদাও বাড়িবে। সিনেমার ছবি দেখাও অভ্যাসের ফলে অধিকাংশ সহরবাসী লোকের অপরিহার্য্য (Necessary) হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; ইহার দাম কিছু বাড়িলেও সিনেমা-যাত্রী লোকের ভীড় কমিবে না। তবে, অনেক গ্রামের লোকের কাছে এখনও ইহা বিলাসের জিনিষ। ইহার দাম একটু কমিলে বা বাড়িলে, এই সব লোকদের মধ্যে দর্শকের সংখ্যা বিশেষভাবে বাড়িবে বা কমিবে।

যদি কোনও জিনিষের বদলে ব্যবহার করার যোগ্য অন্য জিনিষ (substitute) পাওয়া যায়, তাহা হইলে, তাহার চাহিদা পরিবর্ত্তনশীল (elastic) হয়। কলিকাতার পাশাপাশি ট্রাম ও বাস চলিতেছে এবং প্রায় সমান ভাড়া লইয়া যাত্রী বহন করিতেছে। যদি ট্রামের ভাড়া কিছু বাড়ে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ট্রামের যাত্রী-সংখ্যা কমিবে ; ঠিক তেমনি ট্রামের ভাড়া কমিলে বাসের যাত্রী-সংখ্যা কমিবে।

ভোগোদ্বৃত্ত
(Consumer's Surplus)

আমরা যে সকল জিনিষ ক্রয় করি, তাহার অনেকগুলি এরূপ জিনিষ যে, যদি সে সব জিনিষ দুর্লভ হইত, তাহাদের জন্য আমরা যে মূল্য দিয়া কিনি, সেই মূল্য অপেক্ষা বেশী মূল্য দিতে প্রস্তুত হইতাম। কোনও জিনিষের জন্য দরকার হইলে আমরা যে পরিমাণে মূল্য বেশী দিতাম, তাহাই হইল আমাদের Consumer's Surplusএর পরিমাপ। আমরা কোনও কোনও জিনিষ কিনিয়া, তাহার জন্য যে মূল্য দিতেছি, তাহা অপেক্ষা বেশী সন্তোষ লাভ করিতেছি। জিনিষ ক্রয় করিয়া এই যে বেশী সন্তোষ লাভ করিতেছি, ইহাকেই Consumer's Surplus বলা হয়। অধ্যাপক মার্শ্যাল (Prof. Marshall) প্রথম Consumer's Surplus-এর কথা বলেন।

আমরা একটি পোষ্টকার্ড লিখিয়া দূরবর্ত্তী আত্মীয়স্বজনের খোঁজ লইতে পারি। মনে করা যাক, কাহারো আত্মীয়স্বজনকে পত্র দিবার ইচ্ছা এত তীব্র যে, দরকার হইলে একখানি পোষ্টকার্ডের জন্য সে চার আনা ব্যয় করিতে ইচ্ছুক হইত। কাজেই, একখানি দুই পয়সার পোষ্টকার্ড লিখিয়া সে অনেকখানি বেশী সন্তোষ লাভ করিতেছে। ইহাকেই Consumer's Surplus বলা হয়।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগিতা (Law of Diminishing Utility) বর্ণনাকালে বালকের রসগোল্লা খাওয়ার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। রসগোল্লার মূল্য দুই আনা করিয়া হইলে বালকটি চারটি রসগোল্লা কিনিবে। কিন্তু চারটি রসগোল্লা হইতে সে যে সন্তোষলাভ করিয়াছে, তাহা পর পর রসগোল্লাগুলি হইতে সে যে মোট উপযোগিতা লাভ করিয়াছে, তাহা দেখিলেই বুঝা যাইবে। সে চারটি রসগোল্লা হইতে মোট এগার আনা দুই পয়সার সমতুল্য উপযোগিতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু চারিটি রসগোল্লার জন্য সে মোট আট আনা মাত্র খরচ করিয়াছে। অতএব সে তিন আনা দুই পয়সার সমান অতিরিক্ত সন্তোষ বা Consumer's Surplus লাভ করিয়াছে।

বিভিন্ন ব্যবহারের নিয়ম
(The Law of Substitution)

কোনও লোকের যদি বহু কাজে লাগানো যায় এমন কোন জিনিষ থাকে, তাহা হইলে সে সেই জিনিষটিকে এমন ভাবে বিভিন্ন কাজের মধ্যে বণ্টন করিয়া

দিবে, যাহাতে প্রত্যেক কাজ হইতে সেই জিনিষের সমান marginal utility (বা প্রান্তিক উপযোগিতা) লাভ হয়। এই ভাবে ব্যবহার দ্বারাই মানুষ কোন জিনিষ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সন্তোষ বা উপযোগিতা লাভ করিতে পারিবে।

মনে করা যাক, কাহারো কতক পরিমাণ সূতা আছে। এই সূতা হইতে সে নিজের পরিধান করিবার বস্ত্র এবং পাঞ্জাবীর কাপড় বুনাইতে পারে। সে পরিধানের বস্ত্র এবং পাঞ্জাবীর কাপড় বুনিবার জন্য সূতা এমন ভাবে ভাগ করিয়া দিবে, যাহাতে উভয় জিনিষ হইতেই সূতার সমান marginal utility বা প্রান্তিক উপযোগিতা পাওয়া যায়। এইভাবে বলা যায়, টাকা লোকে এমন ভাবে বিভিন্ন কাজে লাগাইবে যাহাতে সব কাজ হইতে টাকার marginal utility (বা প্রান্তিক উপযোগিতা) সমান হয়। মনে করা যাক, কোনও ব্যক্তি ভুল করিয়া তাহার টাকা দিয়া দশ জোড়া জুতা এবং মাত্র দুই জোড়া ধুতি কিনিল। তাহা হইলে, জুতা কিনিতে যে টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার marginal utility বা প্রান্তিক উপযোগিতা, ধুতি কিনিতে যে টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার marginal utility বা প্রান্তিক উপযোগিতা অপেক্ষা অনেক কম হইল। সে যদি এমন ভাবে কম জুতা ও বেশী ধুতি কিনে, যাহাতে জুতা ও ধুতি কিনিতে যে টাকা ব্যয় হইবে, তাহার প্রত্যেকটি টাকার marginal utility সমান, তাহা হইলে টাকা ব্যয় করিয়া তাহার মোট উপযোগিতা সর্ব্বাধিক হইবে।

একাদশ অধ্যায়

বিনিময়

(Exchange)

প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন সমাজ বলিয়া কিছু ছিল না, মানুষ তখন তাহার প্রয়োজনের সামান্য কয়েকটি জিনিষ নিজেই সংগ্রহ করিয়া লইত, সে সময় একজনের জিনিষের সহিত অপরের জিনিষের বিনিময়ের আবশ্যক ছিল না। কিন্তু মনুষ্য সমাজের শৈশব অবস্থা হইতেই দ্রব্য বিনিময় দেখা দিয়াছে। খুব প্রাচীন অথবা সভ্যতা-বর্জ্জিত লোক-সমাজের মধ্যেও কোনও-না-কোনও আকারে বিনিময়ের অস্তিত্ব দেখা যায়। সমাজ-বিবর্ত্তন ও সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রম-বিভাগ ক্রমশঃ জটিল হইয়াছে এবং আনুসঙ্গিক অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে দ্রব্য বিনিময় এবং বাজারের জটিলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিনিময় কি ভাবে হইয়া থাকে

(How Exchange Takes Place)

মনে করা যাক্ একজন ধীবরের মৎস্য আছে, এবং একজন তন্তুবায়ের কাপড় আছে। ধীবরের বস্ত্র আবশ্যক এবং তন্তুবায়ের মৎস্য আবশ্যক। ধীবর যদি নিজের মৎস্য দিয়া তন্তুবায়ের সহিত বস্ত্র বিনিময় করিতে চায়, এবং তন্তুবায় যদি নিজের বস্ত্র দিয়া ধীবরের মৎস্য বিনিময় করিতে চায়, তাহা হইলেই উভয়ের পরস্পরের দ্রব্য বিনিময় হইতে পারে। ধীবরের কাছে অনেক মৎস্য আছে, কিন্তু বস্ত্র নাই। অতএব, ধীবরের কাছে মৎস্যের প্রান্তিক উপযোগিতা কম, কিন্তু বস্ত্রের প্রান্তিক উপযোগিতা বেশী। তন্তুবায়ের কাছে বস্ত্র আছে, কিন্তু মৎস্য নাই। অতএব, তন্তুবায়ের কাছে বস্ত্রের প্রান্তিক উপযোগিতা কম, কিন্তু মৎস্যের প্রান্তিক উপযোগিতা বেশী। এই জন্যই ধীবর তাহার মৎস্য দিয়া বস্ত্র লইতে চাহিবে, এবং তন্তুবায় তাহার বস্ত্র দিয়া মৎস্য লইতে চাহিবে। এই অবস্থায় ধীবর ও তন্তুবায় পরস্পরের দ্রব্য বিনিময় করিয়া উভয়ে লাভবান হইবে। ধীবর মৎস্য দিবার ফলে তাহার যে উপযোগিতা হ্রাস হইল, বস্ত্র পাইবার ফলে তাহার অনেক বেশী সে লাভ করিল। বিনিময়ের ফলে, ধীবরের মৎস্যের পরিমাণ কমিল, এবং কিছু বস্ত্র লাভ হইল। অতএব ধীবরের নিকট মৎস্যের প্রান্তিক উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইল এবং বস্ত্রের প্রান্তিক

উপযোগিতা হ্রাস হইল। এইভাবে, তন্তুবায়ের নিকট বস্ত্রের প্রান্তিক উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইল এবং মৎস্যের প্রান্তিক উপযোগিতা হ্রাস পাইল। এইরূপে বিনিময়ের ফলে ধীবর ও তন্তুবায়ের নিকট মৎস্য ও বস্ত্রের প্রান্তিক উপযোগিতার পার্থক্য হ্রাস পাইয়া সমতার দিকে আসিতে থাকে। উভয় দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগিতার পার্থক্য একেবারে লোপ এবং বিনিময় সম্ভব হইবে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন জিনিষের প্রান্তিক উপযোগিতা পৃথক থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পরস্পরের মধ্যে দ্রব্য বিনিময় চলিবেই।

বিনিময়ের দুইরূপ
(Two Forms of Exchange)

বিনিময় দুই প্রকারের হইতে পারে; এক, দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের বিনিময়, আর, বস্তুর সহিত মুদ্রার।

দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের বিনিময় (Barter)—দ্রব্য বিনিময়

অনেক আগে, টাকা বিনিময়ের মাধ্যমরূপে আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে, সর্ব্বত্রই দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের বিনিময় চলিত। এখনও অনেক অনুন্নত সমাজে এই প্রকারের দ্রব্য-বিনিময় প্রচলিত। বিনিময়ের মাধ্যমরূপে অর্থের প্রচলনের জন্য আমরা এখন কোনও কিছুর দরকার হইলে টাকা দিয়া সেই জিনিষ কিনিয়া থাকি; এই ব্যবস্থা হইবার পূর্ব্বে, কাহারও কোন কিছুর দরকার হইলে নিজের কোন দ্রব্য বদল দিয়া তাহা যোগাড় করিতে হইত। ইহারই নাম Barter বা দ্রব্যবিনিময়।

দ্রব্য বিনিময়ের অসুবিধা
(Disadvantages of Barter)

টাকার মাধ্যমে বিনিময় না করিয়া সোজাসুজি দ্রব্যবিনিময়ের অনেক অসুবিধা আছে। টাকার আবির্ভাবের পূর্ব্বে যখন দ্রব্যবিনিময় প্রচলিত ছিল, তখন মানুষকে এই সব অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। এই অসুবিধাগুলির জন্যই দ্রব্য বিনিময়ের যুগ স্থায়ী হইতে পারে নাই। এই যুগে মানুষ যে সব সময় নিজের প্রয়োজন মত দ্রব্য বিনিময় করিতে পারিবে তাহার কোনও নিশ্চয়তা ছিল না। একজনের কাছে হয়ত কাপড় আছে, সে তাহার কাপড়ের বিনিময়ে কিছু ধান চায়। আর একজনের কাছে হয়ত ধান আছে, কিন্তু সে কাপড় চায় না, তাহার দুই জোড়া জুতা দরকার। এই দুই জনের অভাবগুলি

এমন ভাবে ঠিকঠাক মিলিয়া যায় নাই, যাহাতে উভয়ের মধ্যে দ্রব্য-বিনিময় হইতে পারে। যাহার কাপড় আছে সে তাহার কাপড় দিয়া যদি ধান চাহিত, এবং যাহার ধান আছে সে তাহার ধান দিয়া যদি কাপড় চাহিত, তাহা হইলেই উভয়ের মধ্যে দ্রব্য-বিনিময় সম্ভব ছিল। একজনের অভাবের সহিত আর একজনের অভাবের এইভাব ঠিকঠাক মিলিয়া যাওয়াকে বলে double coinicidence of wants ; ইহার অভাব হইলে বিনিময় হইতে পারে না। একজনের কাছে যাহা বেশী আছে, তাহা দিয়া অপরের কাছ হইতে তাহার যাহা বেশী আছে তাহা লইতে হইলে, অপর ব্যক্তিরও প্রথমোক্ত ব্যক্তির জিনিষের আবশ্যক আছে, এমন হওয়া চাই। কিন্তু সাধারণতঃ এইরূপ সব সময় হয় না। ফলে, যে ব্যক্তির কাপড় আছে এবং কাপড় দিয়া শস্য বিনিময় করিতে চায়, তাহাকে কাপড় লইয়া এমন ব্যক্তির খোঁজ করিয়া বেড়াইতে হইবে, যাহার শস্য আছে, এবং যে শস্য দিয়া কাপড় বিনিময় করিতে চায়। যতক্ষণ না এরূপ ব্যক্তি পাওয়া যায়, ততক্ষণ কাপড়ের অধিকারী শস্য পাইবে না। এই অসুবিধা মুদ্রা প্রচলনের সঙ্গে তিরোহিত হইয়াছে। কারণ, এখন যাহার কাপড় আছে, সে কাপড় বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবে, এবং এই অর্থ দিয়া যাহার শস্য আছে তাহার নিকট শস্য কিনিবে। শস্য বিক্রেতা আবার শস্য বিক্রয়ের অর্থ দিয়া তাহার নিজের প্রয়োজন মত জিনিষ ক্রয় করিবে।

দ্রব্য-বিনিময়ের দ্বিতীয় অসুবিধা হইতেছে যে, ইহাতে দ্রব্য বিভাগের অসুবিধা (want of means of subdivision) অনেক সময় অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া থাকে। মনে করা যাক, একজনের একটি ঘোড়া আছে, সে একখানি বস্ত্র চায়, আর একজনের বস্ত্র আছে, সে ঘোড়া পাইলে বস্ত্র বিনিময় করিতে পারে। এখানে মুস্কিল হইবে, একখানি বস্ত্রের এবং একটি ঘোড়ার কি ভাবে বিনিময় করা যাইবে, তাহা নির্ণয় করা। ধরা যাক, একটি ঘোড়ার মূল্য দশটি বস্ত্রের সমান। তাই বলিয়া, ঘোড়াটিকে কাটিয়া দশভাগের একভাগ দিয়া বস্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। বস্ত্রের মালিকও তাহাতে রাজী হইবে না, ঘোড়াটির মালিকও এমন কথা ভাবিতে পারে না। কাজেই, ঘোড়ার মালিককে বস্ত্রের অভাব লইয়া চালাইতে হইবে।

ইহা ছাড়া, দ্রব্য বিনিময়ে, মূল্য পরিমাপের সাধারণ কোনও উপায়ের অভাব (want of a measure of value) রহিয়াছে।

কোন্ হারে এক জিনিষের সহিত অন্য জিনিষের বিনিময় হইতে পারে, তাহা বলা কঠিন হইয়া পড়ে। যেমন, ক দশটি ছাগল দিয়া খ-এর নিকট তিনটি বড়

ছুরি পাইল, খ দশটি ছুরি দিয়া গ-এর নিকট তিনটি হরিণের চামড়া পাইল। এখানে একটি হরিণের চামড়ার বিনিময়ে কয়টি ছাগল অথবা কয়টি ছুরি পাওয়া যাইবে, তাহা বলা কঠিন। এই মূল্য নিরূপণের সাধারণ কোনও উপায় না থাকায় দ্রব্য-বিনিময় চলা কঠিন হইয়া পড়ে।

উল্লিখিত অসুবিধাগুলির জন্য দ্রব্যবিনিময় প্রথা ক্রমশঃ লোপ পাইয়াছে এবং অর্থের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

বাজার
(Market)

প্রচলিত অর্থে বাজার বলিতে বিবিধ জিনিষ ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান বুঝায়। কিন্তু, অর্থশাস্ত্রে বাজার (Market) এই কথাটির দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের কোনও এক নির্দ্দিষ্ট স্থান বুঝায় না, পরন্তু, এই শব্দ দ্বারা প্রতিযোগিতাপরায়ণ বহু ক্রেতা ও বিক্রেতা সমন্বিত দ্রব্য বা দ্রব্যসমূহ বুঝায়। যেমন, পাটের বাজার, তূলার বাজার, গমের বাজার, লোহার বাজার, শেয়ারের বাজার, প্রভৃতি। অর্থশাস্ত্রে বাজার বলিতে কোনও এক দ্রব্য বা দ্রব্যসমূহ এবং সেই দ্রব্য বা দ্রব্যসমূহের ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগকে বুঝায়। বিভিন্ন জিনিষের বাজারের বিস্তৃতি বিভিন্ন রকম ; যেমন, চা ও গমের বাজার পৃথিবীব্যাপী ; আবার বেশীদিন সংরক্ষণ করা যায় না, এমন সব দ্রব্য যথা, টাটকা দুধ বা টাটকা মাছ, এই সব জিনিষের বাজারের বিস্তৃতি খুবই কম।

কিরূপ জিনিষের বাজার বহুদূর বিস্তৃত ?
(Conditions for a Wide Market)

বর্ত্তমানে অনেক জিনিষের বাজার পৃথিবীব্যাপী, এবং অন্যান্য অনেক জিনিষের বাজারের গণ্ডী ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। যানবাহনের সুবিধা বৃদ্ধির সহিত জিনিষের বাজারের বিস্তৃতি বাড়িতেছে। বহু জিনিষ, আবার এমন যে তাহাদের বাজার স্বভাবতঃই সঙ্কীর্ণ।

যে জিনিষের চাহিদা বেশী, সে জিনিষের বাজার তত বিস্তৃত হইবে। গম, তূলা, লোহা প্রভৃতির চাহিদা পৃথিবীব্যাপী, ইহাদের বাজারও পৃথিবী-ব্যাপী। পৃথিবী জুড়িয়া মানুষের এই সব জিনিষের চাহিদা আছে। কাজেই এই সব জিনিষের বাজারও বিশ্বব্যাপী। তবে, শুধু ব্যাপক চাহিদা থাকিলেই যে জিনিষটির বাজার ব্যাপক হইবে তাহা নহে, টাটকা মাছ বা টাটকা দুধ, ফল প্রভৃতি সহজে-বিনাশযোগ্য জিনিষপত্র পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত হইলেও,

ইহাদের বাজার বহুদূর বিস্তৃত না হইয়া স্থানীয় হইবে। এগুলি একস্থান হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে চালান দিবার সময় নষ্ট হইয়া যায়। অবশ্য বর্ত্তমান যুগে ঠাণ্ডা ভাঁড়ারের (cold storage) ব্যবস্থা হওয়ায়, অবিকৃতভাবে দুধ, মাছ প্রভৃতি দূরে চালান দেওয়া যাইতে পারে। কাজেই, এই সব সহজে-বিনাশযোগ্য জিনিষের বাজারও ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে। তথাপি সহজে বিনাশযোগ্য জিনিষগুলির বাজার বহু-বিস্তৃত হওয়ার পথে অনেক অন্তরায় রহিয়াছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, গম, চা প্রভৃতি দীর্ঘস্থায়ী জিনিষের বাজার সহজেই বহু-বিস্তৃত হইয়া থাকে।

আবার জিনিষগুলি সহজে বিনাশযোগ্য না হইলেই যে বাজার ব্যাপক হইবে, তাহা নহে। জিনিষগুলি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সহজে বহনযোগ্য হওয়া চাই। যেমন, সাধারণ ইট দীর্ঘস্থায়ী জিনিষ বটে, কিন্তু ইহাদের মূল্যের তুলনায় ইহাদের বহনের খরচ এত বেশী পড়িয়া যাইবে যে, এগুলির বাজার ব্যাপক হইতে পারে না। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি জিনিষ অল্প আকারেও অধিক মূল্যবান বস্তু, ইহাদের মূল্যের তুলনায় ইহাদের বহনের খরচ কম; অতএব এগুলির বাজার ব্যাপক হইতে পারে। অর্থাৎ জিনিষগুলি তুলনায় অল্প আকারের মধ্যে অধিক মূল্যযুক্ত হওয়া চাই; কারণ আজকাল প্রায় সকল জিনিষই একস্থান হইতে অন্য স্থানে বহন করা যাইতে পারে, কিন্তু কোনও জিনিষ যদি তুলনায় অল্প আয়তনের মধ্যে অধিক মূল্যযুক্ত না হয়, তাহা হইলে তাহার বহনের ব্যয় এত বেশী পড়িয়া যাইবে যে, তাহার বাজার ব্যাপক হইতে পারিবে না।

ইহা ছাড়া জিনিষগুলি এমন হওয়াও আবশ্যক যে, তাহাদের গ্রেডিং (Grading) করা যায় এবং তাহাদের নমুনা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় করা সম্ভব হয়; তাহা হইলেই তাহাদের বাজার ব্যাপক হইবে। মাল যদি গ্রেডিং করা যায় এবং নমুনা দেখিয়া ক্রয়-বিক্রয় চলে, তাহা হইলে অনেক দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও সহজেই মাল ক্রয়-বিক্রয় চলে, এবং সহজেই বাজার ব্যাপক হইতে পারে।

দ্বাদশ অধ্যায়

মূল্য

(Value)

মূল্য (Value) শব্দটি সাধারণতঃ দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয় ; যথা, ব্যবহারমূলক মূল্য (Value in use) এবং বিনিময়মূলক মূল্য (Value in exchange)। কোন জিনিষ কত উপকারী তাহা বুঝাইতে আমরা অনেক স্থলে মূল্য শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকি, যেমন, শিক্ষার মূল্য, বাতাসের মূল্য, জলের মূল্য স্বাস্থ্যের মূল্য, ইত্যাদি। ইহাই হইল ব্যবহারমূলক মূল্যের (Value in use) প্রয়োগ। এই ভাবে, লোকে যখন বলে, লৌহ খুব মূল্যবান ধাতু, তখন তাহারা লৌহের উপকারিতার কথাই বলিতে চায়। অর্থশাস্ত্রে, মূল্য বলিতে বিনিময়মূলক মূল্য (Value in exchange) বুঝায়, অর্থাৎ, কোনও জিনিষের মূল্য বলিতে সেই জিনিষের বিনিময়ে অন্য জিনিষ কতগুলি পাওয়া যাইবে, তাহাই বুঝায়। যদি এক মণ ধান্য দিয়া দুই খানি বস্ত্র পাওয়া যায়, তাহা হইলে এক মণ ধান্যের মূল্য দুইখানি বস্ত্রের সমান। স্বর্ণ ও রৌপ্য খুব মূল্যবান দ্রব্য। ইহাদের সামান্য পরিমাণ অংশের বিনিময়ে অন্যান্য অনেক জিনিষ পাওয়া যইবে। ইহাদের বিনিময়-মূলক মূল্য (Value in exchange) অধিক।

অনেক জিনিষের ব্যবহার-মূলক মূল্য (Value in use) অনেক বেশী ; কিন্তু বিনিময়মূলক মূল্য (Value in exchange) খুব কম। যেমন, বাতাস ও জলের ব্যবহারমূলক মূল্য অনেক বেশী। এগুলি না হইলে আমাদের প্রাণ-ধারণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এগুলির বিনিময়মূল্য কিছুই নাই। আবার, অনেক জিনিষের বিনিময়মূলক মূল্য খুব বেশী, কিন্তু ব্যবহারমূলক মূল্য খুব কম। যেমন, স্বর্ণ ও হীরা-জহরতের বিনিময়মূলক মূল্য অনেক বেশী ; কিন্তু ইহাদের ব্যবহারমূলক মূল্য বিতর্ক ও সন্দেহের বিষয়। বাতাস, আলো, অথবা গম, চাউল, প্রভৃতি যে-সব জিনিষের ব্যবহারমূলক মূল্য স্বর্ণ প্রভৃতি জিনিষের অপেক্ষা বেশী, অথচ যাহাদের বিনিময়মূলক মূল্য কম, তাহাদের মোট উপযোগিতা (total utility) বেশী হইলেও প্রান্তিক উপযোগিতা (marginal utility) কম বলিয়া বিনিময়-মূলক মূল্য কম। কিন্তু স্বর্ণ

প্রভৃতি জিনিষের যোগান কম বলিয়া প্রান্তিক উপযোগিতা (marginal utility) বেশী হয় এবং ইহাদের বিনিময়-মূলক মূল্য বেশী হইয়া থাকে।

মূল্য নিরূপিত হয় কি ভাবে?

(How is Value determined ?)

মূল্য প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এবং একচেটিয়া বাজারে বিভিন্ন ভাবে নিরূপিত হইয়া থাকে। প্রথমে, প্রতিযোগিতামূলক বাজারের (Competitive Market) কথা বলা হইতেছে।

যখন কোনও জিনিষের বাজারে অনেকগুলি ক্রেতা-বিক্রেতা রহিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা রহিয়াছে, তখন আমরা প্রতিযোগিতা-মূলক বাজারের দৃষ্টান্ত পাই। সাধারণতঃ বেশীর ভাগ জিনিষই প্রতিযোগিতা-মূলক বাজারের ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য জিনিষ। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিম্নোক্তভাবে মূল্য নিরূপিত হইয়া থাকে।

যে কোনও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে দুইটি পক্ষ থাকে, ক্রেতার পক্ষ এবং বিক্রেতার পক্ষ। ক্রেতাপক্ষে রহিয়াছে জিনিষের চাহিদা (demand), আর, বিক্রেতার পক্ষ জিনিষের যোগান বা সরবরাহ (supply) করিতেছে। চাহিদাকারী ক্রেতার পক্ষ একটি নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বোচ্চ মূল্যের অধিক মূল্য দিবে না, আর, বিক্রেতার পক্ষ একটি নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বনিম্ন মূল্যের কম লইয়া বিক্রয় করিবে না। অবশ্য, প্রত্যেক ক্রেতা যতটা সম্ভব কম মূল্যে জিনিষ ক্রয় করিতে চাহিবে, আর প্রত্যেক বিক্রেতা যতটা সম্ভব বেশী মূল্যে জিনিষ বিক্রয় করিতে চাহিবে। ক্রেতারা জিনিষের জন্য যত উৎসুক হইবে, জিনিষের মূল্য সর্ব্বোচ্চ মূল্যের তত নিকটবর্ত্তী হইবে। আর, বিক্রেতাগণ বিক্রয় করিবার জন্য যত বেশী উৎসুক হইবে, জিনিষের মূল্য সর্ব্বনিম্ন মূল্যের তত নিকটবর্ত্তী হইবে। ক্রেতা-বিক্রেতাগণের মধ্যে দর কষাকষির ফলে একটি মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইবে। ক্রেতাদের পক্ষে, জিনিষের মূল্যের বিভিন্নতার উপর জিনিষের চাহিদার বিভিন্নতা নির্ভর করে, এবং চাহিদাকারী ক্রেতার নিকট জিনিষটির প্রান্তিক উপযোগিতা যত, তাহার পরিমাণেই ক্রেতার সর্ব্বোচ্চ মূল্য স্থির হইবে। ইহার বেশী ক্রেতা দিতে পারে না। বিক্রেতার কাছে জিনিষটি উৎপাদনের বা সংগ্রহের যে ব্যয় পড়িয়াছে, তাহাই হইল তাহার কাছে সর্ব্বনিম্ন মূল্য। ইহার কম মূল্যে বিক্রেতা বিক্রয় করিবে না। কারণ, তাহা হইলে তাহার লোকসান হইবে। বিক্রেতাদের পক্ষে মূল্যের বিভিন্নতার উপর যোগানের

অথবা সরবরাহের পরিমাণের বিভিন্নতা নির্ভর করে। অর্থাৎ জিনিষটির দাম কমিতে থাকিলে, জিনিষটির চাহিদা বাড়িতে থাকে এবং যোগান বা সরবরাহ কমিতে থাকে। এই যে দামের উঠতি-পড়তির উপর ক্রেতা-বিক্রেতাদের চাহিদা ও যোগান বিভিন্ন হইয়া থাকে, তাহার ফলেই শেষ পর্য্যন্ত স্বাভাবিক মূল্য নির্ণীত হয়।

ধরা যাক, কোনও এক দামে, যোগান অপেক্ষা চাহিদা বেশী হইল। ইহার ফলে, ক্রেতাদের আগ্রহের জন্য জিনিষটির দাম বাড়িয়া যাইবে। জিনিষটির দাম বাড়িলে, বিক্রেতাদের লাভ বেশী হইবে এবং অধিক বিক্রেতা ব্যবসায় নামিবে এবং অধিক পণ্য বাজারে আসিবে। এইরূপে জিনিষের দাম কমিবে। এই ভাবে জিনিষের দরের উঠা-নামা এবং যোগান ও পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া স্থিরীকৃত মূল্য (equilibrium price) পাওয়া যায়।

মনে করা যাক, বিভিন্ন দরে বাজারে নিম্নলিখিতরূপ আমের চাহিদা ও যোগান রহিয়াছে।

মূল্য	চাহিদা	মূল্য	যোগান
প্রতিটি এক আনা	৫০০০ আম	প্রতিটি এক আনা	২০০০ আম
" দুই "	৪০০০ "	" দুই "	৩০০০ "
" তিন "	৩৫০০ "	" তিন "	৩৫০০ "
" চার "	৩০০০ "	" চার "	৫০০০ "
" পাঁচ "	২৬০০ "	" পাঁচ "	৬০০০ "

উল্লিখিত দুইটি তালিকা পাশাপাশি স্থাপন করিলে নিম্নলিখিত ফল পাওয়া যাইবে।

চাহিদা	মূল্য	যোগান
৫০০০	প্রতিটি এক আনা	২০০০
৪০০০	" দুই "	৩০০০
৩৫০০	" তিন "	৩৫০০
৩০০০	" চার "	৫০০০
২৬০০	" পাঁচ "	৬০০০

যদি এক আনা করিয়া প্রতিটি আমের দর হয় তাহা হইলে ৫০০০ আমের চাহিদা হইবে, কিন্তু মাত্র ২০০০ আমের যোগান পাওয়া যাইবে। আমের

চাহিদা বেশী হইবার জন্য দাম বাড়িবে। প্রতিটি আমের দাম দুই আনা হইলে, যোগান বাড়িয়া ৩০০০ হইলেও, চাহিদা যোগানের চেয়েও বেশী—৪০০০ রহিল। অতএব, দাম আরও বাড়িয়া তিন আনা করিয়া হইলে, যোগান আরও বাড়িয়া ৩৫০০ হইল এবং চাহিদাও কমিয়া ৩৫০০ হইল। এই মূল্যই চাহিদা ও যোগান পরস্পরের সমান; এই মূল্যই equilibrium price বা স্থিরীকৃত মূল্য। ইহার চেয়েও বেশী দাম হইলে, যোগান বাড়িয়া যাইবে, কিন্তু চাহিদা যোগান অপেক্ষা কম থাকিবে।

একচেটিয়া ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মূল্য নিরূপণ কি ভাবে হয়?

(How is Monopoly Value Determined ?)

অনেক সময় জিনিষ অনেকগুলি বিক্রেতা বা উৎপাদকের নিয়ন্ত্রণাধীন না হইয়া একজন বিক্রেতা বা একটি মস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অধীন হইয়া থাকে; তখন আমরা একচেটিয়া কারবারের উদাহরণ পাইয়া থাকি। একচেটিয়া কারবারের মালিকের (monopolist-এর) জিনিষটির যোগানের উপর কর্তৃত্ব থাকে, অবশ্য, চাহিদার উপর তাহার কোনও কর্তৃত্ব থাকে না। একচেটিয়া কারবারের মালিকের লক্ষ্য থাকে জিনিষটির যোগান অদল বদল করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লাভ অর্জ্জন করা। অন্যান্য রূপ কারবারের অধিকারীদের লক্ষ্য থাকে, কি ভাবে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লাভ করা যায়। তবে, একচেটিয়া কারবারের বেলাতেই মালিক যোগানের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিয়া থাকে, অন্যরূপ কারবারের বেলায় কারবারী যোগানের উপায় কর্তৃত্ব করিতে পারে না।

যোগানের উপরে কর্তৃত্ব থাকার ফলে, একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকারী যোগান হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া মূল্য বৃদ্ধি-হ্রাস করিতে পারে। সে ইচ্ছা করিলে কম পরিমাণ জিনিষ বেশী মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে, অথবা বেশী পরিমাণ জিনিষ কম মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে। যে ভাবে বিক্রয় করিলে, লাভের মোট পরিমাণ বেশী হইবে, একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকারীরা তাহাই করিবে।

সাধারণতঃ লোকের ধারণা এই যে, একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকারী তাহার জিনিষ খুব উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া মোটা লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু, একথা সব সময় ঠিক নহে। প্রথমতঃ, ব্যবসায়ীকে দেখিতে হইবে যে, তাহার জিনিষের চাহিদাও কম হইয়া না যায়। সাধারণতঃ যে জিনিষের চাহিদা পরিবর্ত্তনশীল (elastic), সে জিনিষের দাম একচেটিয়া ব্যবসায়ের

অধিকারী বাড়াইতে চাহিবে না। কারণ, তাহা হইলে সেই জিনিষের চাহিদা কমিয়া যাইবে এবং মোট লাভও কমিয়া যাইবে। এই জন্য পরিবর্ত্তনশীল চাহিদা (elastic demand) যুক্ত জিনিষের বেলায় একচেটিয়া ব্যবসায়ীর মালিক জিনিষটির যোগান বেশী করিয়া প্রতিটি জিনিষ কমমূল্যে বিক্রয় করিয়া মোট লাভ বেশী করিবার চেষ্টা করিবে। আর, যদি জিনিষটির চাহিদা অপরিবর্ত্তনশীল (inelastic) হয়, তাহা হইলে, একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকারী জিনিষটির দাম বাড়াইলেও, একই চাহিদা থাকিবে। অন্ততঃ, চাহিদা কমিলেও, বেশী কমিবে না। কাজেই, বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থাকিলে অপরিবর্ত্তনশীল চাহিদাযুক্ত জিনিষটির যে মূল্য হইত, একচেটিয়া ব্যবসায়ীর করতলগত হইলে, জিনিষটির মূল্য তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হইবার সম্ভাবনা।

জিনিষের উৎপাদনের অবস্থার উপরও একচেটিয়া ব্যবসায়ের জিনিষের দাম নির্ভর করে। জিনিষটি যদি বর্দ্ধমান আগমের (increasing returns) জিনিষ হয় হয়, তাহা হইলে জিনিষটি যতই বেশী উৎপন্ন হইবে, ততই জিনিষটি কম খরচে উৎপন্ন হইবে; কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে, একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকারী বেশী জিনিষ উৎপন্ন করিয়া কমমূল্যে প্রতিটি জিনিষ বিক্রয় করিবে। ইহার উপর, যদি জিনিষটি পরিবর্ত্তনশীল চাহিদা-যুক্ত হয়, তাহা হইলে বেশী উৎপাদন ও কমমূল্যে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা খুবই বৃদ্ধি পাইবে। আবার জিনিষটি যদি হ্রাসমান আগমের (decreasing returns) জিনিষ হয়, তাহা হইলে, জিনিষটি যতই বেশী উৎপন্ন হইবে, ততই জিনিষটির দাম বৃদ্ধি পাইবে। এক্ষেত্রে জিনিষটির দাম বেশী হইবার সম্ভাবনা।

একচেটিয়া কারবারী আবার সকলকে একই মূল্যে তাহার জিনিষ বিক্রয় না করিয়া বিভিন্ন খরিদ্দারকে বিভিন্ন মূল্যে একই জিনিষ বিক্রয় করিতে পারে। ইহাকে Price discrimination বা প্রভেদাত্মক মূল্য নির্ণয় বলে। যেমন, বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানি বাড়ীর ব্যবহারের জন্য বিদ্যুতের একরকম মূল্য আদায় করে এবং কল-কারখানা বা সরকারী কার্য্যে ব্যবহারের জন্য বিদ্যুতের অপেক্ষাকৃত কম মূল্য ধার্য্য করিতে পারে। অবশ্য, সোজা সুজি, এক ব্যক্তিকে কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিয়া আর এক জনকে বেশী মূল্যে সেই পণ্য বিক্রয় করা অনেক সময় সম্ভব নহে। কারণ, তাহাতে সুবিধাপ্রাপ্ত ক্রেতা পুনরায় অপরকে পণ্য বিক্রয় করিয়া দিয়া লাভ করিতে পারে; তাহা ছাড়া, এইরূপ পার্থক্যসূচক ব্যবহারে জনমত বিক্ষুব্ধ হইতে পারে।

একচেটিয়া কারবারী সময় সময় দেশের বাজারে বেশী মূল্যে মাল বিক্রয় করিয়া কতক মাল সস্তায় বিদেশে কাটতি করিয়া দেয়। ইহাকে Dumping বলা হয়।

একচেটিয়া কারবারী কি যত ইচ্ছা মূল্য বৃদ্ধি করিতে পারে?

(Restrictions on the Power of the Monopolist to increase Price)

সম্পূর্ণ প্রতিযোগিতা-বিহীন একচেটিয়া কারবার দেখা যায় না। সাধারণতঃ কিছু-না-কিছু প্রতিযোগিতা থাকে, অন্ততঃ, কিছু-না-কিছু বদলি বা পরিবর্ত্ত (substitute) জিনিষের পরোক্ষ প্রতিযোগিতা থাকে। অতএব একচেটিয়া কারবারী যদি নিজের খুসীমত তাহার জিনিষের দাম বাড়াইয়া যাইতে থাকে, তাহা হইলে, ব্যবহারকারী ব্যক্তিরা পরিবর্ত্ত (substitute) জিনিষের খোঁজ করিবে এবং পাওয়া গেলে তাহাই ব্যবহার করিবে। ইহাতে একচেটিয়া কারবারের লাভ হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া কারবারী যদি প্রচুর লাভ করিতে থাকে, তাহা হইলে অপরে সেই কারবারের একচেটিয়া রূপ বিনাশ করিয়া প্রতিযোগিতা করিবার বিশেষ চেষ্টা করিবে। তৃতীয়তঃ, বেশী মূল্য ধার্য্য করার জন্য জনমত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে এবং সরকার জনহিতার্থে একচেটিয়া কারবারের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারে।—এই সকল কারণে বিবেচনা-সম্পন্ন একচেটিয়া কারবারের অধিকারী যথেচ্ছা মূল্য বৃদ্ধি না করিয়া, অধিক উৎপাদন পূর্ব্বক কমমূল্যে প্রতিটি জিনিষ বিক্রয় করিয়া বেশী লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অর্থ

(Money)

বহু প্রাচীন কালে, অর্থ বলিয়া কিছু ছিল না এবং অর্থের বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় মানুষের অজ্ঞাত ছিল। মানুষ তখন যে যাহার জিনিষ প্রয়োজন হইলে অপরের সহিত সোজাসুজি বিনিময় করিত। কিন্তু দ্রব্য বিনিময়ের (Barter) অনেক অসুবিধা ছিল, ইহা আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে দেখিয়াছি। এই অসুবিধাগুলির হাত এড়াইবার জন্য ক্রমশঃ অর্থের প্রচলন হইল। আমরা অর্থের যে রূপের সহিত পরিচিত, তাহা অবশ্য একদিনেই দেখা যায় নাই। বহু বিবর্ত্তনের স্তর অতিক্রম করিয়া অর্থ আমাদের সম্মুখে তাহার বর্ত্তমান রূপ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। মানুষের উৎপন্ন দ্রব্যের বিনিময়ের সর্ব্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম বাহির করিবার জন্য বহুভাবে চেষ্টা হইয়াছে এবং মানব-সভ্যতার ইতিহাসে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জিনিষ বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, জানা যায়। প্রথম প্রথম বিনিময়ের মাধ্যম রূপে নিশ্চয় এমন জিনিষ নির্ব্বাচন করা প্রয়োজন হইত, যাহার সাধারণের নিকট উপযোগিতা রহিয়াছে, অথবা যাহার খুব চাহিদা আছে, অর্থাৎ এমন জিনিষ নির্ব্বাচন করা দরকার ছিল যাহা অপরে লইতে আপত্তি করিবে না, যাহা সকলেই বিনিময়ে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক থাকিবে। প্রাচীন কালে, গরু বাছুর ছাগল প্রভৃতি জিনিষ বিনিময়ের মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সব জিনিষ দিয়াই অপর জিনিষের মূল্য পরিমাপ হইত, এই সব জিনিষ দিয়াই অপর সব জিনিষ কেনা বেচা হইত। এই সব জিনিষের চাহিদা ছিল খুব ব্যাপক। কাহারও কোনও জিনিষ কিনিবার আবশ্যক হইলে, সে হয়ত কয়েকটি ছাগল লইয়া গিয়া তাহাদের বিনিময়ে জিনিষটি কিনিত। বিক্রেতা ছাগল লইতে আপত্তি করিত না ; কারণ, সে জানিত তাহারও কোনও জিনিষ আবশ্যক হইলে, সেও ছাগলের বিনিময়ে তাহার আবশ্যক মত জিনিষ সংগ্রহ করিতে পারিবে। এইভাবে, বিনিময় কার্য্য চলিত। আদিম জাতিদের মধ্যে লবণ অনেক সময় বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কাজ করিয়াছে। পশুচর্ম্ম, ছুরি, কড়ি, তামাক প্রভৃতি জিনিষও বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন

সময়ে বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কাজ করিয়াছে। এই সব জিনিষ বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কাজ করিবার উপযুক্ত নহে, ইহা ক্রমে ধরা পড়িল। তখন ধাতুদ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমরূপে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত লাগিল, এবং কালক্রমে ধাতুদ্রব্যের মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যই বিনিময়ের মাধ্যমরূপে বিশেষ সমাদর লাভ করিল।

স্বর্ণ ও রৌপ্য বিনিময়ের শ্রেষ্ঠ মাধ্যমরূপে পরিগণিত হইবার কারণ কি ?

(Why are Gold and Silver Regarded as the Best Medium of Exchange ?)

বর্ত্তমান যুগে বিনিময়ের মাধ্যম রূপে স্বর্ণ ও রৌপ্যও পরিত্যক্ত হইয়াছে। কাগজী অর্থ (Paper Money) উহাদের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যই ছিল সর্ব্বত্র বিনিময়ের বাহন, আজও বিনিময়ের মাধ্যমরূপে স্বর্ণ ও রৌপ্য,—বিশেষ করিয়া স্বর্ণ ব্যবহারের অনুকূলেই সকলের প্রায় মত রহিয়াছে। ইহার কারণগুলি সুস্পষ্ট। স্বর্ণ ও রৌপের মধ্যেই বিনিময়ের মাধ্যমের যে যে গুণ থাকা দরকার, তাহা রহিয়াছে। প্রথম কথা এই যে, স্বর্ণ ও রৌপ্য সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য (acceptable); এগুলি সর্ব্বত্রই আদরণীয়। কেহই জিনিষপত্রের বিনিময়ে এগুলিকে লইতে দ্বিধা করিবে না। কোনও জিনিষ যদি দেশের সকলে বিনিময়ে লইতে প্রস্তুত না থাকে, কোনও জিনিষের উপর দেশের লোকের অবিসংবাদী আস্থা না থাকে, তাহা হইলে তাহা অর্থরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। স্বর্ণ ও রৌপ্যের সর্ব্বজনপ্রিয়তার এবং গ্রহণযোগ্যতার (acceptability) জন্য ইহারা বিনিময়ের শ্রেষ্ঠ মাধ্যমরূপে গণ্য হয়।

দ্বিতীয়তঃ, অর্থ খুব স্থায়ী (durable) জিনিষ দ্বারা গঠিত হওয়া আবশ্যক। স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্থায়িত্ব (durability) খুবই বেশী; এগুলি সহজে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। ব্যবহারজনিত ক্ষয়ক্ষতি (wear and tear) ইহাদের খুব কম। লৌহ প্রভৃতি ধাতু ইহাদের তুলনায় কম স্থায়ী। পশু ও কৃষিজাত দ্রব্য ত অতি সহজে বিনাশযোগ্য। সেইজন্য উহাদের তুলনায় স্বর্ণ ও রৌপ্য বিনিময়ের মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হইবার বিশেষ উপযুক্ত।

তৃতীয়তঃ, অর্থ খুব মূল্যবান জিনিষদ্বারা গঠিত হওয়া চাই; ইহা যেন অল্প আয়তনের ভিতর বেশী মূল্যের জিনিষ হয় এবং সহজে বহনযোগ্য হয়। স্বর্ণ ও রৌপের এই গুণ আছে।

চতুর্থতঃ, স্বর্ণ ও রৌপ্য সহজ-নমনীয় (malleable) ধাতু। এগুলিকে গলাইয়া সহজে বিভিন্ন ছাপযুক্ত বিভিন্ন আকারের মুদ্রা তৈরী করা যাইতে পারে।

পঞ্চমতঃ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিভাজ্যতা (divisibility) এবং সমজাতিকতা (homegeneity) ইহাদিগকে বিনিময়ের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম করিয়াছে। এই সব ধাতুগুলির মূল্য একটুও ক্ষুণ্ন না করিয়া এগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা যায়। সমজাতিকতা হেতু বিভাগ করিবার ফলে ইহাদের মূল্য হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না।

ষষ্ঠতঃ, অর্থরূপে ব্যবহৃত জিনিষ যেন সাধারণ ব্যক্তিও সহজে চিনিয়া লইতে পারে, এমন (cognisable) হওয়া চাই। স্বর্ণ ও রৌপ্য সহজেই মানুষ চিনিয়া লইতে পারে।

সপ্তমতঃ, অর্থরূপে ব্যবহৃত জিনিষের মূল্য স্থায়ী হওয়া দরকার। ইহার মূল্যের স্থায়িত্ব না থাকিলে, অর্থ-ব্যবহারের একটা প্রধান উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। অর্থের ক্রয়-মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে থাকিলে, অসুবিধার সীমা থাকে না। স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য মোটের উপর দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে বলা চলে।

অর্থের সংজ্ঞা কি ?

(Definition of Money)

স্বর্ণ ও রৌপ্য যদিও বিশেষ মূল্যবান ও সর্ব্বত্র আদরনীয় ধাতু এবং বিনিময়ের মাধ্যমরূপে গণ্য হইবার যোগ্য, তথাপি এগুলি অর্থের সংজ্ঞার ভিতর পড়ে না। কারণ, এগুলি আর বিনিময়ের মাধ্যমরূপে গণ্য হয় না। যে সব জিনিষ বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হয়, আমাদের জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া আমরা যে সব জিনিষ গ্রহণ করিয়া থাকি এবং ক্রয় করিয়া যে সব জিনিষ দিলে অপরে লইয়া থাকে, চাকরি প্রভৃতি কাজের পরিবর্ত্তে যে সব জিনিষ আমরা পাইয়া থাকি এবং অপরে গ্রহণ করিয়া থাকে, যাহা দিয়া দেনা পরিশোধ করিয়া থাকি, অর্থ বলিতে সেই সমস্ত জিনিষই বুঝায়। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, কোনও দেশে বিনিময়ের মাধ্যমরূপে এবং পাওনাদারদের পাওনা মিটাইবার উপায়রূপে যে সব জিনিষ ব্যবহৃত হয়, অর্থ হইল তাহাই।

সরকার যাহাকে বিহিত অর্থ (legal tender money) বলিয়া ধার্য্য করেন, তাহা যে-কোনও লোক তাহার দেনা পরিশোধ করিবার সময় অপরকে দিতে পারে এবং লোকে তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য। ইহাকে কেহ কেহ অর্থের সংজ্ঞা

বলিয়া থাকেন। কিন্তু সরকার যাহাকে বিহিত অর্থ (legal tender money) বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তাহা যদি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য না হয়, কোনও কারণে দেশে যদি তাহা চালু না হয়, তাহা হইলে শুধু সরকারী ঘোষণা-বলেই সেই জিনিষ অর্থ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। অর্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে সেই জিনিষের দেশের সকলের নিকট বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ও ঋণ পরিশোধের উপায়রূপে গ্রহণযোগ্য হওয়া দরকার।

ব্যাঙ্কের উপর কাটা চেক অর্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কারণ চেক বিনিময়ের মাধ্যমরূপে সর্ব্বজনগ্রাহ্য নহে। চেকদাতা আর্থিক খ্যাতিযুক্ত ও পরিচিত হইলেই লোকে চেক গ্রহণ করে, নতুবা চেক প্রত্যাখ্যাত হয়। অর্থ এমন জিনিষ হওয়া চাই, যাহা লোকে বিনা প্রশ্নে বিনিময়ের মাধ্যমরূপে এবং ঋণ পরিশোধের উপায়রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে।

প্রত্যক্ষ দ্রব্য বিনিময় ত্যাগ করিয়া অর্থের মাধ্যমে দ্রব্য বিনিময়ের সুবিধা

(Advantages of the Use of Money)

খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি জিনিষ যেমন প্রত্যক্ষভাবে আমাদের উপভোগে লাগে, অর্থ সেইরূপ প্রত্যক্ষ উপভোগের বস্তু নহে। অর্থ দিয়া অন্য জিনিষপত্র পাইতে পারি, ইহাই হইল অর্থের গুরুত্ব। খাদ্য বা বস্ত্রের মত প্রত্যক্ষভাবে আমরা অর্থের প্রত্যক্ষ ব্যবহার না করিলেও, অর্থ দিয়া যে সব জিনিষ পাওয়া যায়, তাহা আমরা উপভোগ করি। জিনিষপত্র বিনিময়ের বাহনরূপে অর্থ আমাদের প্রভূত উপকার করিয়াছে। প্রত্যক্ষ দ্রব্য বিনিময়ের যা' যা' অসুবিধা, অর্থ প্রচলনের দ্বারা সে সমস্ত দূর হইয়াছে। তাই আজ মোট উৎপাদনের পরিমাণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উৎপন্ন সম্পদের বিতরণ সহজ হইয়াছে। ব্যবহারকগণ অর্থের বিনিময়ে সহজে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পাইতেছে। অর্থের প্রচলন না হইলে, বর্ত্তমান বস্ত্র-তান্ত্রিক যুগের বিরাট উৎপাদন-যন্ত্র একদিনও চলিতে পারিত না।

অর্থের কাজ কি?

(Functions of Money)

অর্থ আমাদের বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম বা বাহন (common medium of exchange); ইহাই হইল অর্থের মুখ্য কাজ। অর্থ প্রত্যক্ষ দ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধাসমূহ দূর করিয়াছে। অর্থ বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যমরূপে

ব্যবহৃত হওয়ায়, প্রত্যেকে নিজের নিজের জিনিষ অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকে ; কারণ প্রত্যেকে জানে যে, অর্থ দিয়া আবার যে যাহার প্রয়োজন মত জিনিষ কিনিতে পারিবে। তন্তুবায় তাহার বস্ত্র দিয়া ধীবরের নিকট হইতে মাছ লইতে অনিচ্ছুক হইতে পারে, কিন্তু অর্থের বিনিময়ে বস্ত্র বিক্রয় করিতে দ্বিধা করিবে না। এই ভাবে অর্থ সকল প্রকার বিনিময়-কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে।

অর্থ জিনিষপত্রের মূল্যের মান (measure of value) হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। বিনিময়ের মাধ্যমরূপে কাজ করা এবং মূল্যের মান হিসাবে কাজ করা, এই উভয় কার্য্যই পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অর্থ বিনিময়ের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য, অর্থের দ্বারাই বিভিন্ন জিনিষপত্র বা সেবা বা চাকরীর মূল্য প্রকাশিত হইয়া থাকে, অর্থের দ্বারাই আমরা জিনিষপত্রের মূল্যের মান নির্ণয় করিতে পারি।

তৃতীয়তঃ, অর্থ মূল্যের ভাণ্ডার (a store of value) রূপে কাজ করিয়া থাকে। কেহ যদি ভবিষ্যৎ বৎসরের জন্য উদ্বৃত্ত শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহা হইলে, তাহার শস্য নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, অথবা শস্যের মূল্য হ্রাস হেতু তাহার ক্ষতি হইতে পারে। অন্যান্য জিনিষ সঞ্চয় সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। কিন্তু যদি সে ব্যক্তি তাহার উদ্বৃত্ত জিনিষের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে যে-কোনও সময় সে সেই অর্থের বিনিময়ে অন্য জিনিষ কিনিতে পারে। ইহাতে তাহার ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, অর্থ তাহার মূল্যের ভাণ্ডার (a store of value) রূপে জমা রহিবে।

চতুর্থতঃ, অর্থ স্থগিত দেনা পরিশোধের মান (a standard of deferred payments) স্বরূপে কাজ করিয়া থাকে। মানুষের দেনা সব সময় সঙ্গে সঙ্গে মিটাইয়া দেওয়া হয় না। যে সব দেনা পরিশোধ স্থগিত রাখা হয়, সেগুলি সাধারণতঃ অর্থের দ্বারাই পরিশোধের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। কারণ, অর্থ দ্বারা স্থগিত দেনা পরিশোধ হইলে, মহাজন সমপরিমাণ মূল্য ফেরত পাইবে, আশা করিতে পারে।

এস্থলে মনে রাখা দরকার যে, অর্থের উল্লিখিত তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যক কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে হইলে অর্থের মূল্য স্থায়ী (stable) হওয়া দরকার। অর্থের মূল্যের যদি অনবরত তারতম্য হয়, তাহা হইলে অর্থ মূল্যের মানরূপে অথবা মূল্যের ভাণ্ডাররূপে কাজ করিতে পারে না। মনে করা যাক, দশ বৎসরের আগে এক ব্যক্তি এক হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়া

রাখিয়াছিল। তখন জিনিষপত্রের দাম ছিল খুব সস্তা। আজ দশ বৎসর পরে জিনিষপত্রের দাম তিনগুণ বাড়িয়াছে। দশ বৎসর পূর্ব্বের সঞ্চিত হাজার টাকার মূল্য আজ কমিয়া এক-তৃতীয়াংশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমাদের সঞ্চয়কারী ব্যক্তি তাহার সঞ্চিত অর্থের বিনিময়ে অনেক কম জিনিষ পাইবে। স্থতরাং এক্ষেত্রে অর্থ মূল্যের ভাণ্ডার (a store of value) রূপে কাজ করিতে পারিল না। ঠিক এই ভাবে, অর্থের মূল্য যদি সুস্থিত (stable) না থাকে, তাহা হইলে অর্থ বিলম্বিত দেনা পরিশোধের মান (a standaad deferred payments) রূপেও কাজ করিতে পারে না। মনে করা যাক, আজ এক ব্যক্তি অপর একজনকে এক হাজার টাকা ঋণ দিল। যদি পাঁচ বৎসর বাদে অর্থের মূল্য বাড়িয়া ১৯৩৯ সালের সমান হয়, অর্থাৎ জিনিষপত্র যদি ১৯৩৯ সালের অনুরূপ সস্তা হয়, তাহা হইলে দেনাদার ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করিলে জিনিষপত্রের হিসাবে তাহাকে অনেক বেশী দিতে হইবে, ফলে, খাতককে খুব মুস্কিলে পড়িতে হইবে। এরূপ হইলে, অর্থ স্থগিত ঋণ পরিশোধের মান (a standard of deferred payments) রূপে কাজ করিতে পারে না।

বিভিন্ন প্রকারের অর্থ

(Different Kinds of Money)

সরকার কর্ত্তৃক ঘোষিত বিহিত অর্থের (legal tender money) কথা আগেই বলা হইয়াছে। সরকার যাহাকে বিহিত অর্থ (legal tender money) বলিয়া ঘোষণা করে, দেশের সকলে তাহা নিজের নিজের পাওনা হিসাবে লইতে বাধ্য। ভারতবর্ষে টাকা বিহিত অর্থ; বিক্রয়ের জন্য অথবা চাকুরী বা সেবার জন্য আমাদের পাওনা হিসাবে টাকা লইতে আমরা বাধ্য। কিন্তু চেক্ (cheque) কোনও দেশে বিহিত অর্থ (legal tender) নহে; কেহ নিজের পাওনা হিসাবে চেক লইতে বাধ্য হইতে পারে না।

বিহিত অর্থ (legal tender) আবার দুইরূপ হইতে পারে, যথা সঙ্কীর্ণ বিহিত অর্থ (limited legal tender) এবং সীমাহীন বিহিত অর্থ (unlimited legal tender); সঙ্কীর্ণ বিহিত অর্থ (limited legal tender) বলিতে বুঝায়, যে অর্থ একটা অল্প নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ঋণের বেশী শোধ করিতে ব্যবহার করা যাইতে পারে না, ঋণ পরিশোধ করিবার যোগ্যতা যাহার সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশের চার আনি, দু-আনি

এক আনি এবং দু-পয়সা ও এক পয়সাগুলি সঙ্কীর্ণ বিহিত অর্থ (limited legal tender)।

এক টাকার বেশী পরিমাণ ঋণ পরিশোধের কাজে এগুলি ব্যবহৃত হইতে পারে না। অর্থাৎ, কাহারও যদি পাঁচ টাকার ঋণ থাকে এবং সে পাঁচ টাকার পয়সা দিয়া ঋণ শোধ করিতে চায়, তাহা হইলে মহাজন তাহা লইতে অস্বীকার করিতে পারে। কিন্তু আমাদের আট আনি বা টাকাগুলি সীমাহীন বিহিত অর্থ (unlimted legal tender); প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ যত বেশী হউক না কেন, টাকা বা আধুলি দিয়া তাহা পরিশোধ করা যাইতে পারে, মহাজন ইহা লইতে অস্বীকার করিতে পারে না।

আদর্শ অর্থ এবং সাংকেতিক অর্থ

(Standard Money and Token Money)

যে সব মুদ্রার নির্দ্দিষ্ট মূল্য (face value) এবং ধাতুর স্বকীয় মূল্যে প্রভেদ নাই এবং যাহা সীমাহীন বিহিত অর্থ (unlimited legal tender) রূপে গণ্য হয়, তাহাকে আদর্শ অর্থ (Standard Money) বলা হয়। আদর্শ অর্থের এক বিশেষ পরিচয় এই যে, ইহার অঙ্কেই দেশের হিসাব পত্র রাখা হয়। আদর্শ অর্থকে গলাইয়া ফেলিলে যে পরিমাণ ধাতু পাওয়া যায় তাহার মূল্য, অর্থের নির্দ্দিষ্ট মূল্যের (face value) সমান হইবে। তাহা ছাড়া, যে-কোনও মহাজন তাহার পাওনা পরিশোধ হিসাবে আদর্শ অর্থ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকে।

নির্দ্দেশক অর্থ (Token Money) বলিতে সেই সব মুদ্রা বুঝায় যাহার নির্দ্দিষ্ট মূল্য (face value) স্বকীয় মূল্য (intrinsic value) অপেক্ষা বেশী। নির্দ্দেশক অর্থ যদি গলাইয়া ধাতু বাহির করা যায়, তবে তাহার মূল্য নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা কম হইবে। সাংকেতিক অর্থ সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ বিহিত অর্থ (limited legal tender) এবং খুচরা টাকা পয়সার কাজে ইহার ব্যবহার হয়। আনা, পয়সা, শিলিং, পেন্স প্রভৃতি সাংকেতিক অর্থের (Token Money) দৃষ্টান্ত।

আমাদের দেশের টাকা দেশের আদর্শ অর্থ (Standard Money) হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে। টাকা সীমাহীন বিহিত অর্থ (unlimited legal tender) এবং টাকার অঙ্কেই দেশের হিসাবপত্র রাখা হইয়া থাকে। কিন্তু

১৮৯৩ সালের পর হইতে টাকার স্বকীয় ধাতুগত মূল্য (untrinsic value) ইহার নির্দ্দিষ্ট মূল্য (face value) অপেক্ষা কম। বর্ত্তমানে নিকেলের তৈরী টাকাগুলির স্বকীয় মূল্য খুবই সামান্য। অতএব, ইহাকে আদর্শ অর্থ এবং সাংকেতিক অর্থ দুই-ই বলা যাইতে পারে।

মুদ্রাঙ্কন
(Coinage)

সব দেশেই বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রা প্রচলিত আছে। দেশের সরকারী টঁ্যাকশালেই (Mint) মুদ্রা প্রস্তুত হইয়া থাকে ; বিভিন্ন আকার ও ওজন বিভিন্ন হইয়া থাকে। টঁ্যাকশালে প্রত্যেকটি মুদ্রায় মূল্যের সাংকেতিক ছাপ দেওয়া হয় এবং বেশী মূল্যের মুদ্রাগুলির ধার যাহাতে দুষ্ট লোক কাটিয়া লইতে না পারে, তাহার জন্য মুদ্রার ধারগুলি খাঁজ কাটা (milling) করা হইয়া থাকে।

সব দেশে সরকার নিজেই টঁ্যাকশাল স্থাপন করিয়া মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া থাকে, অপর কেহ মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অধিকার পায় না। তবে, আগে আগে অনেক দেশেই এই নিয়ম ছিল যে, জনসাধারণ টঁ্যাকশালে ধাতু (স্বর্ণ বা রৌপ্য) বহিয়া আনিয়া নিজেদের প্রয়োজনমত মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিত। ইংলণ্ডে ১৯১৪ সালের আগে যে কেহ সরকারী টঁ্যাকশালে স্বর্ণ দিয়া বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা দাবী করিতে পারিত। ভারতবর্ষেও ১৮৯৩ সালের পূর্ব্বে যে কেহ রৌপ্য দিয়া টাকা পাইবার অধিকারী ছিল। সরকারী টঁ্যাকশালায় ধাতুর (স্বর্ণ বা রৌপ্য) পরিবর্ত্তে যে কোনও পরিমাণ মুদ্রা পাওয়ার ব্যবস্থাকে অবারিত মুদ্রাঙ্কণ (Free Coinage) বলা হয়। বর্ত্তমানে কোনও দেশেই অবারিত মুদ্রাঙ্কন (Free Coinage) নাই ; সব দেশেই সরকার দেশের প্রয়োজনমত সরকারী কর্ত্তৃত্বে মুদ্রা তৈরী করিয়া থাকে। ইহাকে সীমাবদ্ধ মুদ্রাঙ্কন (Limited Coinage) বলা হয়।

অবারিত মুদ্রাঙ্কনের কালে সরকারী টঁ্যাকশালায় মুদ্রা প্রস্তুত করিতে যে খরচ হয়, তাহা হইতে জনসাধারণকে যখন রেহাই দেওয়া হয়, অর্থাৎ জনসাধারণকে নিজেদের মুদ্রাঙ্কন করিবার জন্য যখন কিছুমাত্র খরচ করিতে হয় না, তখন তাহাকে ব্যয়হীন মুদ্রাঙ্কন (gratuitous coinage) বলে। এক্ষেত্রে মুদ্রার নির্দ্দিষ্ট মূল্য (face value) এবং স্বকীয় মূল্য সমান। ১৯১৪ সালের

আগে ইংলণ্ডে জনসাধারণ কোনও ব্যয় না করিয়া মুদ্রাঙ্কন করিতে পারিত। সরকার যখন মুদ্রাঙ্কনে আসল খরচটুকু আদায় করে তখন এই আদায়ী অর্থকে ব্রাসেজ (Brassage) বলে। সরকার যখন মুদ্রাঙ্কনের আসল খরচ অপেক্ষা বেশী আদায় করে, তখন সেই আদায়ী অর্থকে সিনিওরেজ (seigniorage) বা বাণী বলে।

কাগজী অর্থ
(Paper Money)

বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই কাগজী অর্থের (Paper Money) প্রচলন দেখা যায়। বিনিময়ের মাধ্যমরূপে একমাত্র ধাতু মুদ্রার ব্যবহার না করিয়া অন্ততঃ কিছু পরিমাণ কাগজী অর্থের ব্যবহার করিবার দৃষ্টান্ত এসিয়ায় প্রথম দেখা গিয়াছিল। চীন দেশেই সর্ব্বপ্রথম, সম্ভবতঃ নবম শতাব্দীতে কাগজী মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল। জাপান ও পারস্য দেশেও পরবর্ত্তী কালে কাগজী অর্থের প্রচলন দেখা গিয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে, কাগজী অর্থ ধাতব মুদ্রাকে বহু পরিমাণে অপসারিত করিয়া তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র আজ কাগজী অর্থ প্রচলিত মোট অর্থের তিন ভাগ হইবে এবং প্রায় সর্ব্বত্রই আজ কাগজী মান (Paper Standard) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তিন রকমের কাগজী অর্থ
(Three Kinds of Paper Money)

যখন কাগজী অর্থের নির্দ্দিষ্ট মূল্যের সমপরিমাণ ধাতব তহবিল (metallic reserve) মজুত থাকে, তখন তাহাকে প্রতিনিধিস্থানীয় কাগজী অর্থ (representative paper money) বলে। এক্ষেত্রে একশত পাউণ্ডের কাগজী অর্থ (paper money) প্রচলন করা হইলে, একশত পাউণ্ডের পরিমাণ স্বর্ণ তহবিল মজুত রাখিতে হইবে। প্রতিনিধিস্থানীয় কাগজী অর্থের (representative paper money) নির্দ্ধারিত মূল্যের সমপরিমাণ ধাতব তহবিল (metallic reserve) তখন জমা থাকে।

কাগজী অর্থ পরিবর্ত্তনীয় (convertible) অথবা অপরিবর্ত্তনীয় (inconvertible) হইতে পারে। পরিবর্ত্তনীয় কাগজী অর্থ (convertible paper money) ইচ্ছামত ধাতব মুদ্রায় পরিবর্ত্তিত করা যায়। এক্ষেত্রে কাগজী অর্থ প্রচলনকারী কর্ত্তৃপক্ষ দেশের সরকার অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট যাইয়া কাগজী অর্থের বিনিময়ে সমপরিমাণ মূল্যের মুদ্রা চাহিলেই পাওয়া

যাইবে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রচলিত পাঁচ, দশ ও তদূর্দ্ধ মূল্যের নোট বা কাগজী অর্থ চাহিবামাত্র বদল করা যাইবে। সুতরাং এগুলিকে পরিবর্ত্তনীয় কাগজী মুদ্রা (convertible paper money) বলা চলে।

যখন কাগজী অর্থকে ইচ্ছামত ধাতব মুদ্রায় পরিবর্ত্তিত করা যায় না, তখন তাহাকে অপরিবর্ত্তনীয় কাগজী অর্থ (inconvertible paper money) বলে। এরূপ ক্ষেত্রে, কাগজী অর্থের উপর একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্য লেখা থাকে, কিন্তু, কাগজী অর্থ প্রচলনকারী কর্তৃপক্ষ সেই কাগজী অর্থের বিনিময়ে নির্দ্দিষ্ট মূল্যের সমপরিমাণ ধাতব মুদ্রা দিতে বাধ্য থাকে না। অপরিবর্ত্তনীয় কাগজী মুদ্রা আবার দুই রকমের হইতে পারে। এক রকম হইতে পারে যে কাগজী অর্থ প্রথম প্রচলনের সময় পরিবর্ত্তনীয় ছিল, কিন্তু, পরবর্ত্তী কালে, প্রচলনকারী কর্তৃপক্ষের অসামর্থ্য হেতু কাগজী অর্থ অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া গেল। অথবা, এমন হইতে পারে যে, সরকার জানিয়া শুনিয়া প্রথম হইতেই অপরিবর্ত্তনীয় কাগজী অর্থ বাহির করিল। ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক,—ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড,— ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের আগে যে সব নোট প্রচলন করিয়াছিল, সেগুলি ছিল পরিবর্ত্তনীয় কাগজী অর্থ (convertible paper money), ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর হইতে সরকারী ঘোষণার দ্বারা এই সমস্ত নোটকে অপরিবর্ত্তনীয় কাগজী অর্থ (inconvertible paper money) করা হইয়াছে।

কাগজী অর্থের ভাল-মন্দ

(Merits and Demerits of Paper Money)

কাগজী অর্থ ছাপাইবার খরচ নামমাত্র ; আর, ধাতব মুদ্রার খরচ অনেক। কাজেই, ধাতব মুদ্রার প্রচলন কমাইয়া কাগজী অর্থের প্রচলন করিলে, সরকারের অথবা দেশের অনেক লাভ হইবে। যে পরিমাণ ধাতব মুদ্রা বাঁচিবে, তাহা শিল্প-বাণিজ্যে নিয়োগ করিয়া অথবা তাহাতে বিদেশ হইতে জিনিষপত্র কিনিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি করা যাইতে পারে। যদি সমস্ত দেশ ধাতব মুদ্রার মোহ ত্যাগ করিয়া কাগজী অর্থ গ্রহণ করে, তাহা হইলে স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য খনন করিবার জন্য যে বিপুল মূলধন ও শ্রম আবশ্যক হয়, তাহা খাদ্য, পরিধেয় প্রভৃতি মানুষের অত্যাবশ্যক জিনিষপত্র উৎপাদনের কাজে লাগাইতে পারা যায়। তাহা ছাড়া, ধাতব মুদ্রা প্রচলিত থাকিলে, ব্যবহারজনিত ক্ষয় ক্ষতির (wear and tear) পরিমাণও কম হয় না। কাগজী অর্থ প্রচলন করিলে মানুষ এই ক্ষতির হাত এড়াইতে পারে।

কাগজী অর্থের আর একটি সুবিধা এই যে, ইহার সাহায্যে অনেক টাকার লেন-দেন করা সহজ হয়। যেখানে হাজার হাজার টাকার কারবার সেখানে ধাতব মুদ্রা ব্যবহারে অনেক অসুবিধা আছে। ধাতব মুদ্রাগুলিকে গণিতে এবং বাজাইয়া বা অন্যভাবে পরীক্ষা করিতে অনেক সময় লাগিবে। কাগজী অর্থ ব্যবহার করিলে এই অসুবিধাগুলি ভোগ করিতে হয় না। স্থানান্তরে বেশী টাকা পাঠাইতে হইলেও ধাতব মুদ্রা না দিয়া কাগজী অর্থের সাহায্যে টাকা পাঠানই সহজ ব্যবস্থা।

সঙ্কোচ-প্রসারশীলতা (elasticity) কাগজী অর্থের বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুণ। যদি শুধুমাত্র ধাতব মুদ্রা ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে অর্থের পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রাপ্তব্য পরিমাণের উপর নির্ভর করিবে। উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়িলেও যদি স্বর্ণ-রৌপ্যের পরিমাণ না বাড়ে, তাহা হইলে অর্থের পরিমাণ বড়িবে না। কিন্তু, কাগজী অর্থ, সম্পদ উৎপাদন এবং শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রয়োজনের সঙ্গে সমান তালে বাড়ানো-কমানো যাইতে পারে।

কাগজী অর্থের একটী বড় অসুবিধা হইতেছে যে, দেশের বাইরে ইহার প্রচলন সম্ভব নহে। কাগজী অর্থের স্বকীয় বা নিহিত মূল্য (intrinsic value) কিছুই নাই; কাজেই, বিদেশীর দৃষ্টিতে ইহা গ্রহণযোগ্য নহে। কাগজী অর্থের সবচেয়ে বড় অসুবিধা এই যে, ইহার মূল্য অতিমাত্রায় অনিশ্চিত (unstable); বিশেষ করিয়া, অপরিবর্ত্তনীয় কাগজী অর্থ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক যে-কোনও পরিমাণে প্রচলিত হইতে পারে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাগজী অর্থ বাজারে ছাড়া হইলে, জিনিষপত্রের দাম চড়িয়া যাইবে আর অর্থের মূল্যও কমিয়া যাইবে। এইভাবে অর্থের মূল্য যদি স্থায়ী না থাকিয়া অনিশ্চিত হয়, তাহা হইলে অর্থের একটা প্রধান উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।

বিভিন্ন অর্থ-মান বা অর্থপ্রণালী

(Different Money Systems or Money Standards)

আদর্শ মুদ্রা (standard money) যদি একটি মাত্র ধাতু দ্বারা গঠিত হয়, অথবা প্রচলিত অর্থ যদি একটি মাত্র ধাতুতে পরিবর্ত্তনীয় হয়, তাহা হইলে সেই ব্যবস্থাকে এক ধাতুমান (monometallism) বলে। দেশের আদর্শ অর্থ যদি স্বর্ণদ্বারা গঠিত হয়, অথবা, প্রচলিত অর্থ যদি মাত্র স্বর্ণে পরিবর্ত্তনীয় হয়, তাহা হইলে সেই দেশে স্বর্ণমান (gold standard) প্রচলিত আছে

বলা যায়। স্বর্ণমান গ্রহণকারী দেশে যে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত (current) থাকিতে হইবে, তাহা নহে ; সেখানে কাগজী অর্থ চলতি থাকিতে পারে। সেখানে শুধু এই নিয়ম থাকা চাই যে, সব অর্থ একটা নির্দ্দিষ্ট হারে স্বর্ণের সহিত বিনিময় করা যাইবে। অর্থাৎ স্থানীয় চলতি অর্থের পরিমাপে স্বর্ণমূল্য স্থির থাকিবে এবং অর্থবিষয়ক কর্তৃপক্ষ নির্দ্দিষ্ট মূল্যে স্বর্ণ ক্রয় করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। স্বর্ণমানযুক্ত দেশে স্বর্ণ আমদানি ও রপ্তানির উপরও কোনও বাধা নিষেধ আরোপ করা উচিত নহে। বর্ত্তমানে কোনও দেশেই স্বর্ণমান প্রচলিত নহে।

স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়ই যখন দেশের আদর্শ মুদ্রা বলিয়া গৃহীত হয়, তখন আমরা দ্বি-ধাতুমান (Bimetallism)-এর দৃষ্টান্ত পাই, দ্বি-ধাতুমান দেশে স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয়ই সমভাবে অসীমাবদ্ধ বিহিত অর্থ (unlimited legal tender) রূপে পরিগণিত হয় এবং উভয় ধাতুরই সীমাহীন অবাধ মুদ্রাঙ্কনের (unlimited free coinage) অধিকার থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অনেক দেশে ইহা প্রচলিত ছিল।

গ্রেশ্যামের আইন

(Gresham's Law)

ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের জনৈক অর্থনৈতিক উপদেষ্টা স্যার টমাস গ্রেশ্যাম-এর নাম অনুসারে এই নিয়মের নাম রাখা হইয়াছে। যখন কোনও দেশে বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা চলিত থাকে, তখন উহাদের মধ্যে খারাপ মুদ্রা ভাল মুদ্রাকে বিতাড়িত করিয়া চালু হইয়া থাকে, ইহাই হইল গ্রেশ্যামের নিয়ম। কোনও দেশে যদি ভাল এবং খারাপ মুদ্রা একই সঙ্গে চালু করা যায়, তখন খারাপ মুদ্রা ভাল মুদ্রাকে বিতাড়িত করে (Bad money drives good money out of circulation)। প্রথমেই, ভাল মুদ্রা বা খারাপ মুদ্রা বলিতে কি বুঝায়, তাহা জানা দরকার। খারাপ মুদ্রা বলিতে যে এখানে জাল মুদ্রা বুঝায় তাহা নহে। দুইটি বা দুই রকম মুদ্রার মধ্যে খারাপ মুদ্রা সেইটি যাহার ধাতুগত মূল্য ভাল মুদ্রা অপেক্ষা কম। দেশে চলতি এক ধাতুর মুদ্রাগুলির মধ্যে পুরাতনগুলি বহু ব্যবহারের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, ফলে, পুরাতন মুদ্রাগুলির ওজন নূতন গুলির ওজন অপেক্ষা কম হইয়া থাকে। নূতন মুদ্রা হইল ভাল অর্থ, পুরাতনগুলি খারাপ অর্থ, এই অবস্থায় দেশে পুরাতন মুদ্রাগুলি নূতন বিতাড়িত করিয়া নিজেরাই চালু থাকিবার সম্ভাবনা।

যদি দেশে দ্বিমান প্রচলিত থাকিবার জন্য স্বর্ণ এবং রৌপ্য উভয় ধাতুর মুদ্রাই চালু থাকে, তাহা হইলে স্বর্ণ ও রৌপ্যের সরকারী নির্দ্ধারিত মূল্যের সহিত বাজারের মূল্যের প্রভেদ হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে একটি ধাতু অপরটিকে বিতাড়িত করিতে পারে। মনে করা যাক, একটি দ্বিমানগ্রহণকারী দেশে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের সরকারী বিনিময়-হার স্থির হইল ১ : ১৫, অর্থাৎ সরকার ১৫ ভাগ রৌপ্যের বদলে এক ভাগ স্বর্ণ দিবে, ইহা স্থির হইল। যদি বাজারে রৌপ্য সস্তা হইয়া যাইবার জন্য বাজারে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়-হার ১ : ১৬ হয়, অর্থাৎ ১ ভাগ স্বর্ণের বিনিময়ে ১৬ ভাগ রৌপ্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে কম মূল্যের রৌপ্য বেশী মূল্যের স্বর্ণকে বিতাড়িত করিয়া নিজে চালু থাকিবে।

ভাল মুদ্রা যে চলতি থাকে না, খারাপ মুদ্রা চলতি থাকে, তাহার কারণ খারাপ মুদ্রার মূল্য ধাতু হিসাবে ভাল মুদ্রা অপেক্ষা কম। এই জন্য লোকে নিজের কাছে ভাল মুদ্রাগুলি রাখিয়া খারাপ মুদ্রাগুলি অপরকে দিয়া থাকে। লোকে যে চক্‌চকে নূতন তৈরী টাকা আধুলি অথবা নোট নিজের কাছে রাখিয়া ঘসা পুরাতন টাকা আধুলি বা ময়লা ছেঁড়া-কাটা নোটগুলি অপরকে দিবার চেষ্টা করে, ইহাকেই গ্রেশ্যামের নিয়মের এক উদাহরণ বলা যাইতে পারে।

খারাপ মুদ্রা বিবিধ ভাবে ভাল মুদ্রাকে বাজার হইতে বিতাড়িত করে এবং তাহার স্থলে একমাত্র নিজেই চালু থাকে। মানুষ যখন ভবিষ্যতের জন্য মুদ্রা সঞ্চয় করে, তখন ক্ষয়প্রাপ্ত কম-ওজনের ঘসা পুরাতন মুদ্রা না রাখিয়া অবশ্যই পূর্ণ ওজনের সদ্য প্রস্তুত মুদ্রা রাখিয়া থাকে। এই ভাবে ভাল মুদ্রা মানুষের সঞ্চয়-ভাণ্ডারে আত্ম-গোপন করে এবং খারাপ মুদ্রা বাজারে চলতি হইতে থাকে। ইহা ছাড়া, স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যবসায়ীরা নূতন মুদ্রাগুলি গলাইয়া কারবার করিবে, পুরাতনগুলি কম ওজন হইতে পারে বলিয়া সেগুলি বাদ দিবে। আবার, দ্বিধাতুমানের দেশে স্বর্ণের বাজার-মূল্য যদি সরকার-নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে চতুর ব্যবসায়ীরা স্বর্ণমুদ্রা গলাইয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া লাভ করিবে। এইভাবে স্বর্ণমুদ্রা বাজারে দেখা যাইবে না, রৌপ্য-মুদ্রার রাজত্ব চলিবে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা এবং অন্যান্য কারণে বিদেশে অর্থ পাঠাইবার জন্য মুদ্রা পাঠাইবার দরকার হইতে পারে। এই ভাবে বৈদেশিক দেনা মিটাইবার দরকার হইলে, ভাল মুদ্রাগুলিই পাঠাইতে হইবে, খারাপ মুদ্রাগুলি দেশে চলিতে থাকিবে। বৈদেশিক পাওনাদার ধাতব মুদ্রার নিহিত স্বর্ণ বা রৌপ্য ওজন করিয়া

পাওনা-গণ্ডা বুঝিয়া লইবে, মুদ্রার উপর অঙ্কিত সরকার-নির্দ্দিষ্ট মূল্যের ছাপ দেখিয়া ভুলিবে না। অতএব, বিদেশে মুদ্রা প্রেরণ করিতে হইলে, ভাল মুদ্রাই পাঠাইতে হইবে। দেশের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের জন্য শুধু খারাপ মুদ্রাই চলতি থাকিবে।

গ্রেশ্যামের নিয়মের ব্যতিক্রম

(Limitations of Gresham's Law)

গ্রেশ্যামের নিয়ম যে সব সময় খাটে, তাহা নহে। দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি সকল প্রয়োজনের তুলনায় মোট অর্থের পরিমাণ যদি কম হয়, তাহা হইলে খারাপ ও ভাল অর্থ উভয়ই পাশাপাশি চলিতে পারে। দেশের প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। দেশের মোট চলতি অর্থ যদি প্রয়োজনীয় অর্থ অপেক্ষা বেশী না হয়, খারাপ অর্থ ভাল অর্থকে বিতাড়িত করিতে পারিবে না; উভয় প্রকার অর্থই চলতি থাকিবে।

জনমত যদি কোনরূপ খারাপ অর্থের একান্ত প্রতিকূল হয়, কিছুতেই খারাপ অর্থ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হয়, তাহা হইলে, খারাপ অর্থ বাজারে চলতি হইতে পারে না, সেখানে খারাপ অর্থ ভাল অর্থকে তাড়াইতে পারে না।

অর্থের মূল্য

(The Value of Money)

কোন জিনিষের মূল্য বলিতে সেই জিনিষের বিনিময়ে অন্যান্য জিনিষ কতটা পাওয়া যায় তাহাই বুঝায়; সেইরূপ অর্থের মূল্য বলিতেও অর্থের বিনিময়ে যতটা অন্য জিনিষ পাওয়া যায় তাহা বুঝায়। অতএব, অর্থের মূল্য হইল ইহার ক্রয়শক্তি। অর্থের ক্রয়-শক্তি স্থায়ী থাকে না, প্রায়ই ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি হইতেছে। যদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থে অনেক জিনিষ ক্রয় করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে অর্থের মূল্য বাড়িয়াছে। যদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থে কম জিনিষ ক্রয় করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, অর্থের মূল্য কমিয়াছে। অর্থাৎ, যদি জিনিষপত্রের মূল্য কম হয়, তাহা হইলে অর্থের মূল্য বেশী এবং যদি জিনিষপত্রের মূল্য বেশী হয়, তাহা হইলে অর্থের মূল্য কম বুঝিতে হইবে। জিনিষপত্রের মূল্য কম হইলে, আমরা সামান্য অর্থের বিনিময়ে বেশী জিনিষপত্র কিনিতে পাই; তাহা হইলে অর্থের মূল্য বেশী হইল বলা যায়। আর

জিনিষপত্রের মূল্য বেশী হইলে, আমরা বেশী অর্থের বিনিময়ে কম জিনিষপত্র কিনিতে পাই ; তাহা হইলে অর্থের মূল্য কম হইল বলা যায়। জিনিষপত্রের মূল্যের সহিত অর্থের মূল্যের বিপরীত সম্বন্ধ। জিনিষপত্রের মূল্যবৃদ্ধি অর্থের মূল্যহ্রাস এবং জিনিষপত্রের মূল্যহ্রাস অর্থের মূল্যবৃদ্ধি সূচিত করে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের অর্থের মূল্য অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৩৯ সালে জিনিষপত্রের মূল্যস্তর (Level of Prices) বা গড় মূল্যের তুলনায় বর্ত্তমানে জিনিষপত্রের মূল্য প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব, ১৯৩৯ সালের তুলনায় অর্থের মূল্য বর্ত্তমানে এক-তৃতীয়াংশ হইয়াছে।

অর্থের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি হয় কেন?

(Reasons for the Increase and Decrease in the Value of Money)

যে কোনও জিনিষের মত অর্থের মূল্য তাহার যোগান ও চাহিদার (supply and demand) উপর নির্ভর করে। অর্থের যোগান (supply) বলিতে দুইটি জিনিষ বুঝায়—অর্থের মোট পরিমাণ এবং অর্থের প্রচলন-গতি (velocity of circulation)। আমাদের ক্রয়-বিক্রয় দেনা-পাওনার ভিতর দিয়া অর্থ যে বেগে এক হাত হইতে অন্য হাতে গমনাগমন করে, তাহাকে অর্থের প্রচলন-গতি (velocity of circulation) বলে। মনে করা যাক, এক ব্যক্তি দুগ্ধ-বিক্রেতার নিকট এক টাকার দুগ্ধ ক্রয় করিল। দুগ্ধ-বিক্রেতা আবার ঐ টাকা দিয়া মৎস্য ক্রয় করিল, মৎস্য-বিক্রেতা ঐ টাকা দিয়া আম কিনিল। এই ভাবে এক দিনের মধ্যে একই টাকা তিন বার ক্রয়-বিক্রয়ের ভিতর দিয়া এক হাত হইতে অন্য হাতে চালান হইল। অর্থাৎ টাকার প্রচলন-গতি (velocity of circulation) হইল তিন। এই ভাবে দেখিলে, মোট অর্থেরও একটা প্রচলন-গতি (velocity of circulation) আছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়া অনগ্রসর দেশে অর্থের প্রচলন-গতি কম, অর্থনৈতিক উন্নতিসম্পন্ন দেশে অর্থের প্রচলন-গতি বেশী।

অর্থের চাহিদা বলিতে অর্থ-সাহায্যে যে পরিমাণ বিনিময়-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে তাহা বুঝায়। দেশের উৎপন্ন সমগ্র সম্পদ যে অর্থের মাধ্যমে বিনিময় হইয়া থাকে তাহা নহে ; কতক পরিমাণ সম্পদের প্রত্যক্ষ ভাগ দ্রব্য বিনিময় হইয়া থাকে। তবে, বর্ত্তমানে বেশীর ভাগ সম্পদই অর্থের মাধ্যমে বিনিময় হইয়া থাকে। ইহাই হইল অর্থের চাহিদা।

অর্থের যোগান ও চাহিদা হ্রাস-বৃদ্ধির উপর অর্থের মূল্য নির্ভর করে। অন্যান্য জিনিষ না বদলাইয়া যদি শুধু অর্থের যোগান হ্রাস পায়, তাহা হইলে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং জিনিষপত্রের দাম কমিবে ; এবং যদি অর্থের যোগান বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে অর্থের মূল্য হ্রাস পাইবে এবং জিনিষপত্রের দাম বাড়িবে। আবার, অন্যান্য জিনিষ না বদলাইয়া যদি শুধু অর্থের চাহিদা হ্রাস পায়, তাহা হইলে অর্থের মূল্য হ্রাস পাইবে, জিনিষপত্রের দাম বাড়িবে, এবং যদি অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, জিনিষ-পত্রের দাম বাড়িবে। অর্থাৎ অন্যান্য জিনিষ না বদলাইয়া শুধু অর্থের যোগান হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত অর্থের মূল্যের বিপরীত সম্বন্ধ এবং শুধু অর্থের চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত অর্থের মূল্যের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব

(The Quantity Theory of Money)

অন্যান্য জিনিষ ঠিক থাকিলে, অর্থের মূল্য অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির সহিত আনুপাতিকভাবে কমে এবং অর্থের পরিমাণ হ্রাসের সহিত আনুপাতিকভাবে বাড়ে, অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব বলিতে ইহাই বুঝায়। চলতি অর্থের পরিমাণের উপর অর্থের মূল্য আনুপাতিকভাবে নির্ভর করে। চলতি অর্থের পরিমাণ যদি আজ দ্বিগুণ করা যায়, তাহা হইলে, অর্থের মূল্য কমিয়া অর্দ্ধেক হইবে (অর্থাৎ জিনিষপত্রের মূল্য দ্বিগুণ হইবে), চলিত অর্থের পরিমাণ কমাইয়া যদি অর্দ্ধেক করা হয়, তাহা হইলে অর্থের মূল্য বাড়িয়া দ্বিগুণ হইবে, অর্থাৎ জিনিষপত্রের মূল্য অর্দ্ধেক হইবে।

পরিমাণ তত্ত্বের সত্যতা কতকগুলি জিনিষের উপর নির্ভর করে। প্রথমেই বলা হইয়াছে যে অন্যান্য জিনিষ অপরিবর্ত্তিত থাকিলে অর্থের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধির অনুপাতে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস হইয়া থাকে। এই অন্যান্য জিনিষ বলিতে বুঝায় যে অর্থের চাহিদা এবং অর্থের প্রচলন-গতি যেন অর্থের পরিমাণের পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তিত না হয়। অর্থের চাহিদা স্থির থাকা বলিতে বুঝায় অর্থের মাধ্যমে যে পরিমাণ বিনিময় কার্য্য করিতে হইবে, তাহা যেন না বদলায়। ইহা আবার জনসংখ্যা, উৎপাদন, দ্রব্য-বিনিময়ের পরিমাণ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। অর্থের প্রচলন-গতি ব্যবসায় জগতের প্রথা, প্রচলিত অভ্যাস, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির সুবিধা, যাতায়াতের ব্যবস্থা প্রভৃতির উপর নির্ভর করে।

অর্থের চাহিদা এবং অর্থের প্রচলন-গতি স্থির থাকিলে, অর্থের পরিমাণ বাড়িলে, সমানুপাতিক হারে অর্থের মূল্য হ্রাস এবং জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি হইবে এবং অর্থের পরিমাণ কমিলে, সমানুপাতিক হারে, অর্থের মূল্য বৃদ্ধি ও জিনিষপত্রের মূল্য হ্রাস হইবে। অর্থাৎ টাকার পরিমাণ ঠিক যতগুণ বাড়িবে, জিনিষপত্রের মূল্য ঠিক ততগুণ বাড়িবে এবং টাকার মূল্য ঠিক সেই অনুপাতে কমিবে; এবং টাকার পরিমাণ ঠিক যত ভাগ হ্রাস পাইবে, জিনিষপত্রের মূল্যও ঠিক ততভাগ কমিবে এবং টাকার মূল্য ঠিক সেই হারে বাড়িবে।

অধ্যাপক ফিসার (Prof. Fisher) পরিমাণ-তত্ত্বের নিম্নলিখিত সূত্র (formula) আবিষ্কার করিয়াছিলেন ঃ

$$P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

এই সূত্র P = জিনিষপত্রে মূল্যস্তর।

M = অর্থের পরিমাণ।

M' = ক্রেডিটের (credit) পরিমাণ।

(বর্ত্তমানে সম্পদের একটা বড় অংশ প্রত্যক্ষভাবে টাকা পয়সার মাধ্যমে বিনিময় হয় না। হাতে হাতে টাকা না দিয়া, চেক কাটিয়া ক্রেডিটের বলে বিনিময় হয়। সুতরাং, পরিমাণ-তত্ত্বে মোট ক্রেডিটের পরিমাণও ধরিতে হইবে)।

V = অর্থের প্রচলন-গতি।

V' = ক্রেডিটের প্রচলন-গতি।

T = নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ জিনিষপত্র ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ক্রেডিট

(Credit)

ব্যবসা জগতে যে বিপুল পরিমাণ ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে, তাহার সমস্ত অংশের মূল্য হাতে হাতে নগদ অর্থ দিয়া পরিশোধ করা হয় না; অধিকাংশ স্থলে, বিশ্বাসের উপর,—ক্রেডিটে—ধারে কারবার চলে, নগদ টাকার লেন-দেন হয় না। বিশেষ করিয়া, বড় বড় অঙ্কের আদান-প্রদান এই ক্রেডিটের সাহায্যে সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। এক ব্যবসায়ী অপর ব্যবসায়ীর নিকট বিশ হাজার টাকার মাল কিনিলে, নগদ টাকা দিয়া মূল্য শোধ না করিয়া, ক্রেতা একটি চেক (cheque), ড্রাফ্‌ট (draft) এই বিক্রেতাকে দেয়। আবার, বিদেশ হইতে মাল আমদানি করা হইলে, নগদ টাকা বা স্বর্ণ-রৌপ্য না পাঠাইয়া হুণ্ডী (or bill of exchange) মারফত দাম পরিশোধ করা হয়।

ক্রেডিটে যখন কারবার চলে, তখন নগদ টাকা দিয়া বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কারবার চলে। ক্রেতা যখন চেক দিয়া কিনে, তখন, বিক্রেতা নিশ্চয়ই ক্রেতার উপরে বিশেষ আস্থাসম্পন্ন, তাই চেক গ্রহণ করিয়া মাল দিতে পারে। চেকদাতার সততার উপর বিশ্বাস থাকিলে, ব্যাঙ্কে তাহার নামে চেকের টাকা পরিশোধ করিবার মত উপযুক্ত টাকা আছে, এই বিশ্বাস থাকিলে তবে চেক গ্রহণ করা যায়। ক্রেডিট পত্র (Credit instrument) মাত্রই এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ক্রেডিট পত্র দেনাদারের দেন শোধের প্রতিশ্রুতি মাত্র, ইহার বেশী কিছু নহে। এই প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস থাকিলে, তবেই ক্রেডিট পত্র গ্রহণ করা চলে। ক্রেডিটের কারবারে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, ইহাতে হাতে নগদ টাকা শোধ করা হয় না, ভবিষ্যতে এক সময় দাম শোধ করা হইবে, এই প্রতিশ্রুতি থাকে। মহাজনকে তাহার প্রাপ্য বুঝিয়া পাইবার জন্য কিছু কাল অপেক্ষা করিতে হয়। নগদ না পাইয়া, পরে পাওনা পাইবার জন্য কিছুকাল অপেক্ষা করা, ইহাও ক্রেডিটে কারবারের একটি বিশেষ অঙ্গ।

ক্রেডিট পত্রসমূহের মধ্যে চেক (Cheque) এবং হুণ্ডী (Bill of exchange) প্রধান।

চেক
(Cheque)

চেক হইতেছে কোনও ব্যাঙ্কের উপর চাহিবামাত্র একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা দিবার লিখিত আদেশ-পত্র। যে ব্যক্তির চেক কাটিয়া গ্রহণযোগ্য টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে, সে কাহাকেও টাকা দিতে হইলে প্রাপকের নামে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবার জন্য চেক কাটিয়া দিতে পারে। চেকদাতাকে চেকের উপর নিজের নাম সই করিতে হয়। চেক একটি ব্যক্তির নামে বা তাহার আদেশমত অন্য কাহাকেও দেয় হইতে পারে, অথবা চেক একটি ব্যক্তির নামে এবং চেকবাহক যে-কোনও ব্যক্তিকে দেয় হইতে পারে। চেক আসলে টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি মাত্র, ইহার দ্বারা নগদ টাকা দেওয়া হইল না। যে চেক গ্রহণ করে, তাহার চেকদাতার সততায় এবং যে ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটা (draw) হইয়াছে, তাহার উপর বিশ্বাস আছে। এই বিশ্বাস না থাকিলে কেহ চেক গ্রহণ করে না।

চেক-কে কি অর্থ বলা যায়?
(Is Cheque Money) ?

যদিও অর্থনৈতিক দিক দিয়া উন্নত সমাজে চেক সাহায্যে দেনা-পাওনা মিটানো খুব বেশী পরিমাণে হইয়া থাকে, তথাপি চেক-কে অর্থ বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। অর্থের প্রধান গুণ সর্ব্বজন-গ্রাহ্যতা, তাহা চেকের নাই। কাগজী অর্থের মত চেক সকলে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে না। প্রাপক যদি চেকদাতার সততা এবং যে ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটা হইয়াছে, তাহার উপর আস্থাশীল হয়, তবেই চেক গ্রহণ করিতে পারে। অন্যথায় চেক গ্রহণযোগ্য হয় না। অর্থ সকলে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করে, অর্থ সহজে এক হাত হইতে অন্য হাতে চলা-ফেরা করে; কিন্তু চেকের প্রচলন অতি সীমাবদ্ধ, এক নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে চেক চলিবে না। সরকার কর্ত্তৃক বিহিত অর্থ (legal tender money) সকলে তাহাদের নিজ নিজ পাওনা পরিশোধ হিসাবে গ্রহণ করিতে বাধ্য, চেক কেহ গ্রহণ করিতে বাধ্য নহে। যে-কোনও ব্যক্তির কাটা চেক অথবা যে-কোনও ব্যাঙ্কের উপর কাটা চেক, লোকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। তাহা ছাড়া, চেক দ্বারা আদান-প্রদান করিলে বা দেনা শোধ করিলে, দেনা যে মিটিয়া গেল তাহা নহে। চেক-গ্রহীতা চেক লইয়া গিয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা পাইলে, তবেই আদান-প্রদান সম্পূর্ণ হইল, দেনা-পাওনা মিটিয়া গেল। ব্যাঙ্কে উপযুক্ত পরিমাণ টাকা না থাকিবার জন্য অথবা অন্য কোনও কারণে

ব্যাঙ্ক যদি চেকের টাকা না দেয় (চেককে dishonour করে), তাহা হইলে চেক-গ্রহীতা চেকদাতার নিকট পুনরায় টাকা দাবী করিতে পারে।

চেক দ্বারা আদান-প্রদানের লাভ

(Advantages of Payments by Cheques)

চেক দ্বারা আদান-প্রদানের ফলে সমাজ ধাতব মুদ্রা বা টাকার ব্যবহার-জনিত কষ্ট ও বিপত্তির হাত অনেক পরিমাণে এড়ানো যায়। মনে করা যাক, রাম শ্যামের কাছে এক হাজার টাকা ধারে। রাম শ্যামের নামে তাহার ব্যাঙ্কের উপর একটি হাজার টাকার চেক কাটিয়া দিল। শ্যাম চেকটি লইয়া তাহার নিজের ব্যাঙ্কে জমা দিল। রাম ও শ্যামের ব্যাঙ্ক যদি একই হয়, তবে, ব্যাঙ্কটি রামের হিসাবে হাজার টাকা খরচ লিখিয়া শ্যামের নামে হাজার টাকা জমা লিখিবে, কোনও টাকা আদান-প্রদান করিতে হইবে না। আর রাম ও শ্যামের ব্যাঙ্ক যদি পৃথক পৃথক হয়, তাহা হইলে, শ্যাম রামের নিকট হাজার টাকার চেক পাইয়া তাহার নিজের ব্যাঙ্কে জমা দিলে, সেই ব্যাঙ্ক চেক আদায় করিবার জন্য রামের ব্যাঙ্কের নিকট পাঠাইবে। রামের ব্যাঙ্কেও শ্যামের ব্যাঙ্কের উপর টাকা অনুরূপ পরিমাণের চেক কেহ জমা দিয়া যাইতে পারে। এক্ষেত্রে উভয় ব্যাঙ্কে হিসাব খতাইয়া দেখা যাইবে যে, শেষ পর্য্যন্ত হয়ত কোনও ব্যাঙ্কই অপরের নিকট হইতে নগদ কিছু পাইল না, শুধু ব্যাঙ্কের হিসাবপত্রের খাতায় কিছু লেখালেখি হইল, এই মাত্র; কিংবা, শেষ পর্য্যন্ত, হয়ত এক ব্যাঙ্ক হইতে অন্য ব্যাঙ্কে সামান্য পরিমাণ বকেয়া (balance) টাকা দিতে হইবে। এইরূপে মোট যে পরিমাণ টাকার কারবার হয় তাহার তুলনায়, ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে যে বাকী টাকার আদান-প্রদান হয়, তাহার পরিমাণ খুবই কম। আজকাল অবশ্য ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে চেকের পাওনা টাকা আদায় করিবার জন্য আলাদা আলাদা ভাবে মিলিত না হইয়া চেক বিনিময় গৃহে বা Clearing House মিলিত হয়, এবং ইহারই মারফত, পরস্পরের উপর কাটা চেক বাবদ দেনা-পাওনা কাটাকাটি হইয়া সামান্য নগদ আদান-প্রদান হইয়া থাকে।

হুণ্ডী

(Bill of Exchange)

একই দেশের ভিতর দূরবর্ত্তী স্থানসমূহের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে অথবা আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত অর্থ আদান-প্রদান ব্যাপারে হুণ্ডীর (bill of exchange) স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। হুণ্ডী হইতেছে মালপত্রের

বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতার উপর নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট টাকা দিবার লিখিত আদেশ-পত্র। আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে হুণ্ডী অপরিহার্য্য। ইহার দ্বারাই সহজে দেনা-পাওনা মিটানো সম্ভব হয়।

মনে করা যাক, কলিকাতার ব্যবসায়ী রাম পাল ইংলণ্ডের স্মিথ নামক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে এক হাজার পাউণ্ড মূল্যের যন্ত্রপাতি আমদানি করিয়াছেন, এবং কলিকাতার অপর এক ব্যবসায়ী শ্রীদাম সাহা এক হাজার পাউণ্ড মূল্যের চট ইংলণ্ডের এক ব্যবসায়ী জোনসের নিকট রপ্তানি করিয়াছেন। ইংলণ্ডের স্মিথ কলিকাতায় রাম পালের নিকট এক হাজার পাউণ্ড পাইবেন, এবং কলিকাতার শ্রীদাম সাহা ইংলণ্ডের জোন্‌সের নিকট এক হাজার পাউণ্ড পাইবেন। এই অবস্থায় কলিকাতা হইতে রাম পাল এক হাজার পাউণ্ডের স্বর্ণ ইংলণ্ডে স্মিথের নিকট পাঠাইয়া, এবং ইংলণ্ড হইতে জোন্‌স্ এক্ হাজার পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ কলিকাতায় শ্রীদাম সাহার নিকট পাঠাইয়া নিজের নিজের দেনা পরিশোধ করিতে পারেন। কিন্তু স্বর্ণ পাঠাইবার খরচ আছে ; তাহা ছাড়া প্যাক্ করিবার ও ইন্‌সিওর করিবারও খরচ আছে। পথে চুরি হইয়া বা অন্যভাবে খোয়া যাইবার ঝুঁকিও রহিয়াছে। এই সব বিপদ ও হাঙ্গামা এবং অনিশ্চয়তা এড়াইয়া হুণ্ডীর সাহায্যে সহজে আন্তর্জাতিক লেন-দেন সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কলিকাতার শ্রীদাম সাহা ইংলণ্ডের জোন্‌সের নামে এক হাজার পাউণ্ডের এক হুণ্ডী কাটিবেন। কলিকাতার অপর ব্যবসায়ী রাম পালকে ইংলণ্ডের স্মিথের নামে এক হাজার পাউণ্ড পাঠাইতে হইবে। রাম পাল জোন্‌সের নামে শ্রীদাম সাহার কাটা হুণ্ডী কিনিয়া লইবেন এবং এই হুণ্ডী ইংলণ্ডে স্মিথের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। ইংলণ্ডে স্মিথ এই হুণ্ডী দিয়া জোন্‌সের নিকট হইতে এক হাজার পাউণ্ড আদায় করিয়া লইবেন। এই ভাবে ইংলণ্ড ও কলিকাতার মধ্যে দুই দফা বেচা-কেনা একটিমাত্র হুণ্ডীর মধ্যস্থতায় সম্পন্ন হইতে পারে, কিছুমাত্র নগদ টাকাকড়ির দরকার না হইতে পারে।

বাস্তব ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় লেন-দেন মিটাইবার জন্য অসংখ্য হুণ্ডী কাটা হইতেছে এবং ব্যাঙ্কের মারফত এই সব হুণ্ডীর সাহায্যে ধাতব অর্থ বা স্বর্ণ-রৌপ্য চালান না করিয়া, অথবা, শেষ পর্য্যন্ত নামমাত্র স্বর্ণ-রৌপ্য চালান করিয়া, বিপুল পরিমাণ আর্থিক মূল্যের ব্যবসা অতি সহজে সম্পন্ন হইতেছে। হুণ্ডীর প্রচলন ও প্রসার না ঘটিলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ের বিস্তার অসম্ভব হইত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ব্যাঙ্ক

(Bank)

অনেক দিন আগে ইংলণ্ডে লোকে উদ্বৃত্ত অর্থ চুরি-ডাকাতির ভয়ে স্বর্ণকারদের নিকট জমা রাখিত। স্বর্ণকারগণ ছিল প্রতিষ্ঠাবান ধনশালী ব্যক্তি, লোকে তাহাদের সততায় বিশ্বাস করিত। স্বর্ণকারগণ প্রথম প্রথম লোকের অর্থ জমা রাখিবার জন্য কিছু কিছু আদায় করিত। স্বর্ণকারগণ ক্রমশঃ দেখিতে পাইল যে, আমানতকারীরা সকলে এক সঙ্গে তাহাদের জমা দেওয়া অর্থ তুলিয়া লয় না। এই দেখিয়া স্বর্ণকারদের মধ্যে চতুর ব্যক্তিরা তাহাদের নিকট আমানতী অর্থের কিয়দংশ লোকের নিকট ধার দিতে আরম্ভ করিল। এই ভাবে ব্যাঙ্কিংএর উদ্ভব হইয়াছে শুনা যায়।

ব্যাঙ্কের কাজ কি?

(Functions of a Bank)

ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হইতেছে সকলের কাছ হইতে অর্থ আমানত লওয়া এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রয়োজনে টাকা ধার দেওয়া। আমানত (Deposit) প্রধানতঃ দুই প্রকার,—চালু আমানত (Current diposit) এবং স্থায়ী আমানত (Fixed diposit)। চালু আমানতের টাকা যে-কোনও সময় তুলিয়া লওয়া যায়; কিন্তু স্থায়ী আমানতের টাকা একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগে তুলিয়া লওয়া যায় না। চালু আমানতের উপর আমানতকারী চেক কাটিতে পারে। আমানতের উপর ব্যাঙ্ক সুদ দিয়া থাকে।

ব্যাঙ্কের আমানতী টাকা এবং মূলধন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের প্রয়োজনে ধার দেওয়াও ব্যাঙ্কের বড় কাজ। স্বর্ণ, সরকারী ঋণপত্র, বড় বড় কোম্পানির শেয়ার প্রভৃতি সম্পত্তি জামানত (Security) রাখিয়া সাধারণতঃ ধার দেওয়া হয়।

নোট প্রচলনও (Note issue) ব্যাঙ্কের একটি কাজ। আজকাল অবশ্য কোথাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্য কোনও ব্যাঙ্ক নোট-প্রচলন করিবার অধিকার ভোগ করে না। নোট প্রচলন করা আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের (Central Bank) একচেটিয়া অধিকার।

ব্যাঙ্কগুলি সকলে মিলিয়া বিনিময়ের মাধ্যমের একটা বড় অংশ সৃষ্টি করে। আজকাল অর্থনৈতিক দিক দিয়া উন্নত দেশসমূহে, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সাধারণ লেন-দেনের মধ্যে চেকের প্রচলন খুবই বেশী হইয়াছে। চেকগুলি চেক-বিনিময় গৃহের (clearing house) মারফত অধিকাংশ কাটাকাটি হইয়া যায়, সামান্য পরিমাণ অবশিষ্ট পাওনা ধাতব মুদ্রায় বা প্রচলিত বিহিত অর্থে মিটাইতে হয়।

হুণ্ডী কেনা অথবা বাটায় হুণ্ডী ভাঙ্গানো (discount) করা, হুণ্ডী বিক্রয় করা, বিদেশের মুদ্রা বিক্রয় প্রভৃতি কাজও ব্যাঙ্ক করিয়া থাকে। ইহাদের দ্বারা আন্তর্জাতিক ব্যবসায় সহজ হইয়াছে।

স্বর্ণালঙ্কার, দলিল প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য নিরাপদস্থানে জমা রাখাও ব্যাঙ্কের কাজ। আমানতকারীদিগের তরফে তাহাদের পাওনা আদায় করা এবং তাহাদের হইয়া দেয় টাকা যথাস্থানে দেওয়া, এই সব কাজও ব্যাঙ্ক করিয়া থাকে।

বিভিন্ন রকমের ব্যাঙ্ক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

(Different kinds of Banks and Central Bank)

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank) হইতেছে ব্যাঙ্ক জগতের মধ্যমান। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া (Reserve Bank of India) আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক অফ্ ইংলণ্ড (Bank of England) ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। প্রায় প্রত্যেক দেশেই একটি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দেশের আর্থিক ব্যবস্থা এবং ব্যাঙ্ক জগৎ নিয়ন্ত্রিত করে। দেশের ব্যাঙ্কসমূহ যাহাতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলিতে বাধ্য হয়, সেই জন্য দেশের ব্যাঙ্কসমূহকে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয় এবং নানা রকম বিধি নিষেধ মানিতে হয়। দেশের ব্যাঙ্কসমূহ তাহাদের দুর্দ্দিনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থাকিলে, উপযুক্তভাবে পরিচালিত কোনও ব্যাঙ্কের দেউলিয়া হইবার ভয় থাকে না। কারণ, কোনও কারণে সকল আমানতকারী যদি এক সঙ্গে ভয় পাইয়া তাহাদের টাকা তুলিতে যায় (অর্থাৎ ব্যাঙ্কের উপর run হয়) অথবা অন্য কোনও কারণে ব্যাঙ্কের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যথোপযুক্ত সাহায্য দান করিয়া ব্যাঙ্ককে সঙ্কটের হাত হইতে বাঁচাইয়া থাকে। কখনও হয়ত দুই একটি ব্যাঙ্কের ভুলের জন্য অথবা অন্য কারণে,

সমস্ত ব্যাঙ্কিং জগতের মধ্যে আস্থার অভাব দেখা দেয় এবং দেশ ভয়ঙ্কর আর্থিক সঙ্কটের মুখে পড়ে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োজনমত সাহায্য দিয়া দেশের আর্থিক সঙ্কট নিবারণ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের উদ্‌বৃত্ত অর্থ জমা রাখায়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্ক (banker to the Government) হিসাবে কাজ করে। দেশের মধ্যে কাগজী অর্থ প্রচলন (note issue) করিবার ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাগজী অর্থ প্রচলনের নিয়ন্ত্রণের উপর অধিকার থাকার জন্য মোট অর্থের পরিমাণ (currents) নিয়ন্ত্রিত করে। ব্যাঙ্কসমূহের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করিয়া এবং হুণ্ডী ভাঙ্গাইবার বাটার হার (discount rate বাড়াইয়া কমাইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের প্রচলিত 'ক্রেডিট' (credit) নিয়ন্ত্রিত করে।

দেশ যদি স্বর্ণমাণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে দেওয়া হয়। দেশের অর্থমাণ যাহাতে স্থায়ী (stable) থাকে, যাহাতে দেশের অর্থের আভ্যন্তরীণ মূল্য এবং আন্তর্জাতিক মূল্য স্থির থাকে, তাহা দেখাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান কর্ত্তব্য।

অন্যান্য ব্যাঙ্ক
(Other Banks)

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক (Commercial Banks)—এগুলি ব্যবসায়ীদিগকে সাধারণতঃ অল্প-মেয়াদী ঋণ দিয়া থাকে।

শিল্প-সংক্রান্ত ব্যাঙ্ক (Industrial Banks)—এগুলি শিল্পপতিদিগকে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণ দিয়া থাকে। এসমস্ত ছাড়া বিনিময় ব্যাঙ্ক (Exchange Banks) কৃষি ব্যাঙ্ক, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের ব্যাঙ্ক রহিয়াছে।

ষোড়শ অধ্যায়

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য

(International Trade)

কোন দেশেই তাহার প্রয়োজনীয় সকল জিনিষ উৎপন্ন হয় না। ইংলণ্ডে চা উৎপন্ন হয় না, তেমনি, ভারতবর্ষে টিন পাওয়া যায় না। আবার ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের বাহিরে কোথাও পাট উৎপন্ন হয় না। ইংলণ্ডের লোক্জনকে চা-উৎপাদনকারী ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশসমূহ হইতে চা আমদানি করিতে হইবে, এবং ভারতবর্ষকে টিন উৎপাদনকারী মালয় প্রভৃতি দেশ হইতে টিন আমদানি করিতে হইবে ; আবার, ভারতবর্ষ ও পাকিস্থান হইতে বিভিন্ন দেশকে পাট কিনিতে হইবে। এইভাবে, প্রত্যেক দেশের লোককে দেশের মধ্যে কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপন্ন না হওয়ায় সেগুলি অন্য দেশ হইতে আমদানি করিয়া কাজ চালাইতে হয়। দেশে উৎপন্ন হয় না বলিয়াই যে, সব সময় কোনও জিনিষ আমদানি করিতে হয় তাহা নহে, সেই জিনিষ হয়ত দেশে উৎপন্ন করিতে হইলে বেশী খরচ পড়ে, অথবা সেই জিনিষ দেশে যতটা উৎপন্ন করা যায় যাহা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নহে। এসব ক্ষেত্রেও অন্য দেশ হইতে আমদানি করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা

(Advantages of International Trade)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রথম সুবিধা এই যে, ইহার সাহায্যে লোকজন দেশে যে জিনিষ উৎপন্ন করিতে পারে না, অথবা যে জিনিষ অতিকষ্টে ও বেশী ব্যয়ে উৎপন্ন করিতে পারে, তাহা অন্য দেশ হইতে আমদানি করিয়া ভোগ করিতে পারে। আমেরিকা বা অন্যান্য দেশ পাট উৎপাদন করিতে পারে না, আন্তর্জাতিক ব্যবসায় থাকার ফলে ভারতবর্ষ হইতে পাট আমদানি করিয়া অন্য দেশগুলি কাজ চালায়। ভারতবর্ষ আবার বিদেশ হইতে টিন, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু এবং কল-কব্জা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি জিনিষ আমদানি করে, কখন কখন খাদ্যদ্রব্যের অভাব বলিয়া আবার অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে খাদ্যও আমদানি করে।

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ফলে প্রত্যেক দেশ, যে যে জিনিষ উৎপাদনে তাহার তুলনাত্মক সুবিধা (comparative advantage) আছে, সেই সেই জিনিষ সে উৎপন্ন করে, অন্যান্য দেশের যে যে জিনিষ উৎপাদনে তাহার তুলনাত্মক অসুবিধা আছে, সেগুলি আমদানি করে। যে দেশ যে জিনিষগুলি অপেক্ষাকৃত সস্তায় ও সহজে উৎপন্ন করিতে পারে, সে দেশে সেই জিনিষগুলি উৎপন্ন করিয়া বিনিময়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ আমদানি করিয়া লয়। প্রত্যেক দেশ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ জিনিষ উৎপাদনে রত হয়, এবং অন্যান্য জিনিষ আমদানি করে। এইরূপে আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগের (international division of labour) ফলে সমস্ত পৃথিবীতে জিনিষপত্র উৎপাদনের ব্যয় কম পড়ে। প্রত্যেক দেশ সস্তায় সকল জিনিষ ভোগ করিতে পারে। পৃথিবীতে মোট উৎপাদনের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয় এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে নিযুক্ত সকল দেশই লাভবান হয়।

আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের ফলে, দেশসমূহ পরাজয়ের উপর নির্ভরশীল হয়। কেহই নিজের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন করে না, কতকগুলি জিনিষ উৎপন্ন করে, বাকী সব জিনিষ অন্যান্য দেশ হইতে আমদানি করে। এইরূপে পারস্পরিক সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি পায় এবং ফলে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে লিপ্ত দেশগুলি বন্ধুত্বের সূত্রে গাঁথা হয় বলিয়া পৃথিবীব্যাপী শান্তি স্থাপন করা সহজ হইতে পারে।

আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের মন্দ দিক
(Disadvantages of International Trade)

অনেক সময় এই কথা বলা হয় যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে পৃথিবীতে শান্তির পথ প্রস্তুত হয়, কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অংশলাভের কাড়া-কাড়ির জন্য পৃথিবীব্যাপী অশান্তি ও যুদ্ধের আগুনও জ্বলিয়া উঠিতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা, অর্থনৈতিক দিক দিয়া উন্নত দেশসমূহ কর্ত্তৃক অনুন্নত দেশসমূহের শোষণ পৃথিবীকে ক্রমশঃ যুদ্ধের মুখে আনিয়া ফেলে। মানুষের লোভ ও হিংসা প্রণোদিত অস্বাভাবিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই পরিণতির কথা বাদ দিলেও, আর এক দিক দিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অসুবিধার কথা উল্লেখ করা যায়। যখন যুদ্ধ বাধিবার ফলে অথবা অন্য কোনও কারণে মালপত্র বিদেশ হইতে আমদানি এবং বিদেশে রপ্তানি বন্ধ হইয়া যায়, তখন দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষতি হয়, আর্থিক বিপর্য্যয় হয়, বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি পায় এবং লোকজনের খুবই কষ্ট হয়।

আমদানি-রপ্তানির জের এবং দেনা-পাওনার জের

(Balance of Trade and Balance of Account)

প্রত্যেক দেশ বিদেশ হইতে কতকগুলি জিনিষ আমদানি করে এবং কতকগুলি জিনিষ বিদেশে রপ্তানি করে। কোনও দেশের আমদানি ও রপ্তানি মালপত্রের মূল্য সচরাচর সমান হয় না। কখনও দেশের আমদানি মালের পরিমাণ রপ্তানিকৃত মালের চেয়ে বেশী মূল্যের হয়, আবার কখনও বা, রপ্তানি মালের পরিমাণ আমদানিকৃত মালের চেয়ে বেশী মূল্যের হয়। আমদানি ও রপ্তানিকৃত মালপত্রের পার্থক্যকে আমদানি-রপ্তানির জের (বা Blance of Trade) বলা হয়। দেশের রপ্তানিকৃত মালের মূল্য যদি আমদানিকৃত মালের মূল্য অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাণিজ্যে অনুকূল উদ্বৃত্ত (Favourable balance of trade) বলে ; আর দেশের আমদানিকৃত মালের মূল্য যদি রপ্তানিকৃত মালের মূল্য অপেক্ষা বেশী হয়, তাহা হইলে বাণিজ্যে প্রতিকূল উদ্বৃত্ত (Unfavourable balance of trade) বলে। বাণিজ্য অনুকূল উদ্বৃত্ত (Favourable balance of trade) হইলে, বিদেশ হইতে উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের মূল্য স্বরূপ দেশে স্বর্ণ আসিবে ; এইজন্য ইহাকে অনুকূল বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। আর, বাণিজ্য প্রতিকূল উদ্বৃত্ত (Unfavourable balance of trade) হইলে, দেশ হইতে বিদেশে উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের মূল্য স্বরূপ স্বর্ণ পাঠাইতে হইবে, এইজন্য ইহাকে প্রতিকূল বলিয়া বিবেচনা করা-হইবে।

দুই দেশের মধ্যে কেবলমাত্র মালপত্র আমদানি রপ্তানির জন্য যে অর্থের আদান-প্রদান করিতে হয়, তাহা নহে, উভয় দেশের মধ্যে নানারকম উপকার বা সেবার (service) বিনিময়েও অর্থের আদান-প্রদান প্রয়োজন হয়। হয়ত এক দেশে অন্য দেশের ব্যাঙ্ক ও ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানি আছে। ব্যাঙ্ক ও ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানি যে উপকার করে, তাহার বিনিময়ে তাহাদের অনেক টাকা পাওনা হয়। আবার, হয়ত এক দেশের জাহাজী কোম্পানি অন্য দেশের মালপত্র ও যাত্রী বহন করে। ইহাতেও এক দেশের লোকের কাছে অন্য দেশের কোম্পানির টাকা পাওনা হইতে পারে। এইরূপ নানা কাজের জন্যে দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক দেনা-পাওনা হয়। মালপত্র আমদানি রপ্তানি এবং অন্যান্য প্রকার কাজের জন্য দেনা-পাওনার হিসাব বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এই সর্ব্বপ্রকার দেনা-পাওনার পার্থক্যকে দেনা-পাওনার জের (Balance of Accounts) বলে।

অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ
(Free Trade and Protection)

অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) বলিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর কোনওরূপ বাধা নিষেধ আরোপ না করা বুঝায়। কোনও দেশ যখন বিদেশের সহিত বাণিজ্যের উপর কোনও বাধা নিষেধ আরোপ না করে, যখন সে দেশে বিনা বাধায় অন্য দেশ হইতে মালপত্র আমদানি করা চলে, তখন সেই দেশ অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) নীতি গ্রহণ করিয়াছে বলা যায়। এইরূপ দেশেও শুধুমাত্র রাজস্ব (revenue) আদায় করিবার জন্য অল্প হারে আমদানি শুল্ক (import duty) বসানো হইতে পারে, কিন্তু এই আমদানি শুল্ক দেশের শিল্প সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে না বসাইয়া শুধুমাত্র সরকারী আয় (revenue) অর্জ্জন করিবার উদ্দেশ্যেই বসানো হইয়া থাকে।

সংরক্ষণ (Protection) বলিতে দেশের শিল্পসমূহ সংরক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর বাধা নিষেধ আরোপ করা বুঝায়। যে দেশ সংরক্ষণ-নীতি গ্রহণ করে, সে দেশ আভ্যন্তরীণ শিল্পের উন্নতির জন্য উচ্চ হারে আমদানি শুল্ক বসাইয়া বৈদেশিক প্রতিযোগিতা ক্ষুণ্ণ করিয়া এবং অন্য বিবিধ উপায়ে দেশের শিল্পের উন্নতি করিবার চেষ্টা করে। সাধারণতঃ, সংরক্ষণ-নীতি বলিতে দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষুণ্ণ করিয়া দেশীয় শিল্পের সহিত প্রতিযোগী দ্রব্যসমূহের আমদানির উপর রক্ষণ-শুল্ক (protection duty) বসানো বুঝায়। কোনও কোনও সময় এই উদ্দেশ্যে, রক্ষণ-শুল্ক না বসাইয়া, দেশীয় শিল্পকে অর্থ-সাহায্য করা হইয়া থাকে। আমদানি বিদেশী মালের উপর রক্ষণ-শুল্ক বসাইবার ফলে অথবা দেশীয় শিল্পকে সাহায্যদানের ফলে, দেশীয় শিল্পের উৎপন্ন মালপত্র বিদেশ হইতে আমদানি মালপত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারে। আমদানি দেশীয় মালের উপর যখন রক্ষণ-শুল্ক বসানো হয়, তখন আমদানি বিদেশী মালের মূল্য বাড়িয়া যায় এবং দেশী শিল্পসমূহ অনায়াসে তাহাদের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারে। আর, যখন দেশীয় শিল্প সরকারী আর্থিক সাহায্য লাভ করে, তখন, দেশী শিল্পের উৎপন্ন মালের দাম কম পড়িবে এবং সে ক্ষেত্রেও তাহারা বিদেশী প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইবে না।